ইতিহাস-অনুসন্ধান ৫

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে পেশ করা প্রায় ৫০টি প্রবন্ধ-সম্বলিত ইতিহাস-অনুসন্ধান ৫ প্রকাশিত হল। সম্মেলনের মূল নিবন্ধ পেশ করেছিলেন, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক বিপান চন্দ্র—ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ব্যাখ্যা নিয়ে ইতিহাসবিদদের বিভিন্ন মূল্যায়ণের উপর। বিভিন্ন বিভাগীয় সভাপতির ভাষণ দেন সর্বশ্রী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রমাকান্ত চক্রবর্তী, অমলেন্দু দে ও হরি বাসুদেবন। এঁদের সকলের ভাষণই আমরা এই সংকলনে প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। তাছাড়া রয়েছে ৪০টির উপর প্রবন্ধ—নবীন ও প্রবীণ গবেষকদের। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে প্রাচীন ইতিহাসে নতুন গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত থেকে শুরু করে ১৯৪৬-এর নৌবিদ্রোহ পর্যন্ত প্রবন্ধগুলির ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য। ইতিহাসে মেয়েদের স্থান ও অবদানের উপর অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধও এই সংকলনকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

এক দশক আগে বুকে ভরসা বেঁধে বাংলা ভাষায় ইতিহাসচর্চার এই প্রগতিশীল পদক্ষেপ আমরা নিয়েছিলাম। সেদিনের প্রথম ক্ষীণধারা আজ বহু স্রোতের সম্মিলনে বেগবান ও জনপ্রিয়। এরজন্য একটা বড় কৃতিত্ব পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলার মহাবিদ্যালয়ে ছড়িয়ে থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গবেষকদের এবং উৎসাহী প্রকাশক কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোং-এর। তাঁদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কালান্তর ছাপাখানার সর্বস্তরের কর্মীদের ঐকান্তিক, সযত্ন প্রয়াস ছাড়া এই সংকলন সময়মত বের করা সম্ভব হত না। তাঁদেরও অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই। ইতি—

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০

২, পাম প্লেস

কলকাতা-৭০০ ০১৯

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

ভারতের জাতীয় আন্দোলন ঃ ইতিহাসবিদদের প্রধান প্রধান মূল্যায়ণগুলি

বিপান চন্দ্র

১

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ও সহকর্মীবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের শিক্ষকদের সঙ্গে আমাকে ভাব বিনিময়ের সুযোগ দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। আমার এই ভাষণের প্রধান বিষয়বস্তু হল 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের মুখ্য ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাসমূহ'।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের চারটি মুখ্য দিক যাদের সঙ্গে অন্যান্য প্রধান-অপ্রধান বিষয়ও সম্পৃক্ত হয়ে আছে সেগুলো হল ঃ

(১) উপনিবেশবাদ ও ভারতীয় জনগণের সঙ্গে তার বিরোধ ;
(২) জাতি হিসাবে ভারতের বিকাশ ;
(৩) জাতীয় আন্দোলনে প্রতিফলিত স্বার্থ আর তার সামাজিক অথবা শ্রেণীচরিত্র ; এবং
(৪) জাতীয় নেতৃত্বের গৃহীত কৌশল বা স্ট্রাটেজি।

ঐতিহাসিকদের বিগত শত বছরের সাধনায় ইতিহাসচর্চায় তিনটি প্রধান বিদগ্ধ গোষ্ঠীর সন্ধান মেলে যাঁরা স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত চারটি দিক নিয়ে সুনির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ রেখেছেন। এঁরা হলেন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী, জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী ও মার্কসবাদী গোষ্ঠী। এঁদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্পষ্টতই বেশ কিছুটা পার্থক্য থাকলেও উল্লিখিত চারটি দিকের উপর আলোকসম্পাতে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর সুবাদে ভিন্ন গোষ্ঠী হিসাবে এঁরা স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসচর্চায় আর একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল গোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব ইতিহাসচর্চা এবং ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী, জাতীয় আন্দোলন ও সাম্যবাদী দলের যথার্থ চিন্তাধারা ও কার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ও সমাপতন। প্রায়শঃই,

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক ও প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ডঃ বিপান চন্দ্র, ১৯৮১র নভেম্বর মাসে ইতিহাস সংসদের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে মূল নিবন্ধ বলে যে লেখাটি পাঠিয়েছিলেন এটি তারই পূর্ণ বঙ্গানুবাদ।

গোষ্ঠীগুলো সাম্রাজ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী ও সাম্যবাদীদের বাস্তব রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অনুশীলনের ঐতিহাসিক চর্চা তথা তত্ত্বের প্রতিনিধিত্বকারী বলে অভিহিত হতে পারে।

২

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত হয় Dufferin, Curzon, Hamilton ও Minto-র সরকারী ঘোষণার মধ্যে। সর্বপ্রথম এ বিষয়টি খুব জোর দিয়ে প্রকাশিত হয় V. Chirol, Rowlatt (Sedition) কমিটি রিপোর্ট, Verney Lovett ও Montagu-Chelmsford রিপোর্টে। ১৯৪০ সালে মার্কিন পণ্ডিত Bruce T. Mc Cully শিক্ষাক্ষেত্রে এ বিষয়টির তাত্ত্বিক রূপ দেন। ১৯৪৭ সালে Percival Spear বিষয়টির উদারপন্থী ব্যাখ্যা প্রচার করেন আর পরিবর্তনবিরোধী ব্যাখ্যার প্রয়াসে ১৯৬৮ সালের পর অবদান রয়েছে এ ক্ষেত্রে Anil Seal ও Jack Gallaghar আর তাঁদের ছাত্র ও অনুগামীদের। বিস্ময়ের বিষয় হল অন্যান্য দুটি গোষ্ঠীর মত পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদী লেখকরা তাঁদের পূর্বসূরীদের কাছে কোন ঋণ স্বীকার করেন নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শীলের বইগুলোতে, এমনকি গ্রন্থপঞ্জীতেও Chirol, Lovett ও Rowlatt কমিটির রিপোর্টের কোন উল্লেখ নেই। Mc Cully-র প্রতি কোন বৌদ্ধিক ঋণও স্বীকৃত হয় নি যদিও সীলের নিজের রচনাও chiroz ও Mc Cully-র বক্তব্যের প্রতিফলন মাত্র—অবশ্য শীলের লেখায় সাম্প্রতিক সমাজতাত্ত্বিক অবোধ্য অথচ ঝাঁঝাল ভাষার নিদর্শনও মেলে। রাজ প্রতিনিধি-দের সম্বন্ধে তার বক্তব্যও Dodwell কিংবা Roberts-এর থেকে খুব স্বতন্ত্র নয়।

প্রথমদিকে ঔপনিবেশিকতাবাদী লেখকরা ও পরের দিকে সাম্রাজ্যবাদী লেখকরা ভারতবর্ষে আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোতে উপনিবেশবাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন অথচ এই উপনিবেশবাদই এ দেশের সমাজে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল ও বিদেশী সমাজ ও বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে ভারতীয় অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আত্মসমর্পণ সূচিত হয়েছিল। এঁদের লেখায় দেখা যায় না আর্থিক বিকাশে মৌলিক শোষণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে উপনিবেশবাদ স্থান পায় নি, পায় নি এদেশের অর্ধোন্নয়নের প্রধান কারণ হিসেবে। ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে উপনিবেশবাদের পরিণতিতে সংঘটিত সর্বগ্রাসী পরিবর্তনের কথা এখানে অবস্থিত কিংবা ঔপনিবেশিকতার প্রক্রিয়ার থেকে সেগুলো বিচ্ছিন্নভাবে উল্লিখিত। উপনিবেশবাদকে দেখানো এখানে একটি সাধারণ বিদেশী শাসন হিসাবে; ভারতবর্ষ চিত্রিত হয়েছে একটি

অনগ্রসর ঐতিহ্যশাসিত দেশ বলে—যেমনটি ছিল পশ্চিম ইউরোপ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে, কিংবা জাপান ও রাশিয়া যথাক্রমে ১৮৬৮ ও ১৮৯০-এর আগে। উপনিবেশবাদের অবসানেই যে ভারতের আর্থনীতিক বিকাশ ও তার পরবর্তী স্তরে উত্তরণ সম্ভব তা দেখানো হয় নি কিংবা প্রবলভাবে তা অস্বীকার করা হয়েছে।

সর্বোপরি, সাম্রাজ্যবাদী লেখকদের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণটাই ভর করে আছে এই অস্বীকৃতির উপর যে ভারতীয় জনগণের স্বার্থ এবং ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের স্বার্থ মৌলিকভাবে বিপরীতধর্মী। অথচ, সময়ের পথে বৈপরীত্যের ক্রমান্বয়িক বিকাশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি ভারতে প্রবল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের রথটি প্রশস্ততর করেছিল। এই ঘটনাটিই এই আন্দোলনটিকে ও তার নেতৃবৃন্দকে করেছিল জাতীয়তাবাদী কিংবা সাম্রাজ্যবাদী; সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনগণের স্বার্থ উপনিবেশবাদের বিপরীতে উল্লিখিত ঘটনাটিই পাদপ্রদীপে নিয়ে এসেছিল।

উল্লেখ্য যে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ঐতিহাসিকরা জাতীয় আন্দোলনের উন্মেষ ও বিকাশের অন্যান্য উপাদানের অনেকগুলোকে স্বীকার করেন; এমন কি 'উপনিবেশবাদ' শব্দটিকেও তাঁরা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন যদিও তাঁরা উপনিবেশবাদের শোষণমূলক ও আর্থিক বিকাশের পরিপন্থী চরিত্র ও তারই পরিণতিতে উপনিবেশবাদ আর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও ভারতীয় জনগণের মধ্যেকার মৌল বিরোধ ও বৈরীতার উৎপত্তিকে অস্বীকার করেন (আমার দৃষ্টিতে একজন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহাসিককে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক থেকে পৃথক করার ক্ষেত্রে এই সদ্যউল্লিখিত বিষয়টি একটি লিটমাস পরীক্ষার সঙ্গে তুলনীয়)। ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এইসব সাম্রাজ্যবাদী লেখকরা অস্বীকার করেন যে ভারতের জাতীয় আন্দোলন উল্লিখিত বিরোধের ভারতীয় সংস্করণ মাত্র কিংবা এটা ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কেননা তা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছিল মাত্র। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই আন্দোলন কিংবা সংগ্রামকে একটা প্রহসনের যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছেন, বলেছেন এটি একটি—"নকল যুদ্ধ।"[১]

(দৃষ্টান্তস্বরূপ, শীল লিখছেন: "আইন অমান্য আন্দোলন, নয়া সংবিধান, ১৯৪২ সালের সংঘর্ষ—সবই ছিল দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যেকার একটি বিস্ময়কর সংগ্রামের অংশস্বরূপ, দুটি ফাঁপা মূর্তির মধ্যে একটি দশেরা প্রতিযোগিতা"(বাস্তব নয়, বরং রামলীলা নাটিকা) যা শক্তিহীন ও নকল

যুদ্ধের পটভূমিকায় প্রতিবিম্বিত।" তাঁর মতে ভারতে সত্যকারের রাজনৈতিক যুদ্ধ হয়েছিল ১৯৪৬-৪৭ সালে "ভারতীয়দের মধ্যে" সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্যে। লেখকের ভাষায় "সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে আপাত সংঘর্ষ হয়েছিল", বাস্তব ব্যাপারটি ছিল তাদের "আসল অংশদারিত্ব" (ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, পৃ ৩৫১ ও ৩৪২—The Emergence of Indian Nationalism, pp 351 & 342)

এই মৌল বিরোধের অস্বীকৃতি ইতিহাসচর্চার এই গোষ্ঠীর পুরো দৃষ্টিভঙ্গীটাকে বিকৃত করেছে ও এর ব্যাখ্যামূলক তাৎপর্য বিনষ্ট করেছে। অবশ্য ভিন্ন একটি কাঠামোতে অন্য পণ্ডিতদের এক্ষেত্রে সাহায্য করেছে বিশদ গবেষণা।

Ripon থেকে Perceival Spear পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর একটি উদারনৈতিক ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। এর ব্রিটিশ প্রতিরূপ ব্রিটেনের শৈল্পিক পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশে 'প্রগতি' ও 'স্বাধীনতা'র ধারণার ভূমিকা স্বীকার করেছে। এরই অনুকরণে উদারপন্থী সাম্রাজ্যবাদী লেখকেরা জাতীয় আন্দোলনকে 'সত্যিকারের' বৈধ আন্দোলন বলেছেন বটে তবে ঔপনিবেশিক বিরোধ কিংবা শোষণ আর পাশ্চমী শিক্ষা ও চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শের বিস্তার ও উপলব্ধিকে মানেন নি। জাতীয়তাবাদকে খোঁজা হয়েছে জাতীয়তাবাদের ধারণার কিংবা মতাদর্শের মধ্যে, তার বস্তুগত মূলের অন্বেষণ হয় নি। ভারতীয় স্বাদেশিকতায় এ ধারণার প্রমাণ মেলে নি তাঁদের কাছে—তা এদেশে আমদানী করা হয়েছে ব্রিটিশের দ্বারা—ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক না কেন। প্রচার কিংবা ব্যক্তিগত গুণ বা সৃজনশীল ক্ষমতার মাধ্যমে নেতৃবৃন্দের অধিকতর ক্ষমতা ও শিক্ষার বিস্তারের মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলন ও তার ক্রমবর্ধমান উগ্রতার উল্লেখ হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। জনগণের মধ্যে প্রচারের উৎকর্ষ ও তজ্জনিত সাফল্য প্রচার ও প্রচারকারীদের অন্তর্নিহিত গুণেরই দৃষ্টান্ত—সামাজিক প্রেক্ষিতের প্রতিফলনের নয়। সাম্রাজ্যবাদী লেখকদের ভারতীয়রা জাতি হিসাবে উন্মেষিত হবার যোগ্য নয়। ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে তাঁরা বলে আসছেন যে ভারতবর্ষ জাতিই নয়; এ দেশ একটি ভৌগোলিক অভিব্যক্তি মাত্র যাকে সাম্রাজ্যবাদীরা একটি বৃহত্তর ও কৃত্রিম অর্থ দিয়েছে। অধিকন্তু ভারতে জাতিগত প্রক্রিয়াই হয় নি অন্ততঃ ঐতিহাসিক দিক থেকে; তাই ভারত জাতিত্বে পরিণত হচ্ছে না। ভারতবর্ষ যাকে বলে তা হল ধর্মীয় ও জাতপাতের দিক থেকে সম্প্রদায় ও স্বার্থের সমন্বিত রূপ। সে কারণে, ভারতীয় জাতি কিংবা ভারতীয় জনগণ অথবা সামাজিক শ্রেণীগুলোকে

কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনীতির গোষ্ঠীবলয়ের প্রস্তাব ঠিক নয় কেননা আগে থেকেই এদেশে রয়েছে হিন্দু, মুসলিম, ব্রাহ্মণ, অ-ব্রাহ্মণ, আর্য, ভদ্রলোক ও অনুরূপভাবে পরিচিত গোষ্ঠী। এই মতটাকে ঘিরে এই অনুমান গড়ে উঠেছে যে যেমন ইউরোপ, এমনকি চীন ও জাপানেও ধর্মীয় ও সমরূপ গোষ্ঠীগুলো আর্থ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর আধুনিক জাতি ও শ্রেণীবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল হওয়ায় আর প্রথাগত পরিচিতি পায় না, ভারতে কিন্তু এই ধরনের ধর্ম ও জাত-পাতভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোকে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডকে অতিক্রম করে আর্থ-রাজনৈতিক সংগঠনের বনিয়াদ হতে হবে কেননা তারা জাতি ও শ্রেণীবিন্যাসের দ্বারা অতিক্রম হয় না হতেও পারে না। ভারতে ধর্ম ও জাতভিত্তিক সম্প্রদায়গুলো নির্দেশক গোষ্ঠী হিসাবে রয়েছে। সুতরাং, ভারতের জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক সংগঠনের বিষয়গত ভিত্তি হল তারা। অন্য ভাষায়, জাতি ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি হল প্রাথমিক আর জাতীয়তাবাদ আর একটা আবরণ মাত্র। যেমন শীল বলেছেন, "দূর থেকে প্রতিভাত তাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম তাদের নির্দেশক গোষ্ঠীগুলোর সংরক্ষণ অথবা বিকাশের প্রচেষ্টার নামান্তর।" (Emegence. p 342) (শীলের মতে, এটাই ভারতীয় জাতীয়বাদকে চীন, জাপান, মুসলিম দেশগুলো ও আফ্রিকা থেকে পৃথক করেছে।" (উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪২)

যদি ভারতীয় জাতীয় সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি ভারতীয় জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে উন্মেষিত না হয়ে থাকে, তবে তা কাদের স্বার্থ দেখেছে ? আবার, এর যথার্থ উত্তর ও যুক্তিগুলো ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের শুরুতে সরকারী আমলা ও সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্ররা বার করেছেন। এই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর লেখকরা জোর দিয়ে বলেছেন যে জাতীয় আন্দোলন গণ আন্দোলন ছিল না, ছিল বাছাই করা গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থ ও প্রয়োজনসিদ্ধির প্রয়াস মাত্র কেননা এ আন্দোলন তাদের নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ অথবা তাদের নির্দেশক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করেছে। তাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষ ও গতি সঞ্চারে ইন্ধন জুগিয়েছে মুষ্টিমের বাছাই করা গোষ্ঠীগুলোর প্রয়োজন ও স্বার্থ। এই মুষ্টিমেয় বাছাই করা গোষ্ঠী কখনও কখনও ধর্ম অথবা জাতপাতকে ভিত্তি করে, কখনও বা পৃষ্ঠপোষকতাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। যেভাবেই গড়ে উঠুক না কেন, ব্রিটিশ শাসনের কিংবা পরস্পরের বিরোধিতায় এই গোষ্ঠীর স্বার্থ বেশ সংকীর্ণ। প্রাথমিকভাবে তাই জাতীয়তাবাদকে একটা

মতাদর্শভাবে বিবেচিত করা যায় বা এইসব গোষ্ঠী তাদের সংকীর্ণ স্বার্থকে আইনসিদ্ধ করতে অথবা জনগণকে নিজেদের পিছনে সমবেত করতে ব্যবহার করে। এ দিক থেকে জাতীয় আন্দোলন একটা ষড়যন্ত্র বিশেষ অথবা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে এইসব গোষ্ঠীকর্তৃক জনগণের আনুকূল্য লাভের নামান্তর মাত্র।

জাতীয়তাবাদের এই ধরনের ব্যাখ্যাকে সুসংবদ্ধ উপায়ে Dufferin ও curzon কর্তৃক উপস্থাপিত হয় যখন তাঁরা নিজেদের স্বার্থে জাতীয়তাবাদকে শিক্ষিত অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর খুব নগণ্য সংখ্যক লোক ব্যবহার করছে বলে মন্তব্য করেন। সরকারী ও বেসরকারটি লেখায় অসংখ্য সরকারী কর্মী সম্পূর্ণভাবে এই তত্ত্বটিকে বাস্তবে ব্যবহার করেছে। পরে বিস্তৃতভাবে B B Misra, Anil Seal প্রমুখের দ্বারা। একই সঙ্গে কিছু লেখক এই যুক্তিও দেখিয়েছেন শিক্ষিত ভারতীয়দের একটি বাছাই করা গোষ্ঠী পুনার ব্রাহ্মণ, সাধারণ ব্রাহ্মণ, ভদ্রলোক, আর্য প্রভৃতি উচ্চতর জাতগোষ্ঠীরও প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই মতের প্রথম দিককার প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন Chirol, Lovett ও Rowlatt কমিটির রিপোর্টের রচয়িতারা। পরে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিপাটি ও সমাজতাত্ত্বিক দুর্বোধ্যতাসহ তা J. H. Broomfield ও Anil Seal-এর প্রয়াসে গৃহীত ও অভিযোজিত হয় যদিও অবশ্য তার জন্য পূর্বসূরীদের কাছে ঋণ স্বীকার করা হয় নি।

এই সাবেকী সাম্রাজ্যবাদী মতামতের সঙ্গে Gallaghar ও Seal আর ছাত্রদের দ্বারা সম্প্রতি দুটি অতিরিক্ত ঝালর ও মাত্রা যুক্ত হয়েছে। Duflerin, Curzon, Chirol, Lovett, Mc Cully ও B.B. Misra সদাশয় রাজের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদকে হতাশাগ্রস্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলো ব্যবহার করেছে বলে অভিমত দিয়েছেন আর Seal, Chirol ও Rowlatt কমিটির রিপোর্টে উল্লিখিত এরূপ সমান্তরাল মতের কথা বলেছেন যে ব্রিটিশদের আনুকূল্য লাভের প্রয়াসে জাতীয় আন্দোলনগুলো ভারতীয় মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংগ্রাম ছাড়া কিছু নয়। লেখকের নিজের ভাষায়, "এদেশীয় লোকদের স্বদেশী সমাবেশগুলোকে প্রধানতঃ বিদেশী অধিরাজত্বের বিরুদ্ধে নির্দেশিত বলা ভুল। সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের মধ্যেকার আপাত বিরোধগুলোর প্রতি অনেক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে ; এদের আসল যোগসূত্রের গবেষণা অন্ততঃ সমভাবে লাভজনক হবে।" তাই, জাতীয় আন্দোলনের উন্মেষ ও বিস্তৃতির প্রতি ব্রিটিশদের অবদান হল এটাই যে ভারতীয়দের মধ্যে বিভিন্ন অভিঘাত আর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন নতুন ক্ষেত্র ও প্রতিষ্ঠান তৈরী করে তা পারস্পরিক ঈর্ষা ও সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছিল। এখানে দ্বিতীয় মাত্রাটি

যুক্ত হয়েছে Seal, Gallaghar ও তাদের ছাত্রদের দ্বারা যখন তাঁরা বলেছেন যে জাতপাত ও ধর্মকে অতিক্রম করে ভারতের বাছাই করা গোষ্ঠীগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। Namier-কে আরও ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে তারা পৃষ্ঠপোষক-মক্কেলের সম্পর্কের মাধ্যমে এই ধরনের গোষ্ঠী গড়তে শুরু করেছে। বলা হয়েছে—স্থানীয় অঞ্চল ও প্রদেশগুলোতে ব্রিটিশরা প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারিত করলে স্থানীয় ক্ষমতাবান লোকেরা মক্কেলদের স্বার্থসিদ্ধিতে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করতে থাকে আর তাদের উপরের স্তরের পৃষ্ঠপোষকরা পালাক্রমে তাদেরই স্বার্থ দেখাতে থাকে। এইভাবে পৃষ্ঠপোষক-মক্কেলের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে ভারতীয় রাজনীতির সূত্রপাত হতে থাকে। কালক্রমে, বড় দরের নেতারা স্থানীয় ক্ষমতাবানদের রাজনীতিকে সংযুক্ত করতে এগিয়ে আসে। পালাক্রমে, অপরিহার্যভাবেই সারা ভারতে ব্রিটিশরাজ স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বভারতীয় দালালদের যুগ শুরু হয়। কাজে সাফল্য আনতে নিম্নতর স্তরগুলোতে ও জাতীয় আন্দোলনে বিভিন্ন মক্কেলদের সমবেত করতে সর্বভারতীয় দালালদের প্রাদেশিক স্তরে মধ্যবর্তী লোক বা দালালের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই দ্বিতীয় স্তরের নেতারা ছোট ঠিকাদাররূপে অভিহিত হতে পারে। রাজনৈতিকভাবে প্রধান প্রধান মধ্যস্থতাকারী নেতাদের মধ্যে, Seal-এর ভাষায়, উল্লেখ্য গান্ধী, নেহরু ও প্যাটেল। এই অবস্থায় জনগণের অবস্থান কোথায়? ১৯১৮ সাল পর্যন্ত তাদের ঠিক দেখা মেলে না। এর পরে, যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি, রোগ, খরা অথবা মন্দাজনিত অবস্থায় তাদের অস্তিত্বসম্পর্কিত নানা অভিযোগ ও কষ্টকে যাদের সঙ্গে উপনিবেশবাদের যোগ নেই মোটে, খুব চতুরতার সঙ্গে ব্যবহার করে তথা জনগণকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতাবানদের দলাদলিতে টেনে আনা হয়েছে।

চূড়ান্ত দৃষ্টিতে, এই ধরনের মতবাদ শুধুমাত্র ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বৈধতা, ঔপনিবেশিক শোষণ ও অর্ধ-উন্নয়নের ঘটনা আর মৌলিক বিরোধের ব্যাপারটিকেই শুধু অস্বীকার করে না, তা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে উৎসর্গীকৃত জীবন, জীবিকা ও স্বাধীনতার আদর্শকেও স্বীকার করে নি। যেমন S. Gopal বলেছেন, "রাজনীতিকে অন্তরশূন্য করেছেন বলে Namier-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে; কিন্তু এই গোষ্ঠী আরও এগিয়েছে আর শুধু অন্তরটাকেই রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নি, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন থেকে নম্রতা, চরিত্র, সততা ও নিঃস্বার্থ দায়বদ্ধতাকেও সরিয়ে দিয়েছে।" (The Indian Economic and Social History Review, Vol. XIV, No 3, p 405) অধিকন্তু, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে শ্রমিক, কৃষক,

নিম্নমধ্যশ্রেণীসমূহ ও নারীদের বোধশক্তিজ্ঞাপক ও সক্রিয় ভূমিকাকেও অস্বীকার করেছে। এরা নিজেদের প্রয়োজন ও স্বার্থসম্পর্কিত উপলব্ধি-শূন্য একদল বোবা জীব কিংবা শিশু-সুলভ মানুষ বলে চিত্রিত হয়েছে। বিস্ময় লাগে ভারতে কেন ব্রিটিশরা তাদের রাজনীতির পিছনে এদের কিছু লোককে কাজে লাগাতে পারে নি।

৩

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অন্ততঃ শিক্ষাগত দিক থেকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গবেষণায় জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীয় বিশেষ কিছু অবদান ছিল না। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ যেহেতু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে কোন অভিব্যক্তিকে পছন্দ করত না কিংবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিত, যেহেতু জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা তাদের জাতীয়তাবাদী অনুভূতির প্রকাশকে সীমিত করে রাখতেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের সত্যিকারের কিংবা জাল অধিনায়কদের মহিমাকীর্তনে। লাজপৎ রাই, এ. সি. মজুমদার, আর. জি. প্রধান, পট্টভি সীতারামাইয়া, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের হাতেই জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে রচনার ভার পড়ে, শুধু ব্যতিক্রম দেখা যায় গুরমুখ নিহাল সিংয়ের ক্ষেত্রে যিনি নিজে ১৯১৮ সালের পরে আর এগোন নি। এমনকি ১৯৪৭ সালের পরও জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী বিশ্লেষণাত্মক কিংবা ইতিহাস রচনার দিক থেকে বড় রকমের অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। বোম্বাই, বিহার, অন্ধ্র প্রদেশ ও আসামের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসচর্চায় কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লেখা রয়েছে ; তবে চরিত্রগতভাবে সে অবদানও মৌলিক অর্থে পরীক্ষামূলক মাত্র। দুর্বল লেখা আর. সি. মজুমদারের, বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোণ হতে ; তাছাড়া সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ও আধুনিক ভারতীয় উৎসের প্রকৃতিব উপলব্ধিতে ব্যর্থতাও ধরা পড়ে। জাতীয়তাবাদী রচনার দিক থেকে তারা তাঁদের লেখা শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করলেও তাতে ঔপনিবেশিক ও মার্কসীয় দৃষ্টিভংগীকে গ্রহণ করার সারগ্রাহী প্রয়াসে দুর্বলতা রয়েছে।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে এটার ভিত্তি ছিল ঔপনিবেশিকতার শোষণমূলক ও অর্ধ-উন্নয়নমূলক চরিত্রের প্রকৃত উপলব্ধি। প্রথমে অর্থনৈতিক ও কালক্রমে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতা ও ভারতীয় জনগণের মধ্যেকার বিরোধটিকে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছিল। দাদাভাই নওরোজি থেকে তিলক, গান্ধী ও নেহরু পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের ধারায় উপনিবেশবাদের চরিত্র আর ভারতীয় জনগণের স্বার্থের

সঙ্গে তার বিরোধ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি উল্লেখ্য। এই দুটির উপর ভিত্তি করেই বিদগ্ধ সমাজ ও সাধারণ মানুষের প্রতি আন্দোলনের আবেদন রাখা হত। অবশ্য একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই এই বিরোধ সম্পর্কে জ্ঞানের উদয় হয়েছে নেতৃবৃন্দ ও জনগণের মধ্যে।

বাস্তব দৃষ্টিতে উল্লেখিত কারণে আন্দোলনের গতিতে জাতীয় ঐতিহাসিক রচনা এগোতে পারে নি। উপনিবেশবাদের চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হয়েও উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী লেখকরা সামগ্রিকভাবে জাতীয় আন্দোলনকে প্রথমে বিদেশ থেকে আমদানী করা জাতীয়তাবাদের ধারণার জয়যাত্রা ও পরে ভারতীয় জনগণের কাছে তাকে স্বদেশী ব্যাপার বলে ঘোষণা করবার প্রবণতাই দেখিয়েছেন। তবে উদারপন্থী সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে তাদের পার্থক্য ছিল এই যে তাঁদের কাছে জাতীয়তাবাদের ধারণাতে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার কথাটি ছিল। তিনের দশকে ও পরেও জাতীয়তাবাদী লেখকরা ক্রমবর্ধমানভাবে তাঁদের বিশ্লেষণে উপনিবেশবাদের অর্থনৈতিক সমালোচনার কথাও তুলে ধরেছেন।

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ জাতি হিসাবে ভারতের পরিণতিপ্রাপ্তির প্রক্রিয়ার কথা ভাবলেও এ প্রক্রিয়ার পার্থক্যমূলক ও ঐতিহাসিক চরিত্র যার ফলে সংহতিনাশ হতে পারে তা ক্রমবর্ধমানভাবে অবহেলিত হতে থাকে। এ বিষয়টির প্রতি অবশ্য তারা চাঁদ পুরো দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী অধিকভাবেই জাতীয় আন্দোলনকে জনগণের আন্দোলন বলে দেখেন। তবু এর আসল দুর্বল দিকটিকে অনুসরণ করে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ ও তাকে জোরদার করতে গিয়ে ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত বিরোধগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে অথবা লঘু করে দেখাতে চেয়েছেন। অভ্যন্তরীণ শ্রেণী ও জাতপাতের পার্থক্যকে দেখানো হয় নি কিংবা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে তাদের যথার্থ ভূমিকা বিবেচিত হয় নি। সমস্ত ভারতবাসীকে একইভাবে সমান বিস্তারে উপনিবেশবাদের শিকার আর সেই কারণে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে জাতীয় আন্দোলন শ্রেণীপার্থক্য ও শ্রেণীচেতনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে আর উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের প্রসারে বিত্তবান শ্রেণীগুলোর স্বার্থের কাছে শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর স্বার্থকে বলি দিয়েছে। অনুরূপভাবে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা জাতীয় আন্দোলনের ভাবাদর্শ ও চরিত্রের উপর শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণী-আচরণের অভিঘাতের গবেষণাকে তুচ্ছ করার প্রবণতা দেখিয়েছেন। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে একটি 'বিশুদ্ধ' চরিত্রবিশিষ্ট জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষিতে শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীর কোন স্থান নেই।

বাস্তব জীবনে, সাম্রাজ্যবাদকে বুঝবার প্রাথমিক অথবা প্রধান দায়িত্ব পালন শ্রেণীবিভাজন ও শ্রেণীসংগ্রামকে সংহতিসূত্রে গ্রথিত করার দায় নিতে হয়েছে জাতীয় আন্দোলনকে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী এ সংহতির বিরুদ্ধতা করেছে। এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছে কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠী। শ্রেণীসংগ্রাম শুরু ও কিষাণসভা ও শ্রমিক সংঘগুলোকে সংগঠিত করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। তবে তারাও বাস্তবে জাতীয় ও সামাজিক সংগ্রামে সংহতি কেমন করে আনা যায় সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত থাকে নি। সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক কংগ্রেসের দক্ষিণভাগের অবস্থানেই থেকে গেছে কেননা ১৯৪৭ সালে ধনতান্ত্রিক দেশে ভারতবর্ষ কেন ও কিভাবে পরিণত হল তা তিনি ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হন নি। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ভারতীয় সমাজের ধর্মীয়, জাতপাত ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসের উপর রাজনৈতিক আচরণ ও আন্দোলনের অভিঘাতের মোকাবিলাতেও ব্যর্থ হয়েছেন।

৪

পরিশেষে জাতীয় আন্দোলনের মৌল দিকগুলোর উপলব্ধিতে আমি আমার কথা রাখতে পারি। মার্কসবাদী হলেও ঔপনিবেশিক পর্যায়ে পরিলক্ষিত সাম্যবাদী আন্দোলনের বিগত ঘটনাবলীর ব্যাপারে আর তৎকালীন মার্কসবাদী লেখকদের সঙ্গে আমার কিছু ভিন্ন মত রয়েছে, যেমনটি রয়েছে তার পরবর্তীকালেও আর. পাম দত্ত, এ. আর. দেশাই, ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদপ্রমুখের সঙ্গে।

(১) আমার মনেহয় ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দুটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপলব্ধি দিয়েই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গবেষণা কাজ শুরু করা উচিত। একটি দিক হল উপনিবেশবাদ ও ভারতীয় জনগণের মধ্যেকার বিকাশমান বিরোধ; অন্যটি হল জাতি হিসাবে ভারতীয়দের পরিণতি-প্রক্রিয়া।

বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় আন্দোলন মৌলিক অর্থে ছিল ভারতীয় জনগণের স্বার্থ ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদের স্বার্থের মধ্যস্থিত বিরোধের প্রতিফলন ছাড়া কিছু নয় যা ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজকে বিদেশী, মেট্রোপলিটান সমাজভিত্তিক শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের অধীনস্ত করেছিল। জীবন ও সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ শাসন উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা করেছে। উপনিবেশবাদের উৎখাত ছাড়া আর্থ-সামাজিক বিকাশ শুরু করাই যায় না। ফলে, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন হিসাবেই প্রধানতঃ বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে। এই প্রাথমিক বা মৌলিক বিরোধ ও তার অনুবর্তী সাম্রাজ্যবাদ-

বিরোধী সংগ্রামের প্রকৃতি বুঝতে প্রয়োজন হল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের মৌল চরিত্র, জাতীয় জীবন, তার বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, স্তর ও গোষ্ঠীর তার ভূমিকা ও অভিঘাতকে জানা। অধিকন্তু, বিদেশী শাসনের শর্তগুলো ভারতবর্ষকে একটি জাতিতে সংঘবদ্ধ করেছে, জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার সঞ্চার করেছে আর একটি শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য অনুকূল বস্তুগত, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

মনে রাখা দরকার যে ভারতসহ ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে পরিদৃষ্ট মৌলিক বা প্রাথমিক বিরোধের প্রকৃতি ইউরোপের জাতীয়তাবাদের জনক প্রাথমিক বিরোধের থেকে পৃথক। ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়েছিল সামন্তশ্রেণী ও সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা আর উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়া উৎপাদন রীতির মধ্যে বিরোধের পরিণতিতে। ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে, সমস্ত মানুষের, প্রধান প্রধান সমস্ত শ্রেণীর বিরোধ ছিল উপনিবেশবাদের সঙ্গে। উপনিবেশবাদ সমস্ত জনগণকে অত্যাচারিত করেছে ও সমস্ত সমাজের বিকাশকে বাধা দিয়েছে। এর অর্থ হল এই যে যেখানে ইউরোপে জাতীয়তা-বাদ ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব একই সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণী ও সামন্তপ্রথার মধ্যেকার শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিনিধিত্ব করেছে, সামন্তশ্রেণীগুলোর সঙ্গে বিরোধে কৃষকদের ভূমিকাকে উৎসাহ দিয়েছে, এমনকি পুঁজিবাদীদের সঙ্গে শ্রমিকদের বিরোধে রসদ জুগিয়েছে, সেখানে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে উপ-নিবেশবাদের মুখোমুখি সমগ্র মানুষের বিরোধ অন্যসব বিরোধকে ছাপিয়ে গিয়েছে। অন্য ভাষায়, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধ পেয়েছে প্রাথমিক ভূমিকা আর অভ্যন্তরীণ শ্রেণীবিরোধগুলো ছিল গৌণ। সামাজিক সংগ্রাম-গুলোর উপর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ভূমিকা ছিল মুখ্য। উপনিবেশ-বাদের বিরুদ্ধে জনগণের সমস্ত শ্রেণীর ঐক্যকে উন্নীত করতে হয়েছে; পক্ষান্তরে, সাম্রাজ্যবাদ চেয়েছে জনগণের মধ্যে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক, জাতপাত, আঞ্চলিকতা ও ভাষার ভিত্তিতে বিভাজন সৃষ্টি নয়, চেয়েছে শ্রেণীগতভাবেও বিভক্ত করতে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, আমি বিশ্বাস করি ঔপনিবেশিক যুগের ভারতবর্ষকে জাতিতে পরিণত হবার ব্যাপারটিকে বিষয়গত প্রক্রিয়া ও তার বিষয়ীগত চেতনা হিসাবে দেখা দরকার। উপরন্তু, জাতীয় আন্দোলন ছিল ক্রমেই একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভারতীয় জনগণ একটি জনসমাজ তথা জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি সাধারণ অর্থনীতি ও অনুরূপ বিষয়ের বিকাশ ছাড়াও, যেমন অতি উত্তমরূপে দৃষ্টান্তকারী গ্রন্থ The Social Background of Indian Nationalism-এ এ. আর. দেশাই দেখিয়েছেন, একটি পরিচিত শত্রু কর্তৃক

সাধারণভাবে দৃষ্ট উৎপীড়ন ও তারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভারতীয় জনগণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করেছে। সম্ভবতঃ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ছাড়া কোন জাতি বা জনসমাজ গড়ে উঠতে পারে না, যদিও ঔপনিবেশিক আধিপত্যের প্রকৃতি ও তার অভিঘাতের মধ্যে এ সংগ্রাম অন্তর্নিহিত ছিল। এই অর্থে অথবা এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জাতীয় আন্দোলনের পূর্ববর্তী কোন উপান্ত অথবা বিচারবুদ্ধিমূলক কোন ঘটনা হিসাবে জাতির ধারণা করা যায় না। ঔপনিবেশিক অবস্থায় কোন জাতি হল রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অনুশীলনের পরিণতি। তার শক্তি ও দুর্বলতা অংশতঃ জাতীয় আন্দোলনের শক্তি ও দুর্বলতারই প্রতিবিম্ববিশেষ। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম জাতিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া আর তার সক্রিয় অংশেরই ফল। জাতীয় চেতনা জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করে আর এই সংগ্রাম চেতনাকেও প্রেরণা দেয়।

একই সঙ্গে একথাও বলা যায় যে ভারতীয় জাতীত্বের সব প্রক্রিয়াই ছিল শ্লথগতি, আংশিক ও পার্থক্যমূলক। এই আংশিক ও পার্থক্যমূলক চরিত্র সৃষ্টি করেছিল নানা বাঁক, বিভাজন ও পথভ্রষ্টতা যেগুলোকে জাতিতে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গে দেখা যাবে, উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির অস্বীকৃতি কিংবা পৃথক জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন দিকের পরিপ্রেক্ষিতে নয়।

এ প্রসঙ্গে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, স্তর ও গোষ্ঠীগুলোর উপর ঔপনিবেশিকতার অভিঘাত আর উপনিবেশবাদের সম্পর্কে তাদের হতাশাও বিভিন্নভাবে ধরা পড়েছে। এ কথার অর্থ এই নয় যে ভারতে পৃথক পৃথকভাবে জাতীয় আন্দোলন বা জাতীয়তাবাদকে দেখা গেছে, যেমন, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, কৃষকশ্রেণীর জাতীয়তাবাদ, শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয়তাবাদ, গৌণ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, সামন্তযুগীয় জাতীয়তাবাদ। কিংবা এর অর্থ এই নয় যে জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদ একটি বিশেষ শ্রেণী অথবা শাখার বিশেষাধিকারের পর্যায়ভুক্ত ছিল—হয় মধ্যশ্রেণী কিংবা বুর্জোয়াশ্রেণী কিংবা হিন্দুদের। আসলে, কোন বিশেষ পর্যায়ে বাস্তব আন্দোলনে অংশগ্রহণ কিংবা হতাশার বিস্তার যাই হোক না কেন, উক্ত আন্দোলন উপনিবেশবাদের মুখোমুখি ভারতীয় জনগণের স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে।

এই দুটি বিষয়ের আলোচনার শেষে বলা যায়ঃ বিষয়গত বাস্তবতার বৈধ অথবা আইনসিদ্ধ চেতনার প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে দেখতে হবে। এই বিষয়গত বাস্তবতা হল আধুনিক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বাস্তব জীবনে সাধারণ স্বার্থের

বিকাশমান অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে পরিচিত শত্রু, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর যৌথ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা।

(৩) আমি বিশ্বাস করি যে ভারতের জাতীয় আন্দোলন জনগণেরই আন্দোলন ছিল, বিশ্বাস করি যে এই আন্দোলন সামগ্রিকভাবে জনগণ কিংবা জাতির অথবা সব শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছে। একই সঙ্গে এই আন্দোলন শ্রেণীদৃষ্টিকোণ হতেও পরিচালিত হয়েছে; জনগণের আন্দোলন হিসাবে এর শ্রেণীচরিত্রও উদ্ভাসিত। বুর্জোয়া আন্দোলন হিসাবে তা গণ্য হতে পারে না; এ আন্দোলনে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রধান ভূমিকা ছিল না কিংবা বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাদের শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে নি। সংগ্রামের বিন্যাসে এর শ্রেণীচরিত্র ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে না তার কৌশলগত পশ্চাদপসরণ ও আপোষের ঘটনায়। এ আন্দোলনকে বুর্জোয়া আন্দোলন বলা চলে এই অর্থে যে তাঁর প্রধান মতাদর্শ কিংবা সামাজিক দর্শানুনুপাত অথবা স্বাধীন ভারতের সামাজিক ছবি একটা বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে বিস্তীর্ণভাবে সীমিত ছিল। অন্য ভাষায়, এর শ্রেণীচরিত্রকে দেখতে হবে তার বাস্তব রাজনীতি, মতাদর্শ, পরিকল্পনা ও নীতিসমূহের মধ্যে। বুর্জোয়া মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ছিল তা। এই ধরনের বর্ণনার আর একটি সুবিধা আছে। প্রতিটি পর্যায়ে, বিশেষ করে দুইয়ের দশকের শেষভাগ থেকে চারের দশকের মাঝামাঝি সমাজতান্ত্রিক ধারণার বিকল্প প্রভাবের প্রতি তা উন্মুক্ত ছিল। সদ্য উল্লিখিত দর্শানুনুপাতের বাস্তবায়ন হয় নি অথচ আমার মতে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর এখনও পর্যন্ত মার্কসবাদী লেখকরা আলোকপাত করেন নি; হয়ত এই অনুমানে যে আসল আন্দোলনটি ও তার নেতৃত্ব ছিল পুঁজিবাদভিত্তিক। আর যদি সেটা বুর্জোয়া আন্দোলনই হয়ে থাকে তবে বিকল্প সমাজতান্ত্রিক আধিপত্য তার আসার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তখন এর রূপান্তরের প্রশ্নও ওঠে না। তখন হয় তাকে মিশে যেতে হবে একটি সমান্তরাল বিকল্প সমাজতান্ত্রিক স্রোতে অথবা তারই দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা উৎপাটিত হতে হবে আর এ প্রক্রিয়া ঘটবে কোন সংকট-মুহূর্তে।

বেশ আগ্রহের সঙ্গে বলা যায়, ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী আসল জাতীয় আন্দোলনের মুক্ত ব্যাপারটি দেখেছিল ও সে বিষয়ে ভয়ও ছিল তাদের। এই মুক্ততার অন্তর্নিহিত দুটি সম্ভাবনা যেগুলি তাদের দিক থেকে ছিল সমানভাবে বিপজ্জনক। তারা দেখেছিল :

(ক) একটি হল বৃহত্তর বামপন্থী ও শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর যোগদানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণশক্তিসম্পন্ন আরও মানুষের অংশগ্রহণ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ;

(খ) বাম কর্তৃত্বে সমস্ত আন্দোলনের মোড় ফেরানো। সুতরাং, ১৯৩৪ সালের পর থেকেই তারা সর্বদা চেষ্টা করেছে জাতীয় কংগ্রেসকে বাম ও দক্ষিণ-পন্থায় বিভাজিত করে রাখতে।

দুটি অর্থেই জাতীয় আন্দোলন গণ আন্দোলন ছিল ঃ

(১) সকলেই উপনিবেশবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ক্লেশ ভোগ করেছে আর তারা সকলেই চেয়েছে তাকে উৎপাটিত করতে ;

(২) জনগণই এই আন্দোলনকে সংগঠিত করেছে ও তা শুরু করেছে। আন্দোলনের শুরু ও সংগঠনে বুর্জোয়াশ্রেণীর কোন ভূমিকা ছিল না। এ আন্দোলনের শুরু শিক্ষিত সমাজের হাতে যাঁরা সর্বপ্রথমে ঔপনিবেশিকতা ও তার চরিত্র, তার বিরোধকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ঔপনিবেশিকতার এই চরিত্র ও বিরোধ সরাসরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না, বিশ্লেষণ ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে তাদের বুঝা যায় না কেননা ইতিহাস, রাজনীতি, মতাদর্শ ও জ্ঞানের সাহায্যে তার উপলব্ধি সম্ভব। বিদগ্ধ সমাজের নেতৃত্বেই আন্দোলনে সাধারণ মানুষই গতি সঞ্চার করেছে, বুর্জোয়াশ্রেণী বা তার নেতারা এক্ষেত্রে কিছু করে নি। তবে সামাজিক অবস্থা ও তার সমাধানের উপলব্ধি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীদৃষ্টিকোণ থেকেই শিক্ষিত সমাজই করতে পারে। বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর নিজের কোন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত নেই। ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী পুঁজিবাদী সামাজিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতটিকে গ্রহণ করেছিল। এই ধরনের বুর্জোয়া পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে পুঁজিবাদবিরোধী কৃষক-কারিগরদের কাল্পনিক রাষ্ট্রকে সমভাবে সাজাতে চেয়েছিলেন। এই ধরনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। দুই, তিন ও চারের দশকে বামপন্থীরা কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনে একটি সমাজতান্ত্রিক দর্শন দিতে সংগ্রাম করেছিলেন। তবে আংশিকভাবেই বাস্তবক্ষেত্রে এই ধরনের প্রয়াস নেওয়া যেতে পারে কেননা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের হাতেই কর্তৃত্ব ছিল আর বিকল্প আধিপত্যের সুযোগ এতে বেশী থাকে।

তাই জাতীয় আন্দোলনকে ভারতীয় জনগণের জনপ্রিয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন বলে পরিগণিত হতে পারে। গণ-আন্দোলনগুলোকে পদাধিকারীদের বাইরে নয়, ভিতর থেকে খুঁজে নিতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন চীন, ভিয়েতনাম, আলজেরিয়া অথবা স্পেনের মত আমাদের আন্দোলনও ছিল গণ-আন্দোলন, যদিও একথা ঠিক যে এ আন্দোলনে বুর্জোয়া-কর্তৃত্ব ছিল। তাছাড়া, পৃথিবীর ইতিহাসে এ আন্দোলন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণ-আন্দোলনের মর্যাদা পেতে পারে। কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে এ আন্দোলন রাজনীতির মঞ্চে নিয়ে এসেছে আর গণ রাজনৈতিক

সংগ্রামে তাদের টেনে এনেছে। অধিকন্তু, অন্যান্য গণ-আন্দোলনের পথও প্রশস্ত করেছে এ আন্দোলন যেগুলোর অন্তর্ভুক্ত হল শ্রেণী-আন্দোলন ও জাতপাতভিত্তিক অত্যাচার ও পুরুষজাতির আধিপত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

পূর্বে যা বলেছি, বাস্তব জীবনে যে মৌলিক দায়িত্বের সম্মুখীন হয়েছে উক্ত আন্দোলনে আর বলতে কি আমরা ঐতিহাসিকরাও আমাদের গবেষণা ও বিশ্লেষণ কাজে যার মুখোমুখি হই সেটি হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় সংগ্রাম আর শ্রেণীগত অথবা সামাজিক সংগ্রাম সম্পর্কে একটি সুসংবদ্ধ মত নেওয়া। সমস্যাটি একটির সঙ্গে অন্য আর একটিকে সমভাবে স্থাপন করার নয়। ধ্রুপদী মার্কসীয় মতটি আমি গ্রহণ করতে রাজী। সেটি হল ঔপনিবেশিক অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামটি ছিল মুখ্য আর সামাজিক সংগ্রাম ছিল গৌণ। এর অর্থ, সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি ভারতীয় সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে শ্রেণীসংগ্রামকে খুব উচ্চমার্গে নিয়ে যাওয়া যায় নি; বরং তাকে বৈরিভাবাপন্ন শ্রেণীগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সুযোগসুবিধা দিয়ে সংগতিস্থাপন করতে হয়েছে। যেমন মাও জে-দঙ বারংবার বেশ জোর দিয়ে বলেছেন, চীনা জনগণের জাপানবিরোধী সংগ্রামের সময় "জাপান প্রতিহত করতে বর্তমান জাতীয় সংগ্রামের কাছে শ্রেণীসংগ্রামকে অধীনস্ত করার নীতি হবে যুক্ত মোর্চার কাছে মৌলিক নীতি। যে জাতি বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত, শ্রেণীসংগ্রাম জাতীয় সংগ্রামেরই রূপ নিয়ে থাকে—এতে উভয়েরই সঙ্গতি থাকে। একদিকে জাতীয় সংগ্রামের অন্তর্বর্তী সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাহিদা তাদের সহযোগিতা বিনষ্ট না করার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে; অন্যদিকে, শ্রেণীসংগ্রামের সব দাবী জাতীয় সংগ্রামের আবশ্যকতা থেকে উৎসারিত হবে।" (Colected Works, Vol Two, p 294) আবার বলা যায়, "এটা স্বীকৃত নীতি যে জাপানবিরোধী যুদ্ধে জাপানকে প্রতিহত করার স্বার্থের অধীনস্থ হবে অন্য সব কিছু। তাই শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থ বিরোধিতার যুদ্ধের স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে তার অনুপন্থী হবে। তবু শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম অস্তিত্ববিহীন নয়... আমরা শ্রেণী-সংগ্রামকে অস্বীকারকরি না, তার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করি... জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়াসে শ্রেণীসম্পর্কে সঙ্গতিস্থাপন করে উপযুক্ত নীতি আমাদের নিতে হবে (পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২৫০)। মাও জে-দঙ শ্রেণীসমন্বয় সম্পর্কে আরও বলেছেন, "শ্রমিকরা অবশ্যই দাবী করতে পারে যে কলকারখানার মালিকরা বস্তুগত অবস্থার উন্নতি ঘটাবে কিন্তু একই সঙ্গে জাপানের বিরোধিতায় তাদেরও আরও কঠোরভাবে কাজ

করতে হবে। ভূম্যধিকারীরা খাজনা ও সুদ কমাবে কিন্তু একই সঙ্গে কৃষকরাও তাদের খাজনা ও সুদ পরিশোধ করবে আর বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৬৩)।" সেই কারণে জাতীয় অথবা সামাজিক সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু ঐতিহাসিকের দায়িত্ব শুধু সেটাই দেখা নয়, তিনি দেখাবেন কতটা আর কিভাবে সামাজিক, শ্রেণীসংগ্রামে সঙ্গতি ও শ্রেণীসমন্বয় সম্ভব হয়েছে। আজ পর্যন্ত মার্কসবাদী লেখকরা শ্রেণী-সমন্বয় ও শ্রেণী সমঝোতার প্রয়াসটিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বর্ণনা করেছেন ; কিংবা তাকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক বা তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। প্রশ্নটিকে সঠিকভাবে সাজাতে পারলে এ বিষয়ে প্রকৃত কি ঘটেছিল তা ঐতিহাসিক দেখতে পারবেন। মুখ্য, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের গৌণ সামাজিক বিরোধের প্রকৃতির ভিত্তিতে ঐ সংগ্রামের শ্রেণীচরিত্রের আংশিক মূল্যায়ণ সম্ভব নয়—সম্ভব হবে তা বাস্তব অথবা প্রস্তাবিত শ্রেণীসমন্বয়ের প্রকৃতির ভিত্তিতে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত চীনের সাম্যবাদী দলের ভূমিকা, ১৯৪৫ সালের পর ভিয়েতনামীদের কার্যকলাপ আর আফ্রিকার পর্তুগীজ উপনিবেশগুলোর ঘটনাগুলোর সঙ্গে তুলনা তাহলে বেশ শিক্ষাণীয় হয়ে উঠবে।

মূল ইংরেজী থেকে বাংলায় ভাষান্তর করেছেন শান্তিপুর কলেজের অধ্যাপক সুনীলবরণ বিশ্বাস

পাদটীকা

১ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে বিদ্রূপ করে যে চরিত্র সম্প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসবিদরা এঁকেছেন, তাতে ঘোড় দৌড়, কুকুরের দৌড়, ফুটবল ফলাফল নিয়ে বাজি খেলা, ক্রিকেট ও জুয়াড়ীদের আড্ডার আলোচনাকেই জাতীয় আন্দোলনের আলোচনার সময় প্রাধান্য দিয়েছেন

২ উল্লেখ করা উচিত যে এই দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যযুগীয় অথবা প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী—বিশেষ করে যখন অনুমান করা হয়েছে সেগুলির ভিত্তি ছিল ধর্ম অথবা জাতপাত। বাস্তবে ধর্মীয় ও জাতপাতভিত্তিক রাজনীতি প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের সৃষ্টি নয়—সেগুলি ঔপনিবেশিক যুগেরই পরিণতি

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চার একটি গৌরবময় ঐতিহ্য আছে যা দু'শো বছরেরও বেশী পুরাতন। এই দীর্ঘকালীন চর্চার ফলে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানা দিক সম্পর্কে বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এই চর্চার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন একটি ধারাবাহিকতা বর্তমান আছে, অপরদিকে তেমনই বিভিন্ন সময়ে তার গতিপ্রকৃতিও বদলেছে, বিভিন্ন পর্যায়ে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটেছে, গবেষণার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও পরিসর বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কথা অবশ্য ভারত-ইতিহাসের সকল শাখার ক্ষেত্রেই সত্য।

আধুনিক অর্থে ভারতীয় ইতিহাসচর্চার উদ্বোধন প্রাক্তন ইংরাজ শাসকদের হাতে হয়েছিল যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সাম্রাজ্যবাদী এবং পক্ষপাতমূলক। সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস রচনার ধারার সূত্রপাত করেন জেমস মিল যা পরে অনেকের হাতেই পরিপুষ্টি লাভ করে। এই ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন ভিনসেণ্ট স্মিথ। রোমিলা থাপারের ভাষায়, "তাঁদের চোখে উৎপীড়ক ও প্রজাদের কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্করহিত স্বৈরাচারী রাজাই আদর্শ ভারতীয় শাসকের প্রতিমূর্তি।" তাঁদের রচিত ইতিহাসে এই কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার চেষ্টা করা হয়েছিল যে এই গোটা উপমহাদেশে যত ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেগুলির তুলনায় ব্রিটিশ ব্যবস্থাই সর্বোত্তম। এই একই ধরনের মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ভারত-ইতিহাস গ্রন্থমালায়, যার প্রথম খণ্ডে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানের ক্ষেত্রে গ্রীক ও রোমক আকরগ্রন্থসমূহকে ভারতীয় আকরগ্রন্থসমূহের তুলনায় অনেক বেশী মর্যাদার ও নির্ভরতার আসন দেওয়া হয়েছে, ভারতীয় শিল্পকলার মহৎ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ইতিহাস সংসদের ১৯৮৯ অধিবেশনে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণ।

সৃষ্টিসমূহের কৃতিত্ব বিদেশীদের উপর আরোপ করা হয়েছে, এবং সাহিত্যসহ ভারতীয় সংস্কৃতির সকল গৌরবময় বিষয়কেই এদেশে 'সভ্যতার তথাকথিত স্রষ্টা' বহিরাগত আর্যদের অনুপ্রেরণাজাত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আরও একটি বিষয় যার উপর প্রাক্তন শাসকেরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হচ্ছে প্রাচ্যবিদ্যা, ভারততত্ত্ব যার চর্চার একটি অংশ। ডেভিড কফ দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার প্রতি ইংরাজ সরকারের আগ্রহ ছিল বহুলাংশেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া যে তাঁদের সহানুভূতিশীল শাসকবর্গ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বিস্মৃত অধ্যায়গুলিকে জনসমক্ষে এনে তাঁদের অধীনস্থ প্রজাদের আত্মসচেতন করছেন। এর রাজনৈতিক মুনাফা থেকে ব্রিটিশ শাসকেরা বঞ্চিত হন নি। একই সময়ে, প্রাচীন ভারতীয় জীবনের উৎকর্ষময় দিকগুলির উত্তরোত্তর উদ্ঘাটনের ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে কিছু জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে। পুরাকীর্তিসমূহের আবিষ্কার, ঐতিহাসিক ক্ষেত্রসমূহের সঙ্গে পরিচিতি, প্রত্নলেখসমূহের পাঠোদ্ধার, প্রাচীন সাহিত্য নিয়ে গবেষণা এবং সর্বোপরি আর্য শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা তাঁদের মানসিক-ভাবে উজ্জীবিত করে। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বিশুদ্ধ ভারতীয় দৃষ্টিকোণে রচিত হওয়ার প্রয়োজন যা জাতীয় জাগরণের সহায়ক হবে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে আসে। তিনি সম্ভবত প্রথম ভারতীয় যিনি শুধু জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার প্রয়োজনের কথাই বলেন নি, কিভাবে সেই ইতিহাস রচনা করা হবে তারও নকশা ছকে দিয়েছিলেন।

ইংরাজ ঐতিহাসিকরা, 'আর্য' নামক ধারণাটিকে খুবই জনপ্রিয় করেছিলেন এবং বোঝাতে চেয়েছিলেন যে অতীতে যেমন আমরা অনার্যদের 'সভ্য' করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি তাদের আধুনিক বংশধরেরা, অর্থাৎ ইংরাজরা, ভারতবর্ষে অনুরূপ দায়িত্ব নিয়ে এসেছে যা তারা তাদের ভারতীয় সহযোগী আর্য ভ্রাতৃবৃন্দের সহায়তায় সম্পন্ন করতে চায়। তবে এই রকম একটা মতবাদ প্রচারের যে রকম সুফল তাঁরা আসা করেছিলেন তা ঘটে নি। বরং আর্যত্বের ধারণা বিশেষ শ্রেণীর হিন্দুদের বদলে সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই এত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল যে এই ধারণাটিই কালক্রমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম দ্যোতক হয়ে ওঠে যার লক্ষ্য ছিল 'গৌরবময় আর্য অতীতের' পুনরুদ্ধার।

দ্বিতীয় যে ধারণাটি অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা ভারতীয় মনে মুদ্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা হচ্ছে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ।

তাঁরা এই ধারণার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যে ভারতীয়রা কোনদিনই জাগতিক বিষয়বস্তু নিয়ে মাথা ঘামায় নি, তাদের মন সর্বদাই উচ্চমার্গের দার্শনিক চিন্তায় বিভোর থাকত। ফলে তারা রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং বাস্তবজীবনের অপরাপর বিষয় সম্পর্কে উদাসীন ছিল। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মাহাত্ম্যের এই অতিকথনের নেপথ্যে যে উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল তা কিন্তু জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের নজর এড়ায় নি, এবং তাঁরা গবেষণার দ্বারা এই অতিকথনকে খারিজ করার চেষ্টা করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল হিন্দু ভৌতবিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা করেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস রচনা করেন। কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল হিন্দু রাষ্ট্রচিন্তার উপর যে বই লেখেন তার উদ্দেশ্যই ছিল, 'ভারতবর্ষ সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি-নীতি মেনে চলতে অক্ষম' ব্রিটিশ শাসকদের এই বক্তব্যকে খণ্ডন করা। বস্তুত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠন ও পরিচালনা করার ঐতিহ্য প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল এটা দেখানোর জন্যই স্যার শঙ্করণ নায়ার জয়সোয়ালের বইটিকে ভারতের শাসনসংস্কার কমিটির নিকট পেশ করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত কর্পোরেট লাইফ ইন এনসেন্ট ইণ্ডিয়া (১৯১৯) প্রকাশিত হওয়ার পর মডার্ণ রিভিয়্যু পত্রিকা লেখে যে, এই বইটি সেই সকল ব্যক্তির মুখের মত জবাব যাঁরা ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করে বলেন স্বায়ত্তশাসন কেবল পশ্চিমী জাতিদেরই একচেটিয়া সামগ্রী। অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয় যে, ফিরিঙ্গী-ভায়াদের বস্তাপচা যুক্তি যে ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের পরীক্ষার পক্ষে অনুপযোগী এই বই-এ তার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ (প্রকৃত তারিখ নিয়ে সংশয় আছে) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ খোলা হয়। ভারতবর্ষে এটাই সর্বপ্রথম। এই বিভাগ খোলার পিছনে একটি জাতীয়তাবাদী মনোভাব কার্যকর ছিল। প্রাচীন ভারতের মহৎ কৃতিত্বসমূহের সঙ্গে মানুষকে পরিচিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিভাগে পঠনপাঠন ও গবেষণার সূত্রপাত করা হয়। জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে এই বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতবর্গকে এই বিভাগ গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত ক্রমশ ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও গ্রহণ করে এবং এর ফলে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির নানা দিকের উপর বহু গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস কয়েক খণ্ডে ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশ করার কাজে

ব্রতী হয়। এখনও পর্যন্ত অবশ্য সব কটি খণ্ড প্রকাশিত হয় নি। একাদশ খণ্ডে ভারতবর্ষের প্রায় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশ করার কৃতিত্ব অবশ্য ভারতীয় বিদ্যাভবনের। প্রথম পাঁচ খণ্ড পাঁচের দশকে এবং দ্বিতীয় ছয় খণ্ড ছয়ের দশকে প্রকাশিত হয়। এই সিরিজটি সম্পাদনা করতে রমেশচন্দ্র মজুমদার একাদিক্রমে তেত্রিশ বছর কাজ করেন।

ভারতীয় বিদ্যাভবন সিরিজের গ্রন্থগুলি কেমব্রিজ ইতিহাসের মডেলেই রচিত হয়, যদিও এই সিরিজের দৃষ্টিকোণ ছিল ভিন্ন। একটি মর্যাদাপূর্ণ ভারতীয় মানসিকতার প্রতিফলন এখানে ঘটেছে এবং সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোভাব পরিত্যক্ত হয়েছে। এখানে পরিষ্কৃত তথ্য এবং নূতন গবেষণালব্ধ তথ্যের উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এবং লেখকদের নিজেদের মতামত নির্দ্বিধায় প্রকাশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, এমনকি সেই মতামত যদি প্রতিষ্ঠিত ধারণাসমূহের বিপক্ষে যায় তৎসত্ত্বেও। যে সকল ঐতিহাসিক দিয়ে বিভিন্ন অধ্যায় লেখানো হয়েছে তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে দিকপাল হিসাবে পরিগণিত। তৎসত্ত্বেও, সার্বিক বিচারে, এই সিরিজের গ্রন্থগুলিতে ঘোষিত বিষয়নির্ভরতা বজায় থাকলেও, এখানে উচ্চবর্গের মানুষদেরই জীবন-চর্যার প্রতিফলন ঘটেছে এবং এই জীবনাদর্শকেই ভারতের সামগ্রিক জীবনাদর্শের সঙ্গে অভিন্ন করে তোলা হয়েছে। অন্য কথায়, এই সিরিজে যা উপস্থাপিত হয়েছে তা 'উপর থেকে দেখা ইতিহাস' যেখানে শাসকশ্রেণীর ভূমিকাকেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রবাহী ঐতিহ্যকেই তুলে ধরা হয়েছে, শিল্পকলার নিদর্শনসমূহকে অপরাপর পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে উচ্চমার্গের বিষয়গুলিই স্থান পেয়েছে।

এদেশে মার্কসীয় পদ্ধতিতে ইতিহাসচর্চা রাজনীতির মানুষদের দিয়েই শুরু হয় যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কিছু অর্ধপক্ক তথ্যকে পূর্বপ্রস্তুত ছাঁচে ফেলা। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে রচিত যে গ্রন্থটি যুগের পরীক্ষায় বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে তা হচ্ছে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'লোকায়ত'। গ্রন্থটিকে ঠিক ইতিহাসের পর্যায়ে ফেলা না গেলেও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এটি খুবই প্রাসঙ্গিক। এই গ্রন্থটির মূল লক্ষ্য প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বস্তুবাদী দিকটির পুনরুদ্ধার, এবং এই বস্তুবাদের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ লৌকিক ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রথা ও রীতিনীতি, নানা ধরনের বিশ্বাস ও সংস্কারের উদ্ভব ও শ্রেণীচরিত্র অন্বেষণ করেছেন। দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বীর 'ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ভূমিকা' বইটি যথেষ্ট জনসমাদর

পেয়েছে। ভারতীয় পরিস্থিতিতে তাঁর প্রদত্ত ইতিহাসের মার্কসীয় সংজ্ঞা হল উৎপাদন-কৌশল ও উৎপাদন-সম্পর্কের ধারাবাহিক বিকাশকে কালানুক্রমের ভিত্তিতে উপস্থাপিত করা। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে কিছু চিন্তা-উদ্দীপক প্রস্তাব এবং কয়েকটি প্রসঙ্গের বিচ্ছিন্ন ও পারস্পরিক সম্পর্ক রহিত আলোচনা ছাড়া সংজ্ঞাটির কার্যকারিতা দেখানোর ক্ষেত্রে তিনি কোন চেষ্টাই করেন নি। রোমিলা থাপারও খুব গুছিয়ে বলেছেন যে কোন প্রদত্ত যুগের অর্থনৈতিক অন্তর্কাঠামো সেই যুগের নিজস্ব বিনিময় ও বণ্টন পদ্ধতির সৃষ্টি করে এবং নিজস্ব রাজনৈতিক, আইনগত, ধর্মীয় ও আদর্শগত পরিস্থিতি গড়ে তোলে। পাশাপাশি ভৌগোলিক ও পরিবেশগত অবস্থা, বহির্দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয় কিছু স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বক্তব্যের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁরা যতটা মনোযোগী প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে তার সিকিভাগও নয়।

কোশাম্বীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা' অধিকতর সফল। এখানেও অবশ্য উপস্থাপনার কৃতিত্ব আছে কিন্তু প্রতিপাদনের দায়িত্ব নেই। এখানে তিনি বলেছেন, ভারততত্ত্ববিদরা ইতিহাসচর্চার সকল ধারার ক্ষেত্রেই একটা একচোখো, সঙ্কীর্ণ ও বক্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁরা কেউই ভারত-ইতিহাসের মূল সমস্যাগুলিকে উপস্থাপিত করতে পারেন নি। তিনি পদ্ধতিপ্রকরণ ও মেথডোলজির সমস্যা নিয়ে শুরু করেছেন, উৎপাদনব্যবস্থার অসম বিকাশের ক্ষেত্রে কৌমসমাজগুলির ভূমিকার কথা বলেছেন, এবং এও জানিয়েছেন যে আদিম মানুষদের বৈষয়িক সংস্কৃতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোঝার জন্য প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের চর্চা করার বিশেষ প্রয়োজন যা থেকে মানুষের খাদ্য-সংগ্রাহকের পর্যায় থেকে খাদ্য-উৎপাদকের পর্যায়ে উত্তরণের হদিস মিলবে। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রশক্তির উত্থানের কারণ লৌহনির্মিত হাতিয়ারের ব্যবহারের দরুন উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন। এরই ফলে একদিকে নাগরিক জীবনের বিকাশ ঘটেছে, নগরের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ এই নগরকেন্দ্রিক জীবনচর্চারই আদর্শগত প্রতিফলন। তাঁর মতে গুপ্তযুগ পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভূমিকা খুবই বেশী, এবং গুপ্তোত্তর যুগে এই বাণিজ্যে ভাটা পড়ায় অর্থনীতি কৃষি-অভিমুখী হয়ে পড়ে যার ফলে এদেশে সামন্ততন্ত্রের সূচনা হয়।

সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মত মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যেও অসঙ্গতি ও পরস্পরবিরোধিতা বর্তমান। দৃষ্টিভঙ্গী, বোঝাপড়া ও

ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে যাঁদের মার্কসবাদী ঐতিহাসিক বলা হয় তাঁদের অধিকাংশেরই মার্কসবাদের বোঝাপড়ার ভিত্তিটা খুব দৃঢ় নয়। এছাড়া মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সমস্যা আছে। ডি. এ. সুলেইকিন যে উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তন এবং তজ্জনিত সামাজিক বিকাশের মূল ধারাকে অনুসরণ করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের যুগবিভাগ করেছিলেন, কোশাম্বী তা নাকচ করে দেন এই যুক্তিতে যে, যেহেতু এখানে তথ্যসমূহের স্থান-কাল নিরূপণে এবং সেগুলির একত্রীকরণ এবং সার্বিকতাপ্রদানের ক্ষেত্রে যে দুঃসাধ্য দুরূহতা বর্তমান সেই পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন-কৌশল বা তথাকথিত সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে এমন কোন সমজাতীয়তা নেই, যার উপর নির্ভর করে এই ধরনের কোন যুগবিভাগ করা চলতে পারে। রামশরণ শর্মা প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের সাতটি কল্পিত পর্যায়ভেদ করেছেন, কিন্তু পর্যায়গুলি মোটেই সুনির্দিষ্ট নয় এবং ঐতিহাসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সেগুলি খাপও খায় না। কোশাম্বী বলেন যে, প্রাচীন ভারতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যাপ্তি ও পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটেছিল যা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। কিন্তু উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিকল্প শক্তি না থাকলে গুণগত পরিবর্তন আদৌ সম্ভব কি না, অথবা জাতিপ্রথাভিত্তিক প্রথাগত উৎপাদন-কৌশলের মধ্যে এই রকম একটা বিকল্প শক্তির নিহিত থাকার সম্ভাবনা কতটা, এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় বিদ্যমান। আবার ইতিহাসের বিশেষ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা ভিন্নমত পোষণ করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, দেবরাজ চানানা ও রামশরণ শর্মা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দাসপ্রথার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন, কিন্তু কোম্পানী তা সরাসরি খারিজ করেছেন। প্রাচীন ভারতে সামন্ততন্ত্রের ব্যাপারেও মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতৈক্য নেই। রামশরণ শর্মার ভাষায়, যেমন যত সমাজতন্ত্রী আছে, সমাজতন্ত্রের তত রকম সংজ্ঞা আছে, তেমনই এখানে যত লোক সামন্ততন্ত্র নিয়ে কাজ করেন, সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞাও তত রকম।

আমরা এতক্ষণ মোটামুটি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচর্চার বিশেষ ধারাগুলির কথা আলোচনা করলাম। কিন্তু আমাদের সমস্যা বর্তমান নিয়ে। বর্তমান প্রজন্মের তরুণ গবেষকেরা কি ধরনের কাজ করেছেন, সেই কাজের মান কি ধরনের এবং কাজের ক্ষেত্রে তাঁরা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, কাজের মানের অবনতি ঘটলে তার জন্য গবেষকেরা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী, না তাঁরা

পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন, এই সকল বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের গবেষকদের কথাই আমরা প্রধানত আলোচনা করব। এখানে ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলের তুলনায় গবেষকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা ও বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী আমলের দিকপাল ঐতিহাসিকেরা যে ঐতিহ্য তৈরি করে দিয়ে গেছেন তার ফলে গবেষণার ক্ষেত্রে একটা সুনির্দিষ্ট মান গড়ে উঠেছে, যেটা বজায় রাখতে বর্তমান প্রজন্মের গবেষকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেন, যদিও তাঁদের প্রচুর প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করতে হয়। সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হল, তাঁরা জানেন যে তাঁদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। কোন এক দুর্বোধ্য কারণে, অথবা কোন এক অশুভ চক্রান্তে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ইতিহাস বলেই গণ্য করা হয় না। কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়মাবলীতে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের কলেজে চাকরি দেওয়া হবে না। এমনকি স্কুলেও তাঁদের চাকরি দেওয়া হয় না। আর কোন বিষয়ের গবেষকদের এতটা বিপর্যস্ত মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হয় না।

সে যাই হোক পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন তাঁদের কাজের বিষয় প্রাচীন বঙ্গদেশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলির উপরেও তাঁরা কাজকর্ম করেন, এমনকি ভারতবর্ষের বাইরের দেশেরও প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে। এছাড়া অনেকে সর্বভারতীয় বিষয়বস্তুও গবেষণার জন্য বেছে নেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁদের কয়েকটি বিশেষ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ খোলার পিছনে একটি জাতীয়তাবাদী আদর্শ কাজ করেছিল। বিদেশী ঐতিহাসিকদের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণে দেখা প্রাচীন ভারতের একটি গৌরবময় পরিকল্প রূপ তদানীন্তন গবেষকের সমুদয় ঐতিহাসিক আকর মন্থন করে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। এখন যুগ বদলেছে, সেই জাতীয়তাবাদী আদর্শের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু প্রাচীন ভারত সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে পুরাতন পদ্ধতিই বজায় থেকে গেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারত নিয়ে গবেষণার ব্যাপারে দুটি বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুসরণ করেছিল। প্রথমটি হচ্ছে, যাবতীয় কাজ মূল আকর বা উপাদান নিয়ে করতে হবে। এক্ষেত্রে তথ্যাবলীকে সুসমভাবে বিন্যস্ত এবং যতদূর সম্ভব পরিষ্কৃত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তীকালে পণ্ডিতেরা মূল উপাদানসমূহের অর্থভেদ ও ব্যাখ্যায়

যে সকল ভুল করেছেন সেগুলির সংশোধন করতে হবে। উপাদানসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে অবশ্য নূতনভাবে ব্যাখ্যা করা চলতে পারে তবে সে ব্যাখ্যা যেন ব্যক্তিনির্ভর না হয়ে বিষয়নির্ভর হয়।

মূলত পাঁচের দশক পর্যন্ত গবেষণার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি মোটামুটিভাবে অনুসৃত হয়েছে, ছয়ের দশকেও যার অনুশয় কিছুটা বর্তমান ছিল। কিন্তু এখন এই পদ্ধতি আর বজায় রাখা যায় না, ততটা পদ্ধতির দোষে নয়, যতটা এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তব অসুবিধার জন্য। এখন যাঁরা কাজ করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা যে তাঁরা মূল উপাদান-গুলিকে ব্যবহার করতে পারেন না। পক্ষান্তরে উত্তর ভারতে ব্যাপক সংস্কৃতচর্চা বজায় থাকার দরুন সেখানকার গবেষকেরা মূল ধরেই কাজ করতে পারেন। দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতচর্চা বজায় আছে। এ ছাড়া সেখানে স্থানীয় ভাষাসমূহে প্রাচীন ইতিহাসের এত অজস্র উপকরণ বর্তমান যে সেখানকার গবেষকদের এখনও পর্যন্ত কোন অসুবিধায় পড়তে হয় নি। তবে সংস্কৃত আকরভিত্তিক কাজ সবচেয়ে ভাল হয় পুনায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাকে তুলে দেওয়ার ফলে অদূর-ভবিষ্যতে এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না যিনি কোন মূল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রত্নলেখ পাঠ করার মত লোক তো এখনই পাওয়া যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের গবেষকদের সমস্যার সঙ্গে দিল্লী অঞ্চলের গবেষকদের সমস্যার সাদৃশ্য আছে। তবে সেখানকার দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপকবর্গ মূল উপাদানসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলির নিরাকরণকল্পে নূতন পদ্ধতি প্রকরণ অনুসরণ করার পক্ষপাতী। তাঁরা বলেন যে, সংস্কৃত পড়তে বা বুঝতে পারলেই কি উপাদানসমূহকে যথার্থভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়? উপাদানসমূহ এমন কিছু স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়। সেগুলির যথার্থতা বিশ্লেষণ করার জন্য, সেগুলিতে প্রতিফলিত বক্তব্যের সত্যমিথ্যা যাচাই করার জন্য বিশেষ যে পদ্ধতিপ্রকরণ অনুসরণ করার প্রয়োজন থাকে, সেটাকে বাদ দিলে সমস্ত কাজটাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। মূলত যে অঞ্চলটিকে হিন্দী হার্টল্যাণ্ড বলে সেখানে মূল উপাদান নিয়ে কাজ করার ধারাটা এখনও বজায় আছে। এক্ষেত্রে কেউ কেউ যে ভাল কাজ করেন না তা নয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই কাজগুলি নিছকই কিছু তথ্যের সংকলন, এবং কখনও তা এমন বিষয়ের উপর যা প্রাচীন আমলের হলেও প্রাচীন ইতিহাসের পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। এঁদের বক্তব্য: মূল

উপাদান তো গত দেড়শো বছরে কম আহৃত হয় নি, এবং সেগুলি পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত আছে। সেই সকল বই থেকে তথ্য নিয়ে, সেগুলিকে মূল থেকে নেওয়া হয়েছে এই রকম ভান করে কম বই লেখা হয় নি। যদিও কিছু বইকে বিশুদ্ধ চুরির ফসল বলা যায়, সেকেণ্ডারি সোর্স অবলম্বনে রচিত অনেক গ্রন্থই কিন্তু গবেষকের বিচক্ষণতা, পাঠের পরিধি ও বুদ্ধিগত উৎকর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে রীতিমত উচ্চমানের হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই জাতীয় কাজ একমাত্রিক পর্যায়ে রয়ে গেছে, কিন্তু উদ্‌ঘাটিত উপাদানসমূহকে অবলম্বন করেই বহুমাত্রিক পর্যায়েও কাজ করা যায় অন্যান্য ডিসিপ্লিনের সাহায্য নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গেও এই জাতীয় চিন্তাভাবনা হওয়ার দরকার।

বিগত কয়েক বছরের প্রাচীন ভারত সংক্রান্ত কাজকর্মের একটা হিসাব-নিকাশ নিলে দেখা যায় যে, আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রতি সর্বত্রই গবেষকদের উৎসাহ বেড়েছে, যদিও পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লী কিছুটা ব্যতিক্রম। আঞ্চলিক বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা কিছু দোষণীয় ব্যাপার নয় বরং এর প্রয়োজন আছে খুবই বেশী। কিন্তু যে পদ্ধতিতে আঞ্চলিক বিষয়বস্তু নিয়ে অধিকাংশ কাজ করা হয় তার সার্থকতা নিয়ে সংশয় আছে। যাঁরা এই ধরনের কাজ করেন তাঁরা মূলত একটি ছোট অঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যগত উপাদানসমূহকে এক জায়গায় জড়ো করেন নিছকই কালানুক্রমের ভিত্তিতে। কিন্তু সাল তারিখের ব্যাপার ছাড়াও ঐতিহাসিক বিকাশের গতি-প্রকৃতি যে আরও বহুবিধ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হিসাবের মধ্যে আনা হয় না। সংগৃহীত তথ্যসমূহকে তাঁরা যথার্থ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করেন না। দৃষ্টিভঙ্গীগত প্রশ্নের কথা ছেড়ে দিলেও একটি বিশেষ অঞ্চলের বহুমুখী ঐতিহাসিক বিকাশকে যে একটি বৃহত্তর পট-ভূমিকায় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের ঐতিহাসিক বিকাশের তুলনামূলক নিরিখে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন, পরিবর্তনসমূহ যে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না এবং সেগুলির পিছনেও যে কিছু নিয়ম ক্রিয়াশীল, এই ধরনের কোন উপলব্ধির পরিচয় তাঁদের রচনা থেকে পাওয়া যায় না। এছাড়া বিষয়বস্তুর গৌরব বা মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য উপাদানগুলির, বা কোন একটি বিশেষ উপাদানের, যা স্বাভাবিক ইঙ্গিত, তাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেখানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে সেই বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন উপাদানকেও তাঁরা সেই অঞ্চলের উপর আরোপ করেন। তদুপরি সর্বত্রই আঞ্চলিক অহংবোধ আজকাল এত বেশী প্রশ্রয় পাচ্ছে যে তা পরিণামে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করছে।

মধ্যকালীন ভারতে ভক্তি এবং সন্তমত : একটি সমীক্ষা

রমাকান্ত চক্রবর্তী

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

১

বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তিমূলক ধর্মান্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ ভারতের মধ্যকালীন ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট তাৎপর্যবহ ঘটনা। অগণিত মানুষ এসব ধর্মান্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেন তাঁরা প্রভাবিত হলেন, কারা সেই প্রভাব বিস্তার করলেন এবং কিভাবে করলেন, সে প্রভাবের ফল কি হয়েছিল, এই প্রবন্ধে এসব বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

জনসাধারণ যেসব কারণে ধর্মদ্বারা আকৃষ্ট হন, তা অজ্ঞেয় কিংবা অজ্ঞাত নয়। অথচ এ দেশে ইতিহাসের চর্চায় ধর্মের প্রভাবের বিষয়টি তেমন কিছু মান্যতা লাভ করে নি। বিশেষভাবে মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের গবেষণায় সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক তথ্যাদির উপরে জোর পড়ে। গবেষণার বিষয় রূপে ধর্ম প্রায় অবহেলিত। এখনও পর্যন্ত মধ্যযুগীয় ভাব-ধারার প্রভাব দেখা যায় এবং তা নিয়ে আধুনিকতার সমথকদের চিন্তার অথবা দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু, তার সামাজিক-ঐতিহাসিক কারণ নির্ণয়ের জন্য কোন অর্থবহ অন্বেষণ বিশেষভাবে করা হয় না। বিশেষভাবে প্রাচ্য দেশসমূহে ঐতিহ্যবাহিত ধর্মের প্রভাব, সময়ের অগ্রগতি সত্ত্বেও, কিছু পরিমাণে এবং আয়তনে, রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সত্ত্বেও, কেন থাকে এবং ব্যাপকভাবে থাকে, তার পূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ এখনও উদ্ভাবিত হয় নি। এই প্রসঙ্গেই ভারতে ভক্তিমূলক ধর্মান্দোলনের সূত্রপাত, ক্রমবিকাশ, বিস্তার এবং প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে অবশ্যই আলোচিত হতে পারে।

২

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ভক্তির কতকগুলো বিশেষ তাৎপর্য ছিল। ভক্তি ছিল ধর্মীয় অনুশাসনবিরোধী এবং কর্মকাণ্ডবিরোধী। মূলতঃ পৌরোহিত্যবিরোধী

ভারতের ইতিহাস, মধ্যযুগ, বিভাগীয় সভাপতির ভাষণ, ১৯৮৯

হওয়ার জন্য ভক্তির প্রায় সব তত্ত্বেই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছে, যদিও ক্রমশঃ পুরোহিতের স্থান, ভক্তিতত্ত্বানুসারে, গুরু দখল করেন। দ্বিতীয়তঃ, কর্মকাণ্ডবিরোধী হলেও ভক্তি ব্রাহ্মণ্য নৈতিকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। উপনিষদ্-এর ভাববাদ, বৌদ্ধ-জৈন সন্ন্যাসের আদর্শ এবং ব্রাহ্মণ্য সদাচারের আদর্শ ভক্তির তত্ত্বে এবং অভ্যাসে সংমিশ্রিত হয়েছিল। এই সংমিশ্রণই ছিল ভক্তির মৌল ভিত্তি। শ্রেণীসংগ্রামকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই সমাহার-মূলক ভক্তিধর্ম উদ্ভাবিত হয়েছিল কিনা, তা বিতর্কের বিষয়। এটি আলাদাভাবে অবশ্যই আলোচিত হতে পারে।

ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদি-মধ্যযুগে দুটি প্রবণতা দেখা যায়। অর্থনীতি এবং সমাজব্যবস্থা যতই ফিউডাল অথবা আধা-ফিউডাল হয়ে উঠল, ততই ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ অভিজাতবর্গ পৌরাণিক ধর্মের উপরে, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপরে এবং মঠ-ভিত্তিক সন্ন্যাসের উপরে বেশী করে জোর দিতে থাকেন।[১] সম্ভবতঃ শ্রেণীস্বার্থরক্ষার জন্য এবম্বিধ সংরক্ষণশীলতা অভিজাতবর্গ প্রয়োজনীয় বলে মনে করলেন। কিন্তু লক্ষণীয়, সকলেই তা নির্বিচারে মেনে নিতে চান নি। ব্যক্তিগত দেবতার পূজামূলক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যাশ্রয়ী ভক্তির ধারণাও শক্তিশালী হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্যনৈতিকতা এবং গার্হস্থ্যাশ্রমের পবিত্রতা শাস্ত্রানুসারে যতই দুর্লঙ্ঘ্য হতে থাকে, ততই কৃষ্ণের অবৈধ প্রেমকাহিনী জনপ্রিয় হয়।[২]

ভক্তির সমর্থকগণ পুরাণ এবং সংহিতাসমূহে প্রচারিত সদাচারের আদর্শ মেনে নিলেন। কিন্তু তাঁরা ধর্মশাস্ত্রের কৃত্যতত্ত্ব কোথাও বর্জন করলেন, কোথাও সংশোধিত আকারে গ্রহণ করলেন। কৃত্যের উপরে সদাচারকে স্থান দেওয়া হয়, কারণ সদাচার এবং নৈতিকতার মাধ্যমেই ব্যক্তিগত দেবতার কৃপালাভ করা যেত—এটাই ছিল ভক্তদের বিশ্বাস। সদাচারের মাধ্যমে ভক্তিমূলক উপাসনার সঙ্গে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের প্রধান ঐতিহ্যের সম্পর্ক ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হয়। ভক্তির একটি আভিজাত্যব্যঞ্জক রূপরেখা ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে থাকে।

'ভাগবতপুরাণ', 'নারদভক্তিসূত্র', 'শাণ্ডিল্যসূত্র' প্রভৃতি ভক্তিবিষয়ক বিশিষ্ট গ্রন্থাবলীতে ভক্তিকে একটি চিত্তাকর্ষক, উদার, প্রাতিস্বিক এবং নিগূঢ় অতীন্দ্রিয়-বাদরূপে প্রচার করা হয়। এ সব রচনাতে বর্ণভেদ, জ্ঞানমার্গ এবং ক্রিয়াকাণ্ড আদৌ প্রধান্য পেল না; অথচ, প্রাধান্য পেল সদাচারের আদর্শ।[৩] সদাচার অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহজনক, দ্ব্যর্থক এবং জটিল হলেও ভারতীয় সভ্যতার পুষ্টির জন্য, বিভিন্ন জনবিন্যাসে তার প্রচারের জন্য, সম্প্রসারণের জন্য, অবান্তর ছিল না। 'মহাভারত' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

ভারতবর্ষ আপন নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে, তার মর্মগ্রন্থি বারম্বার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, দৈন্য এবং অপমানে সে জর্জর, কিন্তু [মহাভারত] এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেকপ্রণালীকে নানা ধাক্কায় পূর্ণ ও সচল করে রেখেছে ···সেই মূল প্রস্রবণ থেকে এই শিক্ষার ধারা যদি নিরন্তর প্রবাহিত না হোত, তা হলে দুঃখে দারিদ্র্যে অসম্মানে দেশ বর্বরতার অন্ধকূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জন করত।

['শিক্ষা' : "বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ"]

শুদ্ধিগ্রন্থাবলীতে প্রচারিত সদাচার সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য প্রযোজ্য।

৩

ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল ; ব্যাপক রাষ্ট্র-বিপ্লবে কতকগুলো সমস্যা দেখা গেল। মুসলমান শাসকশ্রেণী প্রচলিত অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে কোন যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেন নি। প্রকরণের বিচারে "হিন্দু"-স্বৈরাচার এবং "মুসলমান"-স্বৈরাচার কখনই আলাদা ছিল না। কিন্তু একটি ধর্মীয় 'বর্ণ'-রূপে ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে মুসলমান শাসকশ্রেণীর কোন বিশেষ শ্রদ্ধা অথবা সম্ভ্রমবোধ ছিল না। গুপ্তযুগ থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল।[৪] ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ সব ব্রাহ্মণ-উপনিবেশসমূহের কোন বিশিষ্টতা রইল না। রাষ্ট্রপরিচালনায় বৌদ্ধ পাল যুগে এবং হিন্দু সেন রাজত্বকালে বাংলাদেশে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের কিছুটা ভূমিকা দেখা যায়। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল না।

অতএব ব্রাহ্মণগণ তাঁদের ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং অধিকারসমূহ সংরক্ষণের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত সময়ে বহু স্মৃতিনিবন্ধ রচিত হল।[৫] পূর্ব ভারতে কোনরকমে টিকে থাকা হিন্দু রাজাদের মিথিলাতে নব্যস্মৃতি উদ্ভাবিত হয় ; তা ক্রমশঃ বাংলাদেশে, কামরূপে এবং হিন্দু রাজবংশশাসিত উড়িষ্যাতে সম্প্রসারিত হল। স্মৃতি রচিত হল মহারাষ্ট্রে, মহীশূরে এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য স্থানে। সুপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্র নূতন ভাষ্যে গৌরবান্বিত হয়ে উঠল। তাতে হিন্দু-ঐতিহ্যের পবিত্রতা, পৌরোহিত্যের প্রয়োজনীয়তা, ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের অপরিহার্যতা এবং হিন্দুদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সংশ্লেষের, অথবা "একালচারেশন্"-এর অনিবার্যতা প্রতিপন্ন হল। স্মৃতিনিবন্ধে শুধু যে হিন্দুত্বের ধর্মীয় এবং সামাজিক বিশেষত্ব

বড় করে দেখান হল, তাই নয় ; সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ এবং জাতির উপরেও দেওয়া হল, এবং বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠতা প্রশ্নাতীত প্রাধান্য লাভ করল। কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হওয়ার ফলে হিন্দুত্বের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক সংশ্লেষ অনেকটা প্রসারিত হল এবং ধর্মীয় কৃত্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল।

মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে অথবা পরে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। ভারতে অনেক জায়গায় যুদ্ধের পরে, দেশ বিজয়ের পরে ইসলামধর্ম প্রচারিত হয়। বহু হিন্দু বর্ণ এবং জাতিভেদ সহ্য করতে না পেরে স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। কোন কোন জায়গায় বলপ্রয়োগ করেও হিন্দুদের ইসলামে দীক্ষিত করা হয়। বস্তুতঃ ইসলামধর্মের প্রচার এবং ব্রাহ্মণ্য সংরক্ষণশীলতার ক্রমবর্ধমান তীব্রতা সংশ্লিষ্ট ছিল ; একটিকে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই সমান্তরাল ধর্মীয় প্রবাহে অনেক ক্ষেত্রেই শুভবুদ্ধি অবলুপ্ত হয়। বলাবাহুল্য, তার ফল ভাল হয় নি।

অর্থনীতি ছিল অনুন্নত ; কৃষ্টির ক্ষেত্রে ছিল সঙ্কীর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন। বিবিধ ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব ছিল দুরতিক্রম্য ; প্রগতির সম্ভাবনা ছিল অবরুদ্ধ। এ অবস্থায় যাকে "সিভিল সোসাইটি" বলা হয়, ভারতে কোথাও তার সমুদ্ভবের সম্ভাবনা ছিল না ; এবং সে অবস্থায় কোন রাজনৈতিক-সামাজিক উদারনীতিমূলক রাষ্ট্রদর্শনের কিংবা সমাজদর্শনের আবির্ভাবও ছিল অভাবনীয়। এখানে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিও হয়ে পড়ল সীমাবদ্ধ এবং স্থৈতিক।[৬]

অথচ সামাজিক গতিশীলতার তত্ত্ব এতসব সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ভারতে নিতান্ত অভাবনীয় ছিল না। ভক্তিবাদের সমর্থকগণ সামাজিক চলমানতা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। ভক্তির সমন্বয়মূলক তত্ত্বকে ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপক সংশ্লেষের তত্ত্বরূপে উপস্থাপিত করা হয় কারণ, ভক্তির প্রবক্তাগণ এমন ভাবতে থাকেন যে, এ ধরনের সংশ্লেষে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা সমন্বয় হতে পারে। তাঁদের মতে ভারতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে জাতপাতের অবসান বিশেষভাবে কাম্য ছিল।

কিন্তু সংরক্ষণশীল হিন্দুরা এই মত মানেন নি। তাই ভক্তির সমর্থকদের সঙ্গে হিন্দু এবং ইসলামি সংরক্ষণশীলতার সংঘর্ষ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ সংঘর্ষের বহু রূপ ছিল। সামগ্রিকভাবে এই সংঘর্ষ ছিল মধ্যকালীন ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি তাৎপর্যবহ মাত্রা। অথচ, বিষয়টি সম্পর্কে কোন ব্যাপক গবেষণা হয় নি।

মধ্যকালীন ভারতে যেসব ভক্তিভিত্তিক ধর্মমত ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করে, তাদের মধ্যে প্রধান ছিল দক্ষিণ ভারতে শৈব এবং বৈষ্ণবধর্ম, মহারাষ্ট্রে বৈষ্ণবতাপ্রভাবিত সন্তমত, উত্তর ভারতে 'নিগু'ণ'-ঈশ্বরের চিন্তনমূলক সন্তমত, বাংলাদেশে এবং উড়িষ্যাতে চৈতন্যের বৈষ্ণবভক্তি এবং আসামে শঙ্করদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবমত। শৈব মতাদর্শ কাশ্মীরে এবং বৈষ্ণব মত গুজরাটে এবং সিন্ধুদেশে জনপ্রিয় ছিল। শাক্ত তান্ত্রিকতা কেরলে, কাশ্মীরে এবং পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। পূর্বোত্তর ভারতে শৈব-সিদ্ধ ধর্মমতের জনপ্রিয়তাও লক্ষণীয়।

পূর্বে প্রধানতঃ এসব ধর্মমতের স্রষ্টাদের সম্পর্কে, গুরুপরম্পরা সম্পর্কে এবং মতবাদসমূহের ধর্মীয় এবং দার্শনিক তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু গবেষণা অবশ্যই হয়েছিল। অধুনা এসব মতবাদের সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক-অর্থনৈতিক তাৎপর্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক গবেষিত হচ্ছে। এখানে যেহেতু আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট সময় এবং পরিসর সংক্ষিপ্ত, তাই এসব ধর্মমত সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই। শুধু কিছু মৌল তথ্য এখানে উল্লেখ্য।

প্রথমে সূফীসাধকদের সম্পর্কে সাধারণভাবে মন্তব্য করা বাঞ্ছনীয়, কারণ পূর্বকাল থেকে প্রচলিত ভক্তিতত্ত্ব সূফী অতীন্দ্রিয়বাদদ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। উত্তর ভারতের সন্তমতের বিভিন্ন ধারায় সূফী ধর্ম-সিদ্ধান্তের প্রভাব দেখা যায়। সূফীসাধকগণও কোন কোন ক্ষেত্রে যোগ-সাধনার আঙ্গিকদ্বারা প্রভাবিত হন। সূফী ধর্মমতে মনুষ্যত্বের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে সংঘবদ্ধভাবে উপাসনার বহুবিধ উপায় এবং স্তরভেদ বিশেষিত হয়েছে। সূফীগণ মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে পারস্পরিক প্রেমমূলক সম্পর্কের তত্ত্ব প্রচার করেন। রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গানে আছে ঃ "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।" এটা সূফীদের মর্মকথা।

মধ্যযুগীয় সূফীদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন খ্বাজা আবদুল আহ্মদ অল্-চিশ্তি, মখদুম সৈয়দ আলী অল্ হুজুরী, খ্বাজা মইন্-উদ্-দীন্ চিশ্তি, খ্বাজা কুতুব্-অল্দীন-কাকী, শেখ্ ফরিদ্ আল্-দীন, শকরগঞ্জ, নিজাম আল্দীন আউলিয়া, শেখ্ সলিম্ চিশ্তি, আবদ্-এল্-কাদের এবং খ্বাজা নূর মুহাম্মদ। বহু মুসলমান এবং হিন্দু এসব সূফী সাধকদের অনুগামী ছিলেন।[৭]

সূফীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবরণ এবং গুরুপরম্পরার কথা জানা গেছে;

কিন্তু তাঁদের শিষ্য এবং অনুগামীদের সম্পর্কে এবং তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক তথ্যাদি অত্যন্ত দুর্লভ। সূফীধর্মের ইতিহাসাশ্রিত ভৌগলিক বিবরণ পূর্ণভাবে জানা যায় না। এসব বৃত্তান্তের বড় অংশ ঐতিহ্য এবং কিংবদন্তী। যেসব ব্যক্তি এই সাধকদের ভক্ত ছিলেন, তাঁদের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক পরিচয়, দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই অজ্ঞাত।

বাংলাদেশে, বিহারে, উত্তর প্রদেশে, পাঞ্জাবে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে, লোকবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সূফীবাদের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সূফীধর্মমত থেকেই উৎসারিত হয়েছিল পীর্-পূজা। সূফীগণ কোথাও কোথাও সাম্প্রদায়িক একতার বাণী প্রচার করেছেন। বাংলাদেশে সূফীমতে বৈষ্ণবতাও সঞ্চারিত হয়েছিল। বস্তুতঃ গোঁড়া মুসলমানগণ এমন ভেবেছিলেন যে, সূফীসাধকগণ ইসলামের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় কিংবা আঞ্চলিক সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। পরবর্তী ওয়াহাবি আন্দোলন এই মিশ্রণের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদরূপে পরিকল্পিত হয়। অথচ সূফী অতীন্দ্রিয়বাদ যে সর্বক্ষেত্রেই সামাজিক প্রগতির সহায়ক হয়েছে, তাও বলা যায় না। কিন্তু হিন্দী, উর্দু, বাংলা এবং উড়িয়া সাহিত্যের উপরে সূফীবাদের প্রভাব লক্ষণীয়, লক্ষণীয় উত্তর ভারতের সমস্ত সন্তমতের উপরে।

৫

দাক্ষিণাত্যে ভক্তি জন্মলাভ করে—এই মত এখনও প্রচলিত। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রধান গ্রন্থ 'ভাগবত পুরাণ' দাক্ষিণাত্যে রচিত হয়েছিল, এটিও একটি প্রচলিত ধারণা। আদি মধ্যযুগে এবং পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যের ভক্তিমূলক শৈব এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রধান উৎস ছিল প্রাচীন পৌরাণিক ধর্ম। দক্ষিণের ভক্তিভাব সম্ভবতঃ সমকালীন সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্থা ও সংগনঠনসমূহ দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়; এসব সংগঠনে ব্যক্তির এবং সামাজিক বর্গসমূহের কোন কোন মৌলিক অধিকার কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছিল।[৮] তার আংশিক প্রতিফলন দাক্ষিণাত্যের ভক্তিসাহিত্যে উচ্চারিত ব্যক্তির মানসিকতায় দেখা যায়।

দাক্ষিণাত্যে শৈব, বৈষ্ণবসিদ্ধ ধর্মমতের প্রধান কেন্দ্র ছিল কোন দেব-মন্দিরকে অথবা একাধিক দেবমন্দিরকে ঘিরে গড়ে ওঠা নগর কিংবা জনবহুল বড় গ্রাম। ভক্তিধর্মমতের দক্ষিণের প্রচারকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সন্তকবি, যাঁরা অভিজাতদের এবং রাজাদের অনুগ্রহ লাভ করেন। সম্প্রতি কোন কোন ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন

যে, শৈব অথবা বৈষ্ণবভক্তির মতাদর্শ দাক্ষিণাত্যের রাজারা নিজেদের রাজত্বকে মান্যতা দেবার জন্য সমর্থন করেছিলেন। উপাস্য দেবতার মন্দিরকে কেন্দ্র করে তাঁরা নগর-স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হন।[৯]

আর্য-সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে খর্ব করতে চাইলেও, জৈন এবং বৌদ্ধধর্মবিরোধী দাক্ষিণী ভক্তিবাদ ছিল হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানমূলক "রিভাইভালিস্ট" মতবাদ।[৯ক] দাক্ষিণাত্যে ভক্তির তাত্ত্বিকগণ উপাস্য দেবতার সঙ্গে ভক্তের নিতান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপরেই জোর দিয়েছিলেন। তাঁরা ধর্মীয় কৃত্যাকাণ্ডকে গ্রাহ্য করেন নি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সদাচারকেও শ্রদ্ধা করেছেন।

সেখানে শৈববৈষ্ণব সিদ্ধ মতবাদ এক ধরনের গণতান্ত্রিকতাকে সমাজে এবং ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করে। তাকে একজন ঐতিহাসিক "আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র" বলেছেন।[১০] অর্থাৎ, উপাস্য দেবতার পূজনের ক্ষেত্রে, জাতি, বর্ণ এবং আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে, সকলেরই সমান অধিকার থাকবে, কিন্তু তা আরাধনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। এ ধারণা শুধু যে দাক্ষিণাত্যের ভক্তদের মধ্যেই ছিল, তাই নয়। কৌলতান্ত্রিকগণ ভৈরবীচক্রে জাতির বিচার নিষিদ্ধ করেছিলেন ; বাঙালি বৈষ্ণবরাও সংকীর্তনে, মহোৎসবে জাতির ব্যবধান মানেন নি। কিন্তু, জটিলভাবে বিন্যস্ত বিভিন্ন স্তর এবং বর্ণভিত্তিক দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন আঞ্চলিক সমাজসংগঠনে "আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র" ছিল অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার।

"আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র" কিন্তু শেষপর্যন্ত সামাজিক বৈষম্যকে দূর করতে পারে নি। তামিল শৈবভক্তিবিষয়ক কবিতা এবং গীতাবলী পাঠ করে এ সিদ্ধান্তই দুর্নিবার হয় যে, এ সব গীতাবলীর রচয়িতাগণ সাধারণ মানুষকে, খেটেখাওয়া মানুষকে অবজ্ঞা করেছেন এবং কেবলমাত্র নিজেদের আধ্যাত্মিক ঊর্ধ্বায়নের স্বপ্ন দেখেছেন। এ বিশ্বাস তাঁদের ছিল যে, ভক্তির প্রাবল্যে দেবতার কৃপালাভ হলেই সামাজিক রীতিনীতিকে এবং সামাজিক ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করা যায়, তার আগে নয়। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সন্ত তোন্ডারতি আল্‌বার স্পষ্টভাবেই বৌদ্ধ এবং জৈনদের অচ্ছুৎ বলে মনে করতেন।[১১]

মিলটন সিঙ্গার একটি সুলিখিত প্রবন্ধে মাদ্রাজ সহরে ভক্তির মাধ্যমে হিন্দুধর্মের 'বৃহৎ' এবং 'ক্ষুদ্র' ঐতিহ্যের মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াসের বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলেছেন।[১২] হয়ত এইরূপ সেতুবন্ধনের প্রয়োজন ছিল, মূল্য ছিল। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, সবরকমের ঈশ্বরভক্তি মূলতঃ এক

হলেও দাক্ষিণাত্যে এবং অন্যত্র তা শৈববৈষ্ণব সাম্প্রদায়িকতাকেই জোরদার করে তুলল। দাক্ষিণাত্যে এই সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নিয়েছিলেন স্থানীয় রাজারা এবং অভিজাতশ্রেণী।

৬

সন্তমত এবং সন্তপরম্পরা সম্পর্কে প্রথম প্রয়োজনীয় কথা, সন্তদের শ্রেণীবিভাগ। একটি গ্রহণযোগ্য বিচারধারা অনুসারে ভক্তিমতালম্বী দুই ধরনের সন্ত ছিলেন, যথা: 'নির্গুণ' ঈশ্বরে বিশ্বাসী সন্ত যেমন কবির; এবং 'সগুণ' ঈশ্বরে বিশ্বাসী সন্ত, যেমন মহারাষ্ট্রের বৈষ্ণবসন্তগণ।[১৩] কবিরের মতাবলম্বী গুরুসম্প্রদায় নিজেদের বৈষ্ণব বলেই মনে করতেন; তখনও তাঁদের উপাস্য দেবতা 'নির্গুণ', এবং 'নির্গুণ', বলেই নিরাকার।

প্রথমে 'সগুণ' ঈশ্বরের উপাসক মহারাষ্ট্রের বৈষ্ণবসন্তদের কথা আলোচ্য। সেখানে ভক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাতরূপে জ্ঞানদেবের (১২৭৫—১২৯৬) 'জ্ঞানেশ্বরী' গীতাভাষ্য উল্লিখিত হয়। তারপরে ভক্তিধর্ম প্রচার করেছিলেন নামদেব, একনাথ, তুকারাম, [গুজরাটের] নরসি মেহ্‌তা এবং রামদাস। আরও অনেক সাধু ছিলেন। পানঢারপুর মহারাষ্ট্রের ভক্তি-আন্দোলনের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। বিঠ্‌ঠল্‌-রূপে এখানে বিষ্ণু পূজিত হন।

এখানে একনাথের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কারণ তিনি স্থানীয় ভাষায় এক ধরনের গীতিমূলক আলেখ্য রচনা করেন, যাদের বলা হয় "ভারুদ"।[১৪] এসব "ভারুদ"-এর মধ্যে অন্ততঃ চল্লিশটির প্রধান চরিত্র মুসলমান ফকির, বাজিকর, গ্রামীণ লোকগীতিশিল্পী, বিভিন্ন অবৈদিক লৌকিক গুরু, সর্বহারা স্ত্রীলোক, ভিক্ষুক এবং গণিকা। একনাথ অসামান্য সহানুভূতির সঙ্গে নিম্নবর্গের ধর্মচিন্তাকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। প্রথমে লুড্‌বিগ্‌ ফয়েরবাখ্‌ এবং পরে কার্ল মার্কস্‌ এই মত প্রকাশ করেন যে, ধর্মে নিপীড়িত মানুষের, অসহায় মানুষের দীর্ঘশ্বাস অনুরণিত হয়।[১৫] এ কথা যে কত সত্য, তা একনাথের 'ভারুদ' পড়লে জানা যেতে পারে। রাষ্ট্রের মধ্যযুগীয় অবস্থাতে, সমাজবিন্যাসের মধ্যযুগীয় স্তরে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যযুগীয় স্থিতিশীলতায় সাধারণ লোকের দুর্দশার অন্ত ছিল না। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই যে ঈশ্বরের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়, তা শুধু মহারাষ্ট্রীয় সন্ত-সাহিত্যে নয়, সমগ্র ভক্তি সাহিত্যেই সুস্পষ্ট।

মহারাষ্ট্রের সন্ত-আন্দোলনে অব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য ছিল। যদিও ধর্মীয় সংরক্ষণশীলতা এবং কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধেই তাঁদের অভিযোগ ছিল, তবুও ব্রাহ্মণ্য

সদাচারকেই তাঁরা পছন্দ করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, একনাথ বৈষ্ণব হলেও কৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনীসমূহকে বর্জন করে 'ভাগবতপুরাণ'-এর সদাচারতত্ত্বমূলক একাদশ স্কন্ধের উপরে টীকা রচনা করেন। মহারাষ্ট্রে সন্ত-আন্দোলনের একটি উদ্দেশ্য ছিল, জাতিধর্মনির্বিশেষে ব্যক্তির ধর্ম এবং সমাজ-বিষয়ে মত প্রকাশের মৌল অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এ উদ্দেশ্যের প্রতিফলন দেখা যায় 'ভারুদ'-এ, এবং মারাঠী ভাষায় রচিত 'আভাঙ' নামক সুললিত ভজন-গীতিমালাতে। পরে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে দেখাতে চেষ্টা করেন যে, আঞ্চলিক স্বাধীনতার জন্য শিবাজির মুঘল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম এবং একটি জাতীয়তা-সম্পন্ন জনগোষ্ঠীরূপে মারাঠাদের মহান আবির্ভাব, স্থানীয় ভক্তি-আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শদ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।[১৬]

অবশ্য প্রসঙ্গতঃ একথাও বলা দরকার যে, মহারাষ্ট্রের সন্তমতে প্রথমাবধি ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের একটি ধারা ছিল; ক্রমশঃ তা প্রবল হয়ে ওঠে। শিবাজির গুরু সন্ত রামদাস তাঁকে গরু এবং ব্রাহ্মণের হিতার্থে মনোযোগী হতে বলেন।[১৭] মহারাষ্ট্রীয় সন্তমতে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ-বর্ণিত একটি "আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য" প্রতিষ্ঠিত হল। মহাদেব গোবিন্দ রানাডের যুক্তি অনুসরণ করে বলা যায়, তার প্রতিফলন দেখি বর্গি-সাম্রাজ্যবাদে। এই সাম্রাজ্যে ক্ষমতা দখল করলেন বেদবাদী মারাঠী ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ। অথচ, মহারাষ্ট্রের সন্ত-কাহিনীতে শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে ভক্তের ভাঙ্গা কুঁড়েঘর মেরামত করিয়ে নেওয়ার বৃত্তান্তও আছে —অষ্টাদশ শতকে মহীপতিরচিত 'ভক্তবিজয়' নামক গ্রন্থে।[১৮]

৭

মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, সিন্ধুদেশে, পাঞ্জাবে এবং উত্তর ভারতে ভক্তি-আন্দোলনে শূদ্রদের প্রাধান্য ছিল। কোন কোন জায়গাতে উচ্চবর্ণের লোকজন তাতে জড়িত হয়ে পড়লেও, শুরুতে ভক্তির সামাজিক উদ্দেশ্যে নিম্নবর্গের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। অব্রাহ্মণ নিম্নবর্গের প্রতিনিধি ছিলেন কবির, নানক, ধন্না, পিপা, ধর্মদাস, দাদূ, রজ্জব, গরিব দাস, ভান সাহেব, জগজ্জীবন সাহেব, লালগীর, ভিখা, সুরদাস, পল্টুদাস, পিরনশাহ, লালদাস, ধরণী দাস, ছজ্জু ভগৎ, মুলুকদাস, বুল্লেশাহ ধেদরাজ, তুলসীদাস এবং মুন্নাদাস।[১৯]

ঐতিহ্য অনুসারে কবির রামানন্দপন্থী ছিলেন।[২০] রামানন্দের শিষ্যগণ পরে দাক্ষিণাত্যের রামানুজাচার্যের শ্রীসম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সংরক্ষণশীল হয়ে ওঠেন। রাজস্থানে রামানন্দী মঠে অচ্ছুৎদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অন্যান্য 'নির্গুণ'-বাদী সন্তগণ জাতবিচার বর্জন

করেছিলেন। কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারাতে প্রচলিত অতীন্দ্রিয়বাদের প্রভাব দেখা যায়। তাঁরা ব্যক্তির মানসিক উৎকর্ষ এবং পবিত্রতার উপরে জোর দিয়েছেন; অবশ্য পবিত্রতা বলতে তাঁরা "শুচিবায়ু" বোঝান নি। যাদুবিশ্বাসমূলক আভিচারিক ক্রিয়াকর্ম, হঠযোগ এবং ধর্মের নামে সরল মানুষদের প্রবঞ্চনা করার ব্যবসা তাঁরা বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে অসামান্য প্রতিভাশালী কবির বার-বার "সাধু" বলতে সেই মানুষকে বুঝিয়েছেন যিনি নিরভিমান, সচ্চরিত্র, বহুদর্শী, বস্তুবোধসম্পন্ন, সাধারণ মানুষ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল, পরিশ্রমী, সংযমী এবং আদর্শবান। সন্ন্যাসের আদর্শ উত্তর ভারতের সন্তমতে প্রাধান্য পায় নি; বরঞ্চ প্রাধান্য পেয়েছে পার্থিব মানবজীবনের মূল্য, সংযমিত গার্হস্থ্য, সৌভ্রাতৃত্ব এবং সাধারণ লোকের আধ্যাত্মিক অধিকার। নিম্নজাতির জনগোষ্ঠীর মধ্যে সদাচার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং স্ত্রীলোকদের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, সন্তদের প্রযত্ন ছিল প্রশংসনীয়। শুরুতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মসম্পর্কে তাঁদের বিশেষ কোন শ্রদ্ধা ছিল না তাঁদের বিশ্বাসে যেহেতু দেবতার রূপকল্পনা ছিল না, তাই তাঁরা বহু দেবদেবীর অস্তিত্ব মানেন নি। লোকসমাজে প্রচলিত কুসংস্কার তাঁরা অগ্রাহ্য করেছেন।

কিন্তু, দক্ষিণের এবং মহারাষ্ট্রের ভক্তি-আন্দোলনের সন্ত-নেতাদের মতো উত্তর ভারতীয় সন্তরাও প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করতে চান নি, অথবা করতে পারেন নি। তাঁরা শেষপর্যন্ত সে ব্যবস্থাতে একটি হিতবাদীভিত্তিক উদারনীতির সঞ্চার ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, উদারতা ছাড়া সামাজিক সংহতির এবং চলমানতার কোন সম্ভাবনা তখন ছিল না। ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপরে তাঁরা জোর দিয়েছিলেন; তার ফলে ধর্মশাস্ত্রের নাগপাশবন্ধন কিছুটা শিথিল হয়। সামাজিক স্তরবিন্যাসে কিছুটা পারস্পরিক নৈকট্য অনুভব করা যায় এবং একটি সহজবোধ্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভাবাদর্শ প্রচারিত হওয়ার ফলে জন-সাধারণের পক্ষে জীবনের কঠোর বাস্তবতাকে সহ্য করা কিছুটা সহজসাধ্য হয়।

উত্তর ভারতের সন্তদের মধ্যে অধুনা কবির এবং নানক সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে।[২১] কবিরের নামাঙ্কিত রচনাবলীতে ভাষার, ভাবের এবং প্রকাশভঙ্গীর এমন বিশিষ্টতা আছে, যা প্রায় অতুলনীয়; তাকে আধুনিক ভাষায় নিখুঁতভাবে রূপান্তরিত করা দুঃসাধ্য। বিশেষ করে কবিরের "বিজক"-এ কিছু আলো-আঁধারী "সন্ধ্যাভাষায়" লেখা কবিতা আছে, যার আসল মর্ম বোঝা সম্ভব হয় না। কোন কোন কবির-বাণী অতীন্দ্রিয়বাদ দ্বারা আচ্ছন্ন এবং

অস্পষ্ট ; কিন্তু কবিরের দোহাতে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং বাচনভঙ্গি দেখা যায়।[২২]

গুরু নানক প্রবর্তিত শিখধর্ম সন্তমতরূপেই প্রচারিত হয়েছিল। এই ধর্মের পবিত্রতম গ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেব'-এ নানক ছাড়াও অন্যান্য সন্তদের বাণী সঙ্কলিত হয়েছে ; তাতে জয়দেবের শ্লোকও আছে। সন্তমতে উদার দৃষ্টিভঙ্গি সর্বত্রই লক্ষণীয় ; বিশেষভাবে 'গ্রন্থ সাহেব'-এ তা দেখা যায়। ক্রমশঃ শিখদেরও ধর্মীয় সদাচার "রহিতনামাতে" গ্রথিত হয়। বিভিন্ন সামাজিক-ঐতিহাসিক কারণে শিখগণ একটি বিশিষ্ট ধর্মমতকে কেন্দ্র করে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করলেন। এ ধরনের স্বাতন্ত্র্য এবং সংগঠন অন্য কোন সমকালীন সম্প্রদায়ের ছিল না। সাম্প্রদায়িক সত্তাকে প্রায় একটি স্বাতন্ত্র্য জাতিসত্তায় রূপান্তরিত করার অভিপ্রায় অন্য সব সন্তমতে স্পষ্ট নয়। শিখধর্মের ক্ষেত্রে কেন এমন হল, তা আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই।[২৩]

৮

আদি মধ্যযুগে ভক্তিকে অবলম্বন করে পঞ্চোপাসনার ঐতিহ্য শক্তিশালী হয়।[২৪] 'পঞ্চোপাসনা' অর্থ শিব শক্তি গণপতি সূর্য এবং বিষ্ণুর উপাসনা। ভক্তির তত্ত্বে অবশ্য একেশ্বরবাদ নিহিত ছিল, এবং ক্রমশঃ একেশ্বরে বিশ্বাস ভক্তির মনোভূমিতে প্রাধান্য লাভ করল। পঞ্চোপাসনা উপপুরাণসমূহের উপজীব্য হল, এবং ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকাণ্ড এই পঞ্চোপাসনার ঐতিহ্যকে সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় সংমিশ্রণের মাধ্যমে পল্লবিত করল।[২৫] একেশ্বরবাদে সাম্প্রদায়িক মতানুসারে প্রাধান্য পেতে থাকলেন বিষ্ণু অথবা তাঁর কোন অবতার, শিব এবং শক্তি। গণপতির পূজা উত্তর-পশ্চিম ভারতে কিছুটা প্রচলিত থাকলেও, সূর্যোপাসনার ঐতিহ্য ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। একসময়ে তার একটি বড় কেন্দ্র ছিল কোণারক। রাজা বল্লাল সেনের মতো কট্টর হিন্দুরা শৈবশাক্ত মতবাদকে 'পাষণ্ড' মতবাদরূপেই বিচার করেছিলেন ;[২৬] কিন্তু তাঁরা বিষ্ণু এবং তাঁর অবতারদেব মেনে নিলেন। নাথ-সিদ্ধ-যোগীদের সঙ্গে শৈবদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল ; বৈষ্ণবীয় প্রেমভাবনা সূফীদের ভাল লেগেছিল ; এবং শাক্ত-মতবাদের সঙ্গে কোথাও কোথাও শৈব-সিদ্ধান্তের মিলন হয়েছিল। মিথিলাতে এবং নেপালে আবিষ্কৃত মধ্যকালীন মৈথিলী-বাংলা নাটকসমূহে সুপ্রাচীন বোধিসত্ত্বের লোককল্যাণমূলক ভাবাদর্শও দেখা যায়।[২৭] মধ্যকালীন ধর্মের ক্ষেত্রে এত সব মিল-গরমিলের পূর্ণ বিবরণ এখনও লেখা হয় নি। ভক্তির মতবাদ এই ধর্মীয় সংশ্লেষকে আরো বেশী শক্তিশালী করে তোলে।

'নির্গুণ'-বাদী সন্তমতে ভক্তির উচ্ছ্বাস অনেকটা অবদমিত ; কিন্তু 'সগুণ'-সন্তমতে এবং বিশেষভাবে পূর্ব ভারতের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনে এই উচ্ছ্বাস এবং তার অভিব্যক্তি একটি প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়াল। ভক্তির উচ্ছ্বাসই চৈতন্যের বিখ্যাত ধর্মান্দোলনের মূলীভূত উপাদান। চৈতন্যের মধ্যকালীন জীবনীসমূহে তিনি একজন ক্রুদ্ধ যুবকরূপে চিত্রিত হয়েছেন। তিনি শাস্ত্রব্যাখ্যা, স্মৃতি, ব্যাকরণ এবং নব্যন্যায়কে বর্জন করেছেন। তিনি নবদ্বীপে মালাকার, শঙ্খকার, তৈলকার, কুম্ভকার এবং বাজারের দোকানদারদের সঙ্গে, রাস্তার অপরিচিত লোকদের সঙ্গে মিশেছেন। উচ্ছ্বাসমূলক ধর্মান্দোলন একই সঙ্গে নাগরিক বর্গসমূহকে এবং কৃষকদের যুগে যুগে আকর্ষণ করেছে। চৈতন্যের ক্ষেত্রে এবং দাক্ষিণাত্য ও মহারাষ্ট্রের সন্তদের ক্ষেত্রে এই ঘটনা স্পষ্ট।

এমন ধারণা এখনও আছে যে, চৈতন্যের ধর্মান্দোলন ছিল প্রধানতঃ মুসলমান-অভিঘাতবিরোধী : অর্থাৎ, ইসলাম-এর সম্প্রসারণ রোধ করার জন্যই চৈতন্য হরির নাম প্রচার করেন। কিন্তু এই হিন্দু সাম্প্রদায়িক ধারণা সর্বাংশে শ্রদ্ধেয় নয় ; কারণ, চৈতন্যের জীবনীসমূহে ইসলামের প্রসঙ্গ অথবা মুসলমানদের প্রসঙ্গ সর্বত্র সামান্য এবং প্রক্ষিপ্ত। সেখানে প্রধান্য পেয়েছে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বস্তুবাদের অনিষ্টকর পরিণাম, লোকসমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের কুফল এবং সমকালীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতা, যার ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্নতা অথবা 'এলিয়েনেশন্' মারাত্মক রূপ ধারণ করেছিল এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংকট ঘনীভূত হয়েছিল। চৈতন্যের জীবনীকারগণ দেখাতে চেয়েছেন যে, ভক্তির অন্তর্নিহিত উচ্ছ্বাসদ্বারা সামাজিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে এসব নঞর্থক অবস্থাকেই চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরগণ দূর করতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য সন্তদের মতো চৈতন্যও ধর্মের একটি উদার এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যাশ্রয়ী ভাষ্য প্রস্তুত করেন, যাতে কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত না হলেও, ভক্তজনের প্রাতিস্বিকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। উচ্ছ্বাস এবং কীর্তনের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ক্রমশঃ একাত্মতা আসে। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, চৈতন্য এবং তাঁর সমর্থকগণ প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চান নি।'[১৮]

৯

মধ্যকালীন ভক্তি-ভাবনার অন্যতম "ভাব" ছিল "দাস্যভাব", অর্থাৎ, ভক্ত ঈশ্বরের দাস, এই ভাব। কোন কোন মার্কসবাদী ঐতিহাসিক দাক্ষিণাত্যের ক্ষেত্রে দাস্যভাবের সঙ্গে ফিউডাল সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত বিশেষ দাসত্ব প্রথার,

অথবা 'সাফ'-প্রথার কিছুটা মিল দেখেছেন।[২৯] তাঁদের মতে দাস্যভাবে জাতি এবং বৃত্তি অনুসারে নিম্নবর্গের মানুষদের আর্থসামাজিক পরবশতা ব্যঞ্জিত হয়েছিল। এই মত কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই মত একটি মন্তব্য মাত্র। দাস্যভাব সর্বতোভাবে ফিউডাল ভাবাদর্শ কিনা—তার বিচার করতে হলে বহু রকমের তথ্য আলোচনা করতে হয়। এখানে সে আলোচনা করার সুযোগ নেই। কিন্তু এ তথ্য তো আছে যে, সবাই যদি ঈশ্বরের দাস হয়, তবে তাদের মধ্যে, অন্ততঃ দাস্যভাবে, কিছুটা সাম্য আসে, 'আধ্যাত্মিক' গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরের দাসত্বের মধ্যে রকমফের তেমন থাকে না। বর্ণভেদমূলক সমাজব্যবস্থায় দাস্যভাব অন্ততঃ আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে, ভেদভাবকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখে। বৃন্দাবনদাসের মতে চৈতন্য দাস্যভাবেরই প্রচারক ছিলেন।[৩০] নিত্যানন্দ দাস্যভাবের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নিত্যানন্দকে সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রবাদী বলে অভিহিত করেন।[৩১] তিনি "সর্বক্ষণ শূদ্রের আশ্রমে" থাকতেন।[৩২] দাস্যভাব প্রচার করেছিলেন আসামের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের নেতা শঙ্করদেব।[৩৩] 'দাস্যভাব' যে সামাজিক চলমানতা বৃদ্ধি করেছিল, তারও প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য নয়।

১০

এখানে স্মরণীয়, ভক্তির ভাবাদর্শ এক এবং অভিন্ন ছিল না। ভক্তির বহুবিধ ভাষ্য ছিল। ভক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতাদর্শের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে এভাবে যে, ভারতে আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে বিভিন্নতাই পুষ্টিলাভ করেছে। এক বেদান্তদর্শনেরই বহু ভাষ্য রচিত হয়েছিল। স্থানীয় বিভিন্নতা এবং গুরুবাদ থেকে উৎসারিত সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতাও ছিল। তাতে বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রস্থানভেদ ব্যঞ্জিত হয়েছে। তাতে শিষ্যদের ভাবনাচিন্তার ছাপও দেখা যায়।

চারটি বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন ভাবে গড়ে উঠেছিল।[৩৪] শৈব-ধর্মসাধনার এবং তান্ত্রিক ধর্মেরও বিভিন্ন স্তর এবং ধারা ছিল। সন্তমতের ক্ষেত্রেও সর্বত্র তত্ত্বের, তত্ত্বের ভাষ্যের এবং আচরণের বিভিন্নতা লক্ষণীয়। ভক্তির একটি প্রধান তত্ত্ব ছিল অহিংসা। শিখ সন্তগণ এবং অন্যান্য 'নির্গুণ' উপাসকগণ ব্যক্তির সামাজিক এবং পারিবারিক দায়িত্বের উপরে যথেষ্ট জোর দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এই সামূহিক দায়িত্ববোধ থেকেই ক্ষেত্র এবং অবস্থা অনুসারে হিংসাও লোকব্যবহারে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষভাবে শিখ-সম্প্রদায় কৃপাণকে তাঁদের ধর্মের একটি প্রধান চিহ্ন বলে মনে করলেন। বৈষ্ণব মারাঠারাও অস্ত্রধারণ করেন।

মধ্যকালে ভারতের সর্বত্র শৈব ধর্মের এবং বৈষ্ণব ধর্মের 'বৃহৎ' এবং 'ক্ষুদ্র' ঐতিহ্য দেখা যায়। 'বৃহৎ' ঐতিহ্যের সঙ্গে পৌরাণিক ধর্মের যোগ ছিল, যোগ ছিল বেদান্তদর্শনের। শিখ সম্প্রদায় এ ধরনের সংযোগ এড়িয়ে চলেছেন। অন্যদিকে উত্তর ভারতে "কণিষ্ঠ" সন্তগণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের বাণী প্রচার করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দাদূ, চরণদাস, পল্টুদাস এবং রবিদাস।

পঞ্চোপাসনার সূত্র ধরে, বেদান্তের দুরতিক্রম্য প্রভাবে এবং প্রথমাবধি ব্রাহ্মণদের সক্রিয়তার জন্য, বাংলাদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম একটি নবব্রাহ্মণ্য মতবাদ রূপেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৩৫] বিশেষ করে যেখানে শূদ্র শিক্ষিতবর্গ, শূদ্র অভিজাতগণ ভক্তির অথবা সন্তমতের আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানেই এসব ধর্মীয় মতবাদ সামাজিক সংস্কৃতকরণের একটি প্রক্রিয়ারূপে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি শিখদের মধ্যেও জাতিভেদ দেখা গেল। সংরক্ষণশীলতার দ্বারা আক্রান্ত হল রামানন্দের এবং কবিরের ধর্মমত। কেবলমাত্র সূফীগণ এবং নিম্নবর্গীয় ভক্তগণ জাতবিচারকে মানলেন না। কিন্তু সূফীবাদও বেদান্তদ্বারা প্রভাবিত হয়।[৩৬]

একসময়ে কোন কোন ঐতিহাসিক দাক্ষিণাত্যের ভক্তি-আন্দোলনকে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে 'প্রলেটারিয়ান'-দের সংগ্রামরূপে বিচার করেছিলেন।[৩৭] কিন্তু এই বিচার ভিত্তিহীন ছিল। দাক্ষিণাত্যের শৈব-ভক্তদের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তরজনই ছিলেন হয় ব্রাহ্মণ, নয়তো ক্ষত্রিয়।[৩৮] বাংলাতে চৈতন্যের চারশ' নব্বইজন পরিবারের মধ্যে দু'শ' ঊনচল্লিশজন ছিলেন ব্রাহ্মণ, সাঁইত্রিশজন ছিলেন বৈদ্য এবং ঊনত্রিশজন ছিলেন কায়স্থ।[৩৯] সূফীসাধকদেরও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সুযোগ হয়। উত্তর ভারতে কিছু রামাৎ অথবা রামায়েৎ গুরু মাটির কাছাকাছি ছিলেন। বাংলাদেশের আউল, বাউল, সহজিয়া গুরুদের মতো তাঁরাও অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নি। তাঁদের ধর্মচিন্তা প্রসারিত হল বৃহত্তর লোকসমাজে, এমনকি আদিবাসীদের প্রান্তিক জগতে।[৪০] বৈষ্ণব রামায়েৎ গুরুগণ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। রামায়েৎ-প্রভাবে ক্রমশঃ আদিবাসীদের মধ্যেও, বিশেষভাবে মুণ্ডা ও সাঁওতালদের মধ্যে, সমাজসংস্কারের ধারণা, ব্যক্তিজীবনের সংস্কৃতকরণের ধারণা শক্তিশালী হয়।[৪১] এই ঘটনার তাৎপর্য ব্রাহ্মণগণ এবং ভূম্যধিকারী শূদ্র অভিজাতবর্গ বুঝতে চান নি। আদিবাসীদের এবং কোথাও কোথাও নিম্নবর্ণের কৃষকদের সংস্কার আন্দোলনে অতএব ব্রাহ্মণদের এবং জমিদার-জাগিরদারদের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে রইল। মুসলমান পুরোহিতগণ তার

বাইরে রইলেন। নিম্নজাতিভিত্তিক ভক্তিমার্গের সৃষ্টি এভাবেই ভক্তি-আন্দোলনে একটি নূতন মাত্রা সংযুক্ত করল।[৭২]

১১

অনেকেই এমন ভেবেছেন যে, ভক্তি আন্দোলন, বিশেষভাবে অহিংস বৈষ্ণবতা জাতিকে দুর্বল করে দেয়। ভক্তি পরনির্ভরতার মানসিকতাকে পুষ্ট করে।[৪২ক] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম ছিল উড়িষ্যার হিন্দু-রাজত্বের পতনের মৌল কারণ।[৪৩] যদুনাথ সরকার বাঙালিদের উপরে আরোপিত হৃদয়দৌর্বল্যের জন্য কোমলকান্ত পদাবলীসমৃদ্ধ বৈষ্ণবধর্মকে দায়ী করেছেন।[৪৪] এই বিচারধারা অনুসরণ করে বলা যায় যে, ভক্তির সমন্বয়-মূলক তত্ত্ব ক্রমশঃ অভ্যাসে পরিণত হওয়ার ফলে বিরাট জনসমষ্টি—বিশেষভাবে দুর্বলতর শ্রেণীসমূহ—গুরুবাদে বিশ্বাসী এবং অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়েন। তাঁরা বর্বরতা এবং সীমাহীন নির্যাতনকেও শান্তভাবে মেনে নেন। ভক্তির তত্ত্বে অর্থের কিংবা আর্থিক পুঁজির সঞ্চয় আদৌ প্রাধান্য না পাওয়াতে মূলধন ধর্মকর্মে এবং গুরুপোষণে ব্যয় করা হতে থাকে, লিখেছেন ম্যাকস্ ওয়েবার।[৪৫]

ভক্তির সদর্থক ফলও কিছু ছিল। সেগুলো উল্লেখ করার আগে উপরে উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে দু'চার কথা বলি। প্রথমতঃ ভক্তি থেকে পরনির্ভরতার মানসিকতা সমগ্র জনসমষ্টির উপরে আরোপ করা কি ইতিহাসের বিচারধারা-সম্মত? এ ধরনের কাঁচা মনোবৈজ্ঞানিকতা ইতিহাসের আলোচনায় স্বীকার্য নয়। বাইবেলেও বহুভাবে অহিংসা ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাতে কি খ্রিস্টানগণ মেরুদণ্ড-হীন হয়ে পড়েছেন? আমরা যেন না ভুলি যে, কতকগুলো ক্ষেত্রে ভক্তি প্রচলনির্ভরতার বিরুদ্ধে উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং উপাসনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে উজ্জীবিত করেছিল। এমনও নয় যে, ভক্তি বললেই অপার্থিবতা, কিংবা আধ্যাত্মিকতা বুঝতে হবে। বহুকাল আগে বিনয়কুমার সরকার বাংলা বৈষ্ণব কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপত্তি করে লিখেছিলেন যে, এ কবিতায় বাংলার সূর্যকরোজ্জ্বল গ্রাম, বহতা নদী এবং মানুষই চিত্রিত হয়েছে।[৪৬] ভক্তি আন্দোলনের স্রষ্টাগণ এই পৃথিবীতেই আরো ভালভাবে বাঁচতে চেয়েছেন।

উড়িষ্যাতে ভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্মের কুফল সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণা যে ভিত্তিহীন ছিল, তা প্রমাণ করেছিলেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়।[৪৭] তিনি দেখিয়েছেন যে, এমনসব ঘটনার ফলে উড়িষ্যাতে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে, যার সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের কোন যোগ ছিল না। বাঙালিরাও

বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ফলে মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েন নি ; তাঁরা মুঘল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করেছিলেন—তা যদুনাথ সরকার নিজেই বিষদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।[৪৮] অপরপক্ষে বলা যায়, শুধু কি ধর্মের জন্যই অর্থব্যয় করা হত ? "সুস্পষ্ট ভোগ", অথবা 'কন্সপিকুয়াস্ কন্সাম্প্শন'-এর জন্য ব্যয় করা হয় নি ?

মুঘল আমলে এবং ব্রিটিশদের শাসনকালে বহু কৃষকবিদ্রোহ হয়েছে। হাজার বৎসরেরও বেশী সময় ধরে ভক্তিবাদ প্রচারিত হয়েছে। ভক্তিসম্ভূত মানসিক দুর্বলতার পরেও জনসাধারণ বারবার বিদ্রোহ করার সাহস কোথা থেকে পেল ?[৪৯] ভক্তির পক্ষে এসব যুক্তির পরেও বলা যায়, ভক্তি, সন্তমত সর্বত্র, সমভাবে সদর্থক ছিল না। প্রচলিত বিশ্বাসের এবং সমাজের একটি আংশিক সমালোচনারূপেই ভক্তির বিকাশ ঘটে ; তার ফলে ভক্তির অথবা সন্তমতের কোন বৈপ্লবিক সম্ভাবনা ছিল না। ভক্তি এবং সন্তমত যখন কালক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম হয়ে উঠল, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে প্রাচীনতর এবং বৃহত্তর ব্রাহ্মণ্যতার কোন বিরোধ রইল না। ভক্তি সাম্প্রদায়িক বিভেদের কারণ হয়ে উঠল।

অথচ, বহুবিধ দুর্বলতা সত্ত্বেও ভক্তি আন্দোলনে, সন্তদের প্রভাবে, মধ্যকালীন ভারতীয় সভ্যতার সমৃদ্ধি দেখা যায়। সামাজিক চলমানতা বেড়েছে। আঞ্চলিক ভাষাসমূহের এবং সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালাম, মারাঠী, গুজরাটী, গুরুমুখী, হিন্দী, বাংলা, অহমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলী—এ সব ভাষার বিকাশে ভক্তিমতের এবং সন্তমতের অবদান অবিস্মরণীয়। ভক্তিকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছিল গুজরাটের, রাজস্থানের, বাশোলির এবং পাহাড়ী চিত্রশিল্প,[৫০] বাংলাদেশের বিশিষ্ট মন্দিরভাস্কর্য এবং স্থাপত্য, নূতন নূতন ভজন গীতিমালা, পদাবলী কীর্তন।

উৎপাদনযন্ত্রের পরিবর্তন সাধনের কথা ভক্তিসূত্র রচয়িতাগণ, সন্তগণ ভাবতেই পারেন নি। আধ্যাত্মিকতার স্তরে তাঁদের চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ ছিল। সেই দুরতিক্রম্য সীমাবদ্ধতার পরেও তাঁরা ব্যক্তির জীবনে, সমাজজীবনে এবং আবহমান সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছুটা গতির সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। এটাকে ছোট করে দেখা যায় না।

সূত্রনির্দেশ

১ A. L. Basham, The Wonder That was India, New York, 1954, p 127, Romila Thapar, A History of India, I Harmondsworth, 1966, pp 241 ff , বিষয়টি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা : Ramakanta Chakraborty, "Problems And Perspectives of a Marxist Critique of Hinduism", Society And Change, July-September, 1983 : pp 292-326 ; ভক্তির প্রাচীন ইতিহাস : B.K. Goswami-Sastri, The Bhakti Cult InAncient India, Delhi, Reprint, 1975 ; Ramnarayan Vyas, The Bhagavata, Bhakti Cult, And Three Advitya Acharyas, New Delhi, 1977 ; Jan Gonda, Vishnuism And Sivaism : A Comparison, Indian ed. New Delhi, 1976

২ W. G. Archer, The Loves of Krishna. London, 1957, p 73 ; Ramakanta Chakraborty, Vaisnavism In Bengal : 1486-1900 Calcutta, I985, ch. I

৩ Visnu Puri, Bhaktiratnavali, ed. A. B. (Allahabad, 1918) ; Nandalal Sinha, ed. Bhaktisutras of Narada and Sandilyasutram, reprint, Delhi, n. d.

৪ বাংলাদেশে ব্রাহ্মণদের উপনিবেশ স্থাপন সম্পর্কে তথ্যাদির আলোচনা : Puspa Niyogi, Brahmanic Settlements in Different Subdivisions of Ancient Bengal, Calcutta 1967

৫ P. V. Kane, History of Dharmasastra, 5 vols. (Poona, 1930-1958), Jaydev Ganguly, Dharmasastra in Mithila, Calcutta, 1972 : বাণী চক্রবর্তী, 'সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন', কলিকাতা, ১৯৭০ ; Max Weber লিখেছেন : 'Earlier Hinduism was borne by a hereditary caste of cultured literati ..They formed a stable centre for the orientation of the Status Stratification, and they placed their stamp upon the Social order. Only Brahmanas educated in the Veda formed, as bearers of tradition, the fully recognized religious status group. And only later a non-Brahman status group of asletics emerged by the side of the Brahmanas and competed with them. Still later, during the Indian Middle Ages. Hinduism entered the plain. It represented the ardent (Inbrunstige) sacramental religiosity of the savior. and was borne by the lower strata with their plebeian mystagogues'. From Max

Weber, Essays In Sociology, Trans. ed. H. H. Gerth, C. Wright Mills, London, 1957, pp 268-69

৬ দ্রষ্টব্য, A. Rahaman, "Science And Technology in Mediaeval India", Journal of Scientific And Industrial Research, vol. 40, October 1981, pp 615-22

৭ Muhammad Enamul Haq, A History of Sufism in Bengal, Dacca, 1975 ; R. A. Nicholson, Studies In Islamic Mysticism (Cambridge, 1921) ; John A. Sobhan, Sufism, Its Saints And Shrines (Lucknow, 1938) ; এনামুল হক্, 'বঙ্গে সূফী প্রভাব' (কলিকাতা ১৯৩৫) ; Tarachand, Influenee of Islam on Indian Culture (Allahabad, 1963) ; Kshitimohan Sen, Mediaeval Mysticism In India (London, 1930) ; Roma Chaudhuri, Sufism And Vedanta (in two parts : Calcutta, 1945-1948) ; পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, 'সূফী মতের উৎস সন্ধানে' (কলিকাতা, 1981) ; Martin Lings, What is Sufism ? (London, 1975) ; Narayan Bulchand Butani, "Sufism" : The Cultural Heritage of India, II [Belur Math, n. d.], pp 366-94 ; Momtazur Rahaman Tarafdar, Hussain Shahi Bengal : A Socio-Political Study, Dacca, 1965 ; ch. IV ; S. T. Lokhandwala, "Indian Islam : Composite Culture And Integration", New Quest (Pune), March-April, 1985, No. 50, pp 87-101 ; Bruce B. Lawrence, "The Sant Movement and North Indian Sufis" in The Sants : Studies In a Devotional Tradition of India, ed. Karinc Sehomes and W. H. Mcleod, Delhi, 1987, pp 359-73 ; S. H. Askari, 'Bengal As Reflected in the Sufi Literature of Bihar and U. P.', in Culture of Bengal Through the Ages, ed. Bhaskar Chattopadhyay (Burdwan 1988), pp 200-214

৮ K. Karasima, South Indian History And Society : AD 850-1800 (Oxford University Press, 1984) ; A. L. Basham, "Some Reflections on Dravidians And Aryans", Bulletin of the Institute of Traditional Cultures, Madras, II, 1963, pp 225-34 ; K. A. Nilkanta Sastri, A History of South India From Prehistoric Times to the fall of Vijayanagar (Oxford University Press, 1958), pp 355-409 ; S. Vaiyapuri Pillai, History of the Tamil Language And Litera-

ture (Annamalainagar, 1956), pp 70-82 ; E Sa Visswanathan, "The Emergence of Brahmanas in South India with Special Reference to Tamilnadu", in S. N. Mukherji ed. Essays In Honour of A. L. Basham, Calcutta, 1982, pp 242 ff ; Kamil Zvelebil, The Smile of Marugan, Leiden, 1973, pp. 185-206 : পূর্বোক্ত The Cultural Heritage of India, II-তে সংকলিত : V. Rangacharya, "The Historical Evolution of Sri Vaisnavism in South India" ; S. Satchidananda Pillai, "The Saiva Saints ot Southern India" ; M. N. Srinivas, Religian And Society Among the Coorgs of South India (Oxford, 1952) ; যতীন্দ্র রামানুজ, 'কুরুল' [দুই খণ্ডে বঙ্গলিপিতে লিখিত মূল তামিল সহ 'কুরুল'-গীতির অনুবাদ] ; T. P. Meenakshi Sundaram, A History of Tamil Literature (Annamalainagar, 1965)

৯ M. G. S. Narayanan & Veluthat Kesavan, "Bhakti Movement in South India", in D. N. Jha, ed. Feudal Social Formation in Early India, Delhi, 1987 দ্রষ্টব্য

৯ক দ্রষ্টব্য, N. K. Sastri, পূর্বোক্ত ; Esa Visswanathan, পূর্বোক্ত ; Romila Thapar, পূর্বোক্ত ; T. P. Meenakshisundaram, পূর্বোক্ত ; Kamil Zvelebil, পূর্বোক্ত

১০ "Spiritual Democracy"-র ব্যাখ্যা : Kamil Zvelebil, পূর্বোক্ত

১১ তদেব, p 196

১২ Milton Singer, "The Great Tradition of Hinduism in the city of Madras". Anthropology of Folk Religion, ed. Charles Leslic (Vintage Books, New York, 1960) pp 105-166

১৩ Dr. Justin E. Abbott and Pandit Narahar R. Godbole, Stories of Indian Saints : Translation of Mahipati's Bhaktavijaya (Reprint, Delhi, 1982) ; Krishnarao Venkatesh Gajendragadkar, "The Maharashtra Saints And Their Teachings", Cultural Heritage of India, পূর্বোক্ত, Vol II. pp 267-90 ; V. Raghavan. The Great Integrators : The Saint-Singers of India (New Delhi, 1964) ; B. S. Sakhase, ed. (in Marathi), Sri Ekanath Maharaj Yanchya Abhanganchi Gatha (Pune, Indira Prahashan, 1952) ; (In Marathi), Sri Tukaramancha Gatha, 2 Vols. (Bombay, Government Central Press, 1950) ; Nicol Macnicol

(Trans.) Psalms of Maratha Saints (Calcutta, 1919); Arun Kolatkar, "Translations From Tukaram And other Sant Poets". Journal of South Asian Literature 17 : 1 (1982), pp 111-114; (In Marathi): Nana Maharaj Shakhade, ed. Sakala Sant Grantha (Poona, 1961)

১৪ Shankar Gopal Tulpule, Classical Marathi Literature (Wiesbaden, otto Harrassonitz, 1979); Eleanor Zelliot. "Ekanath's BHARUDS : The Saint As Link Betureen Cultures", in The Sants : পূর্বোক্ত ; আরো দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত Sri Eknath Maharaj Yanchya Abhanganchi Gatha

১৫ Feuerbach, The Essence of Christianity (English Trans. Harper Torchbooks. New York, 1957), p 121; Marx W. Wartofsky, Feuerbach (Cambridge, 1977), ch. VIII; Karl Marx and F. Engels, On Religion (Moscow, 1974) p 39

১৬ M. G. Ranade, Rise of Maratha Power (New Delhi, 1961) pp 66 67; Rabindra Kumar, "The New Brahmanas of Maharastra", in Soundings In Modern South Asian History, ed. D. Low, pp 120-21

১৭ Stories of Indian Saints, পূর্বোক্ত, pp XVII-XVIII

১৮ তদেব, p 340; প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য, Ramchandra D. Ranade, Mysticism in Maharashtra : Indian Myticism (Reprint, Delhi, 1982); Gangadhar Balkrishna Sardar, The Saint Poets of Maharashtra : Their Impact on Society (Bombay, 1969)

১৯ বিষয়টি সম্পর্কে সুবিস্তৃত পুস্তকতালিকা দেওয়া যায় ; এখানে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম :

ক মূল হিন্দী : 'কবীর গ্রন্থাবলী', এলাহাবাদ, ১৯২৮ ; এলাহাবাদে প্রকাশিত, "সন্তবাণী পুস্তকমালার অন্তর্গত" : 'ভিখা সাহেব কা বাণী ঔর জীবনচরিত, (১৯৭৪) ; "বুল্লা সাহেব কা শব্দ সাগর" (১৯৭৩) ; "দরিয়া সাহেব কা পদ ঔর সাখি" (১৯৬৮) ; "গরিবদাস জী কী বাণী" (১৯৬৪) ; "জগজীবন সাহেব কী বাণী", ২ খণ্ড (১৯৬৭) ; "পল্টু সাহিব কী বাণী", ৩ খণ্ড (১৯৬৫) ; 'শ্রী দাদূ চরিতামৃৎ', সম্পাদক, স্বামী নারায়ণদাস, ২ খণ্ড, জয়পুর, স্বামী জয়রামদাস স্মৃতি গ্রন্থমালা, ১৯৬৫ ; "সন্ত কাব্য", পরশুরাম চতুর্বেদী সংকলিত, এলাহাবাদ, কিতাব মহল, ১৯৬৭, "সন্ত গুরু রবিদাস বাণী', P. B. Sarma সম্পাদিত, নূতন দিল্লী, ১৯৭৮

খ অনুবাদ : [বঙ্গভাষা] : তুলসীদাস, 'রামচরিতমানস ও দোহাবলী',

৩ খণ্ড, জ্যোতিভূষণ চাকী কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত : কলিকাতা, ১৯৮০ ; ভগবানদাস কাব্যতীর্থ, ভাগবতভূষণ, 'সচিত্র মীরার ভজন' কলিকাতা, ১৯৮৭ ; মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দোহাবলী' ২ খণ্ড, উত্তরপাড়া, হুগলী, ১৯৩১-১৯৪৭ ।

গ অনুবাদ : ইংরাজিতে Rabindranath Tagore, Evelyn Underhill, One Hundred Poems of Kabir (Newyork, 1915); Selections From The Sacred Writings of the Sikhs, Trans. Trilochan Singh, etal. [London, 1960] ; Linda Hess, Sukhdev Singh : The Bijak of Kabir [San Francisco, 1983]

ঘ ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, ধর্মতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা : [হিন্দী] হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, 'কবির', বোম্বাই, ১৯৬০ ; তারকনাথ অগ্রবাল, 'কবির পরিচয়' কলিকাতা, ১৯৫১ ; বি. এন. শ্রীবাস্তব, 'রামানন্দ সম্প্রদায় তথা হিন্দী সাহিত্য পর উস্‌কা প্রভাব' প্রয়াগ, ১৯৫৭ ; G. H. Westcott, Kabir And Kabirpanth (Calcutta, Sushil Gupta, 1965) ; Prabhakar Machway, Kabir (New Delhi, 1868) ; K. M. Munshi, R. R. Divakar, ed. Indian Inheritance, 3 Vols. (Bombay, 1959-60) ; I : K. M. Munshi, "Chaitanya And Mirabai". pp. 192, ff; Haraprasad Sastri, "Kabir". pp. 179 ff ; F. S. Grouse, "Tulsidas", pp 203 ff; H. H. Wilson, Religious Sects of the Hindus (Calcutta, Sushil Gupta, 1958) ; J. N. Farquhar. An Outline of the Religious Literature of India (Delhi, 1967) ; William Crooke, The Popular Religion And Folklore of Northern India, 2 Vols. (Delhi, reprint, 1968) . Kshitimohan Sen, পূর্বোক্ত গ্রন্থ : M. A. Macauliffe, The Sikh Religion, [6 Vols Oxford, 1909] ; W. H. McLeod, Guru Nanak And The Sikh Religion (Oxford 1976) , W. H. McLeod, "Problem of the Panjabi Rahitnamas", in Essays in Honour of A. L. Basham, পূর্বোক্ত, pp. 103-126 : John C. Archer, The Sikhs in Relation to Hindus, Muslims, Christians, Ahmadiyas (Princeton, 1946) : Gurmukh Nihal Singh, "The Origin And Growth of Sikhism", in The Cultural Heritage of India, পূর্বোক্ত, II. pp 222 ff.W. H. McLeod, The Evolution of the Sikh Community : Five Essays (Delhi, 1975)

১০ দ্রষ্টব্য : David C. Scort, Kabir Mythology (Delhi, 1985)

১১ David N. Lorenzen, ed. Religious Change and Cultural Denomination (Mexico, 1981) ; W. G. Orr, A Sixteenth

Century Indian Mystic: Dadu And His Followers [London, 1947]; Charlotte Vaudeville, "Kabir And Interior Religion", in History of Religions, 3 : 2 (1964), Eleanor Zelliot, "The Mediaeval Bhakti Movement in History: An Essay on the Literature in English" in Bardwell L. Smith, ed. Hinduism: New Essays in the History of Religions, Leiden, 1976

২ Linda Hess, Sukhdev Singh, The Bijak of Kabir, পূর্বোক্ত, প্রস্তাবনা দ্রষ্টব্য

২৩ দ্রষ্টব্য, W. H. McLeod, Guru Nanak And The Sikh Religion, পূর্বোক্ত

২৪ জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পঞ্চোপাসনা', কলিকাতা, ১৯৬০, R. C. Hazra, Studies In the Upapuranas, 2 Vols, Calcutta, 1958-1963

২৫ R. C. Hazra, পূর্বোক্ত, Vol. I, ch- IV

২৬ Bhavatosh Bhattacharya, ed. Danasagara of Vallalasena, Calcutta, 1953-56, Fasciculus I, p 6

২৭ দ্রষ্টবা, বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, 'প্রাচীন বাংলা মৈথিলী নাটক', বর্ধমান, ১৯৮০

২৮ মধ্যকালীন বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: Ramakanta Chakrabarty, Vaisnavism In Bengal: 1486-1900, পূর্বোক্ত; Sushil Kumar De, Early History of the Vaisnava Faith And Movement in Bengal, Calcutta, 1961; বিমানবিহারী মজুমদার, 'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান', কলিকাতা, ২য় সং, ১৯৫৯; হরিদাস দাস, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য' [নবদ্বীপ, ১৯৬৯]

২৯ M. G. S. Narayanan Veluthat Kesavan, "Bhakti Movement in South India", পূর্বোক্ত

৩০ বৃন্দাবন দাস, শ্রীচৈতন্যভাগবত' (কলিকাতা, অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস, ১৯৪৯) দ্রষ্টব্য; Ramakanta Chakravarty, পূর্বোক্ত, ch. VII

৩১ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, 'শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদগণ, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ ৮৯-৯০, ৯৬

৩২ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পূর্বোক্ত পৃ ৩৯৩

৩৩ Mahesvar Neog, Early History of the Vaisnava Faith And Movement in Assam: Sankaradeva And His Times. (Delhi, reprint, 1985); H. V. Srinivasa Murthy, Vaisnavism of Sankaradeva And Ramanuja (Delhi, 1979); বঙ্গভাষায় রচিত এবং কলিকাতার প্রকাশিত সব উল্লেখযোগ্য "পঞ্জিকা-"তে আসামের বৈষ্ণব উৎসবসমূহের বিস্তৃত তালিকা এবং গুরুদের নামধাম প্রতি বৎসরেই প্রকাশিত হয়।

৩৪ Ramnarayan Vyas, The Bhagavata, ইত্যাদি, পূর্বোক্ত, pp 74-159

৩৫ Ramakanta Chakrabarty, পূর্বোক্ত, ch. XIX, pp 320-45 ; ভারতীয় ব্রাহ্মণদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা দ্রষ্টব্য, J. N. Bhattacharya, Hindu Castes And Sects, 2nd. ed. Calcutta, 1968. pp. 37, 38-39, 41-42 ; 45, 48, 49, 53, 57, 58-65, 74, 78-79, 86 ; দ্রষ্টব্য : K. Rangachari, Srivaisnava Brahmanas (Delhi, reprint, 1986) ; "Sect", অথবা সম্প্রদায়ের সমাজতাত্ত্বিক অর্থ : Louis Dumont, Religion, Politics And History of India (Paris, 1970), pp 55 60

৩৬ Roma Chaudhuri, Sufism And Vedanta, পূর্বোক্ত, Part I দ্রষ্টব্য

৩৭ সোভিয়েত রাশিয়ার ঐতিহাসিক Smirnova এবং Pyatigorsky-র এই মত। এই মতের ভারতীয় সমর্থক, Cari Citamparanar, C. Rakuratnam, ইত্যাদি ঐতিহাসিকগণ ; S. Vaiyapuri Pillai এই মতের সমর্থক। দ্রষ্টব্য, Kanvil Zvelebil, পূর্বোক্ত, p 191

৩৮ Kamil Zvelebil, উপরে উল্লিখিত

৩৯ বিমানবিহারী মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫৬৭

৪০ বাঙলা, বিহার, এবং উড়িষ্যাতে নিম্নবর্গের জনসমূহের মধ্যে এবং উপ-জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণবীয় ধর্মমতের প্রসার সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : H. H. Risley, The Tribes And Castes of Bengal, 2 Vols. Calcutta, Reprint, 1981. Risley ৬১টি জাতির এবং উপ-জাতির উল্লেখ করেছেন। যাঁরা পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে বৈষ্ণবীয় ধর্মমতের অনুগামী ছিলেন। Surajit Sinha, "Vaishnava Influence on a Tribal Culture", In Milton Singer, ed. Krishna : Myths, Rites, And Attitudes (Honolulu, 1965).

৪১ David N. Lorenzen, "The Kabir Pant And Social Protest", in The Sants, পূর্বোক্ত ; Jayant Lele, Tradition And Modernity in Bhakti Movements (Leiden, 1981) ; Baidyanath Sarasvati, "Notes on Kabir : A non-literate Intellectual", in S. C. Malik, ed. Dissent, Protest, And Reform in Indian Civilization (Simla, 1977) ; K. N. Panikkar. "Presidential Address", Section III, Proceedings of the Indian History Congress, 36th session, Aligarh, 1975 ; Milton Singer, ed. Traditional India : Structure And Change (Philadelphia, 1959) ; Stephen Fuchs, Rebellious Prophets (Bombay, 1965) ; David N. Lorenzen, "The Kabir Panth and Politics", Political Science Review, Jaipur. 20 : 3 (1982).

৪২ দ্রষ্টব্য, Sitakanta Mahapatra, "Bhima Bhoi" (Sahitya Akademi, New Delhi, 1983) ; সুধীর চক্রবর্তী, 'সাহেবধনী সম্প্রদায় : তাদের গান', কলিকাতা, ১৯৮৫ ; 'বলাহাড়ি সম্প্রদায় ও তাদের গান', কলিকাতা, ১৯৮৬

৪২ক P. Spratt, "Hindu Culture And Personality : A Psychoanalytic Study" (Bombay, 1967), p 820 ; Richard Lannoy, "The Speaking Tree : A Study of Indian Culture and Society" (Bombay, 1971), p 291

৪৩ Rakhaldas Banerjee, "History of Orissa", I (Calcutta, 1930-31), pp 330-36

৪৪ Jadunath Sarkar, "History of Bengal", II (Dacca, 1948), pp 221 ff

৪৫ Max Weber, "The Religion of India : The Sociology of Hinduism And Buddhism" Translated by Hans H. Gerth, Don Martindale, (The Free Press of Glencoe) (1962), p 323

৪৬ Benoy Kumar Sarkar, "The Positive Background of Hindu Sociology" (Allahabad, 1937), pp 478-94

৪৭ Prabhat Mukherjee,"The History of Mediaeval Vaishavism in Orissa" (2nd ed. New Delhi, 1981) ch. XI, pp 170-78

৪৮ Jadunath Sarkar, পূর্বোক্ত গ্রন্থ

৪৯ কৃষকদের চেতনায় ধর্মের স্থান সম্পর্কে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য : "The very nature of Peasant Consciousness, the apparently cousistent unifiication of an entire set of beliefs about nature and about men in the collective and active mind of a peasantry, is religious. Religion to such a community provides an ontology, an epistemology, as well as a practical code of ethics, including political ethics." "Subaltern Studies" I, ed. Ranajit Guha (Oxford University Press, 1982), p. 31 ; আরো দ্রষ্টব্য, Cathleen Gough, "Indian Peasant Uprisings" : A. R. Desai, ed. "Peasant Struggles in India" (Oxford Universty Press, Bombay 1979), pp 85-118

৫০ এইসব চিত্রশিল্পে ভক্তির অসামান্য প্রভাব সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : Ananda Coomaraswami,"Rajput Paintings" (2 vols. Delhi, Reprint. 1976) ; W. G. Archer, "The Loves of Krishna", পূর্বোক্ত

মুসলিম লীগ রাজনীতি ঃ কয়েকটি প্রশ্নের বিশ্লেষণ

অমলেন্দু দে

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সাম্প্রতিককালে মুসলিম লীগ রাজনীতি সম্পর্কে যেসব প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটো গবেষণা গ্রন্থের রচয়িতা হলেন আয়েশা জালাল ও আয়ান ট্যালবট। তাঁরা দু'জনেই প্রচুর তথ্যের সাহায্যে লীগ রাজনীতির রূপটি সুস্পষ্ট করে তোলেন।[১] তাছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে যেসব প্রবন্ধ ও গ্রন্থ মার্কসবাদী মহল থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাতেও লীগ রাজনীতির বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এইসব রচনার মধ্যে গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ ও অমলেন্দু সেনগুপ্ত লিখিত গ্রন্থ আমাদের কয়েকটি মূল্যবান প্রশ্নের সম্মুখীন করে।[২] স্বভাবতই আমি এই কয়েকটি রচনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আলোচ্য প্রবন্ধের প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। বলাবাহুল্য, এইসব রচনার সূত্র ধরেই প্রশ্নগুলো উদ্ভূত। প্রথমেই একটি কথা নিবেদন করতে চাই। সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ রাজনীতির প্রেক্ষাপটে, প্রধানত বাংলার মুসলিম লীগের ভূমিকা আলোচনায়, এই প্রবন্ধের উল্লিখিত প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এবার প্রশ্নগুলো উল্লেখ করা যাক ঃ (১) মুসলিম লীগ কিভাবে মুসলমান জনসাধারণের পার্টিতে পরিণত হল? লীগ প্রচারিত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত দাবিগুলির প্রকৃতি কি রকম ছিল? (২) ইসলাম ধর্মীয় ও সেকুলার দাবিসমূহের মধ্যে কিভাবে ধর্মীয় দাবি ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠল? আর কেনইবা সেকুলার দাবিগুলো শিথিল হয়ে পড়ল? (৩) মুসলিম লীগ রাজনীতিবিদ এবং ইসলাম ধর্মতত্ত্ববিদ ও উলেমা সম্প্রদায় কিভাবে ও কেন একসঙ্গে মিলিত হলেন? (৪) লাহোর প্রস্তাবের একাধিক রাষ্ট্রের তত্ত্ব থেকে এক রাষ্ট্রের তত্ত্বের উদ্ভব কিভাবে হল? (৫) ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১-১৫ ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ ফৌজের

আধুনিক ভারত বিভাগের সভাপতির ভাষণ, ১৯৮৯

ক্যাপ্টেন আবদুল রসিদের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলনে মুসলিম লীগের যোগদানের প্রকৃত কারণ কি ছিল? তাতে কতটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, কতটা পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করার বিষয় ছিল? (৬) ১৯৪৫-১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের উত্তাল গণ আন্দোলন কলকাতায় ১৬ আগস্টের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় কেন পরিণত হল? ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুলাইয়ের বাংলার সর্বাত্মক হরতাল কেন ক্ষণস্থায়ী হল? বৈপ্লবিক পরিস্থিতি কেন স্বাভাবিক পরিণতি পেল না? 'উত্তাল চল্লিশের' 'প্রায়-বিপ্লব' কেন 'অসমাপ্ত' থেকে গেল?

আয়েশা জালাল সাতটি অধ্যায়ে জিন্না, মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান দাবির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি ছবি এঁকেছেন। তাতে লীগ রাজনীতির বিভিন্ন দিক বুঝতে অসুবিধা হয় না।[৩] আয়ান ট্যালবট ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতে মুসলিম লীগের প্রভাব বৃদ্ধির ইতিহাস চারটি মূল অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।[৪] দু'জনেই ভারতের মুসলিম রাজনীতিতে ইসলামের ভূমিকা আলোচনা করেন। আয়েশা জালাল মুসলিম রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে ইসলামকে 'একটি অলীক ব্যাখ্যামূলক শক্তি' হিসেবেই দেখেন। তিনি মনে করেন, পাকিস্তান দাবির তত্ত্বের পরিবর্তে দীর্ঘকালব্যাপী বংশগত দ্বন্দ্ব এবং দলাদলির আঞ্চলিক রাজনৈতিক ঐতিহ্যই মুসলিম লীগ আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করে ও ব্যাপ্তি ঘটায়, এবং ক্রমশ কেন্দ্রে একই দাবির সমর্থনে একটি ঐক্যবদ্ধ সর্বভারতীয় মুসলিম আন্দোলন গড়ে ওঠে। তিনি মুসলিম রাজনীতি আলোচনায় প্রাদেশিক রাজনীতির প্রকৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।[৫] আয়ান ট্যালবট পাকিস্তান আন্দোলনে ইসলামের ভূমিকাকে সম্পূর্ণভাবে 'সহায়ক' অথবা 'অলীক' বলে মনে করেন নি। তিনি ইসলামকে 'একমাত্র প্রেরণাদায়ক উপাদান' হিসেবে দেখেন নি।[৬] ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে মুসলমান ভোটদাতারা লীগকে যে সমর্থন করে তা কেবলমাত্র লীগের ঐস্লামিক আবেদনের জন্য নয়। যদি ধর্মই একমাত্র নির্ধারক হত তাহলে পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি ও বাংলায় ন্যাশনাল মুসলিম পার্লামেন্টারী পার্টি অনেক ভাল ফল করত। কারণ তারা উভয়েই তাদের প্রচারে ঐস্লামিক আবেদন অন্তর্ভুক্ত করে এবং পীর ও উলেমাদের সহায়তা লাভ করে। লীগের সাফল্যের মূলে ছিল ঐস্লামিক আবেদন সমূহকে গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো সমাধানের বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে তাদেরই ভাষায় প্রচার করা। 'পিতৃশাসিত জ্ঞাতিবর্গের ভ্রাতৃত্ববোধ' এবং সুফিদের প্রভাব যুক্ত হয়ে

লীগের অনুকূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নির্বাচনে লীগের সাফল্যকে জিন্না পাকিস্তান দাবির পক্ষে অকপট রায় বলেই উল্লেখ করেন।[৭]

আয়েশা জালাল বিভিন্ন মুসলিম দল, ধর্মতত্ত্বিবিদদের পরিচালিত সংস্থা অর্থাৎ জামাত-ই-ইসলামী, জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-হিন্দ, জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-ইসলাম ইত্যাদি সংস্থার কথা এবং নির্বাচনে লীগের সাফল্যে পীর ও মোল্লাদের ভূমিকা উল্লেখ করে কোন বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেন নি।[৮] এমন মন্তব্যও তিনি করেন, পীর ও মোল্লাদের ভূমিকা কেন্দ্রে কুশলী জিন্নার লীগ সংগঠন পরিচালনার ক্ষতিসাধন করতে পারত।[৯] আয়েশা জালাল লেখেন ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মওলানা মওদূদী প্রতিষ্ঠিত জামাত-ই-ইসলামী সংস্থা 'পাকিস্তান' দাবির বিরোধিতা করে এবং তাদের প্রভাব একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে।[১০]

আয়েশা জালাল এই কথাও বলেন, জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-হিন্দ সংস্থার মধ্যে একটি লীগ সমর্থক ও আর একটি কংগ্রেস সমর্থক গ্রুপ ছিল।[১১] প্রধানত লীগকে নির্বাচনী প্রচারে সাহায্য করার জন্যই ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-ইসলাম সংস্থা স্থাপিত হয়। আর আজাদ-জিন্না দ্বন্দ্বের উল্লেখ করে আয়েশা জালাল মন্তব্য করেন, পাকিস্তান দাবি মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যে অভূতপূর্ব প্রত্যাশা জাগ্রত করে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কংগ্রেস ও আজাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।[১২]

আয়েশা জালাল ও আয়ান ট্যালবট উভয়েই বাংলার মুসলিম রাজনীতি আলোচনায় লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের ভূমিকা আলোচনা করেন।[১৩] আয়েশা জালাল এই মন্তব্যও করেন, ব্রিটিশ শাসনের শেষ তেরো মাসে জিন্নার 'কৌশলের বিয়োগান্ত পরিণতি' ঘটে। জিন্না নিজেকে সব সময়ে 'অমার্জিত সাম্প্রদায়িকতাবাদ' থেকে ঊর্ধ্বে রাখার চেষ্টা করেন এবং ভারতীয় ঐক্য সম্বন্ধে নিজের পরিকল্পনা পালন করেন। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়।[১৪] ছয় বছর ধরে জিন্না বিভিন্ন আঞ্চলিক লীগ নেতাদের মধ্যে যে 'অগভীর সংহতি' ও 'ঐকমত্য' তুলে ধরেন তা মোটেই 'সুদৃঢ়' ও 'সর্বসম্মত' ছিল না। এতটুকু সাফল্য তিনি অর্জন করেন শুধুমাত্র নিজের উদ্দেশ্যসমূহ নিজের কাছে আবদ্ধ রেখে। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই পাকিস্তান প্রস্তাবটিকে অবর্ণিত রেখে বিভিন্ন প্রদেশের লীগ নেতাদের নিজেদের মত করে এই প্রস্তাবকে দেখবার অনুমতি দেন।[১৫] আয়েশা জালাল এই মন্তব্যও করেন, জিন্না কর্তৃক 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' হল 'কাগুজে ভীতি প্রদর্শন।' মেজাজের দিক থেকে জিন্না হলেন 'নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির' পক্ষপাতী। তাছাড়া

তাঁর এমন 'সংগঠন' অথবা 'সঙ্গতি' ছিল না যে একবার সংগ্রাম আহ্বান করলে তাকে তিনি আয়ত্তে রাখতে পারবেন।[১৬] কলকাতার দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড তাই প্রতিফলিত করে। তারপর শুরু হল নোয়াখালির হত্যাকাণ্ড। অপরাধজগতের লুণ্ঠনজীবীরা ক্ষয়প্রাপ্ত ভারতীয় সমাজব্যবস্থা থেকে যতটা কেড়ে নেওয়া যায় তার জন্য তারা শহর ও গ্রামকে আবর্জনাস্তূপে পরিণত করে। এই অরাজকতা হল 'বিত্তবানদের' বিরুদ্ধে 'বিত্তহীনদের' সংগ্রাম। একে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়গত বিরোধ হিসেবে দেখলে তা হবে অতি-সরলীকরণ এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে আয়েশা জালাল এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেন।[১৭]

আয়ান ট্যালবট কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে দেখেন। তাঁর মতে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ থেকে লীগ লাভবান হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে লীগের প্রভাব কতটা বৃদ্ধি পায় তা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন ও তার পরিণতি বিষয়ে শুধুমাত্র উল্লেখ করেন, কোন বিস্তৃত আলোচনা করেন নি।[১৮] খুবই সংক্ষেপে এই কয়েকটি বিষয়ে আয়েশা জালাল ও আয়ান ট্যালবটের মতামত উল্লেখ করা হল।

এবারে উপরে উল্লিখিত প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করা যাক। আয়েশা জালাল ও আয়ান ট্যালবট দু'জনের কারও পক্ষেই আবুল হাশিমের ইংরেজি বা বাংলা রচনাবলী, হাশিম সম্পাদিত বা পরিচালিত 'মিল্লাত' পত্রিকার ফাইল, বাংলার আইনসভায় হাশিমের ইংরেজি ভাষণসমূহ ; অথবা হাশিমের প্রতিপক্ষ মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত 'আজাদ', 'মোহাম্মদী', 'মর্ণিং নিউজ' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য তথ্য দেখার সুযোগ হয় নি। তাই তাঁদের বাংলার লীগের ভূমিকা আলোচনায় প্রধানত নির্ভর করতে হয় শীলা সেনের গ্রন্থ, সারা ভারত মুসলিম লীগের সম্পাদকের কাছে লেখা হাশিমের পত্র, জিন্নার কাছে লেখা রাগেব আহসানের পত্র ইত্যাদির উপর।[১৯] তাঁরা দু'জনেই খুব সংক্ষেপে হাশিমের সঙ্গে কমিউনিস্টদের যোগাযোগের বিষয়ে মন্তব্য করেন। তাঁরা হাশিমের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বলে দেখতে পান নি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হাশিম কিভাবে মুসলমান ছাত্র-যুবকদের সহযোগিতায় আর উচ্চবর্গের মুসলমান নেতাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করে লীগ সংগঠনকে প্রদেশের সর্বোচ্চ স্তর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে দেন এবং লীগকে গণ পার্টিতে পরিণত করেন।[২০] তাতে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনগত রূপের খানিকটা প্রতিফলনও পাওয়া যায়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে

হাশিমের সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশীর পরিচয় হয় এবং তখন যোশী মুসলিম লীগের গণভিত্তির প্রসার ঘটিয়ে লীগকে একটি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে সংগঠিত করার জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। কমিউনিস্ট পার্টি'র পক্ষ থেকে নিখিল চক্রবর্তী হাশিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং তাঁকে প্রয়োজন মত সাহায্য করেন। এই সময়ে ঢাকা জেলায় লীগ সম্মেলনকে সফল করতে কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক সমিতি সাহায্য করে। আয়েশা জালাল শীলা সেনের গ্রন্থ উল্লেখ করে যে লীগ ইস্তাহারের আলোচনা করেন, তাতো হাশিম নিখিল চক্রবর্তীর সাহায্যেই রচনা করেন। বস্তুত তরুণ লীগ নেতৃবৃন্দের ও কর্মীদের চিন্তা এবং কাজের রূপরেখা এই ইস্তাহারই করে দেয়।[২১] মুসলমান ছাত্র-যুবকরা হাশিমকে সমর্থন করায় খাজা নাজিমুদ্দিন ও তাঁর অনুগামীরা উদ্বিগ্ন হন। হাশিমের বিরুদ্ধে তাঁরা ষড়যন্ত্র করেন। সোহরাওয়ার্দি দোদুল্যমান ছিলেন। কখনও তিনি 'দক্ষিণ' দিকে, আবার কখনও 'বাম' দিকে থাকেন। হাশিমকে সম্পাদক পদ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা উদ্যোগী হয়। তার ফলে হাশিমকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। কিন্তু এই সময়ে লীগের তরুণ নেতারা তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান এবং হাশিম পুনরায় এই পদে নির্বাচিত হন।[২২] বাংলার লীগের অভ্যন্তরের এই দ্বন্দ্বের কথা জিন্না জ্ঞাত থাকলেও, তিনি কিন্তু হাশিমকে তখনই ক্ষমতাহীন করতে অগ্রসর হন নি। কারণ বাংলায় মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে লীগের প্রভাব বৃদ্ধি ফজলুল হকের শক্তি হ্রাস করার পক্ষে সহায়ক ছিল, আর তা জিন্নার প্রভাব অপ্রতিহত করার পথ প্রশস্ত করে। হাশিমের নেতৃত্বেই ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয় এবং কি কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী লীগ নির্বাচনের প্রচার করবে তা উল্লেখ করে হাশিম একটি পুস্তিকাও রচনা করেন।[২৩] উল্লেখ্য এই, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ নভেম্বর থেকে হাশিম পরিচালিত বাংলা সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' পত্রিকার মাধ্যমে লীগের মধ্যে হাশিমের সঙ্গে যুক্ত একটি মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তাঁরাই লীগের বার্তা মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন।[২৪] হাশিম-বিরোধীদের কাছে তাঁরা লীগের 'বামপন্থী' গোষ্ঠী নামেই পরিচিত ছিলেন। স্যার নাজিমুদ্দিন ও তাঁর অনুগামীরা এবং 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক তো হাশিমকে 'কমিউনিস্ট' বলে নিন্দা করেন। 'মর্নিং নিউজ' ও 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' কাগজও হাশিমের তীব্র সমালোচক ছিল। অন্যদিকে হাশিম তাঁর বিরোধীদের 'দক্ষিণপন্থী' বলে উল্লেখ করেন।[২৫] এই কথাও মনে রাখা দরকার, লীগ রাজনীতির

একটি পর্যায়ে হাশিম ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নবাব- জমিদার-শিল্পপতিদের দ্বন্দ্ব থাকলেও, তাঁরা একই সঙ্গে চলেন মূল লক্ষ্যে পৌছুনোর জন্য, 'হিন্দু' কংগ্রেসের প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য। অবশ্য উচ্চবিত্ত লীগ নেতৃত্বের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল তাতে ত'াদের মধ্যে কোন কোন নেতা ব্যক্তিগতভাবে বা গ্রুপ হিসেবে অন্য গ্রুপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হাশিমদের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রেখে চলেন।[২৬]

লীগকে শক্তিশালী করার জন্য হাশিম যে কর্মসূচী গ্রহণ করেন তার বিষয়ে সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হল। তা থেকেই হাশিম প্রচারিত ইসলাম ধর্মীয় ও সেকুলার দাবিগুলো সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব। হাশিম নিজেকে ইসলামের একান্ত অনুরক্ত প্রচারক বলে মনে করেন। তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ইসলামের মৌল তত্ত্ব প্রচার করেন, ঐশ্লামিক আদর্শ অবলম্বন করে সমাজ গঠন করতে উদ্যোগী হন। একই সঙ্গে হাশিম ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন। উচ্চবিত্ত লীগ পার্লামেণ্টারী নেতাদের প্রভাবমুক্ত করে তিনি লীগকে 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতিতে গঠন করতে প্রয়াসী হন। তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতার এবং কাজের, শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের অধিকার অর্জন করার কথা বলেন। তিনি আইনের শাসন প্রবর্তন করতে চান। তিনি একচেটিয়া পুঁজির অবসান ঘটিয়ে এবং জমিদারের খাজনা আদায়ের অধিকার বাতিল করে বৃহৎ শিল্প ও যানবাহন শিল্প জাতীয়করণের দাবি উথাপন করেন। তিনি সর্বনিম্ন মজুরি নির্দিষ্ট করতে ও বেকার ভাতা দিতে বলেন। তাছাড়া তিনি তপসিলী শ্রেণীকে সমান অধিকার দেবার ও অ-মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিও দেন। সমগ্র জনসাধারণের উন্নতির পক্ষে সহায়ক একটি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ইস্তাহার হাশিম রচনা করেন।[২৭] ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এই ইস্তাহারের অন্তর্ভুক্ত ঐশ্লামিক আদর্শের সঙ্গে গণতান্ত্রিক বিধির বিরোধের উপাদান লক্ষ্য করা গেলেও এই কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, অক্টোবর বিপ্লবের পর যেসব তরুণ মুসলমান বিপ্লবীরা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন অথবা রুশ বিপ্লবের সমর্থক হন, তাঁরা কিন্তু ইসলামের সাম্যনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। হাশিম রচিত ইস্তাহারেও ইসলামের 'বাস্তবধর্মী মূল্যবোধের' ও 'সাম্য নীতির' প্রতিফলন পাওয়া যায়।[২৮] আয়েশা জালাল ও আয়ান ট্যালবট কেউ-ই এই ইস্তাহারের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেন নি। তার ফলে তাঁদের রচনায় লীগের গণপার্টিতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি এবং হাশিম প্রচারিত ইসলাম ধর্মীয় ও

সেকুলার দাবিগুলো ততটা পরিস্ফুট হয় নি। বাংলায় লীগকে ও জিন্নার নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে হাশিম ও তাঁর সহযোগীদের তো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আয়েশা জালাল ও আয়ান ট্যালবট যদি হাশিমের রচনাবলী ও 'মিল্লাত' পত্রিকার সমগ্র ফাইল দেখতেন তাহলে এই বিষয়ে আরও বহু চিত্র ধরতে পারতেন।[২৯]

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ধর্মীয় আবেগ উজ্জীবিত করে সাধারণ মুসলমানদের লীগের সমর্থনে সমবেত করার যে প্রয়াস চলে তাতে স্বাভাবিকভাবেই লীগ রাজনীতিতে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। লীগ রাজনীতিবিদদের সঙ্গে উলেমা সম্প্রদায়ের সখ্যতা স্থাপিত হয়। প্রশ্ন হল ঃ জিন্নার কি তাতে কোন ভূমিকা ছিল ? 'লাহোর প্রস্তাব' আলোচনা ও গৃহীত হওয়ার সময়ে জিন্না 'দ্বিজাতিতত্ত্বের' যে ব্যাখ্যা করেন তাতে তো ধর্মতত্ত্ববিদদের সঙ্গে লীগ নেতৃত্বের সংযোগের ক্ষেত্রটি তৈরি হয়।[৩০] আয়েশা জালালের গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত কোন আলোচনা নেই। তখন থেকে লীগ রাজনীতিতে ধর্মীয় রং ক্রমশ উগ্র হতে থাকে। 'মুসলিম সংস্কৃতি' 'হিন্দু সংস্কৃতি' থেকে পৃথক—এই মনোভাব লীগের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হতে থাকে। সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনেও দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাব পড়ে। এই ধারণা তাত্ত্বিক আবরণে জোরালোভাবে ব্যক্ত করেন আবুল মনসুর আহমদ।[৩১] আয়েশা জালাল মনসুর আহমদ রচিত গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু তাঁর এই ভূমিকা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। বলাবাহুল্য, মুসলমানের 'নিজস্ব সংস্কৃতি' ও 'নিজস্ব সাহিত্য' ভিত্তি করে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তার প্রভাব উচ্চ ও নিম্নবর্গের শিক্ষিত মুসলমান সমাজের উপর বিশেষভাবে পড়ে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি' জোরালো হয়ে ওঠে।[৩২]

জিন্না কিভাবে পাকিস্তান দাবিটিকে শক্তিশালী করার জন্য উলেমাদের সাহায্য গ্রহণ করেন সে বিষয়ে এখানে উল্লেখ করছি। অনেক আগেই ইকবাল রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে যুক্ত করেন। প্যান-ইসলামিক মতবাদের একজন গোঁড়া সমর্থক ইকবাল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবি উত্থাপন করেন। তাতে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রকাশ ও বিভেদের উপাদান পাওয়া যায়।[৩৩] স্বভাবতই তখন থেকে ইকবাল মুসলমান রাজনীতিবিদদের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেন। তাঁরা তাঁকে 'পথপ্রদর্শক' ও 'তাত্ত্বিক নেতা' রূপে গ্রহণ করেন। ১৯৩৬-১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে

ইকবাল ও জিন্নার অন্তরঙ্গতা খুবই গভীর হয়। এই সময়ে ইকবালের মতবাদের দ্বারা জিন্না প্রভাবিত হন। ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণে গঠিত জিন্না মানস মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের পথটিকে প্রশস্ত করতে উদ্যোগী হয়। তারই পরিণত রূপ হল 'লাহোর প্রস্তাব'।[৩৪] প্রায় একই সময়ে দ্বিজাতি-তত্ত্বের ক্ষেত্রটিকে উর্বর করার চেষ্টা করেন মওলানা আশরাফ আলী থানভী। জিন্নার উপরে তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মওলানা থানভী 'কংগ্রেস' ও 'হিন্দু নেতাদের' কথা উল্লেখ করে স্পষ্ট করেই বলেন, তাঁদের সঙ্গে মুসলমানদের 'সহাবস্থান সম্ভব নয়'।[৩৫] আয়েশা জালাল তাঁর গ্রন্থে মওলানা মওদূদী প্রতিষ্ঠিত 'জামাত-ই-ইসলামী' সংস্থার প্রতি কোনই গুরুত্ব আরোপ করেন নি। ইসলাম কেন একটি ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ থাকবে—এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মওলানা মওদূদী 'পাকিস্তান দাবির' বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাঁর বলিষ্ঠ রচনাবলীর মাধ্যমে যে ধর্মীয় মৌলবাদী চিন্তা প্রচার করেন তাতো ঐশ্লামিক স্বাতন্ত্র্যবাদ বিকাশে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। আর এই স্বাতন্ত্র্যবাদ পাকিস্তান আন্দোলনের অনুরূপ পরিবেশ তৈরি করে। এই কারণেই মওলানা মওদূদীকে পাকিস্তানের 'অন্যতম স্রষ্টা' বলা হয়। ইকবাল মওলানা মওদূদীর রচনার দ্বারা প্রভাবিত হন এমন তথ্যও পাওয়া যায়। সুতরাং দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচারে মওলানা মওদূদীর অবদান অগ্রাহ্য করলে কি পটভূমিতে লীগ নেতা-উলেমা সখ্যতা হল বোঝা সম্ভব নয়।[৩৬]

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হওয়ার পর একটানা পাঁচ বছর লীগ নেতৃত্ব লীগ পরিচালিত পাকিস্তান আন্দোলনে উলেমা সম্প্রদায়কে সমবেত করার জন্য উদ্যোগী হন। অবশেষে তাঁরা ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-হিন্দ' সংগঠনে ভাঙন ধরাতে সক্ষম হন। এই সময়ে দেওবন্দ্ আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ দুই ভাগে বিভক্ত হন: (ক) মুসলিম লীগের সমর্থক; (খ) মুসলিম লীগ বিরোধী। একদল দেওবন্ধের অধ্যক্ষ মওলানা হোসাইন আহম্মদ মাদানীর নেতৃত্বে 'জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-হিন্দ' সংগঠনে থেকে মুসলিম লীগের বিরোধিতা করেন; অপর দল মওলানা শাব্বীর আহম্মদ উসমানীর নেতৃত্বে 'জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-ইসলাম' নামে নবগঠিত সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হন।[৩৭] উল্লেখ্য এই, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬-২৯ অক্টোবর কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-ইসলাম-'এর অধিবেশনে লীগের সমর্থক আলেম ও মওলানারা এই নূতন সংস্থা গঠন করেন।[৩৮] তখন থেকেই লীগ নেতৃত্ব

প্রভাবশালী মুসলমান ধর্মতত্ত্ববিদদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেন, আর তাঁদের মাধ্যমে ব্যাপক মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে লীগের প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। তার ফলে 'জামিয়াত-ই-হিন্দ-'এর সঙ্গে যুক্ত ধর্মতত্ত্ববিদদের প্রভাব দ্রুত হ্রাস পেতে লাগল। ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও খান আবদুল গফফর খান যে ধর্মনির্ভর উদারনীতিবাদের প্রচার করেন তাও প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।[৩৯] এই সময়ে পীরদের প্রতি জিন্না গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় যে উলেমা সম্মেলন হয় তাতে যোগদান করতে জিন্না তাঁর 'দক্ষিণহস্ত' মওলানা জাফর আহমদ আনছারীকে পাঠান। তাঁর মাধ্যমে জিন্না সমবেত উলেমাদের জানান, পাকিস্তান হবে 'ইসলামী রাষ্ট্র'।[৪০] সুতরাং ধর্মতত্ত্ববিদদের ভূমিকা বিশ্লেষণ না করে পাকিস্তান আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও শক্তি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। বস্তুত উলেমাদের মুসলিম রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার ফলে ধর্মীয় দাবি প্রবল হয়, সেকুলার দাবি শিথিল হয়। আর তখন পাকিস্তান দাবির সমর্থক উলেমাদের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। আয়েশা জালাল ও আয়ান ট্যালবট দু'জনের কেউ-ই তার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেন নি।[৪১]

এবার 'লাহোর প্রস্তাব' সংশোধনের বিষয়টি আলোচনা করা যাক। আয়েশা জালালের মতে, জিন্না ইচ্ছাকৃতভাবেই পাকিস্তান প্রস্তাবটিকে অবর্ণিত রাখেন এবং প্রাদেশিক লীগ নেতাদের নিজেদের মত করে এই প্রস্তাব ব্যাখ্যা করার অনুমতি দেন। লাহোর প্রস্তাবের ৩নং অনুচ্ছেদে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চল নিয়ে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই কথা পরিষ্কার করে বলা হয় নি যে, এই রাষ্ট্রগুলো পৃথকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে থাকবে অথবা এই রাষ্ট্রগুলো একটি মাত্র ফেডারেল বা ইউনিটারী ধরনের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।[৪২] 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হওয়ার পর একই বছরে ডঃ বি. আর. আম্বেদকর লিখিত 'পাকিস্তান অথবা ভারত বিভাগ' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাতে আম্বেদকর পাকিস্তান প্রস্তাবের ত্রুটি ও স্ববিরোধিতা আলোচনা করেন। তা সত্ত্বেও জিন্না তখনই পাকিস্তান প্রস্তাবের ত্রুটি সংশোধন করতে উদ্যোগী হন নি।[৪৩] কিন্তু কেন জিন্না তা করেন নি? এই প্রশ্নের যথার্থ বিশ্লেষণ আয়েশা জালালের গ্রন্থে নেই। 'লাহোর প্রস্তাব' যখন গৃহীত হয় তখন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে লীগের প্রভাব ততটা ছিল না। আয়েশা জালাল ও আয়ান ট্যালবট লীগ রাজনীতির যে অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্যের কথা লেখেন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়, জিন্নার সামনে তখন অন্য

কোন পথ খোলা ছিল না। বিভিন্ন প্রদেশে লীগ সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হলে আঞ্চলিক সমস্যাগুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন ছিল। একই সঙ্গে পাকিস্তান দাবির সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের লীগ সংগঠনকে যুক্ত করতে পারলে আঞ্চলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও লীগ সংগঠনকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংহত রূপদান করা সম্ভব। আর তার ফলেই জিন্নার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—'হিন্দু কংগ্রেস' প্রভাবমুক্ত 'আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি' ঐসব অঞ্চলের প্রভাবশালী উচ্চবিত্ত মুসলিম নেতাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণেও সহায়ক ছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কমিউনিস্ট পার্টি 'পাকিস্তান' ও 'জাতীয় ঐক্য' বিষয়ে যে পথটি নির্দিষ্ট করে তাতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' অধিকার স্বীকৃত হয়।[৪৪] লীগের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন যাঁরা ছিলেন তাঁরা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিটি জোরালো করে তোলেন। স্বভাবতই ভারতীয় রাজনীতিতে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করে। লীগ রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়ে। হাশিম ও তাঁর অনুগামীরা তার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়।[৪৫] এই অবস্থায় জিন্নাকে অপেক্ষা করতে হয় প্রদেশে ও কেন্দ্রে লীগকে তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত করা পর্যন্ত। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি এই কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হলেন, তখনই কিন্তু তিনি পাকিস্তানের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রকে 'একজাতির' ও 'একরাষ্ট্রের' ভিত্তিতে গঠন করতে অগ্রসর হন।[৪৬] নির্বাচনে লীগের সাফল্যে জিন্না একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন। অবশেষে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লীগ কনভেনশনে 'লাহোর প্রস্তাব'কে সংশোধন করে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে 'একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেই সময়ে হাশিমের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হলেও জিন্নার পক্ষে তা স্তব্ধ করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নি। ইতিমধ্যে নির্বাচনে মুসলিম কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ায় হাশিমের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মতবিরোধ ঘটে। কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করা সত্ত্বেও হাশিম লীগের কমিউনিস্টবিরোধী মহলের আস্থাভাজন থাকতে পারেন নি। লীগে 'দক্ষিণপন্থী' নেতৃত্ব তাঁদের ক্ষমতা সংহত করে, লীগের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বন্ধুভাবাপন্নদের ক্ষমতাহীন করে।[৪৭] লীগ রাজনীতিবিদ-উলেমা সম্প্রদায়ের সখ্যতা আগেই সাংগঠনিক রূপ পেয়েছে। এখন 'একরাষ্ট্রের' প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় ধর্ম-নির্ভর দ্বিজাতিতত্ত্বের রূপটি আরও সুস্পষ্ট হল।

এবার আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন আবদুল রসিদের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে

বিক্ষোভ আন্দোলনে মুসলিম লীগের যোগদানের বিষয় আলোচনা করা যাক। আয়েশা জালাল ও আয়ান ট্যালবট লীগের এই আন্দোলনে অংশ-গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন নি। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১-১৫ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আবদুল রসিদের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত হয় তার বিস্তৃত বিবরণ গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে পাওয়া যায়। তিনি সরকারী ও অন্যান্য তথ্যের সাহায্যে, আর এই আন্দোলনের একজন নেতা হিসেবে, তার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। তাতে মুসলিম লীগপন্থী ছাত্র-যুবকদের ভূমিকাও উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৮] অমলেন্দু সেনগুপ্ত রচিত গ্রন্থে তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতাদের মতামত সংযোজিত করে বিষয়টিকে আরও পরিস্ফুট করা হয়েছে।[৪৯] কিন্তু লীগ নেতৃবৃন্দ আবদুল রসিদের কারাদণ্ডের বিষয়টি কিভাবে দেখেন, তার কোন বিস্তৃত আলোচনা তাঁদের দু'জনের রচনায় পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে যে বিস্তৃত সরকারী তথ্য নয়া দিল্লীর মহাফেজখানায় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আবদুল রসিদের শাস্তিদানকে লীগ নেতৃত্ব 'লীগের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ' বলেই মনে করেন। তাঁরা এও মনে করেন, রসিদকে শাস্তিদান করে লীগকে 'সরাসরি অপমানিত' করা হয়েছে। তার ফলে মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ইংরেজজাতিবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়।[৫০] লীগ নেতারা এই সন্দেহও করেন, ভাইসরয় লীগকে অগ্রাহ্য করে ও পাকিস্তান দাবি উপেক্ষা করে কংগ্রেসকে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে দেবেন। সুতরাং লীগ নেতারা এই বিষয়ে ঐকমত্য হন যে, সরকারের উপর এমন চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে পাকিস্তান দাবি কার্যকর করা যায়; প্রয়োজন হলে লীগ নেতারা কারাগারে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকবেন অথবা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' পথ অনুসরণ করবেন। তাই লীগ নেতারা আবদুল রসিদের মুক্তির দাবিতে জোরালো আন্দোলন শুরু করেন।[৫১] মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের ছাত্ররা মিলিত হয়ে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলে। ১১ ফেব্রুয়ারী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্ররাই প্রথমে আন্দোলনের সূচনা করে। সরকারী তথ্যে বলা হয়, কমিউনিস্ট নেতাদের পরামর্শ অনুযায়ী বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্র লীগ ও কমিউনিস্ট ছাত্ররা যুক্তভাবে আন্দোলনের জন্য একটি পরিকল্পনা করে।[৫২] মুসলিম লীগ ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে বাংলার জেলাসমূহের লীগ পরিচালিত ছাত্র সংগঠনের কাছে কমিউনিস্ট ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করবার নির্দেশও পাঠানো হয়।[৫৩] কলকাতা শহরে যে বিক্ষোভ মিছিল হয় তাতে মুসলমান ছাত্রদেরই

মুখ্য ভূমিকা ছিল। যার ফলে 'পরিস্থিতি সঙ্কটজনক' হয়। সরকার মনে করে, মুসলিম লীগই এই আন্দোলন প্রথমে শুরু করে, পরে অন্যান্য দল যোগদান করে।[৫৪] ১২ ফেব্রুয়ারী ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যে একটি বৃহৎ জন-সমাবেশ হয় তাতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তা ছিলেন স্যার নাজিমুদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দি।[৫৫] ১৩ ফেব্রুয়ারীর সভায় সভাপতিত্ব করেন সোহরাওয়ার্দি এবং বক্তাদের মধ্যে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট নেতারা ছিলেন।[৫৬] গণবিক্ষোভ দমন করার জন্য সরকার সেনাবাহিনী ও পুলিশ নিয়োগ করে। কলকাতা এক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। বহু লোক হতাহত হয়। বিক্ষোভ দমনের জন্য রাঁচি থেকেও এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য আনা হয়।[৫৭] বহু গাড়ি, ট্রাম ইত্যাদি পোড়ানো হলেও, দোকানপাট বিধ্বস্ত হলেও এবং রাস্তাগুলো নানা জিনিসপত্র দিয়ে অকেজো করে দেওয়া হলেও, বিক্ষোভকারীরা কিন্তু 'আগ্নেয়াস্ত্র' ব্যবহার করে নি।[৫৮] ছাত্ররাও 'ধ্বংসাত্মক' কাজে অংশগ্রহণ করে। সরকারী সূত্রে বলা হয়, এই কারণেই পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে তাদের মধ্যে অনেকে নিহত অথবা আহত হয়।[৫৯]

সরকারী তথ্যে এই কথাও বলা হয়, ১১ ফেব্রুয়ারী মুসলমান ছাত্ররা লীগ পরিচালিত সরকার থাকাকালীন বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহণ করায় মুসলিম লীগ রাজনৈতিকভাবে এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। নির্বাচন আসন্ন হওয়ায় সোহরাওয়ার্দির পক্ষে জনসমর্থন হারানো সম্ভব ছিল না। অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের মত তাঁরও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে সাধারণ স্তরের রাজ-নৈতিক কর্মীরা ছিল না। সোহরাওয়ার্দি বুঝতে পারেন তাঁকেও আবদুল রসিদের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করতে হবে, যদি সে বিক্ষোভ হিংসাত্মক ঘটনায় পর্যবসিত হয় তাহলেও তা তাঁকে করতে হবে। তিনি এই কথাও জানতেন, ১১ ফেব্রুয়ারীর শোভাযাত্রা এমন জায়গা দিয়ে যাবে যেখানে লীগ মন্ত্রীসভা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করেছে এবং ছাত্ররা তা অমান্য করলে বলপ্রয়োগ করে তাদের প্রতিরোধ করা হবে। তার ফলে গুরুতর বিশৃঙ্খলা হবে। ছাত্রদের উপর তাঁর ততটা প্রভাব ছিল না বলে এবং প্রভাব বিস্তারে তাঁর সাফল্যের সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না বলে সোহরাওয়ার্দি খুবই ক্ষীণকণ্ঠে ছাত্রদের সরকারী নির্দেশ অমান্য করতে নিষেধ করেন। তাছাড়া লীগ মন্ত্রীসভার আলোচনা থেকে তিনি এও জানতেন যে, ১২ ফেব্রুয়ারী শোভাযাত্রাটি নিষিদ্ধ অঞ্চল দিয়ে যেতে দেওয়া হবে এবং তার ফলে তিনি 'স্বাধীনতার একজন আদর্শ পুরুষ' ও 'হিন্দু-মুসলিম' অথবা 'কংগ্রেস-লীগ' 'ঐক্যের প্রতীক' হিসেবে সমাদৃত হবেন। নিঃসন্দেহে তিনি এই আশাতেই

এই শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন যাতে তাঁর উপস্থিতিতে শোভাযাত্রীরা 'অশোভন আচরণ' থেকে বিরত থাকে। মুসলিম লীগের একজন নেতা হিসেবে তিনি তীব্রভাবে পুলিশের আচরণের ও সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি যে নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলার সরকার পরিচালনা করবেন তাও সোহরাওয়ার্দি জানতেন। তিনি 'বিশৃঙ্খলার' সময়ে শান্তিরক্ষারও চেষ্টা করেন। যদি নির্বাচনে ভোট সংগ্রহের ব্যাপার না থাকত তাহলে হয়তো মুসলিম লীগ মুসলমান ছাত্রদের বিক্ষোভে অংশগ্রহণের বিষয়ে কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করত। তাতে অবশ্য লীগ নেতৃত্বের সফল হবার আশা ছিল না। যদিও সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের শোভাযাত্রা থেকেই গোলযোগের সূত্রপাত, তাহলেও এই বিক্ষোভ শোভাযাত্রায় মুসলমানদের তুলনায় অ-মুসলমানদের সংখ্যা বেশী ছিল।[৬০] সরকারী তথ্যে এই কথাও বলা হয়, এই বিক্ষোভ সমাবেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল সবচেয়ে বেশী 'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী' সংগঠন। কমিউনিস্ট নেতাদের 'প্ররোচনায়' শ্রমিকরা ধর্মঘট করে এবং কলকাতার যানবাহন স্তব্ধ হয়ে যায়। পুলিশ ও মিলিটারী অবস্থা আয়ত্তে আনার পরেও কমিউনিস্ট পার্টি বিক্ষোভ আন্দোলন প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এই দলের উদ্দেশ্য হল 'হিংসাত্মক বিদ্রোহ'।[৬১] ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহণ করলেও, সংগঠনগতভাবে কংগ্রেস এই আন্দোলনে কোনই অংশ নেয় নি।[৬২] সুতরাং সরকারী সূত্রে মুসলিম লীগের মনোভাব, মুসলমান ছাত্রদের ভূমিকা, কমিউনিস্ট পার্টির বিক্ষোভ সমাবেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দান ও কংগ্রেসের সংগঠনগত অবস্থান সম্বন্ধে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই সময়ে লীগ নেতৃত্ব পাকিস্তান দাবির সমর্থনে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার যে সুযোগ গ্রহণ করে এবং তার জন্য বাংলায় নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধেও মনোভাব ব্যক্ত করে, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান জনসাধারণের উপর লীগের প্রভাব অপ্রতিহত করা। তাই একটি পর্যায় পর্যন্ত লীগ নেতৃত্ব আন্দোলনকে অগ্রসর হতে দেন এবং এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যাতে আন্দোলন দমনের দায়দায়িত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর বর্তায়।[৬৩]

একদিকে পাকিস্তান দাবিকে জোরালো করা, অন্যদিকে নির্বাচনে লীগের শক্তি বৃদ্ধি করা, এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই জিন্না লীগকে পরিচালনা করেন। আবদুল রসিদের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল নৌবিদ্রোহ। ১৯ ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে

নৌসেনারা বিদ্রোহ করেন। তারপর করাচিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতাতেও বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতে কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলছে এমন মনোভাব সরকারের সমর্থকদের মধ্যেও দেখা দেয়।[৬৪] একই সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের জন্য প্রচার শুরু করে। মুসলিম লীগের সেনট্রাল পার্লামেণ্টারী বোর্ড বাংলার লীগ প্রার্থীদের তালিকা নির্ধারণ করে। এখানকার লীগ সংগঠনের অবস্থা দেখবার জন্য জিন্না কলকাতায় আসেন এবং কয়েকটি বড় বড় সভায় ভাষণ দেন। তারপর তিনি আসামে যান। লীগ সংগঠনে জিন্নার কর্তৃত্ব আরও সুদৃঢ় হয়।[৬৫]

ক্যাবিনেট মিশনের ভারতে আগমনের বার্তা ঘোষিত হবার পর মুসলিম লীগের পত্র-পত্রিকায় বলা হল লীগের পাকিস্তান দাবি মেনে নিলেই আলোচনার অগ্রগতি হতে পারে।[৬৬] ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস সমাপ্ত হওয়ার আগেই পরিস্থিতির এমন দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যে, লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লীগ রাজনীতি নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। মুসলমান ছাত্র ও অন্যান্যরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী পাকিস্তান দাবি কার্যকর করার জন্য অগ্রসর হয়।[৬৭] লীগ নেতৃত্ব ফেব্রুয়ারী মাসের বিক্ষোভ সমাবেশের ফলাফল লক্ষ্য করে উপলব্ধি করেন, অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে তাঁরা চাপ সৃষ্টি করে অথবা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হুমকি দিয়ে তাঁদের মূল লক্ষ্য পাকিস্তান দাবি আদায় করতে সক্ষম হবে।[৬৮] আয়েশা জালাল ও আয়ান ট্যালবট সরকারী সূত্রের ও লীগ দলের কাগজপত্র অবলম্বন করে আবদুল রসিদের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে ও নৌবিদ্রোহের সময়ে অনুষ্ঠিত আন্দোলনে লীগের ভূমিকা বিশ্লেষণ না করেই লীগ কর্তৃক আহূত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' উদযাপন ও কলকাতায় দাঙ্গার কথা উল্লেখ করেন। এই দাঙ্গার চরিত্র নিয়ে আয়ান ট্যালবট কোন বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। আয়েশা জালালের মন্তব্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকেই পোস্টাল কর্মীদের আন্দোলনের সূচনা হয়। জুলাই মাসের শুরুতেই আরম্ভ হল ডাক শ্রমিকদের ধর্মঘট।[৬৯] বাংলায় ডাক-তার শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে ২৯ জুলাই হল সর্বাত্মক ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের ব্যাপ্তি ও শক্তি দেখে অনেকেই মনে করেন, শ্রমজীবী মানুষ 'ক্ষমতার কাছাকাছি' পৌঁছে গেছেন।[৭০] কিন্তু তার পরিবর্তে কয়েকদিনের মধ্যে কলকাতায় শুরু হল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। কিন্তু কেন এই ভয়ানক পরিণতি

ঘটল ? তার কোন যথার্থ ব্যাখ্যা এখানে উল্লিখিত লেখকদের রচনায় পাওয়া যায় না। আমার এই প্রবন্ধে মুসলিম রাজনীতিকে আলোচ্য বিষয় করেছি বলে তার প্রেক্ষাপটেই কয়েকটি কথা বলছি। ফেব্রুয়ারী ও জুলাই মাসের ঘটনাবলীতে ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্ব অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধারাটিকে ব্যাহত করার একটি পথই খোলা ছিল। তা হল, ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধের পথ রচনা করা। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে নির্বাচনের সময়ে লীগ রাজনীতিবিদ ও উলেমারা মিলিতভাবে পাকিস্তান দাবির সমর্থনে যে প্রকট ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ উজ্জীবিত করেন তাতে এই দাবির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার-কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রের কথা বলা হলেও, 'হিন্দু কংগ্রেস', হিন্দু জমিদার' ও 'হিন্দু ব্যবসায়ী-শিল্পপতি' লীগের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল হয়। এই সময়কার 'ডন', 'আজাদ', 'মর্ণিং নিউজ', 'মিল্লাত' ইত্যাদি পত্রিকার ফাইল থেকে এই বিষয়ে অজস্র তথ্য পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে লীগ কি চায় তা অস্বচ্ছ রাখা হলেও ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' উদযাপনের বিষয়ে এমনভাবে লীগ পত্র-পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন করা হয় তাতে সাধারণ মুসলমানদের মনে হল পাকিস্তান দাবির প্রধান প্রতিপক্ষ হল হিন্দুরা। এই কথাও লীগের মঞ্চ থেকে বলা হল, ভারতে 'ইসলাম বিপন্ন'। পাকিস্তান হবে 'প্রকৃত ইসলামিক রাষ্ট্র'। আর তা কায়েম করা গেলেই মুসলমানদের 'মুক্তি' অর্জিত হবে।[১] 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর কর্মসূচী সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা না করে জিন্না এই মন্তব্য করেন, 'আমি নীতিশাস্ত্র আলোচনা করতে যাচ্ছি না'। ৫ আগস্ট মওলানা আকরম খাঁ বলেন, মুসলমানরা অহিংসার ভণ্ডামিপূর্ণ নীতিবাক্যে বিশ্বাস করে না'।[২] প্রকট ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের দ্বারা মুসলিম মনন প্রভাবিত হওয়ায় অতি সহজেই জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা বৃহত্তর মুসলিম জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রবাহটি খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। মুসলিম রাজনীতির গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রশাসকরা যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তার বহু নিদর্শন সরকারী তথ্যে পাওয়া যাবে।[৩] তাই ২৯ জুলাইয়ের পর ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক অস্ত্রটি প্রয়োগ করতে বিলম্ব করা সমীচিন মনে করে নি। লীগ অদ্ভুত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' সেই সুযোগ করে দেয়। কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্বন্ধে লীগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায়িত্ব কতটুকু তা বোঝা যায় পাকিস্তান দাবির পক্ষে লীগের প্রচারের প্রকৃতি থেকে। লীগ নেতৃত্বের প্রভাবশালী বৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হাশিমের পক্ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের

পরিণতি কি হতে পারে তা বোঝা হয়তো সম্ভব হয় নি ! কিন্তু তাঁর পরিচালিত 'মিল্লাত' কাগজে যেভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করা হয় তাতে কি 'ডন' পত্রিকার মত একই রণধ্বনি উচ্চারিত হয় নি ?[১৪] সেনাবাহিনীর সূত্রে জানা যায়, কলকাতায় দাঙ্গা দমনে লীগ মন্ত্রীসভা অনেক আগেই সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিতে পারত। তা কেন করা হল না ? অন্যদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষই বা কেন সব দায়দায়িত্ব লীগ মন্ত্রীসভার উপর ছেড়ে দিয়ে কয়েকদিন নীরব হয়ে থাকল ? একই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে মনোভাব ব্যক্ত করে তাতে বোঝা যায়, কমিউনিস্টদের শক্তি হ্রাস করে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামকে দুর্বল করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।[১৫] সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমেই তা সহজে করা সম্ভব ছিল। এই অবস্থায় কলকাতার দাঙ্গা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই দাঙ্গায় ধনী-দরিদ্র বিরোধের উপাদান খুঁজতে যাওয়ার অর্থ হল ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত সম্প্রদায়গত বিরোধের প্রকৃতি উপলব্ধি করতে না পারা।[১৬]

সূত্রনির্দেশ

১ Ayesha Jalal, "The Sole Spokesman Jinnah, the Muslim League and Demand For Pakistan", Cambridge. 1985 ; Ian Talbot, "Provincial Politics and the Pakistan Movement The Growth of the Muslim League in the North-West and North-East India 1937-47", Karachi, 1988

২ Gautam Chattopadhay, "The Almost Revolution (A case Study of India in February 1946)", in "Essays in Honour of Prof, S. C. Sarkar", New Delhi, 1976 ; অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, কলিকাতা, ১৯৮৯

৩ Ayesha Jalal, op. cit.

৪ Ian Talbot, op. cit.

৫ Ayesha Jalal, op. cit., p. 151. আয়েশা জালাল লেখেন : "Here the pattern of provincial particularism, the strong continuities of the local political traditions—of feud and faction, struggles between ins and outs, and the quiddities

of local circumstance—qualify any notion of an united all-India Muslim movement rallying single-mindedly behind a common demand at the centre" (Ibid). এই প্রসঙ্গে আয়ান টালবট লেখেন "Ayesha Jalal has seen. Islam as having an illusory explanatory power for understanding the conduct of Muslim politics. Local political traditions of feud and faction rather than the ideology of the Pakistan demand drove forward the Muslim League Movement" (Ian Talbot, op. cit., p 108)

৬ Ian Talbot, op. cit., p 108

৭ Ibid, pp 108-109

৮ Ayesha Jalal, op. cit., p 172, see also footnote in pp 120-121

৯ Ibid, p 172

১০ Ibid, footnote in p 120

১১ Ibid, footnotes in pp 120-121

১২ Ibid, footnote in p 121

১৩ See Works of Jalal and Talbot

১৪ Ayesha Jalal, op. cit., p 208. আয়েশা জালাল লেখেন: "The Last thirteen months of British rule saw the tragic collapse of Jinnah's strategy—tragic, because the Quaid-i-Azam had always tried to keep himself above communalism in its cruder forms and had cherished his own vision of Indian Unity." (Ibid)

১৫ Ibid

১৬ Ibid, p 223

১৭ Ibid, আয়েশা জালাল লেখেন: "Direct action was a paper threat, directed at the Congress and the Raj, but quickly proving to be a snare and a delusion. Jinnah, 'no longer a young man', 'temperamentally preferring constitutional methods, did not have the organisation or the resources to direct agitation once it had been invoked. The Calcutta Killings undirlined the point in red. Soon the gang warfare and semi-organised hooliganism of

Muslim goondas in the localities of Noakhali showed that countryside as well as town could become the scrap-yards for the predators of the underworld, snatching for instant spoils within the decaying fabric of India's social order. These disorders were just one symptom of a more generalised and diverse unrest, that endemic rivalry in a society of scarce resources, unevenly distributed, of 'have-nots' against 'haves', debtors against creditors, landless against the possessors, workers against jobless and employers, and above all the hired hands of factions and clientage networks who unilatrally declared their independence from their patrons' control and forced their way throug thc fragile crust of order. To dub all these violent stirrings from below as evidence that India's myriad splits line of division between Muslims and Hindus, where community ruled and all else was secondary, is an unaceptable simplification". (Ibid)

১৮ Ian Talbot, op. cit., pp 76, 88

১৯ See Works of Jalal and Talbot including their Bibliographies.

২০ Speeches of Abul Hashim, in Proceedings of the Bengal Legistative Assembly (1937-1946) ; 'মিল্লাত' পত্রিকার ফাইল (১৯৪৫-৪৭) ; Abul Hashim, In Retrospect, Dacca, 1974. হাশিমের পিতা মৌলবী আবুল কাশেম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি মারা যান। পিতার মৃত্যুর পরে আবুল হাশিম নভেম্বর মাসে বর্ধমান মুসলিম কেন্দ্র থেকে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জিন্নার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে এবং তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। জিন্নার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের পর এবং পরে জিন্না সম্বন্ধে হাশিমের কি মনোভাব হয় তা এখানে তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃত করছি: "I left him with the impression that Mr. Jinnah wanted to organise the Muslim League as a broad-based democratic and progressive political party. Believing in what Mr. Jinnah said, I joined the

Muslim League. But I was deceived. Later I found that to Mr. Jinnah, persons other than Nawabs, Knights and business magnets were of no consequence." (In Retrospect, pp 17-18) হাশিম লেখেন: "Leaders and workers of the Muslim League who accepted my policy of mass orientation of Muslim League stayed at the Party House when they came to Calcutta." (Ibid, p 44) ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ নভেম্বর 'মিল্লাত' বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। আবুল হাশিম ছিলেন সম্পাদক। প্রতি সপ্তাহে ৩২০০০ কপি এই পত্রিকা মুদ্রিত হত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সরকারী মুখপত্র ছিল এই পত্রিকা। মুসলিম বাংলার 'জাতীয় পত্রিকা' হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। এই পত্রিকায় লেখা হত, মুসলিম লীগ মুসলমানদের 'জাতীয় প্রতিষ্ঠান', শুধু একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়। প্রতি সংখ্যায় বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদীনের আঁকা ছবি প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় আবুল হাশিমের ভাষণসমূহ ও মতামত প্রকাশিত হত, 'আজাদ' পত্রিকায় সমালোচনা থাকত। এই পত্রিকার জিন্নার অসংখ্য ভাষণ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে জানা যায়, কিভাবে জিন্না সম্প্রদায়গত প্রকট স্বাতন্ত্র্য-বোধ জাগ্রত করেন। আবুল মনসুর আহমদও এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। মুসলিম লীগ কিভাবে 'মুসলিম গণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত' সে বিষয়ে প্রচুর তথ্য 'মিল্লাত' কাগজে পাওয়া যায়। গ্রামের মুসলমান কৃষক ও দিনমজুর লীগের জন্য কাজ করে, তারাই লীগকে গড়ে তোলে। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি প্রবন্ধ উল্লেখ করছি: "বাংলার গ্রামে গ্রামে জাগিতেছে লক্ষ লক্ষ 'মমতাজ'—সুদূর 'বজ্রযোগিনী' গ্রামে "লীগ সংগঠন"—লেখক সরদার ফজলুল করীম (দ্রঃ মিল্লাত, ৩০ নভেম্বর, ১৯৪৫, পৃ ১, ৭)। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ থেকে প্রধান সম্পাদক হিসেবে আবুল হাশিমের নাম, আর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের নাম ছাপা হত।

২১ Abul Hashim, In Retrospect, pp 28-39, 39-40, 54, 79, 85. ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হাশিমের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগ ঘটে। তারপর ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের পূরণচাঁদ যোশীর সঙ্গে পরিচয় হয়। হাশিম লেখেন: "I felt deeply the necessity to place before the people a Manifesto with a view to organising and consolidating the ideas I preached in 1944 from the Muslim League platform. I prepared a draft Manifesto of the Bengal Provincial Muslim League. A very

efficient young Communist, Mr. Nikhil Chakrabarty, very kindly helped me prepare the draft. The draft was based on universal values of Islam preached and practised by the prophet of Islam and his faithful followers" (Ibid, p 79). উল্লেখ্য এই, ইস্তাহারের খসড়া প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মার্চ।

২২ Ibid, pp 89-93

২৩ Abul Hashim, "Let us Go to War". Dacca, 5 September, 1945. This booklet contains 16 pages. এই সময়ে বাংলার মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশী ছিল, বাংলায় তখন মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৫০ লক্ষ (Ibid, p 4)

২৪ 'মিল্লাত' পত্রিকার ফাইল (১৯৪৫-১৯৪৬)। মুসলমান লেখকরা তীব্র ভাষায় 'হিন্দু' কংগ্রেস', 'হিন্দু' লেখকদের রচনা, 'ব্রিটিশ-বর্ণহিন্দু মিতালী,' 'অখণ্ড হিন্দুরাজের তত্ত্ব' ইত্যাদির বিরুদ্ধে মুসলিম জনমত গঠন করেন।

২৫ Abul Hashim, In Retrospect ; 'মিল্লাত' পত্রিকায় 'আজাদ' পত্রিকার সমালোচনার উত্তর দেন আবুল হাশিম এবং অন্যান্য সংবাদে ও প্রবন্ধেও 'আজাদ'-এর সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়।

২৬ Abul Hashim, In Retrospect

২৭ Ibid, pp 79-82

২৮ Ibid, হাশিম ইসলাম ও সাম্যবাদ নিয়ে পড়াশুনা করেন। তিনি 'রাব্বানিয়াৎ' দর্শনের সমর্থক ছিলেন। ঐশ্লামিক আদর্শের দ্বারাই তাঁর মনন গঠিত হয়। মৌলানা আজাদ সোভানি তাঁকে এই দর্শনে দীক্ষিত করেন। তাঁর প্রসঙ্গে হাশিম লেখেন: "He initiated me to the philosophy of 'Rabbaniyat' or 'Rabbanism'." (Ibid, pp 31-32). তাঁর মননে ও কর্মে ইসলামের প্রভাব সম্বন্ধে হাশিম লেখেন: "As a zelous missionary of Islam I also preached from the Muslim League platfrom social, political, economic and cultural fundamentals of Islam and how they were implemented in individual and collective life under the leadership of the Holy Prophet Muhammad (plece be upon him) and the Caliphate of Islam" (Ibid, p 42) ; দ্রঃ 'মিল্লাত'-এর ফাইল (১৯৪৫-১৯৪৬)।
উল্লেখ্য এই, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে যে সব তরুণ মুসলমান বিপ্লবীরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে অংশগ্রহণ করেন তাঁরাও কিভাবে ইসলামের

সাম্য নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বল্‌শেভিক রাশিয়া ও সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য আমার প্রবন্ধ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া। (স্মারক পুস্তিকা, পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা, ১৯৮৭-১৯৮৮)

২৯ আবুল হাশিমের রচনাবলী ও 'মিল্লাত'-এর ফাইল দ্রষ্টব্য। ইসলামের একনিষ্ঠ প্রচারক হিসেবে হাশিম মুসলিম লীগ মঞ্চ থেকে ইসলামের মূল নীতি প্রচার করেন। তার প্রভাব মুসলমান জনসাধারণের উপর কতটা পড়ে সে প্রসঙ্গে তিনি লেখেন: "This inspired the Muslim Youths of Bengal and they succeeded in formally enrolling more than half a million two anna members of the Bengal Muslim League in 1944". (Abul Hashim, In Retrospect, p 42)
ঐস্লামিক আদর্শের সঙ্গে সেকুলার দাবিগুলোর কোন সংঘাত হাশিম দেখতে পান নি। তাঁর ইস্তাহারে যাঁরা সাম্যবাদের উপাদান দেখতে পেয়ে হাশিমের বিরূপ সমালোচনা করেন তাঁদেরও তীব্র সমালোচনা করে তিনি লেখেন: "The reactionaries of the Muslim League and the die-hards of the Islam of Baghdad, scented Communism in the Manifesto" (Ibid, p 80). ভারতে ইসলামের আগমন সম্বন্ধে হাশিমের নিজস্ব একটি মত ছিল। তিনি লেখেন, ভারতে ইসলাম মদিনার খলিফার কাছ থেকে সরাসরি আসে নি, তা আসে আরব সাম্রাজ্যবাদের রাজধানী বাগদাদ থেকে পারস্য দেশ হয়ে। আরবরা পারস্য দেশ জয় করে, কিন্তু পারসিকরা সাংস্কৃতিক দিক থেকে আরবদের উপর প্রাধান্য স্থাপন করে। তার ফলে বিশুদ্ধ ইসলামের সঙ্গে পারস্য দেশের প্রাক-ইসলামিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে। ভারতে ইসলামের রক্ষণশীল গোঁড়াপন্থীরা বাগদাদের এই 'বিকৃত' ইসলামকেই প্রচার করেন এবং অনুসরণ করেন এবং তাঁদের কাছে মদিনার ইসলাম হল, 'সাম্যবাদ'। তাই খাজা নাজিমুদ্দিন মনে করেন, ইসলামের মোড়কে হাশিম সাম্যবাদ প্রচার করেছেন। (Ibid, pp 79-80)

৩০ Presidential Address Delivered by "M. A. Jinnah at the All India Muslim League. Lahore Session, 22 March, 1940", vide Jamil-ud-din Ahmed (Collected and edited), "Speeches and Writings of Mr. Jinnah", 6th edition, Lahore, March 1960, vol. I (1935-1944), pp 143-163 ; See also M. A. Jinnah, "Western Democracy Unsuited For India", in Time and Tide, New Delhi, 13 February, 1940.

নয়াদিল্লীর কাগজে প্রকাশিত জিন্নার এই প্রবন্ধটি 'জিন্নার থিসিস' নামে খ্যাত। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য" পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক", কলিকাতা, ১৯৭২

৩১ আমার গ্রন্থ ''বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ'', কলিকাতা ১৯৭৪ দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

৩২ ঐ; আরও তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য সরদার ফজলুল করিম (সম্পাদনা), "পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য", ঢাকা ১৯৬৮

৩৩ আমার গ্রন্থ "পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক", পৃ ৭২-৮০

৩৪ ঐ

৩৫ জুলফিকার আহমদ কিসমতী, "আযাদী আন্দোলনে আলেম সমাজ", ঢাকা ১৯৭৬, পৃ ১১৮ ১৫১

এই গ্রন্থে মওলানা আশরাফ আলি থানভী নামক বিখ্যাত মুসলিম ধর্মতত্ত্ব-বিদের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। মওলানা থানভী রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'রুয়েদাদে তাবলীগে'। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই মওলানা থানভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় তাঁর শিষ্য ছিলেন মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ও মওলানা আতহার আলী। সিলেট 'জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-হিন্দের' প্রভাব হ্রাস করে পাকিস্তানী আন্দোলনকে শক্তিশালী করেন মওলানা আতহার আলী। বাংলায় মওলানা থানভীর আরও দু'জন প্রভাবশালী শিষ্য ছিলেন: বুর্য হামেজজী হুযুর (মওলানা মোহাম্মদুল্লাহ) ও পীরজী হুযুর (মওলানা আবদুল ওহাব)। তাঁরাও তাঁদের ভক্তদের মাধ্যমে পাকিস্তান দাবির সমর্থনে মুসলিম জনমত গঠন করেন। (ঐ, পৃ ৯৬)

৩৬ ঐ, তদেব। পৃ ১৫২-১৭৬

৩৭ 'মিল্লাত', ১৬ নভেম্বর, ১৯৪৫, পৃ ৭, ১১

এই সংখ্যায় 'জামিয়াত-ই-উলেমা-ই ইসলাম' সংস্থার বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৬-২৯ অক্টোবর কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে এই সংস্থার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ফুরফুরা শরীফের পীর হজরত মওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ আবদুল সিদ্দিকী উদ্বোধনী ভাষণ দেন। পঁচিশ হাজার প্রতিনিধি ও দর্শকের উপযোগী প্যাণ্ডেল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত আলেম, ফাজেল প্রভৃতির দ্বারা প্রতিদিনই পরিপূর্ণ ছিল। এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ আলেম মওলানা আজাদ সোভহানী। এই সম্মেলন থেকে যে কর্মকর্তা ও ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয় তাঁর সভাপতি হন মওলানা শাব্বীর আহম্মদ উসমানী।

উলেমাদের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য "Role of the Uelma in Bengal Muslim Politics", in "The Quarterly Review of Historical Studies", vol. xviii, No. 2, 1978-1979

৩৮ ঐ

৩৯ ঐ। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী 'জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-হিন্দ'-এর কর্মপরিষদের প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি পাকিস্তান দাবির অন্যতম প্রবক্তা হন। (দ্রঃ আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজ, পৃ ৮৩)

৪০ ঐ, তদেব, পৃ ১০৫

৪১ ঐ, পৃ ৮০-১৭৬

৪২ "Resolution on Pakistan", File No. F. 163/40-R, in National Archives of India, New Delhi ; B. R. Ambedkar, "Pakistan or The Partition of India", Bombay, Third Edition, 1946, pp 4-5

৪৩ Ibid

৪৪ Abul Hashim, "In Retrospect.' pp 22-23 ; 'লাহোর প্রস্তাব' সম্বন্ধে হাশিমের কি ধারণা ছিল তা নিজেই উল্লেখ করেন। তাঁর গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়। হাসিম লেখেন: "The Lahore Resolution was the basis of our movement for carving out of India, independent and sovereign states as homelands for the Muslims of India. It did not contemplate creation of a single Pakistan state as homelands for the Muslims of India. One in North-West India consisting of Punjab, Sind, Baluchistan, North-West Frontier Province and Kashmir and the other in North-East India consisting of Bengal and Assam. In the Lahore Resolution I saw my complete independence as a Muslim and as a Bengali and for this I supported the movement based on Lahore Resolution of 1940. Mr. Jinnah preached the two-nation theory and this was the burden of his song. I never believed in Mr. Jinnah two-nation theory and I never preached this in Bengal. I preached the multi-nation theory. I maintain that India is a sub-continent and not a country. India consists of many countries and many

nations……The Muslim League did not contemptate partition of any country of India or partition of the Punjab or of the Punjabis and partition of Bengal or of the Bengalis. Thus there was nothing communal in the Lahore Resolution of 1940". (Ibid)

ভারতের জাতিসমস্যা সমাধানে কমিউনিস্ট পার্টি যে মত প্রচার করে তার সঙ্গে হাশিমের চিন্তার খানিকটা মিল পাওয়া যায়। কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্ববিদ ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী ভারতের বিভিন্ন জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য গঠনের ও পাকিস্তান দাবি সমাধানের যে সূত্র উল্লেখ করেন তার জন্য দ্রষ্টব্য "National Unity Now!" by G. Adhikary, in "People's War", August 8, 1942; G. Adhikary (ed.), "Pakistan and National Unity —The Communist Solution", P. P. H., Bombay 1943. এই বিষয়ে ডঃ গঙ্গাধর অধিকারীর প্রবন্ধেই প্রথমে আলোচিত হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত প্লেনামে "On Pakistan and National Unity" এই শিরোনামায় প্রস্তাবে গৃহীত হয়। ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী সম্পাদিত পুস্তিকায় তাঁর প্রবন্ধ ও এই প্রস্তাবটি মুদ্রিত রয়েছে। আরও তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য T. G. Jacob (Editor), "National Question in India C P I Documents 1942-47", New Delhi, 1988

৪৫ Abul Hashim, op. cit., 'মিল্লাত' পত্রিকার ফাইল

৪৬ Stanley Wolpert, "Jinnah of Paklstan", New Delhi, 1984. ১৯৪৪-১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জিন্না লীগ সংগঠনে তাঁর কর্তৃত্ব কতটা সুদৃঢ় করেন তার বিষয়ে তথ্য এই গ্রন্থে রয়েছে। গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা এবং সিমলা সম্মেলনে জিন্নার সঙ্গে ওয়াভেলের কথাবার্তায় তা প্রকাশ পায়।

৪৭ Abul Hashim, op. cit., pp 109-110, 179-181. See also Appendix 4: The Delhi Resolution 1946. ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ এপ্রিল দিল্লীর অ্যাংলো-অ্যারাবিক কলেজে জিন্না মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের কনভেনশন ডাকেন। এখানে সাবজেকটস কমিটির সভায় জিন্না 'এক পাকিস্তান রাষ্ট্র' (One Pakistan State) দাবির প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন আবুল হাশিম। হাশিমের আপত্তিতে জিন্না তাঁর প্রস্তাবের খানিকটা সংশোধন করেন। কনভেনশনের প্রকাশ্য অধিবেশনে জিন্নার পরামর্শে সোহরাওয়ার্দি এই সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন (See Appendix 4). এই প্রকাশ্য অধিবেশনে হাশিম ইচ্ছাকৃতভাবেই অনুপস্থিত ছিলেন। তার কারণও

হাশিম উল্লেখ করেন। তিনি উপস্থিত থাকলে তাঁকে দিয়েই জিন্না প্রস্তাবটি উত্থাপন করতেন। (Ibid, p 110) জিন্না-হাশিম বিতর্ক কমিউনিস্ট পার্টির People's Age কাগজে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচনের সময়ে মুসলিম কেন্দ্রে কমিউনিস্ট পার্টি প্রার্থী দেওয়ায় লীগের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। তার ফলে লীগের বামপন্থীদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে চিড় ধরে। লীগের দক্ষিণপন্থীরা তার সুযোগ গ্রহণ করে হাসিমকে দুর্বল করতে সক্ষম হয়। (Ibid, pp 101-102) নির্বাচনের প্রাক্কালে লীগের অভ্যন্তরে লীগ নেতৃত্বের কাছে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকদের কোনই গুরুত্ব ছিল না। পঞ্জাবের পরিস্থিতি আলোচনায় সরকারী নোটে লেখা হয়: "Dr. Adhikari has now left the Punjab. Both he and Sajjad Zaheer, who paid a short visit to Lahore recently, were unsuccessful in their attempts to reach an agreement with the Muslim League over the elections and they were disappointed to find that their supports in the League were receiving no recognition from League leaders opposed to the Communists". [See Note by H. D. Bhanot, Chief Secretary to Government, Punjab, dated 18. 11. 45. in H. D. Dy 0436/45—Poll (I). National Archives of India (Henceforth abbreviated as N. A. I)]

৪৮ Gautam Chattopadhyay, op. cit.

৪৯ অমলেন্দু সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ

৫০ Intelligence Bureau, H. D., Calcutta Disturbances, C. I. O. Calcutta's telephone report no. 2, received at 3.30 pm. on 12. 2. 46, File No. 5/22/46—Poll(I). marked secret, in N. A. I. ১২ ফেব্রুয়ারী E. J. Beveridge [Assistant Director(s)] লেখেন: Secret information is that the Muslim League as a whole in Calcutta are in sympathy with all this, though they have not yet openly packed the students, who began it. The Muslim League, as already eported, regard the conviction as a direct insult to the League and have now expressed the intention of organising a hartal on 12. 2. 46. and a procession and demonstration possible, regardless of consequences".

বোম্বে ও অন্যান্য স্থানেও মুসলমানেরা আবদুল রসিদের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ অথবা হরতাল পালন করেন। বোম্বের

ঘটনা সম্পর্কে 'গোপন' সরকারী নোটে (১৯. ২. ৪৬) লেখা হয়: "Bombay Muslims observed a hartal on February 12th as a protest against the sentence passed on Abdul Rashid of the I. N. A. All Muslim shops, schools, markets and slaughterhouses were closed. A few textile mills and factories closed down and Muslim employees in other mills remained absent." (vide Fortnightly Report for the month of February 1946. H. D. Dy. No. 2317/46-Poll, in N. A. I.)

৫১ Calcutta Disturbances, C. I. O. Calcutta's Telephone report no. 2, received at 3.30 p. m. on 12. 2. 46, op. cit. এই গোপন রিপোর্ট থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করা হল: "C. I. O. has reccived secret information from two Muslim agents to the effect the Muslim League intends to take up the agitation for the relese of Abdul Rashid in earnest, at any rate in Bengal. The League leaders are extremely annoyed and regard the sentence of Abdul Rashid as a direct hit at the League, and they also suspect that the Viceroy is about to from a Congress Central Government as a preliminary to the convening of a single constitution-making body. As this means that the League is to be by-passed and the demand for Pakistan completely disregarded, it is agreed amongst the leaders that a strong atmosphere must be created, League members must be fully prepared to Court imprisonment or repression and that following this some sort of direct action will be necessary".

৫২ Ibid. ১২ ফেব্রুয়ারীর এই গোপন রিপোর্টে আরও যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা এখানে উদ্ধৃত করা হল: "The situation in Calcutta has diteriorated considerably, and at the movment it is grave. It appears and that the Muslim League are sponsoring the agitation and that student groups of all political denominations, have combined under the auspices of their parent political organisations, i. e. all political parties are united. The persons who actually started the agitation Yesterday (11. 2. 4( ) were the

Communist-Controlled Students Federation and the Muslim League... ..Muslim students are taking a bigger part than anybody else and the situation is serious at the movement." (Ibid)

১৪ ফেব্রুয়ারী E. J. Beveridge [Assistant Dircctor (s)] লেখেন : "According to reliable secret information just reeeived, all this has been engineered according to a pre-arranged, plan by the Bengal Provincial Students' League and Communist students advised by a few Communist leaders" (vide "Intilligence Bureau (H. D.), Calcutta Disturbances, C. I. O. Calcutta's report" no : 4 recived at 10'40 pm. on 13. 2. 46, File No. 5/22/46. Poll (I), Secret, in N. A. I.)

৫৩ Ibid. গোপন পোর্টে বেভারিজ লেখেন : "Further information from the same source is that the Muslim League Students have sent word to district organisations in Bengal to stage demonstration with Communist students. This means that disorder may spread to the districts". (Ibid)

৫৪ "Calcutta Disturbances", C. I. O. Calcutta's Telephone report No. 2 on 12. 2. 46, op. cit.

৫৫ Ibid

৫৬ Ibid ; See also "Telegram from Governor of Bengal to Viceroy", No. 27, Dated 13 February 1946, Fil No. H. D. Dy No. 1149/46-Poll (I), in N. A. I.

৫৭ Ibid ; See also "Telegram from Governor of Bengal to Viceroy", No. 28, 13 February, 1945, File No. H. D. Dy No. 2069/46-Poll (I), in N. A. I.

৫৮ "Telegram from Governor of Bengal to Vicerey", No. 30, 14 February, 1946, File No. H. D. Dy. No. 1897/46-Poll (I), in N. A. I. এই গোপন বিশেষ জরুরি টেলিগ্রামে বাংলার গভর্ণর জানান : "No evidence of fire-arms being used by rioters duridg three days disturbauces".

৫৯ "Telegram from Governor of Bengal to Viceroy", No. 40, 25 February, 1946, op. cit. এই গোপন রিপোর্টে ভাইসরয়কে জানানো হয় : Muslim League and Communist Party India

students were responsible for the first procession on 11. 2. 46. into the prohibited area and were joind by other students organisations, including the Bengal Provincial Students' Federation (New) and Bengal Provincial Students' Congress in the second procession, It is evident that the ultimate object of these students was to cause civil disorder...Having started the trouble, students also participated in incidents of mob violence as is evident from the quite considerable numbers of them who were killed or injured as a result of counter-action by the Police and Mititary". (Ibid)

৬০ Ibid. ২৫ ফেব্রুয়ারী বাংলার গভর্ণর মুসলিম লীগের ভূমিকা সম্বন্ধে গোপন টেলিগ্রামে ভাইসরয়কে যেসব তথ্য সরবরাহ করেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হল : "The Muslim League was forced into an awkward situation politically by the action of the Muslim students who defied Government on the 11th. With the elections approaching Mr. Suhrawardy could not afford to lose popular support. Like all other party leaders in Bengal he has no control over his rank and file. He knew that he had to agitate against the connection of Abdul Rashid even if the agitation led to violence. He knew that the procession on the 11th through the prohibited area, declared such by the Cabinet of which he was a member, would be dispersed by force and that this would led to serious disorders. His efforts to prevent this difiance were feeble, for he knew that his influence our students was small and that he had little hope of success. His knowledge that the procession on the 12th would be allowed to pass through the prohibited area enabled him to pose with safety as a hero of liberty and the protagonist of Hindu-Muslim or League-Congress unity. He also led the procession, undoubtedly in the hope that his presence would prevent unseemly behaviour, but undoubtedly, too, with the intention of not committing the error of Sarat Bose who lost much popularity by now showing himself at Dhurrumtolla on the 21st November. As a

leader of the Muslim League he reviled the police and criticized the Government of which he was confident he soon would be the Prime Minister. He organized peace squads during the disturbances. Had votes not been necessary perhaps the Muslim League would have attempted to take a stronger line with the Muslim students, but with no hope of success. Although the disturbances arose out of a Muslim demonstration against the Government the participants in them were probably more non-Muslim than Muslim". (Ibid)

৬১ Ibid. এই আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করে ২৫ ফেব্রুয়ারী বাংলার গভর্ণর তাঁর গোপন নোটে ভাইসরয়কে যেসব তথ্য জানান তা এখানে উদ্ধৃত করা হল : "The Communist Party of India was without doubt the most dismptive organisation concerned in the disturbances. The meeting at Wellington Square on 11. 2. 46 was organized, for the greater part, by Communists and there were student supporters in both processions on 11. 2. 46. On 12. 2. 46 leading Communists instigated workers to go on strike and caused a stoppage in the Transport services and were strongly represented in all political demonstrations that took place that day. They issued objectionable posters and leaflets and wished to be much more violent than they actually were but were restrained somewhat by the Congress and Muslim League. There is reliable evidence that even after matters had been brought under control by the Police and the Military the Communist Party India leders were considering ways of prolonging the agitation. This party may always be expected to be a danger during troublers times. Its aim is violent revolution. If it remained quiet and constitutional its following would rapidly melt away and go over to the Congress or other organizations with great popular appeal. To retain a hold on its supporters, it has to be continually attracting by using agitation against the Government. As it has so many low-class supporters the step from agitation to mob-violence is but a short one". (Ibid)

৬২ Ibid. বাংলার গভর্ণর ভাইসরয়কে এই খবরও দেন: "The Indian National Congress, whatever individual members may have done, took no part in the agitation immediatly preceding the disturbances" .(Ibid) ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বিচার শুরু হওয়ার সময়ে বিক্ষোভ-সমাবেশ শুরু হয়। এখানে ফেব্রুয়ারী মাসের আন্দোলনের উল্লেখ রয়েছে, তার আগে নভেম্বর মাসে আন্দোলন হয়। এই প্রসঙ্গেই দল হিসেবে কংগ্রেসের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৬৩ "Secret Report on the Political Situation in Bengal for the first half of February, 1946", File No. H. D. Dy. No. 2317/46 Poll (I), dated 23. 2. 46. in N. A. I. এই রিপোর্টে লেখা হয়, আবদুর রসিদের (সরকারী নোটে আবদুল লেখে নি) সাত বছর কারাদণ্ডের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলমান ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়। ৫ ফেব্রুয়ারী পাঁচশত মুসলমান ছাত্রের প্রতিবাদ মিছিল কলকাতার রাস্তায় বের হয়। কিন্তু তারা কোন আইন লঙ্ঘন করে নি। ৯ ফেব্রুয়ারী মুসলিম ছাত্ররা সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে, কিন্তু ৮ ফেব্রুয়ারী মুসলিম লীগ নেতাদের পরামর্শে ছাত্ররা তা প্রত্যাহার করে। মুসলিম লীগের প্রতি ব্রিটিশ সরকার অবিচার করেছে এই মনোভাব মুসলমানদের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে। তাদের ধারণা হয়, শাহনাওয়াজ ও অন্য দুজনের প্রতি যে ধরনের আচরণ করা হয়েছে, আবদুল রসিদের ক্ষেত্রে তা করা হয় নি, বিচারে তারতম্য করা হয়েছে। কমিউনিস্টরা এই বিক্ষোভের সুযোগ গ্রহণ করে। লীগের প্রবীণ নেতারা মুসলমান ছাত্রদের হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেন। তা সত্ত্বেও ১১ ফেব্রুয়ারী মুসলমান ছাত্ররা কমিউনিস্ট ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত-ভাবে সমাবেশ-মিছিল করে। একটি ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা, তার বেশীরভাগই ছিল মুসলমান বিক্ষোভকারী, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সেক্রেটারিয়েট চত্বরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে সহজেই তাদের তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। এই সংবাদ যখন কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্রদের আর একটি প্রতিবাদ সভায় এসে পৌঁছয় তখন সেখানে সমবেত ছাত্ররা সভার সভাপতির নির্দেশে পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মিছিল করে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে অগ্রসর হয়। তখন লাঠিচার্জ করে, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে ও ছাত্রদের গ্রেপ্তার করে এই বিক্ষোভ-সমাবেশ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তা থেকেই সমগ্র শহরে বিশৃঙ্খলা শুরু হল। এই সরকারী নোটটি গুরুত্বপূর্ণ বলে তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল: "The disturbances started apparently in connection with a demand for the release of

Captain Abdur Rashid of the I. N. A. Who has recently been sentenced to 7 years, imprisonment. The agitation was not receiving much support at first ; On the 5th February a procession of about 500 Muslim Students paraded the streets shounting slogans but showing no disposition to break the law. Even a general strike and a meeting announced by the Muslim students for the 9th February were abandoned on the advice of Muslim League leaders on the 8th. There was considerable feeling among Muslims that there had been discrimination by Government against the Muslim League in this case as the accused defended by them has been treated differently from Shah Nawaz and 2 others in the first trial. It seems that the Communists exploited this situation and, in spite of the persuasion by their elders not to have any truck with Hindu Students, the Muslim Students arranged meetings and processions jointly with the Communists on the 11th February. A small procession, predominantly Muslim, which tried to enter the Secretariat area in violation of a long standing prohibitory order was easily dispersed by making a few arrests. On reciving this news the main body of students who were holding a protest meeting under a Communist decided to dify the police bau at the instigation of their President and marched towards the prohibited area where they were dispersed after a lathi charge, use of tear-smoke and a few arrests. From these rather small beginnings started an orgy of lawlessness all over the city on lines which were practised with some success during the riots of last November." (Ibid) উল্লেখ্য এই, সরকারী গোপন নোটে অনেক জায়গাতে আবদুল না বলে আবদুর রসিদ লেখা হয়েছে।

এই দীর্ঘ নোটের আর একটি স্থানে লীগ নেতাদের বিষয়ে যে সব মন্তব্য করা হয়েছে তারও কিছুটা এখানে উধৃত করা হল : "The Muslim leaders who did not encourage these demonstrations had to make a virtue of the necessity and come out later in support of the students. As a concession to soothe their feelings, His Excellency allowed a procession to pass

through the prohibited area on the 12th February on the assurance of Mr. Suhrawardy and Sir Nazimuddin that calm would thereby be restored, but this had no effect at all and, on the contrary, was hailed as a great Victory for Muslims. Mr. Suhrawardy boastfully proclaimed that the Muslims could take what they wanted. Some of the worst outrages took place after this procession". (Ibid)

১২ ফেব্রুয়ারীর বিক্ষোভ সমাবেশের বিষয়ে সরকারী নোট থেকে যে চিত্র পাওয়া যায় তা এখনও আলোচিত হয় নি। এই নোটে কংগ্রেস সম্বন্ধে যে সব কথা লেখা হয় তাও উল্লেখযোগ্য বলে উদ্ধৃত করা হল : "The Congress President and Sarat Bose at first denounced these acts or lawlessness as sheer hooliganism but later, possible to retrieve his position, Sarat Bose made a virulent attack on Government also for using the troops. it may be said on the whole that the Congress leaders did not identify themselves with these happenings and did what they could to stop them. The Muslim leaders out wardly did the same. It seems, however, that the leadership of the mob rested in other hands ; one of the lorries going abent with some Congress leaders on a tour of pacification was set upon by the mob and burnt and were roughly handled in a Hindu area". (Ibid)

সরকারী তথ্য থেকেই বোঝা যায়, বিক্ষোভ-সমাবেশ এমন রূপ ধারণ করে, তাতে লীগ ও কংগ্রেস নেতৃত্ব বিচলিত বোধ করেন। এই অবস্থায় লীগ নেতৃত্ব মুসলমান ছাত্রদের আর বেশী দূর অগ্রসর হতে দেন নি।

প্রায় একই সময়ে বাংলার মুসলিম লীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যেভাবে প্রকটিত হয় তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে লীগ নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রতি কতটা গুরুত্বদান করেন। প্রাদেশিক পার্লামেন্টারী বোর্ডে সোহরাওয়ার্দির প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর মনোনীত ব্যক্তিরাই নির্বাচনে প্রার্থী হবার সুযোগ পান। নাজিমুদ্দিন ও তাঁর সমর্থকদের শক্তি যথেষ্ট হ্রাস পায়। এই অবস্থায় কলকাতার লীগ অফিসে ও সোহরাওয়ার্দির আবাস স্থলের সামনে মুসলমান ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। লীগের কেন্দ্রীয় বোর্ডের কাছে অভিযোগপত্রও জমা পড়ে। লীগ নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ছাত্ররাও যুক্ত হয়ে পড়ে। (Ibid)

৬৪ "Secret Report on the Political Situation in Bengal For the Second half of February, 1946". File No. H. D. Dy.

2753/46-Poll (I), dated 13. 3. 46 ; File No. 5/21/46—Poll (I) in N. A. I. এই রিপোর্টে লেখা হয় : "Even those while will to the administration, or who at bast do not actively wish evil, feel seriously disturbed at what appears to them to be lack of a definite policy by Government and a gradual loosening Governmental Control." (Ibid) See also File No. 5/14/46—Poll (I) in N. A. I. এই ফাইলের বিষয়বস্তু হল "R. I. N. Strike and Reactions."

৬৫ Ibid. এই রিপোর্টে লেখা হয় : "Political interest has centred largely on the elections and the parties are busy in the field with their Campaign. The central Parliamentary Board of the Muslim League has set aside on appeal a number of nominations made by the Provincial League, and this has greatly reduced the volume of discontent which was being felt by large sections aganist the provincial selections .. Mr. Jinnah was in Calcutta to make a first-hand study of the League affairs in Bengal. He was presented with a purse of a large amount which attracted very large audiences. He has left for Assam". (Ibid)

এই সময়ে জিন্না যে কথা বারে বারে মুসলমান শ্রোতাদের কাছে ভাষণে বলেন অথবা বিবৃতিতে বলেন, তা হল : 'কংগ্রেসই সাম্প্রদায়িক তিক্ততার স্রষ্টা' (দ্র "মিল্লাত", ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ ; "আজাদ" পত্রিকার ফাইল (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫)। ২৫ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় মুসলমান মহিলাদের সভায় জিন্না বলেন : "পাকিস্তান ব্যতীত ভারতবর্ষের মুসলমান জাতি এবং ইসলাম ধ্বংস হইয়া যাইবে" (দ্র "মিল্লাত", ১ মার্চ, ১৯৪৬)। ২৪ ফেব্রুয়ারী কলকাতার ময়দানে এক বৃহৎ জনসভায় জিন্না যে বক্তৃতা দেন তাঁর ভাষণটি এবং এই সভার বিবরণ এই শিরোনামায় বড় হরফে 'মিল্লাত' কাগজে ছাপানো হয় : 'নিপীড়িত জনগণের কণ্ঠে রণিয়া উঠিয়াছে আজাদীর আওয়াজ ইংরাজ ও হিন্দুর গোলামী হইতে নবজাত-লাভের একমাত্র রাস্তা পাকিস্তান' (দ্র ১ মার্চ, ১৯৪৬)। 'মিল্লাত'-এর মতে প্রায় সাত লক্ষ লোক এই বিশাল সমাবেশে ছিল। এই সংখ্যায় 'দুষমণের দুঃসাহস' নামে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা হয় তাতে স্পষ্ট করেই লেখা হয় 'হিন্দুজাতি শোষণকারী', আর 'মুসলমান জাতি শোষিত'। (দ্র ঐ)

৬৬ "Secret Report on the Political Situation in Bengal for the second half of February, 1946". op. cit.

৬৭ Ibid ; দ্র "মিল্লাত", ১ মার্চ ১৯৪৬—এই সংখ্যায় এই খবর প্রকাশিত হয়

যে, এই সময়ে কলকাতার কারমাইকেল, বেকার হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেল, জিন্নাহ হল ও ইসলামিয়া কলেজের মিলিত তিনশত ছাত্র নিয়ে কলিকাতা মুসলিম ছাত্র লীগ যশোহর, বাগেরহাট, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে লীগ প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারের জন্য অংশগ্রহণ করে।

৬৮ 'মিল্লাত' ও 'আজাদ' পত্রিকার ফাইল। ১৯ মার্চ থেকে ২২ মার্চ বাংলায় নির্বাচন হয়। লীগ প্রার্থীদের ভোট দেবার জন্য লীগ নেতৃত্ব যে বিবৃতি দেন তাও দ্রষ্টব্য। সরকারী তথ্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে উদ্ধৃতি সহকারে।

৬৯ "Fortnightly report for the first half of February, 1946", File No. H. D. Dy. 2356/46—Poll (I), Dated February 20, File No. 5/14/46—Poll (I), in N. A. I.

৭০ অমলেন্দু সেনগুপ্ত. "উত্তাল চল্লিশ" পৃ ১৭০। উল্লেখ্য এই, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুলাই বোম্বে শহরে সারা ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ দিবস উদ্‌যাপন বিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণ করে। "Dawn", Delhi, August 15, 1947. এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কেন পট দ্রুত পরিবর্তিত হল।

৭১ "Report on the Situation in the Punjab for the first half of February, 1946". op. cit. এই রিপোর্টে লেখা হয়: "......the deterioration of Pakistan and cry of 'Islam in danger".

নিউ দিল্লীর মুহাফেজখানায় 'ডন' পত্রিকার যেসব কার্টিং প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস সম্বন্ধে পাওয়া যায় তা দ্রষ্টব্য [vide File No. 17/1/1946 (I), in N. A. I.] ১৫ আগস্ট 'ডন' পত্রিকায় জিন্না ও শাব্বির আহমদ উসমানীর বিবৃতি প্রকাশিত হয়। 'প্রত্যক্ষ দিবস' সম্বন্ধে জিন্না বিবৃতিতে বলেন: "The object and purpose of this is to make the Muslims understand fully the situation that is facing Muslim India and that they should prepare themselves for any eventuality that we may have to face" ("Dawn", August 15, 1946). শান্তিপূর্ণভাবে প্রচারের কথা বলা হলেও বিবৃতিটিতে হুমকি যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল। পূর্ণ বিবৃতি পাঠ করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সারা ভারত জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-ইসলামের সভাপতি শাব্বির আহমদ উসমানীর বিবৃতি জিন্নার বিবৃতির সঙ্গে একই দিনে 'ডন' কাগজে এইভাবে প্রকাশিত হয়: "The Viceroy and the Cabinet Mission's most shabbily going back on their words and the vanity and arrogance of the Congress

have forced the 100,000,000 followers of Islam to disregard all sorts of trouble and come out courageously in the field of action, in order that the world may know that the muslim nation can still give the highest sacrifices for the attainment of its great aim, and by its activities may teach a lesson to the aggressive opposition, and to the men who dishonoured their own pledges" ("Dawn", August 15, 1946). জিন্নার মত শাব্বির আহমদও হুমকি দিয়ে ও আত্মত্যাগের কথা বলে শান্তিপূর্ণভাবে দিবসটি পালন করতে বলেন।

১৬ আগস্ট 'ডন' পত্রিকায় পাকিস্তানের মানচিত্র দিয়ে বড় হরফে লেখা হয় "We shall Fight For it. We shall Die For it We must win or Perish" "To Day is Direct Action Day Muslims of India Dedicate Anew Their Lives And All They Possess To The Cause of Freedom To Day Let Every Muslim Swear In The Name of Allah To Resist Aggression Direct Action Is Now Their Only Course Because

They offered Peace But Peace was spurned They Honoured Their Word But Were Betrayed They Claimed Liberty But Are Offered Thraldom Now Might Alone Can Secure Their Right"

"Pledge of Sacrifice"

জিন্নার নির্দেশে লীগ সদস্যদের শপথ গ্রহণ করতে হয়। এই শপথের যে বয়ান রচনা করা হয় তার প্রথমেই পবিত্র কোরাণ গ্রন্থ থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করা হয়:

"In the name of Allah the Beneficint and Merciful
"Say: my prayer......sacrifice and my living and my dying are all for Allah,......the Words' (Al-Quran)"

এই শপথের শেষ অংশে লেখা হয়: 'To day let every Muslim also take this pledge of sacrifice in the cause of national freedom."

উল্লেখ্য এই, জিন্নাও এই শপথ নেন (দ্র 'ডন', ১৬ আগস্ট ১৯৪৬)। 'ডন' পত্রিকায় যেভাবে সংবাদ প্রকাশিত হয়, একইভাবে লীগ পরিচালিত অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও এই দিবস সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত জিন্নার বিবৃতি পাঠ করলেই বোঝা যায়, কিভাবে জিন্না ধর্মের মোড়কে রাজনৈতিক বক্তব্যকে সাধারণ মুসলমানদের কাছে তুলে ধরেন।

৭২ "Morning News", August 2, 1946 ; Ibid, August 5, 1946 ; Ibid, August 11, 1946. স্যার নাজিমুদ্দিন স্পষ্ট করেই বলেন, মুসলমানরা নানাভাবেই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে তারা যখন অহিংসায় বিশ্বাস করে না। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' বলতে কি বোঝায় তা বাংলার মুসলমানরা ভালভাবেই জানে।

৭৩ "Secret Report on the Political Situation in Bangal for the first half of February, 1946", op. cit.

বাংলায় ও অন্যত্র জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে লীগের বিরোধের অনেক খবর সরকারী তথ্যসমূহে পাওয়া যায়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে পূর্ববঙ্গে জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা একটি বড় সম্মেলন করেন। তাতে উত্তরপ্রদেশ থেকে মওলানা হোসেন আহমদ মাজানী যোগদান করেন। এই সভার উদ্যোক্তা দিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী সহকর্মী আসরাফউদ্দীন চৌধুরী। মুসলিম লীগ থেকে সম্মেলন ভেঙে দেবার চেষ্টা হলে সভার উদ্যোক্তারা প্রতিরোধ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারী করে শান্তি বজায় রাখেন। তারপরে ক্রমশ জাতীয়তা-বাদীদের মুসলমানদের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। 'মিল্লাত' কাগজেও মৌলানা আজাদের ও সীমান্তগান্ধীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ চলতে থাকে।

৭৪ Transfer of Power, vol, VIII ; 'মিল্লাত' পত্রিকার ফাইল ; Richard D. Lambert, "Hindu-Muslim Riots" (Ph. D. Dissertation, University of Pennsylvania, 1951—A xerox copy of the thesis in possession of Mr. Hiroshi Sato, Tokyos) ; Anita Inder Singh, "The Origins of the Partition of India", New Delhi, 1987, pp 180-188

৭৫ "Transfer of Power", op. cit. ; Anita Inder Singh, opcit. S. No. 7 File H. D., Dy. No. 4949/47-Poll (I), in N. A. I. See article "White Sahib's Unclean Hands Behind Calcutta Riots, published by the "Swadhinata", Communist Party's Bengali Daily, in its issue of August 26, 1946. The "Swadhinata published the information from a confidential document issued by General Bucher, Commander-in-chief Eastarn Command, The "Swadhinata" wrote : "Secret arrangement have been made by the military for an enquiry into recent communal riots. A confidential circular on these arrangements has been issued by the General Bucher." [vide File H. D. Dy No. 4949/47-Poll (I)].

উল্লেখ্য এই, হাশিম তাঁর আত্মজীবনীতে ১৬-১৯ আগস্টের কলকাতার দাঙ্গা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন এবং অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দিকে নির্দোষ বলে যেসব কথা বলেন, তাতে বোঝা যায় তিনি সোহরাওয়ার্দির তৎকালীন কার্যাবলীর সঙ্গে মোটেই পরিচিত ছিলেন না। হাসিম বলেন, সোহরাওয়ার্দি দাঙ্গার জন্য দায়ী নন ও দাঙ্গা থামাতে তিনি খুবই পরিশ্রম করেন। (vide "Proceeding of Bengal Legislative Assembly") যদিও হাশিম স্বীকার করেন : "দাঙ্গার দিনগুলিতে কলিকাতা শহরে আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার ব্যবস্থা যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, সে বিষয়ে সংশয় নাই।" (দ্র "মিল্লাত", ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬)। তাতে স্বরাষ্ট্রবিভাগের দায়িত্বশীল সোহরাওয়ার্দির কোন দায়িত্ব নেই ?

হাশিম এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন নি। দাঙ্গার সময়ে বাংলার গবর্ণর স্যার ফ্রেডরিক বারোজ-এর আচরণ, কলকাতার পুলিশ কনট্রোল রুমে কয়েকজন অন্তরঙ্গ সহযোগীসহ প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দির অবস্থান, দাঙ্গা প্রসারের পর বারোজ কর্তৃক সেনাবাহিনী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ইত্যাদি কি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দিকে নির্দোষ প্রমাণিত করে ? হাশিম এইসব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরুত্তর থেকে লীগের তৎকালীন বক্তব্যের পক্ষেই 'মিল্লাত' পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করেন অর্থাৎ হিন্দুদের বাধা দেবার ফলেই কলকাতার দাঙ্গা বাধে (দ্র "মিল্লাত", ঐ ; 'মিল্লাত'-এর ১৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যাও দ্রষ্টব্য)

৭৬ "Minutes of Evidence of the Calcutta Disturbances Commission of Enquiry", 11 vols. (Alipore, n. d.) ; "Transfer of Power", op. cit ; Richard D. Lambert, op. cit. ; নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য "Report on the Communal Disturbances in Noakhali and Tippura Districts Received from H. E. the Governor of Bengal", File No. H. D. Dy. 9920/46—Poll(I) ; File No. 5/55/1946-I in N. A. I. ; নোয়াখালি ও ত্রিপুরার দাঙ্গা সম্বন্ধে মুসলিম লীগ তদন্ত কমিটির রিপোর্টের জন্য দ্রষ্টব্য "মিল্লাত", অক্টোবর ১৯৪৬।

আয়েশা জালাল কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার চরিত্র সম্বন্ধে যে মূল্যায়ণ করেন তা এখানে উল্লিখিত তথ্যসমূহ থেকে যথার্থ বলে গ্রহণ করা যায় না। গবর্ণর বারোজ-এর রিপোর্টে কলকাতার দাঙ্গার বিষয়ে যে মন্তব্য পাওয়া যায় তা হল : "...a progrom between two rival armies of the Calcutta under world" ("Transfer of Power", vol.VIII, p 302). এই মন্তব্যটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আয়েশা জালাল তাঁর মতটি গড়ে তোলেন। শুধু তিনি নন জাপানের তরুণ গবেষক নারিয়াকি নাকাজাতো একই সিদ্ধান্তে আসেন (see Nariaki Nakazato, "The

'Mobs' in the Calcutta Communal Riot of 1946", in "Proceedings" of Session IX, International Conference on Urbanism in Islam, October 27, 1989, Tokyo. কিন্তু কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার অজস্র সরকারি ও বেসরকারী তথ্য থেকে প্রকট ধর্মীয় রং সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এবার 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' গুণ্ডাদের বিষয়ে কয়েকটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। কলকাতার দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের কথা বলা হয়েছে। তাদর সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত তথ্য নিয়ে কোন গ্রন্থ এখনও রচিত হয় নি। কলকাতার লালবাজার ক্রিমিনাল রেকর্ডস সেকসনে গুণ্ডাদের বিষয়ে তথ্য আছে। কিন্তু সেইসব ফাইলে শুধু 'হিন্দু' গুণ্ডাদের বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের দাঙ্গার সময়কার 'মুসলমান' গুণ্ডাদের বিষয়ে কোন তথ্য নেই। কেন নেই? তার উত্তর আমার জানা নেই। সেই সময়ে 'শ্রমিক নেতা' হিসেবে সোহরাওয়ার্দির অনুগত বেশ কিছু 'মুসলমান' গুণ্ডার নাম শোনা যেত। তাদের মধ্যে মিনা পেশওয়ারি নামে এক গুণ্ডা ছিল; বাবু খান নামে আর একজন তার সহযোগী ছিল। কলকাতার দাঙ্গায় মিনা পেশওয়ারির বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু 'মুসলমান' গুণ্ডাদের বিষয়ে কোন ফাইল পুলিশ রেকর্ডসে নেই। 'হিন্দু' গুণ্ডাদের মধ্যে ছিল গোপাল মুখার্জি (যিনি গোপাল পাঁঠা নামে পরিচিত ছিলেন)। আর তার সহযোগী ছিল ভানু বসু। দাঙ্গার সময়ে কলকাতা শহরে থাকায় আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এই নামগুলো উল্লেখ করলাম। দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুহাফেজখানার আঞ্চলিক কমিটির একজন সদস্য হিসেবে ক্রিমিনাল রেকর্ডসের বিষয়েও আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে 'মুসলমান' গুণ্ডাদের ফাইল নেই বলেই আমি খবর পেয়েছি। যাই হোক, এইসব গুণ্ডাদের নারকীয় কাজকর্মের মধ্যে ধর্মগত বিদ্বেষপরায়ণতা যে প্রবল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তারা কেউ দরিদ্র ছিল না, হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন করেছে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। 'ঘৃণা' ও 'হিংসা' প্রচারে কলকাতার 'হিন্দু' নেতাদেরও ভূমিকা ছিল। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' হিন্দুদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হবে, এই মনোভাব থেকে হিন্দুরা তার জন্য প্রতিরোধের বা প্রতি আক্রমণের প্রস্তুতিও নেয়। শিখরাও তার সঙ্গে যুক্ত হয়। সুতারং ধর্মীয় বিদ্বেষ দুই সম্প্রদায়কে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উদযাপনের প্রাকালে দুটো 'যুদ্ধ শিবিরে' বিভক্ত করে ফেলে। তাতে উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডারাও যুক্ত হয়। এই প্রেক্ষাপটটি 'তথাকথিত শান্তিরক্ষক' বারোজ-এর পক্ষে ভুলে থাকা সম্ভব, কিন্তু বিশিষ্ট গবেষকরা কেন অগ্রাহ্য করবেন?

ঊনবিংশ শতকের রাশিয়াতে জনকল্যাণমূলক নীতি ঃ কিছু মন্তব্য

এইচ. বাসুদেবন

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সংগঠকরা ও সদস্যরা, তাঁদের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে আমাকে ভারত বহির্ভূত বিভাগে সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানানোতে, এই সম্মানের জন্য আমি তাঁদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আমাকে এই সম্মান দেবার কারণ আমার জানা নেই, কিন্তু তাঁদের এই অনুরোধে আমি অভিভূত।

সংসদের কর্মসূচীতে এই বিভাগটির অস্তিত্ব থাকায় এই সম্ভাবনার দরজা খুলে গেছে যে ভারতীয় ইতিহাসবিদরা এই দিকটিতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলতে ও নিজেদের গবেষণা ও জ্ঞানচর্চা আরও অর্থবহ করতে পারবেন। বাংলাদেশে অতীতে এই কাজ খুবই দক্ষতার সঙ্গে করে গেছেন কুরুভিল্লা জ্যাকেরিয়া, সুশোভন সরকার ও প্রদ্যোৎ মুখোপাধ্যায়ের মত ইতিহাসবিদরা। আর যদি বিনয় সরকারকেও এই হিসেবের মধ্যে টেনে আনা যায়, তবে ঐতিহ্য দীর্ঘতর হতে পারে। পরে, ব্রিটিশ ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে পার্থসারথি গুপ্ত এদিকে মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

আমি নিজে রাশিয়ার জনকল্যাণমূলক নীতির সমস্যাসমূহ নিয়ে কৌতূহলী এবং ইউরোপের ইতিহাস পড়াবার ও সামান্য যে কয়েক জায়গায় বলবার আমন্ত্রণ পেয়েছি, সেই উভয় ক্ষেত্রেই আমি এই সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি।

সেই সমস্যাগুলি নিয়েই আমি আজ কিছু বলতে চাই, বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে রাশিয়ার ইতিহাস যেভাবে পড়ানো হয়, তার সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন তুলতে চাই। আশা করি আপনারা এই সংকীর্ণ ও তর্ক-

অধ্যাপক হরি বাসুদেবন, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে ভারত বহির্ভূত বিভাগে সভাপতির ভাষণে এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার উপস্থিত করেছিলেন

সাপেক্ষ বিষয়ে আলোচনা শোনবার ধৈর্য দেখাবেন। এটুকু বলতে পারি যে হয়তো এর ফলে ইউরোপে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু আলো পাওয়া যেতে পারে এবং তা হয়তো অনেকেরই কৌতূহল জাগাতে পারে।

রুশ সাম্রাজ্যের শেষ পর্বে (১৮৯০-১৯০৪)
সমাজ কল্যাণের রাষ্ট্রীয় নীতি

শতাব্দীর মোড়ে এসে রুশ কর্তৃপক্ষ কতকগুলি জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়ে আইন পাশ ক'রে, সেখানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এসব প্রশ্নে রাজধানী সেন্ট পিটার্স'বার্গে এর আগে বিশেষ কেউ মাথা ঘামাতেন না। অন্যান্য দেশের সরকারেরা এই সময়ে যেসব সামাজিক সংস্কার করেছিলেন, তার সঙ্গে তাল রেখেই এই পদক্ষেপগুলি করা হয়েছিল।

এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এই আইনগুলির পিছনের উদ্দেশ্য ও তাদের চরিত্রকে এবং তার ফলে যে সাড়া জেগেছিল, তাকেও। এটা স্পষ্ট বোঝা দরকার যে রাশিয়ার প্রশাসকরা তাদের এইসব পদক্ষেপকে শুধুমাত্র জনকল্যাণের কাজ বলে মনে করেন নি। তাঁরা এইসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নতি ও দক্ষ প্রশাসনের কথা ভেবেই। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে, জনকল্যাণের প্রশ্নগুলি নিয়ে যারা পেশাগত বা আদর্শগতভাবে বিচার করেছিলাম, তাঁরা সমালোচনায় মুখর হলেন। তাঁদের সমালোচনার মূল বর্ষাফলক উঁচানো ছিল জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলিকে রাষ্ট্রের হুকুম তামিল করার ব্যবস্থাতে পরিণত করার বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত ১৯০৪-০৫এ বিপ্লবী বিরোধী শক্তিরা এই সংস্কারগুলির বিরুদ্ধেই তাঁদের আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। আর এই সংস্কারসমূহ বাতিল করার দাবীই মুক্তি সংগ্রামের মঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সংস্কারসমূহের পরিচয়

নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের উপর অনেক বেশী কঠোর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করল এই সংস্কারসমূহ।

ক) বিশেষ বিশেষ বিভাগ
(১) প্রাথমিক শিক্ষা

১৮৯২এর আইনের দ্বারা স্থানীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে (তখন তাদের সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজারের বেশী) চার্চের অধীনে

নিয়ে আসা হল। ১৮৯৪এর আর একটি আইনে বলা হল স্থানীয় স্কুল কমিটিরা যেসব শিক্ষকদের চাকরী দেবেন, সেই নিয়োগপত্র কেন্দ্রীয় প্রশাসকদের দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। ১৮৯৬এর আর একটি আইনে, এই ধরনের স্কুল কমিটিতে মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হল।[১]

(২) জনস্বাস্থ্য

১৮৯৫এর ৬ জুন আইন পাশ করে প্রধান প্রধান সমস্ত হাসপাতালকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্তৃত্বাধীনে আনা হল। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আইন, কেননা এতদিন চিকিৎসা, গবেষণা এবং মেডিকেল শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষর দ্বারা পরিচালিত হয়েই এই হাসপাতালগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[২]

(৩) বীমা ব্যবস্থা

এতদিন পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছামূলক বীমাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেন বেসরকারি কোম্পানীরা ও স্থানীয় নির্বাচিত কর্তৃপক্ষরা। এখন স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রকের অধীনে "বীমা কমিটি" প্রতিষ্ঠা করে, এইসব বীমা ব্যবস্থাগুলিকেই তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হল। বীমা কোম্পানীগুলি তাই দৃঢ়ভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে চলে এল। কৃষকদের জন্য ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক অগ্নি-বীমাও চলে এল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে।[৩]

(৪) অসামরিক সরবরাহ-ব্যবস্থা

১৮৯৬এর ১২ জুন এক আইনের বলে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অসামরিক সরবরাহ ব্যবস্থার উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করল। তার অর্থ দাঁড়াল গ্রামাঞ্চলে মজুত শস্যের উপর নিয়ন্ত্রণ; সেইসব শস্যভাণ্ডার থেকে নেওয়া ঋণের উপর নিয়ন্ত্রণ; অতিরিক্ত সরবরাহ ক্রয় করার উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।[৪]

(৫) কৃষিব্যবস্থায় সাহায্য

কৃষিব্যবস্থা আগে ছিল স্থানীয় সরকারের তদারকির বিষয়বস্তু। এখন তা রূপান্তরিত হল প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন কর্মক্ষেত্র এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চলে গেলেন প্রাদেশিক কৃষিসংক্রান্ত কমিটি ও কৃষিসংক্রান্ত ইনস্পেক্টরেটের অধীনে। ১৯০০এর ২৯ জুন এক আইন পাশ করে একটি বিশেষ তহবিল সৃষ্টি করা হল—কৃষির বড়রকম উন্নতিবিধানের জন্য।[৫]

(৬) পশু চিকিৎসা-সংক্রান্ত ব্যবস্থা

১৯০২এর ১২ জুন একটি আইন পাশ করে, ১৮৭৯এর ৩ জুনের আইনের পরিবর্তন করা হল। বলা হল রোগগ্রস্ত গবাদি পশুদের তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলতে হবে এবং গরু বেচাকেনা যে ব্যবসায়ী করেন, রোগগ্রস্ত গবাদি পশু যেসব চাষীরা মেরে ফেললেন, তাঁদের একটা ক্ষতিপূরণ দিতে তাঁরা বাধ্য থাকবেন।[৬]

জনসাধারণকে সাহায্যদান

এখন থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ সক্রিয় ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশাসকরা জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম করতে শুরু করলেন। ১৮৯৩তে একটি কেন্দ্রীয় কমিশন অনুসন্ধান করে। নিঃসঙ্কোচে সুপারিশ করলেন যে জনসাধারণকে সাহায্যদানের সমগ্র ব্যবস্থাটি থাকা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে, স্থানীয় সরকারদের ভূমিকা থাকা উচিত নামমাত্র।[৭]

খ) স্থানীয় সরকার

(১) প্রশাসনিক পরিস্থিতি

জেমস্তভা বা নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব চেপে বসায়, অনেকগুলি ক্ষেত্রেই তার ছাপ পড়ল। এইসব স্থানীয় সরকারগুলি নির্বাচিত করতেন স্থানীয় করদাতারা ও সম্পত্তির মালিকরা এবং সেই সরকারগুলিই এতদিন পূর্বে বর্ণিত কাজকর্মগুলি দেখাশুনো করত।

১৮৯০এর একটি আইনের জোরে জেমস্তভা বা স্থানীয় সরকারদের আরও মোক্ষমভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের স্থানীয় প্রতিনিধি প্রাদেশিক গভর্ণরদের এখন স্থানীয় সরকারের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করার আইনী সুযোগ বহু পরিমাণে বেড়ে গেল। অন্যান্য প্রশাসক ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষর কাছে স্থানীয় সরকারদের আবেদনপত্রগুলিও এখন পরীক্ষা করে দেখতে লাগল একটি নতুন সংস্থা—প্রাদেশিক বোর্ড, যেগুলিতে প্রাধান্য ছিল কেন্দ্রীয় প্রশাসকদেরই।

জেমস্তভা এতদিন নির্বাচন করতেন স্থানীয় শান্তিরক্ষক বিচারকদের। এই পদগুলি বিলুপ্ত করে স্থানীয় সরকারদের ক্ষমতা আরও অনেক কমিয়ে দেওয়া হল। তাদের স্থানে এলেন জমির ক্যাপ্টেন—যাঁরা সবাই ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত। স্থানীয় সরকারদের ইতিপূর্বেই পুলিশী

ব্যবস্থার উপর আর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসকরা তাঁদের সঙ্গে কোনও শলা-পরামর্শ করতেন না বললেই চলে। আর এই নতুন পদক্ষেপের ফলে তাদের ক্ষমতা আরো হ্রাস পেল।[৮]

(২) আর্থ-ব্যবস্থা

এতদিন স্থানীয়ভাবে কর বিতরণের প্রায় পূর্ণ স্বাধীন অধিকার ছিল স্থানীয় সরকারদেরই। প্রশাসকরা এবার তারও অবসান ঘটালেন।

এদিকে তাঁদের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ১৮৯৫এ পাশ করা গ্রামাঞ্চলে রাস্তা তৈরীর জন্য আইন মুতাবেক সংরক্ষণ তহবিল সৃষ্টি। আইন করে আরও বলা হল যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষর হাতে একটা ভ্রাম্যমান তহবিল থাকবে, তাৎক্ষণিক খবরের জন্য, কিন্তু তা কিভাবে খরচ করা যাবে, তা স্থির করবে কেন্দ্রীয় আইন। একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বলা হল যে, এখন থেকে স্থানীয় সরকারের সমস্ত টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারের স্থানীয় শাখাতে জমা রাখতে হবে। ফলে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের ইচ্ছামত এই তহবিল ব্যবহার করা বন্ধ হয়ে গেল।

১৮৯৪ ও ১৯০০তে দুটি আইন পাশ করে কর কিভাবে স্থির করা বা বাড়ানো হবে, তা বেঁধে দেওয়া হল। ১৮৯৪ পর্যন্ত জেমস্তভাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল জমি ও বনজঙ্গলের উপর কিভাবে কর স্থির করবে, তার সিদ্ধান্ত করার। এগুলিই ছিল তাদের আয়ের প্রধান উৎস। ১৮৯৪এর আইনে প্রাদেশিক পরিসংখ্যান কমিটি গঠন করে তাদের উপরই ভার দেওয়া হল সম্পত্তির "আয়" ও "মূল্য" নির্ধারণ করার। আর কমিটিগুলিতে প্রাধান্য রইল কেন্দ্রীয় প্রশাসকদেরই। তবে করের বোঝা যাতে অত্যধিক বেশী না হয়, তার জন্য ১৯০০তে বেঁধে দেওয়া হল যে স্থানীয় সরকারের আগের বছরের করের চেয়ে এ-বছরে একটা নির্দিষ্ট সীমার উপরে কর বাড়ানো যাবে না। সেই সীমা অতিক্রম করা যেত একমাত্র কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের অনুমতিক্রমে।[৯]

সরকারী মনোভাব

পর পর কয়েকজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এইসব নীতিকে সোৎসাহী সমর্থন জানালেন: ডি. এন. টলস্টয়, আই. এল. গোরেমোকিন, ডি. এস. সিপিয়াগিন ও ভি. কে. প্লেভে। তা ছাড়াও এইসব পদক্ষেপকে দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছিলেন উচ্চপদস্থ ধর্মীয় নেতা কে. পোবেডোনস্টেভ যিনি ছিলেন

তৃতীয় আলেকজান্দার ও দ্বিতীয় নিকোলাসের একজন প্রধান পরামর্শদাতা। আর ছিলেন অর্থ মন্ত্রকের এস. ইউ. উইটে।

এইসব নীতি বহু ক্ষেত্রেই উৎসারিত হয়েছিল নির্বাচিত আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসিত সরকারের প্রতি গভীর অনীহা থেকে। পোবেডোনস্টেভ অবশ্য নির্বাচিত সরকারি সংস্থার পক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে একমাত্র তবেই জনসেবার কাজে "কিছুটা স্বাধীনতা" ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব। আর প্রশাসনে নানান ধরনের সংস্থা থাকায় যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল, উইটে প্রধানতঃ তারই বিরোধী ছিলেন। কিন্তু দু'জনেই নীতিগতভাবে ঐসব সংস্থাদের আরও স্বাতন্ত্র দিতে মোটেই সম্মত ছিলেন না। আর একই ধরনের মত পোষণ করতেন ডি. এন. টলস্টয়ের মত প্রশাসক এবং এম. এন. কাটকভ ও ভি. পি. মেশ্বেরেস্কির মত প্রভাবশালী প্রচারকরাও।[১০]

(ক) নিরাপত্তার প্রসঙ্গ

নিরাপত্তার প্রসঙ্গ জোরালোভাবে প্রভাবিত করেছে সরকারি নীতিকে। ১৮৭৭ থেকে **নারোদনিয়া ভলইয়া** যে সন্ত্রাসবাদের তরঙ্গদেশে প্রবাহিত করেছিল, তার আগে পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ডাক্তার, শিক্ষক ও আঞ্চলিক প্রশাসক হিসাবে ব্যাপকভাবে কাজে নিযুক্ত ছিলেন বহু বিপ্লবী। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ১৮৮১তে দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যা করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

আঞ্চলিক সরকারে প্রভাবশালী "উদারপন্থীরা" (যেমন এফ. আই. রোভিচেভ ও আই. আই. পেট্রুঙ্কেভিচ) সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিঃশর্ত সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিলেন। পয়লা মার্চে সম্রাটকে হত্যা করার ব্যাপারেও অনেকে কোনও মন্তব্য করেন নি। নারোদনিকের মুখপাত্র এল. এন. টিখোমিরভ তাঁর জনপ্রিয় পুস্তিকাগুলিতে এইসব কথা জোর দিয়ে প্রচার করেছিলেন। তাই "রক্ষণশীলদের" প্রায় সকলেরই মত ছিল যে গ্রামাঞ্চলের সরকার ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিপ্লবীদের ও রাজদ্রোহের আড্ডায় পরিণত হয়েছে।[১১]

(খ) জনসেবামূলক কাজের সীমাবদ্ধতা

জীবনবীমা, অসামরিক সরবরাহ ও কৃষিকার্যে সহায়তা অন্য কারণেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সরকারি তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছিল যে এক জেলা থেকে অপর জেলায় জনসেবামূলক কাজের যথেষ্ট বৈষম্য ঘটছিল। তদুপরি আঞ্চলিক সরকারদের বীমা-ব্যবস্থায় পরিচালনায় অব্যবস্থা

ও বেসরকারি বীমা কোম্পানীদের সদস্যদের দুর্নীতি, প্রশাসকদের নজরে এসেছিল।

১৮৯১-৯২এর দুর্ভিক্ষ প্রমাণ করল যে খাদ্যশস্য মজুত রাখার জন্য ভার-প্রাপ্ত অধঃস্তন কর্মচারীদের উপর আঞ্চলিক সরকারদের নিয়ন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত ঢিলেঢালা।[১২] আর গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে আসা বহুসংখ্যক আবেদনপত্র দেখাল যে কৃষিব্যবস্থার সংকটে সরকারি সাহায্য কত অপ্রতুল ও সরকারি সাহায্য কত অকিঞ্চিতকর।[১৩]

প্রশাসকদের একাংশের মত ছিল যে এইরকম জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। তাঁরা বলতেন যে প্রজারা এই ধরনের হস্তক্ষেপ অবশ্যই প্রত্যাশা করতে পারে। ১৮৯৩এর এই কমিশনে এই ধরনের আলোচনা করা হয় এবং গরীবদের যত্ন নেবার ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়।[১৪]

নীতিগতভাবে এটা মানা হলেও বলা হয় যে বাস্তবে এত সর্বব্যাপী জন-সেবার সংগঠন গড়ে তোলা সরকারের পক্ষে অসম্ভব। অর্থমন্ত্রী উইটে বলেন যে "দেশের দাবী অসংখ্য কিন্তু তা মেটাবার উপায় সীমাবদ্ধ।" তিনি সাবধান করে বলেন যে বুঝেশুনে এ ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত।[১৫]

(গ) আঞ্চলিক সরকারের অর্থকরী সমস্যা

এই সাবধানবাণীর ভিত্তিতেই আঞ্চলিক সরকারের অর্থকরী ব্যবস্থা সম্বন্ধে নতুন আইন প্রণয়ন করা হল। ১৮৯৪ ও ১৯০০এর আইনে আঞ্চলিক করের হার ও স্থানীয় সরকারের ব্যয়বরাদ্ধ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। আঞ্চলিক সরকাররা আরও অর্থ দাবী করায় প্রশাসকরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তাছাড়া অনেক জেলাতে করভারের অত্যধিক চাপ দেখেও তাঁরা চিন্তিত ছিলেন। ১৮৯৪-তে "আয়" ও "সম্পত্তির দাম" সঠিকভাবে স্থির করার জন্য যে আইন গৃহীত হল, বেশী ভরতুকি বা ধার না দিয়েও তাতেই সমস্যার সমাধান হবে মনে করা হল। আর ১৯০০এর আইনে স্থানীয় অর্থব্যবস্থার বৃদ্ধির উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ চালু করা হল।

জেমস্তভা বা আঞ্চলিক সরকারের গঠনপ্রকৃতিই এই ধরনের উদ্বেগের কারণ ছিল। প্রশাসকদের মতে নির্বাচিত আঞ্চলিক সরকারের কাঠামো ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ ও অর্থের অপচয় ছিল প্রায় অবধারিত। ১৮৯৪-তে করব্যবস্থার পরিচালক এন. এম. কুটলার অভিযোগ করলেন যে :

"আঞ্চলিক সরকারি উদ্যোগের অস্থিতিশীলতার প্রধান কারণ

আইনসভার নতুন সদস্যরা বহুক্ষেত্রেই পুরানো সদস্যদের আঞ্চলিক সরকারের প্রয়োজন সম্বন্ধে মূল্যায়ণের থেকে ভিন্নতর মত পোষণ করতেন।”

অর্থমন্ত্রকের পদস্থ কর্মচারীরা মনে করতেন যে স্থানীয় অর্থব্যবস্থার উপর কঠোর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই একমাত্র অর্থের অপ্রতুলতা ও করভারের চাপের সমস্যার সমাধান সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই রচিত হয়েছিল ১৮০৪ ও ১৯০০এর আইন দুটি। রাষ্ট্রীয় আইন পরিষদে মত প্রকাশিত হয়েছিল যে ঃ

“জেমস্তভাদের কাজকর্ম নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী করতে হবে; সেই কর্মসূচী অনুযায়ী করতে হবে; সেই কর্মসূচীর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বাঁধা থাকবে এবং তা করা হবে গৃহীত আইনকানুন অনুযায়ী।”[১৬]

(ঘ) প্রশাসক নিয়োগ প্রসঙ্গ

নতুন কেন্দ্রীয় আইনসমূহকে কার্যকরী করার চেষ্টা করা হল অভিজাত ভূস্বামীদের ও সরকারী পরিদর্শনের উপর নির্ভর করে। বিশেষত নিয়োগ সন্দেহর চোখে দেখা হল, কারণ আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা ছিলেন রাজ-নৈতিকভাবে সন্দেহভাজন ব্যক্তি, অথবা মনে করা হত যে তাঁরা স্থানীয় রীতিনীতি ও মেজাজ সম্বন্ধে অজ্ঞ হবেন।

এ. ডি. পাজুখিন ও এস. এম. বেথ্‌তিদের উৎসাহী সমর্থন পেয়ে, কাউণ্ট ডি. এন. টলস্টয় ও তাঁর সমর্থকরা ১৮৯০এর আইনে নির্বাচিত আঞ্চলিক সরকারে অভিজাতদেরই প্রাধান্য দিলেন। তাছাড়া গ্রাম-ভিত্তিতে তাঁরা জমির ক্যাপ্টেন নিয়োগ করলেন, স্থানীয় ভূস্বামীদের মধ্য থেকেই (১৮৮৯)। এঁরা কৃষক অঞ্চলে ব্যাপক প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ১৮৮৫-তে (অভিজাতদের জন্য যে সনদ দিয়েছিলেন দ্বিতীয় ক্যাথারিণ তার শতবার্ষিকীতে) যেসব মতবাদ প্রাধান্য পায় তার ভিত্তি ছিল এই বিশ্বাস যে অন্য “সম্পত্তির মালিক” বা “করদাতাদের” চেয়ে অভিজাত ভূস্বামীরা রাজনৈতিকভাবে ঢের বেশী নির্ভরযোগ্য শ্রেণী। তাই তাদের মতামতকেই আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও সরকারের প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

এই ধরনের কর্মচারী ব্যাপকভাবে নিয়োগ করলে প্রাদেশিক শাসন অনেক ভালভাবে চলবে মনে করা হল। জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানদেরও পুনর্গঠিত করা সম্ভব মনে করা হল।[১৭]

নতুন নীতির সমালোচকরা

(ক) দৃষ্টিভঙ্গী

উদারপন্থী সংবাদপত্রসমূহে এইসব সংস্কারের তীব্র সমালোচনা করা হ'ল রুশকায়া মিস্‌লে প্রশ্ন তোলা হল যে অভিজাত ভূস্বামীরা শ্রেণী হিসাবে আদৌ নির্ভরযোগ্য কিনা। তার থেকেই প্রশ্ন উঠল যে তাদের উপর নির্ভরশীল প্রশাসনিক সংস্থাগুলিও নির্ভরযোগ্য কিনা। বলা হল ভূস্বামীরা ব্যক্তিস্বার্থ ও পারিবারিক স্বার্থ নিয়েই ডুবে থাকেন। বলা হল যে সবশ্রেণী মিলিয়েই যেখানে নির্বাচকমণ্ডলী, সেখানে এরকম একচক্ষু পদক্ষেপ ভ্রান্তিকর।

আরও প্রগতিশীল পত্রিকা ভেস্তনিক ইয়েভ্রোপিতে কে. কে. আরসেনেভ জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গৃহীত আইনসমূহের ঘোরতর সমালোচনা করলেন। বীমা ও কৃষির ক্ষেত্রে নতুন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার কোনও কারণ তিনি দেখতে পেলেন না, কারণ প্রাদেশিক গভর্ণররা ইতিপূর্বেই সে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। জনসেবায় তহবিলের ক্ষেত্রে আইন ছিল একেবারেই অর্থহীন, কেননা একদিকে বলা হচ্ছে যে টাকার প্রধানতঃ ব্যবস্থা করবে আঞ্চলিক সরকার এবং বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় অর্থ-বরাদ্দ খুবই কম থাকবে। আরসেনেভ লিখলেন যে জনকল্যাণের জন্য কোন সামাজিক সংস্থা কি কাজ করছে, তা বিচার করে, তারপরই কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়া উচিত।

সরকারি নীতির অন্যান্য সমালোচনা ছিল এই ধরনের :

(ক) অসামরিক সরবরাহ

অসামরিক সরবরাহর উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে যুক্তি ছিল এই যে জেমস্তভারা নীচের তলার সংস্থাদের যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কিন্তু এরকম তদারকি কোনও সংস্থাই ছিল না, তাই জেমস্তভাদের দোষ দেওয়া যায় কি করে? নতুন সংস্কারে প্রশাসনের কি উন্নতি হল তাও ঠিক বোঝা গেল না।

(খ) জনস্বাস্থ্য

নতুন আইনে বরঞ্চ বড় হাসপাতালগুলির পরিচালনায় অব্যবস্থা বৃদ্ধিই করা হল। সরকার কোনও নতুন অর্থ সাহায্য দিলেন না। স্থানীয় সরকারের তহবিলেই হাসপাতালগুলি চলতে থাকল। ফলে এই সংস্কারের মানে কি ঠিক বোঝা গেল না।

(গ) স্থানীয় অর্থব্যবস্থা

১৯০০তে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ করে, সবচেয়ে পেছিয়ে পড়া জেমস্তভাগুলির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হল, কারণ তারা তখন সবে নতুন সংস্কারকার্যে হাত লাগিয়েছিল।[১৮]

ফলাফল

কে. কে. আরসেনেভ ও তাঁর সমমতাবলম্বীরা ছিলেন অনেকগুলি স্থানীয় সরকারী সংগঠনে প্রভাবশালী উদারপন্থী গোষ্ঠী (যেমন মস্কো, ভ্লাদিমির, ইয়ারোস্লাভ প্রভৃতি)। তার ফলে তাঁদের সমালোচনাকে ভিত্তি করেই সেণ্ট পিটার্সবুর্গে জেমস্তভাদের আবেদনপত্রগুলি রচিত ও প্রেরিত হতে লাগল। আবার রাজধানীতে মন্ত্রীসভার অন্তর্দ্বন্দ্বে এই আবেদনপত্রগুলি ব্যবহৃত হল হাতিয়ার হিসাবে। উদারপন্থীরা তখন প্রভাবশালী ইম্পিরিয়াল ফ্রী ইকনমিক সোসাইটি, মস্কো ও সেণ্ট পিটারসবুর্গের সাক্ষরতা কমিটি ও বহু কৃষি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন। ফলে তাঁদের সমালোচনার প্রভাবও যথেষ্ট বেশী অনুভূত হল। পেশাদার সংগঠনদের (যেমন পিরভগ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন) সঙ্গে উদারপন্থীদের নিবিড় সংযোগের ফলে তাদের সম্মিলিত বিরোধিতা প্রবলভাবে অনুভূত হল।[১৯]

সংবাদপত্রে সমালোচনা, আবেদনপত্র ও মন্ত্রিসভাতে দলাদলি শেষপর্যন্ত হাসপাতাল ও পশুচিকিৎসা সংক্রান্ত আইনগুলিকে কার্যকরী হতে দিল না। তবে এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রশমিত করতে পারল না। কারণ জনকল্যাণের খাতে কোনও নতুন অর্থ বিনিয়োগ বা নতুন পরিকল্পনা দেখতে পাওয়া গেল না। আর এর প্রভাব সবচেয়ে তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হল ১৯০৪-০৫এর বিপ্লবী আন্দোলনে।[২০]

সূত্রনির্দেশ

১ বি. বি. ভেসেলভ্স্কি : "ইস্তোরিয়া জেমস্তভা জা সোরোক লেট" (এস. পি. বি. ১৯০৯) প্রথম খণ্ড

২ এন. ফ্রিডেন : "রাসিয়ান ফিজিশিয়ানস ইন এ্যান এরা অব রিফর্ম অ্যাণ্ড রেভল্যুশন (প্রিন্সটন, ১৯৮১)

৩ "ভেস্তনিক এভ্রোপি", অক্টোবর, ১৮৯৪

৪ বি. বি. ভেসেলভ্স্কি, পূর্বোদ্ধৃত, দ্বিতীয় খণ্ড

৫ "রুশকায়া মিস্‌ল", ১৮৯১, নং ৬

৬ বি. বি. ভেসেলভ্স্কি : পূর্বোদ্ধৃত, ২য় খণ্ড

৭ "ভেস্তনিক এভ্রোপি", আগস্ট/সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

৮ এইসব পরিবর্তনের সবচেয়ে ভাল বিবরণ পাওয়া যাবে পি. এ. জাইনচকভ্স্কির "রসিকো সামোদারজাভি ভি কন্‌ৎস ১৯ স্তোলেটিয়া", (মস্কো, ১৯৭০)

৯ বি. বি. ভেসেলভ্স্কি : পূর্বোদ্ধৃত, প্রথম খণ্ড

১০ এই সময়ে সরকারী মনোভাব কি ছিল, তার সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল আলোচনা রয়েছে টি. এস. পিয়ারসনের "রাশিয়ান অফিসিয়ালিজম ইন ক্রাইসিস", (কেমব্রিজ, ১৯৮৯) গ্রন্থে

১১ ভি. পি. মেশ্চেরস্কি : "মাই ভোস্পোমিনানিয়া" (এস. পি. বি. ১৮৯৭-১৯১২) এবং এল. এ. টিখোমিরভ : "লিবারেলি ই টেররিস্তি" (মস্কো ১৮৯২)

১২ "দি ফেমিন ইন রাশিয়া ১৮৯১-৯২", (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৫)

১৩ এ. এম. অ্যানফিমভ : "ইকনমিকচেস্কো পোলোজেনি ই ক্লাসোভায়া বোরবা ক্রেস্ত ইয়ান ভি এভপ্রেস্কোয়া রেসি" (মস্কো, ১৯৮৪)

১৪ "ভেস্তনিক এভ্রোপি", আগস্ট/সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

১৫ টি. এইচ. ভন লুয়ে : সার্জি উইটে অ্যাণ্ড দি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজেশন অব রাশিয়া

১৬ বি. বি. ভেসেলভ্স্কি : পূর্বোদ্ধৃত, প্রথম খণ্ড, এবং "মিনিস্তারস্ত্ভো ফিনান্সভ" (এস. পি. বি. ১৯০২)

১৭ টি. পিয়ারসন : পূর্বোদ্ধৃত এবং পি. এ. জায়োনোচভ্স্কি : পূর্বোদ্ধৃত

১৮ উপরে উদ্ধৃত "ভেস্তনিক এভ্রোপি" ও "রুশকায়া মিসল্"-এর প্রবন্ধগুলি থেকে উদারপন্থী সমালোচনার ধারা বুঝতে পারা যায়। অর্থনৈতিক পদক্ষেপের সমালোচনা পাওয়া যাবে বি. বি. ভেসেলভ্স্কি ও জেড. জি. ফ্রেস্কেল (সম্পাদিত) "ইয়ুবিলেনি জেমস্কি স্বোর্নিক" (এস. পি. বি. ১৯১৪) গ্রন্থে

১৯ এম. এম. পিরুমোভা : "জেমস্কো, লিবারেল নো ভিজেনি" (মস্কো ১৯৭৭)

২০ বি. বি. ভেসেলভ্স্কি : "ইস্তোরিয়া" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

ইংরেজী থেকে বঙ্গানুবাদ : গৌতম চট্টোপাধ্যায়

খরোষ্ঠী লিপির আলোকে চন্দ্রকেতুগড়

গৌরীশংকর দে

খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে ইরানের হখামনীষীয় বংশের রাজগণ বর্তমান পাকিস্তানের অনেক অংশে অধিকার স্থাপন করেন। সম্রাট কাইরস (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮—৫৩০) সিন্ধুনদের পশ্চিম দিকে অবস্থিত কতকগুলি জাতির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[১] পরে সম্রাট দারিয়স (খ্রীঃ পূঃ ৫২২—৪৮৬) গন্ধার এবং হিন্দু (সিন্ধু অর্থাৎ সিন্ধুনদের তীরবর্তী দেশ) অধিকার করেন।[২] এই সময় থেকে প্রায় দু'শ বৎসর উপরোক্ত অঞ্চল ছিল ইরানের অধিকারে।

ইরানের হখামনীষীর বংশের রাজগণের দরবারী ভাষা ও লিপি ছিল আরামায়িক।[৩] শাসন সূত্রে ভারতে ইরান অধিকৃত অঞ্চলে আরামায়িক বর্ণমালার ব্যবহার প্রচলিত হয়।[৪] ভারতের অন্যতম প্রধান লিপি খরোষ্ঠী হল এদেশের হখামনীষীয় অধিকৃত অঞ্চলে প্রচলিত আরামায়িকের বিবর্তিত রূপ।[৫] পরবর্তীকালে মৌর্য সম্রাটগণও খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহার করেছেন। খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতকে প্রিয়দর্শী অশোক ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁর গিরিশাসনগুলিতে এই লিপির ব্যবহার করেন। এর উদাহরণ, মানসেহরা (হাজারা জেলা, পাকিস্তান) ও শাহবাজগঢ়ী (পেশোয়ার জেলা, পাকিস্তান)-তে প্রাপ্ত লেখ।[৬] সংস্কৃত ভাষার পক্ষে অনুপযোগী বলে খরোষ্ঠী লিপি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে ও মধ্য এশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। ভারতে এই লিপি প্রচলিত ছিল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত।

খরোষ্ঠী (১৯৮১ সাল পর্যন্ত 'খরোষ্ঠী' এই বানান লেখা হত, কিন্তু এই বানান অশুদ্ধ)[৭] লিপির উদ্ভব ইরানীয় সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে। হখামনীষীয় শাসকদের শাসনব্যবস্থার সুবিধার্থে এই লিপির প্রচলন। তবে এই লিপি সম্রাট ও তাঁর অধীনস্থ রাজপুরুষদের কাজেই যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়; জনসাধারণও নানা প্রয়োজনে এই লিপি ব্যবহার করত। এমন কি খরোষ্ঠী লিপিতে ধর্মগ্রন্থ পর্যন্ত রচিত হয়েছিল।

ইতিহাস বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়, হাবড়া

প্রাচীন ভারতের প্রধানতম লিপি ব্রাহ্মী। ব্রাহ্মী ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত দেশীয় বর্ণমালার আদি জননী, যার অন্যতম কন্যা বঙ্গলিপি। প্রাচীন যুগের আরেকটি প্রধান লিপি খরোষ্ঠী। ব্রাহ্মীর মতো গুরুত্ব অর্জন না করলেও খরোষ্ঠী লিপির নিজস্ব অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়। মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারের মূল্যবান মাধ্যম ছিল খরোষ্ঠী। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন সময়ে বণিক, বৌদ্ধ শ্রমণ, ভারতীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত বহু মানুষ খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহার করতেন। মধ্য এশিয়ার এরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অঞ্চল হল :

চীনের অন্তর্গত সিনকিয়াং প্রদেশের খোটান (খ্রীঃ পূঃ বা খ্রীঃ প্রথম শতক ও তৃতীয়-চতুর্থ শতক), লপ-নরের উত্তরে প্রাচীন শান শান রাজ্যের এলাকা (খ্রীঃ তৃতীয়-চতুর্থ শতক), ও এই প্রদেশের উত্তরাংশে কিছু প্রাচীন বসতি (খ্রীঃ সপ্তম শতক), এবং সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার কিছু অঞ্চল (খ্রীঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক)।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ব্যবহৃত লিপি ছিল খরোষ্ঠী আর ভাষা ছিল গান্ধারী প্রাকৃত। খননের মাধ্যমে খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা বিভিন্ন লেখ পাওয়া গেছে প্রধানতঃ পূর্ব আফগানিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কেবল মথুরা ও পাটনা অঞ্চলের কুমারহারে খরোষ্ঠী লিপির সামান্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। কুমারহারে এক প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত একটি পোড়া মাটির ফলকে প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের একটি খরোষ্ঠী এবং সম্ভবত একটি ব্রাহ্মী লেখ দেখা যায়। ভারত উপমহা-দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অর্থাৎ যে অঞ্চল ছিল খরোষ্ঠী বর্ণমালার ব্যবহারের প্রধান কেন্দ্র তার থেকে বহু দূরে পূর্ব ভারতের একটি অঞ্চলে দীর্ঘকাল এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল পণ্ডিতদের নিকটে অজ্ঞাত, তাঁদের কল্পনার অতীত।

পণ্ডিতদের প্রচলিত ধারণাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিল ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে বর্তমান লেখক কর্তৃক আবিষ্কৃত অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, যাকে বলা যায় 'পাথুরে প্রমাণ।'

চন্দ্রকেতুগড়ের প্রাচীন নগর-প্রাচীর সংলগ্ন গ্রাম হাদিপুরে একটি পুরাতন পুষ্করিনী সংস্কারকালে প্রায় পনেরো ফুট গভীর মৃত্তিকাতল থেকে উঠে আসে বেশ কিছুসংখ্যক বিচিত্র ছোট-বড়ো মৃৎপাত্র। এর আগেও চন্দ্রকেতুগড়ের বিভিন্ন অংশ থেকে মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। কিন্তু আগেকার পাত্রগুলি থেকে এই পাত্রগুলি গুরুত্বের দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। পাত্রগুলি সংক্ষিপ্ত লিপি-সম্বলিত। লিপিযুক্ত দুটি ঘট পুস্তক-ব্যবসায়ী বন্ধু নরেন্দ্র কুমার নাথকে দেখাই।

তিনি ব্যবসায়ের ফাঁকে-ফাঁকে সখ হিসেবে প্রাচীন লিপির চর্চা করে থাকেন। আমার সংগৃহীত ঘট দু'টির লিপি দেখে তিনি বললেন, এই লিপি সম্ভবত খরোষ্ঠী। আমার কাছে খরোষ্ঠী লিপি সংক্রান্ত যে দু-একখানা বই ছিল তাতে প্রদর্শিত লিপি দেখে আমারও তা-ই মনে হল। এর পরে চন্দ্রকেতুগড় থেকে আরও কিছু পাত্র ও সীল পেলাম ; এই সব পুরা-দ্রব্যের গায়েও একই ধরনের লিপি। কিছু অক্ষর পড়া গেলেও তার অর্থ বোধগম্য হল না।

আমরা সংগৃহীত পাত্রগুলির মধ্যে দুটি ক্ষুদ্র পাত্র বা ঘট নিয়ে দেখা করলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক ও খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পাত্রগুলি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত ও উত্তেজিত অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন পাত্রের লিপি অবশ্যই খরোষ্ঠী। কয়েক দিন পরে পরীক্ষা করে বললেন, দুটি পাত্রই কুষাণযুগে নির্মিত। একটি পাত্রের গায়ে লেখা আছে 'বপয়কোষ', অর্থাৎ এই পাত্রটি চাষীদের বীজ রাখবার পাত্র। আরেকাটতে লেখা আছে 'পেয়দ', অর্থাৎ জলপান করার পাত্র। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় জানালেন, পাটনার পরে পূর্বভারতে এই প্রথম খরোষ্ঠী লিপির সন্ধান মিললো ; এ এক বড়ো রকমের আবিষ্কার এবং এর ফলে প্রাচীন বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে। বললেন, এই পাত্র দুটির গুরুত্ব অসাধারণ ; এদের 'জাতীয় গুরুত্ব' রয়েছে ; এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ব্যক্তিগত সংগ্রহে না রেখে ভারতীয় যাদুঘরে অর্পণ করা উচিত। তাহলেই অসাধারণ পুরাদ্রব্যগুলি সযত্নে সংরক্ষিত হবে ও দেশ-বিদেশের পণ্ডিতদের দৃষ্টিগোচর থাকবে। আমি তাঁর পরামর্শ অনুসারে পাত্র দুটি ভারতীয় যাদুঘরে হস্তান্তরিত করি। উক্ত পাত্র দুটি বর্তমানে ভারতীয় যাদুঘরের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮৯ সালের ৮ জুলাই তারিখের দি স্টেটসম্যান, ১৯৮৯, সালের ২ আগস্টের কলিকাতা পত্রিকা, ১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসের এশিয়াটিক সোসাইটির বুলেটিন, ২-১৬ সেপ্টেম্বর, '৮৯ তারিখের 'প্রতিক্ষণ', ২৭ অক্টোবর-২ নভেম্বর, ১৯৮৯ তারিখের 'পরিবর্তন' প্রভৃতি পত্রিকায় যে বিবরণ ও ফটো ছাপা হয় তার কল্যাণে লিপিযুক্ত উক্ত পাত্র দুটি আজ বিখ্যাত ও সুপরিচিত। অন্তত বাংলার গুরুত্ব সম্পর্কে যারা বিন্দুমাত্র সচেতন ও আগ্রহী তাঁদের কাছে।

উপরোক্ত পাত্র দুটি ছাড়া আরও প্রায় ৪০।৫০টি লিপিযুক্ত (খরোষ্ঠী) মৃৎপাত্র বর্তমান লেখক চন্দ্রকেতুগড় থেকে উদ্ধার করেছেন। সংগ্রহ করেছেন অসাধারণ কয়েকটি সীল (পোড়ামাটির)। এর একটি সীলে শস্যবাহী জাহাজ দৃশ্যমান ; কিনারায় খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ 'জলধি শকট'। এই

সীলটি প্রাচীনকালে বহির্ভারতে ভারতের শস্য প্রেরণ ও বাণিজ্যের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই বছর অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ৩০ মার্চ অতি গুরুত্বপূর্ণ এই সীল, যূপ চিহ্ন-অঙ্কিত ও লিপিযুক্ত আরেকটি সীল ও সাতাশটি লিপিযুক্ত মৃৎপাত্র বর্তমান লেখক ভারতীয় যাদুঘরে হস্তান্তরিত করেছেন, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শক্রমে। বর্তমান লেখক চন্দ্রকেতুগড় থেকে আরেকটি পোড়ামাটির সীল আবিষ্কার করেছেন যাকে অনন্য বললে ভুল বলা হয় না। পাশাখেলার ঘুটির মতো দেখতে এই সীলটির দুদিকে খরোষ্ঠী লিপি, আর চারদিকে চার রকম ছবি। একদিকে রয়েছে একটি গাছ যার দিকে ধাবমান আরোহীসহ দুটি ঘোড়া। আরোহীদ্বয় ঘোড়া দুটিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। এই ছবি ও তার পাশের লিখন থেকে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, ঘোড়াগুলিকে তালিম দেওয়া হচ্ছে। ভারতের বাইরে ঘোড়া আমদানী করে ও তালিম দিয়ে তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড়ের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ঘোড়া বাণিজ্যিক পণ্যরূপে প্রেরণ করা হত। আলোচ্য সীলমোহরটি তার অভ্রান্ত নিদর্শন। চন্দ্রকেতুগড় থেকে বেশ কিছুসংখ্যক ঘোড়া, আরোহীসমেত ঘোড়া প্রভৃতি প্রতিকৃতিসম্বলিত মৃৎফলক সংগ্রহ করেছি। এই নিদর্শগুলিও ইঙ্গিত করে যে প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ বন্দর চন্দ্রকেতুগড় ছিল ঘোড়ার ব্যবসায়ের অন্যতম কেন্দ্র। এর আগেও ঘোড়ার ছবিসমেত বহু মৃৎফলক চন্দ্রকেতুগড় থেকে আগে পাওয়া গেছে। কিন্তু দেবপ্রসাদ ঘোষ, কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ পুরাতাত্ত্বিকগণ এই ঘোড়াগুলিকে পৌরাণিক কাহিনী বা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[৮] কিছু মৃৎফলক যে বাস্তব অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে, বৈদেশিক বাণিজ্যের পণ্য রূপে যুক্ত এই অতি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য সর্বপ্রথম ধরা পড়ল ১৯৮৯ সালের গুরুত্বপূর্ণ পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে।

খরোষ্ঠী উৎকীর্ণ যে বিপুলসংখ্যক পুরাদ্রব্য পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গেছে তার একটি শুধু মেদিনীপুর জেলার পার্বতীপুরে (তমলুকের নিকটে) পাওয়া গেছে। বাকি সব পুরাদ্রব্য সংগৃহীত হয়েছে চন্দ্রকেতুগড় থেকে। চন্দ্রকেতুগড়ের লিপিযুক্ত অধিকাংশ পুরাদ্রব্য আবার বর্তমান লেখক কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত পুরাদ্রব্যের লিপির পাঠোদ্ধার ও তার ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়।[৯]

চন্দ্রকেতুগড়ের খরোষ্টী উৎকীর্ণ পাত্র, ফলক ও সীলগুলি চারশ্রেণীর ঃ

১) প্রথমশ্রেণীর পাত্র এবং সীল বিশুদ্ধ খরোষ্টী লিপিযুক্ত।

২) দ্বিতীয়শ্রেণীতে পড়ে সেই সব সীল যার গায়ে খরোষ্টীর পাশাপাশি

ব্রাহ্মী লিপি উৎকীর্ণ। ব্রাহ্মী ছাপ দিয়ে তোলা আর তার চারপাশে খরোষ্ঠী খুদে খুদে লেখা। অর্থাৎ ব্রাহ্মী লিপিযুক্ত সীলে খরোষ্ঠী পরে উৎকীর্ণ। এ থেকে অনুমান করা যায় ব্রাহ্মী প্রচলিত একটি এলাকায় খরোষ্ঠী প্রবর্তিত হয়েছিল। সীলের লিপিকরগণ খরোষ্ঠী জানত না, খরোষ্ঠী তাই খুদে খুদে লেখা। এইসব সীল তারাই ছাড়ত যারা খরোষ্ঠী জানত ও ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। খরোষ্ঠী ব্যবহারকারী এক প্রভাবশালী গোষ্ঠী উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে বাণিজ্যিক সূত্রে তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড়ে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। উর্বর ও শস্যসমৃদ্ধ দক্ষিণবঙ্গে তারা বড়-বড় কৃষিক্ষেত্র গড়ে তুলেছিল। তারা শস্য এবং ঘোড়ার বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। বিভিন্ন মৃৎপাত্র ও সীলের গায়ে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এইসব মানুষের নাম পর্যন্ত পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে কয়েকজন ইরানী বণিকের নাম। এই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অনেকে স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্ম-বিশ্বাস (ব্রাহ্মণ্য ও লৌকিক) ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। গুপ্তযুগ নাগাদ তারা স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এই মানুষেরাই তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড়ে খরোষ্ঠী লিপি আমদানী করেছিল।

৩) তৃতীয় শ্রেণীর প্রত্নদ্রব্য থেকেও একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। এই শ্রেণীর দ্রব্য হল কতগুলি সীল। এই সীলগুলির মূল ব্রাহ্মী লিখনের চারপাশের কথাগুলি ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী হরফে লেখা। এ হল মিশ্রলিপি তৈরীর সচেতন প্রচেষ্টার উদাহরণ।

৪) চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে কতগুলি সীল যাতে ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী মিশ্রলিপি ছাপ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা (উৎকীর্ণ করা নয়)। এইসব সীলের লিপিকরগণ ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী এই দু'রকম অক্ষরই জানত।

ব্রাহ্মী-অধ্যুষিত চন্দ্রকেতুগড়ে খরোষ্ঠী প্রবর্তিত হয়েছিল। খ্রীঃ প্রথম-তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতক পর্যন্ত এই অঞ্চলে এই ধরনের লিপি প্রচলিত ছিল। খরোষ্ঠী লিপির ভাষা ছিল পশ্চিমী প্রাকৃত। তবে অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত খরোষ্ঠী লিপির সঙ্গে চন্দ্রকেতুগড়ে প্রচলিত খরোষ্ঠী লিপির কিছু পার্থক্য দেখা যায়। দুই ভাষাভাষী অধিবাসীদের দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে হয়তো এই পার্থক্য ও নিজস্বতা এই অঞ্চলের লিপিতে এসেছিল। এখানকার খরোষ্ঠীতে পাঁচটি স্বরবর্ণই দেখা যায়, যা অন্যত্র দেখা যায় না।

পাত্র, ফলক ও সীলগুলিতে যেসব লেখা পাওয়া গেছে তার বিষয়বস্তু বিচিত্র। কৃষি উৎপাদন, বণিক সম্প্রদায়, ধর্ম, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, কৃষি ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, যাদু বিশ্বাস ইত্যাদি নানা বিষয় সংক্ষিপ্ত

লিপিগুলির বিষয়। অজ, হোন্দজাদ ইত্যাদি যেসব ব্যক্তির নাম পাওয়া গেছে তারা যে উত্তর-পশ্চিম ভারত বা ইরানের লোক তা সুস্পষ্ট। পাওয়া গেছে অন্তত তিনজন রাজার নাম। একটি সীলে খরোষ্টীতে লেখা আছে 'গণরন্ধ' যা এই অঞ্চলে গণরাজ্যের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দিচ্ছে।[১০] চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত মৃৎফলকে বিদেশী নর-নারীর প্রতিকৃতি ও তাদের পোশাক পরিচ্ছদ থেকেও এই অঞ্চলে পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীদের আগমনের তথ্যটি সমর্থিত।[১১] চন্দ্রকেতুগড়ের টেরাকোটায় যে গ্রীক ও রোমান প্রভাব দেখা যায় তা এসেছিল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে আগত বণিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে যারা সঙ্গে করে এনেছিল গান্ধার শিল্পরীতি। তারা নিজেদের মুদ্রাও সঙ্গে করে এনেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমান লেখক চন্দ্রকেতুগড় থেকে কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের একটি স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেছেন।[১২] চন্দ্রকেতুগড় থেকে যে অসংখ্য মিথুনফলক পাওয়া গেছে তাতে এমনসব মৈথুনরীতি পরিলক্ষিত হয় যা রীতিমতো অ-ভারতীয় ও নিঃসন্দেহে বিদেশী।[১৩]

চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত খরোষ্টী ও ব্রাহ্মী-খরোষ্টী লিপিসম্বলিত পাত্র, ফলক ও সীলসমূহ বাংলা তথা ভারতের প্রাক গুপ্তযুগের অমূল্য উপকরণ। জানা গেছে, কেবল ব্রাহ্মী নয়, খরোষ্টী ছিল বঙ্গলিপির জননী। আলোচ্য প্রত্ন-নিদর্শনাবলী প্রাচীন বাংলা তথা ভারতের সমাজ, অর্থনীতি, বিশেষত বাণিজ্য ও সংস্কৃতি, নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। নিদর্শনগুলি চন্দ্রকেতুগড় তথা ভারত-ইতিহাসে সংযোজিত করেছে নতুন এক মাত্রা ও তাৎপর্য।

সূত্রনির্দেশ

১ দি এজ অফ ইম্পিরিয়েল ইউনিটি : সাধারণ সম্পাদক : আর সি মজুমদার, বোম্বাই, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ ৩৯

২ তদেব, পৃ ৪০-৪১

৩ শিলালেখ—তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ : ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ ৪

৪ তদেব

৫ তদেব

৬ অশোকের বাণী : ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার : কলকাতা, ১৯৮১, পৃ ৪৩

৭ শক্তিরূপ—ভারতে ও মধ্য এশিয়ায় : ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ ৩৭

৮ ভারতীয় শিল্পধারা—প্রাচ্য ভারত ও বৃহত্তর ভারতে : দেবপ্রসাদ ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ ১৪

৯ এশিয়াটিক সোসাইটি, মান্থলি বুলেটিন, আগস্ট, ১৯৮৯

১০ সংগ্রহ : নরেন্দ্রকুমার নাথ, হাবড়া

১১ টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল : এস এস বিশ্বাস, দিল্লী, ১৯৮১, পৃ ১১৫-১১৬

১২ টু গোল্ড কয়েন্স ফ্রম চন্দ্রকেতুগড় : গৌরীশংকর দে, জার্নাল, নিউমিসমাটিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া. ভলিউম XLI, ১৯৭৯ ; চন্দ্রকেতুগড়ের মুদ্রা : গৌরীশংকর দে, ইতিহাস অনুসন্ধান ৪, পৃ ৯১-৯৫

১৩ চন্দ্রকেতুগড় ইরোটিকা : গৌরীশংকর দে, ১৯৮৯ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের গোরক্ষপুর অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ।

ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের আলোকে হিন্দু বিবাহ

চিরকিশোর ভাদুড়ি

বিবাহ অতি প্রাচীন কাল থেকে মানবসমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মহাভারতে বিবাহ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। আমরা বর্তমান সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের অনুশাসনকে অনুসরণ করে বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান আলোচনার চূড়ান্ত রূপ দেবার চেষ্টা করব।

আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে বৈদিক শাস্ত্র, বেদ পরবর্তী শাস্ত্র, অনুশাসন গ্রন্থগুলি, মহাকাব্য দুইটি এবং পুরাণগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র কথাটি খুবই নমনীয় চেহারা বুঝিয়ে থাকে এবং আমরা যে শাস্ত্রগুলির কথা বললাম সেইগুলি এক হয়ে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের রূপরেখা গঠন করে থাকে।

ঋগবেদের উল্লেখ করে আমরা বর্তমান প্রবন্ধের সুচনা করছি। ঋগবেদে হিন্দু বিবাহের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ওয়েস্টারমাক[১] মনে করেন মানব বিবাহ বানর জাতীয় পুর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে এসেছে।[২] নিজের লেখা মানব সভ্যতার[৩] ইতিহাস নামক গ্রন্থে বিবাহের উৎপত্তি এবং প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিশদভাবে তিনি আলোচনা করেছেন।

বিবাহ প্রসঙ্গে নিচের কথাগুলি আমরা অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করব।

জন্তু-জানোয়ারের মত মানুষেরও সুদুর প্রাচীন কাল থেকে যৌন সম্ভোগের বাসনা কখনও কম ছিল না। জীবজন্তুর থেকে মানুষ অনেক বেশী স্বার্থপর এবং বুদ্ধিমান বলে আবহমান কাল থেকে সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে নিজের সঙ্গিনী হিসেবে পেতে চেয়েছে। পরিণতিতে সংঘর্ষ এবং রক্তপাতের সঙ্গে সহাবস্থান করে মানুষকে সব সময় চলতে হয়েছে। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে যখন সমাজের একটা প্রাথমিক চেহারা রূপ নিল, তখন সমাজপতিরা বিবাহ সম্বন্ধে কিছু কিছু নিয়মকানুন তৈরী করার চেষ্টা করলেন। এই যুক্তির সমর্থনে মহাভারতে বিভিন্ন কাহিনী লিখিত আছে।

বিবাহ শব্দটি সংস্কৃত বি এবং বহ সহযোগে গঠিত হয়েছে। এই শব্দটির

অর্থ এই দাঁড়ায় যে স্বামী তাঁর স্ত্রীর ভরনপোষণ এবং নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। অবশ্য আজকের দিনের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে এই সংজ্ঞা আর গুরুত্ব পায় না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে ঋক অথবা অন্য কোন বেদে বিবাহের অনুশাসন কিংবা খুঁটিনাটি জানবার মত কোন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা হয় নি। এই কারণে আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রগুলির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হবে। স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে আট রকম বিবাহের সম্বন্ধে বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে।

এইবার আমরা বেদে আর্য বিবাহের সম্বন্ধে কি কি কথা বলা হয়েছে তা বুঝে নেবার চেষ্টা করব। ঋগবেদে[৪] বিমদ পুরামিত্রর মেয়েকে (খুব সম্ভবত অপহরণ করে) বিবাহ করেছিল বলা হয়েছে এবং পণ্ডিতেরা[৫] এই ব্যাপারটাকে রাক্ষস বিবাহের প্রাথমিক চেহারা বলে মনে করেন। ঋগবেদের বিবাহ সূক্ত পড়ে আমরা জানতে পারি যে সেই যুগেও পাণিগ্রহণ এবং সপ্তপদী হিন্দু বিবাহের দুটি অতি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হত। ওয়েস্টার মার্ক[৬] মনে করেন হস্তধারণ প্রাচীনকালে আর্য জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত হত। আবার পাশাপাশি আমরা এই কথাও মনে রাখব যে মনু দ্বিজের সবর্ণে বিবাহে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং বলেছেন দ্বিজের সবর্ণে বিবাহে পাণিগ্রহণ একটি বিশেষভাবে মেনে চলার বিষয়।[৭] তাহলে আমরা এই সমস্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ঋগবেদের যুগে দ্বিজের নিজ বর্ণে বিবাহ বিধিসম্মত বলে গণ্য করা হত। ঋগবেদের কথোপকথন সূক্তে[৮] (দশম মণ্ডল, দশম সূক্ত) ভাই এবং বোনের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার কোনরকম সম্ভাবনাকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে। এই সূক্ত পড়ে, যমীর নিজের ভাই যমের সঙ্গে যৌন মিলনে আবদ্ধ হবার প্রস্তাবকে গান্ধর্ব বিবাহ ঋগবেদের যুগে সবেমাত্র আকার নিচ্ছে এই ধারণা করলে বোধহয় অসমীচিন হয় না। বিবাহসূক্ত[৯] ঋগবেদের যুগে আর্যবিবাহে যৌতুক প্রথার অস্তিত্বের দাবীকে সমর্থন করে।

ঋগবেদে এক বিচিত্র বিবাহের উল্লেখ আছে। সেটি হল পুরুরবা এবং উর্বশীর বিবাহ-কাহিনী। সম্রাট পুরুরবা অপ্সরা উর্বশীকে কতকগুলি বিচিত্র শর্ত মেনে নিয়ে বিবাহ করেছিলেন। উর্বশী বেশ কয়েক বছর বিবাহিত জীবনযাপন করার পরে পুরুরবা বিবাহ সম্বন্ধীয় একটি শর্ত অমান্য করেছেন এই অজুহাতে পুরুরবাকে পরিত্যাগ করেন। আমরা সকলে নিশ্চয় জানি যে হিন্দু-বিবাহ কোনরকম শর্ত বা চুক্তি দ্বারা কোন সময়েই নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং

সেইজন্যে এই বিবাহকে চুক্তিবদ্ধ বিবাহ বলে পণ্ডিতেরা[১০] অভিহিত করেছেন। অবশ্য ডঃ হেরম্বচন্দ্র[১১] চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে ঋগবেদের সূক্তগুলি সম্পাদিত হওয়ার যুগে বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। কয়েকটি পুরাণেও[১২] উর্বশী-পুরুরবার উপরিলিখিত বিবাহ কাহিনীটি সন্নিবেশিত হয়েছে। অবশ্য এই উপাখ্যানটির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত সংশয় প্রকাশ করেছেন কেননা তাঁদের মতে পুরুরবা সুদূর অতীতের ভারতীয় নৃপতি হিসেবে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত হন নি বরঞ্চ, পুরুরবাকে তাঁরা[১৩] অর্ধ-কাল্পনিক নরপতি হিসেবে গণ্য করে থাকেন। কিন্তু যাস্কর নিরুক্ত উর্বশী-পুরুরবার উপাখ্যান যেভাবে বাণীবদ্ধ করেছে তার ফলে এবং মহাকাব্য ও পুরাণে রাজাদের বংশপঞ্জী যেভাবে লিখিত হয়েছে তাতে প্রতীতি হয় যে সম্রাট পুরুরবা, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব কিন্তু উর্বশীর সঙ্গে তাঁর তথাকথিত প্রেমকাহিনী কল্পনামাত্র। অধিকন্তু এই যুক্তিও দেখান হয়ে থাকে যে উর্বশী অপ্সরা বলে মানুষের নিয়মকানুনে নিয়ন্ত্রিত হতে পারেন না। কিন্তু এই ধরনের বিবাহ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে নিয়মিতভাবে বর্ণিত হতে থাকায় এই ধারণা হয় যে আজগুবি বা কল্পনা যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, এই ধরনের বিবাহের অস্তিত্ব প্রাচীন ভারতে ছিল। উদাহরণ হিসেবে আমরা মহাভারতে বর্ণিত গঙ্গাদেবীর সঙ্গে রাজা শান্তনুর বিবাহ কাহিনীর উল্লেখ করতে পারি।

পণ্ডিতদের[১৪] অনেকে মনে করে থাকেন বৈদিক ভারতে মেয়েরা বেশী বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতেন। বস্তুতপক্ষে, বেশী বয়স পর্যন্ত মেয়েদের অবিবাহিতা থাকার ঘটনা প্রাচীন ভারতে বেশী খুঁজে পাওয়া যেত না এবং বয়স্কা মেয়েদের অনূঢ়া থাকার কারণ পরবর্তী যুগে মনু এবং অন্যান্য স্মৃতিকারেরা ব্যাখ্যা করে বলেছেন। মনু এই বিধানও দিয়েছেন যে অনুপযুক্ত পাত্রের হাতে পড়ার চেয়ে যেকোন মেয়ের সারাজীবন অবিবাহিতা থাকাই ভাল। এই বিষয়ে আরও আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে করা যাবে।

এখন বৈদিক ভারতে শিশুবিবাহ প্রচলিত ছিল কিনা সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য উপস্থিত করা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েদের সুদীর্ঘকাল কুমারী থাকার কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা অবশ্যই ব্যতিক্রম। শিশুবিবাহ প্রায় সব স্মৃতিশাস্ত্রই সুপারিশ করেছে বলে মনে হয় বৈদিক যুগেও এই ধরনের বিবাহের প্রচলন ছিল। আমরা বিবাহ[১৫] সূক্তে কোন কোন পংক্তি পড়ে এই ধারণায় উপনীত হই যে নববিবাহিতা বধূ তাঁর স্বামীকে সঙ্গদান করছেন এবং

যে কারণে পণ্ডিতেরা[১৬] মনে করেন যে বৈদিক যুগের বধূরা পরিণত বয়স্কা হতেন এবং বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিবাহের প্রকৃত কাজ শুরু হয়ে যেত। আমরা অবশ্য সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাবে ঐসব পণ্ডিতদের বৈদিক যুগের পত্নীর বয়স্কা হওয়ার স্বপক্ষে কোন যুক্তি মেনে নিতে পারি না। অপরপক্ষে আমরা ঋগবেদে[১৭] ঘোষার বেশী বয়স পর্যন্ত পিত্রালয়ে অবিবাহিতা অবস্থায় বসবাস করার কথা জানতে পারি। এই বেদে আমরা এমন কিছু শ্লোকের সন্ধান পাই (কানে[১৮] মনে করেন) যেগুলি পড়ে আমাদের এই ধারণা হয় যে সেই যুগে নিজেদের স্বামী বেছে নেবার মত পরিণত বয়সে মেয়েদের বিবাহ হত। আবার ঋগবেদের[১৯] কোন কোন মন্ত্রে এমন ইঙ্গিতও করা হয়েছে যে অল্পবয়সেও মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হত। সব কিছু বিচার বিবেচনা করে আমরা কানের[২০] সঙ্গে এই বিষয়ে সহমত হতে পারি যে বৈদিক ভারতে অল্প এবং বেশী—এই দুই বয়সেরই মেয়েদের বিবাহ হত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েরা সারাজীবন কুমারী থেকে যেতেন।

ঠিক কবে বা কোন যুগ থেকে আর্যবিবাহ প্রচলিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। ওয়েস্টার মার্ক[২১] অবশ্য মানবজাতির মধ্যে সাধারণভাবে বিবাহের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

ঋগবেদের বিভিন্ন সূক্তে একবিবাহ[২২] এবং বহুবিবাহের[২৩] সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু বেদে মেয়েদের বহু স্বামী বরণের কোন উল্লেখ নেই। ঋগবেদের বিবাহ সূক্তে সেই সময়কার বিবাহের খুব সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। (যেমন, পাত্রের[২৪] শোভাযাত্রা সহ পাত্রীর বাড়ীতে বিয়ে করতে আসা, কন্যার[২৫] হস্ত ধারণ করে পাত্রের বিবাহের প্রকৃত উৎসবের সূচনা করা, শোভাযাত্রা[২৬] সহকারে নবপরিণীতা পত্নীকে নিয়ে স্বামীর নিজগৃহ অভিমুখে যাত্রা বধূর[২৭] হস্তে স্বামীগৃহের দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ এবং স্বামীর[২৮] আত্মীয়স্বজনের উপরে নিজের মধুর প্রভাব বিস্তারে বধূকে আহ্বান ইত্যাদি) উপরের বর্ণনা থেকে আমাদের মনে হয় হিন্দু বিবাহের মূল লক্ষণগুলি আর্য সভ্যতার শুরু থেকে অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে। বিবাহসূক্ত প্রাজাপত্য বিবাহকে চিহ্নিত করছে বলে মনে হয়। এই সূক্ত পড়ে আরও ধারণা হয় যে পাত্রপক্ষ দূরদেশ থেকে বিবাহ করতে এসেছে এবং কন্যার সঙ্গে তার কোন রক্ত-সম্বন্ধ নেই।

এই প্রসঙ্গে Vedie Index of Names and Subjects মাননীয়[২৯] সম্পাদকের এই উক্তি উধৃত করা অসমীচিন হবে না। বাবা মা অনেক সময়

পরিণত বয়স্ক ছেলে বা মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করতেন, অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ কোন ব্যক্তির মাধ্যমে হত, কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েদের বিক্রী করাও হত, যৌতুক দেওয়া হত এবং কন্যা অপহরণ করে বিবাহের উদাহরণও বিরল নয়।

অন্যদিকে, কানে[৩০] মনে করেন, বিবাহ সূক্তে ব্রাহ্ম বিবাহের নিদর্শন আছে, আবার এই বেদের ১.১০৯.২ অধ্যায়ে আসুর বিবাহের নজির মেলে। অন্যদিকে ঋগবেদের ১০.২৭.১২ এবং ১.১০৯.৫ অধ্যায়ে গান্ধর্ব বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এই বেদের ১০.৬১ অধ্যায়ে দৈব বিবাহের কিছুটা ইঙ্গিত আছে।

ঋগবেদের বিভিন্ন অধ্যায়ে বহুমূল্য বস্ত্র এবং অলঙ্কার কন্যাকে দেওয়া ছাড়াও পাত্রকে গোধন, এবং আরও অন্যান্য যৌতুক পাত্রীর পিতার পাত্র-পক্ষকে প্রদানের উল্লেখ আছে। কারণ পাত্রী যদি কোন রাজকন্যা হতেন, তাহলে সেক্ষেত্রে পাত্রপক্ষকে বহুমূল্য উপহার ছাড়াও বহুসংখ্যক রথ, অশ্ব ইত্যাদিও যৌতুক হিসাবে পাত্রের পিতাকে কন্যাপক্ষের তরফে প্রদানের উল্লেখ আছে। আমাদের মহাকাব্য, পুরাণ এবং অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন উদাহরণ থেকে যৌতুক প্রথার যুগে যুগে অস্তিত্বের প্রমান মেলে।

এই প্রসঙ্গে আমরা প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে আর্য বিবাহের রূপরেখা সম্বন্ধে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে দু'চার কথার অবতারণা করছি। স্মৃতিশাস্ত্র-গুলিতে অথবা মনুর বিধানে আট রকম বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল : (১) ব্রাহ্ম, (২) দৈব, (৩) আসুর, (৪) আর্স, (৫) গান্ধর্ব, (৬) রাক্ষস, (৭) প্রাজাপত্য এবং (৮) পৈশাচ। আমরা ইতিমধ্যে বৈদিক ভারতে এই আট রকমের বিবাহের প্রচলন ছিল কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

অবশ্য স্মৃতিশাস্ত্রে আর্য বিবাহের বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র এবং মানব ধর্মশাস্ত্রে হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। মনুর মতে, একজন দ্বিজ তাঁর বৈদিক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন শেষ করে গৃহে ফিরে এসে বিবাহ করবেন। বিবাহ করার পরে তাঁর গৃহস্থ জীবন শুরু হল বলে ধরে নেওয়া হবে।

বিবাহ সম্বন্ধে মনুর[৩১] বিধান হল, দ্বিজ এমন একজন রমণীকে বিবাহ করবেন যিনি মাতৃকুল কিংবা পিতৃকুল কোনদিকেই রক্ত সম্পর্কে যুক্ত হবেন না।

মনু প্রতিলোম বিবাহ অগ্রাহ্য করেছেন এবং মোটামুটিভাবে অনুলোম বিবাহ সমর্থন করেছেন।

ডঃ বার্নেট[৩২] মনে করেন আর্য বিবাহের মূল সূত্রই হল বর্ণের সমতা এবং গোত্র পার্থক্য।

আরও আলোচনা শুরু করার আগে ব্রাহ্মণগুলিতে এই বিষয়ে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে সংক্ষেপে সে সমস্ত কথা আলোচনা করা দরকার। ব্রাহ্মণ-গুলিতে ঐ আট প্রকার বিবাহের কয়েকটির অস্তিত্বের আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষত্রিয় রমণীদের স্বয়ম্বর প্রথার প্রতি আগ্রহের উল্লেখও করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে স্বয়ম্বর প্রথার অস্তিত্বের সন্ধান মধ্যযুগের মাঝামাঝিও ভারতে লক্ষ্য করা গিয়েছে। যাইহোক, ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় রমণীদের মধ্যে মিশ্রবিবাহ এবং উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে শূদ্র রমণীর অবৈধ মেলামেশার কথাও লিখিত আছে। এছাড়া এই শাস্ত্রে ঊর্বশী-পুরুরবার উপাখ্যান স্থান পেয়েছে।

মহাকাব্যের যুগে আর্য বিবাহের চেহারা কিরকম ছিল জানতে হলে আমাদের রামায়ণ এবং মহাভারতের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হবে।

মহাভারতে আমাদের বিবাহের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য মহাভারতে আলোচিত বিবাহ সংক্রান্ত বিধিগুলির সঙ্গে মানব ধর্মশাস্ত্রে উদ্ধৃত বিভিন্ন সুপারিশের অবিকল মিল লক্ষ্য করা যায়। এই মহাকাব্যে ব্রাহ্মণদের জন্যে আর্স, দৈব, ব্রাহ্ম এবং প্রাজাপাত্য, ক্ষত্রিয়দের জন্যে গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং মিশ্র গান্ধর্ব-রাক্ষস বিবাহ এবং বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্য আসুর বিবাহ সুপারিশ করা হয়েছে। পৈশাচ বিবাহকে মহাভারতে বিশেষভাবে নিন্দা করা হয়েছে। মহাভারতে এই কথাও বলা হয়েছে যে ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপাত্য এবং আর্স বিবাহ সকল মানুষের জন্যেই বিধিসম্মত হওয়া উচিত। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মহাকাব্যের যুগে আট রকম বিবাহ হিন্দুসমাজে বিশেষভাবে স্থান করে নিয়েছে। যদিও এগুলির উদাহরণ মিলিতভাবে মহাকাব্যে পাওয়া যায় না।

মহাভারতের[৩৩] বিধান স্বামীকে ভর্তা অথবা পতি অথবা পালক বলে মনে করতে হবে (কারণ স্বামীই স্ত্রীর ভরনপোষণের দায়িত্ব বহন করে থাকেন।) মহাভারতে[৩৪] আবার মনুর এই সুপারিশটির অবিকল সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়, যে স্ত্রীলোক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পিতা, স্বামী এবং সন্তানের উপর নির্ভর করে চলবেন এবং কোন সময়েই তাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা যায় না। রানী ভদ্রার[৩৫] বিবৃতি পড়েও আমাদের ধারণা হয় বিধবাদের জীবন আমাদের দেশে সুদূর অতীতে সবসময় খুব সুখদায়ক হত না। তাহলে এই সমস্ত আলোচনা থেকে আমাদের এই ধারণা হয় যে প্রাচীন ভারতে আমাদের

দেশে মেয়েরা সবসময় নির্ভরশীলতার মধ্যে দিন কাটাতেন। একটা কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলি সবিশেষ উচ্চমনা এবং নিরপেক্ষ ঋষিরা রচনা করেছিলেন। কেন তাঁরা মহিলাদের সার্বিক স্বাধীনতার সমর্থন করেন নি সেই ব্যাপারটা আমাদের বিশেষ-ভাবে ভেবে দেখা দরকার। যৌনচিন্তা এত বেশী প্রভাবশালী যে যেকোন সময় যেকোন নারী অথবা পুরুষের বিপথে চালিত হবার কারণ হতে পারে এবং বিবাহিতা কিংবা অবিবাহিতা যেকোন মহিলার অপূরণীয় সম্মানহানির কারণ হতে পারে। এইজন্যে আমাদের দেশের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা মেয়েদের পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণে রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। তাঁদের এও বক্তব্য ছিল যে এর ফলে নারীপুরুষ নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন করতে পারবে এবং মেয়েরা সম্ভাব্য যেকোন রকম বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। এই প্রসঙ্গে আমরা দীর্ঘতমা মুনির বিধানগুলির কথা স্মরণ করতে পারি। তিনি[৩৬] সুপারিশ করেছিলেন বিবাহিতা মেয়েরা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে স্বামীর সক্রিয় কর্তৃত্ব মেনে চলবেন এবং অনাত্মীয় কোন পুরুষের সঙ্গে কখনও মেলামেশা করবেন না।

এই প্রসঙ্গে আমরা শ্বেতকেতু মুনির উপাখ্যানটি সম্বন্ধে দু-এক কথা আলোচনা করতে পারি। তিনি একদিন তাঁর মাকে একজন অপরিচিত যুবকের অবৈধ বাসনা চরিতার্থ করতে তার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এই ধরনের অনৈতিক সুবিধাবাদী ব্যবস্থা সেই যুগে চালু থাকার সুবাদে তাঁর বাবাও এই ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ করতে পারেন নি। শ্বেতকেতু কিন্তু মার এই স্বেচ্ছাচারে খুবই বেদনাবোধ করেছিলেন। পরবর্তী-কালে যখন তিনি একজন সামাজিক প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন তখন তিনি বিবাহিতা মহিলাদের একাধিক পুরুষ সম্ভোগের বিরুদ্ধে একটি বিধি প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য আমাদের এই আলোচনা থেকে সেই যুগে আমাদের দেশে মেয়েদের বহুস্বামী সম্ভোগের প্রথা চালু ছিল কিনা সে বিষয়ে সঠিকভাবে কোন ধারণায় পৌঁছতে পারি না।

মহাভারতের[৩৭] মতে, শ্বেতকেতু ঐ সমস্ত বিধি চালু করার আগে বিবাহিতা রমণীরা সম্পূর্ণ বেপরোয়াভাবে তাঁদের স্বামীর চোখের সামনেই যে-কোন পুরুষের সঙ্গে যথেচ্ছ বিহার করতেন। স্বামীদের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলার কিছু ছিল না এবং তারা স্বাভাবিকভাবে এবং নীতিগতভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণে বাধ্য ছিলেন।

আমরা বাল্মীকির রামায়ণ পড়ে জানতে পারি বিদর্ভ দেশের রাজা জনকের পালিত কন্যা সীতার যখন মাত্র ছয় বছর বয়স সেই সময় তার অযোধ্যার

যুবরাজ রামচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ হয়। রামের সেই সময় ষোল বছর বয়স পূর্ণ হয় নি। আমাদের এই যুক্তির সমর্থন বিশ্বামিত্র মুনির কাছে অযোধ্যার রাজা দশরথের[৩৮] বিবৃতি থেকে, এবং ছদ্মবেশী রাবণের কাছে অরণ্যে সীতার[৩৯] উক্তি থেকে পাই। সীতা রাবণের কাছে বলেছিলেন যে নিজের স্বামীর সঙ্গে অযোধ্যার প্রাসাদে বারো বছর বাস করার পরে নিজের ১৮ বছর বয়সে স্বামীর সঙ্গে তিনি বনে বাস করতে এসেছেন। এবং তাঁর স্বামী রামের বয়স ২৫ বছর মাত্র। একই কথা সীতা অশোক বনে হনুমানের কাছে বলেছিলেন। এই কথাটাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে সীতার বিবাহের দিনে তাঁর কনিষ্ঠা তিন ভগিনীর সঙ্গে রামের আরও ছোট তিন ভাইয়ের বিবাহ হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে মহাকাব্যের যুগে মেয়েদের শিশুবয়সে বিবাহের আমরা সমর্থন পাই। দুইটি মহাকাব্যেই অনুলোম বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। বহুবিবাহ এবং একবিবাহের সমর্থনও দুইটি মহাকাব্যেই আছে। যৌতুক প্রথার অস্তিত্ব বেশ ভালভাবেই মহাকাব্যের যুগে চোখে পড়ে। এই সঙ্গে আরও এক উল্লেখ্য বিষয় হল আমাদের বিবাহের যে সমস্ত মূলগত বৈশিষ্ট্য ঋগবেদে কিংবা অথর্ববেদে অথবা বেদ পরবর্তী সাহিত্যে লক্ষ্য করেছি সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য মহাকাব্যের যুগেও অপরিবর্তিত ছিল।

মহাকাব্যে একবিবাহের বহু উদাহরণ লিপিবদ্ধ আছে। যেমন রামায়ণ[৪০] পড়ে আমরা জানতে পারি, অযোধ্যারাজ দশরথের ছেলেরা সকলেই একবার মাত্র বিবাহ করেছিলেন। মহাভারতে[৪১] কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের একবার মাত্র পাণিগ্রহণের উল্লেখ আছে। নিষধ রাজা নলের[৪২] বিদর্ভ রাজকন্যা দময়ন্তীর সঙ্গে শুধুমাত্র বিবাহ হয়েছিল এবং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর[৪৩] সঙ্গে একমাত্র মৎস্যরাজ বিরাটের কন্যা উত্তরার বিবাহ হয়েছিল।

অগস্ত্য,[৪৪] ঋচীক,[৪৫] জমদগ্নি[৪৬] এবং চ্যবন মুনি[৪৭] প্রত্যেকে একবার মাত্র বিবাহ করেছিলেন বলে মহাভারতে উল্লিখিত আছে।

অনুলোম বিবাহের বিভিন্ন উদাহরণ মহাভারতে লিখিত আছে। এই বিবাহগুলি প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উপরিল্লিখিত ঋষিরা (অগস্ত্য, ঋচীক, জমদগ্নি, চ্যবন) সকলে ক্ষত্রিয় রাজকন্যা বিবাহ করেছিলেন। রাজা যযাতি এবং অসুরগুরু শুক্রের কন্যা দেবযানীর বিবাহ মহাভারতে[৪৮] প্রতিলোম বিবাহের একমাত্র দৃষ্টান্ত।

মহাকাব্যে সাধারণতঃ রাক্ষস, অসুর, গান্ধর্ব এবং প্রাজাপত্য বিবাহের উল্লেখ আমরা পাই। উদাহরণ হিসেবে, রাজা দুষ্মন্ত[৪৯] এবং কণ্ব মুনির

পালিত কন্যা শকুন্তলার বিবাহকে গান্ধর্ব বিবাহ হিসেবে গণ্য করা যায়। হস্তিনাপুরের রাজা বিচিত্রবীর্যের[৫০] কাশীরাজ কন্যা অম্বিকা এবং অম্বালিকার সঙ্গে বিবাহ (এই দুই রাজকন্যাকে ভীষ্ম বলপূর্বক স্বয়ম্বরসভা থেকে অপহরণ করেছিলেন) রাক্ষস বিবাহের একটি উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যায়। যদুরাজ বাসুদেবের[৫১] কন্যা সুভদ্রার সঙ্গে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের বিবাহকে গান্ধর্ব-রাক্ষস বিবাহ হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের[৫২] সঙ্গে গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর এবং অভিমন্যুর[৫৩] সঙ্গে উত্তরার বিবাহকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে গণ্য করা যায়।

স্বয়ম্বরের কিছু কিছু উদাহরণ মহাকাব্যে উল্লিখিত আছে। মহাভারতে[৫৪] স্বয়ম্বরকে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিবাহের জন্য অবশ্য অনুকরণীয় বলে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। যাদবরাজ[৫৫] শূরের কন্যা এবং কুন্তীভোজ রাজার পালিতা কন্যা কুন্তী কুরুরাজ পাণ্ডুকে এবং দময়ন্তী[৫৬] রাজা নলকে স্বয়ম্বরসভায় আগত রাজদের মধ্যে থেকে স্বামী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। কান্যকুব্জ-রাজ গাধীর কন্যা সত্যবতীর[৫৭] সঙ্গে ঋচীকের বিবাহ এবং মদ্ররাজ শল্যর ভগিনী মাদ্রীর[৫৮] সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহকে আসুর প্রথায় বিবাহ বলে গণ্য করতে হবে।

এই তথ্য আমাদের সকলেরই বোধহয় জানা আছে যে হিন্দু বিবাহ একটি বৈদিক সংস্কার এবং মানুষের দ্বারা এর অবসান ঘটান যায় না বলে ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা মনে করে থাকেন। কিন্তু মহাকাব্য পড়ে জানা যায় তখনকার দিনে কোন কোন বিবাহ বিভিন্ন ধরনের শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যেমন, রাম[৫৯] রাজা জনকের শর্ত অনুযায়ী বিশাল এবং ভারী এক ধনুক থেকে তীর ছুঁড়ে সীতাকে বিবাহ করেছিলেন। হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু[৬০] গঙ্গার কিছু শর্ত মেনে নিয়ে বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের বেশ কিছুদিন পরে শান্তনু শর্ত মেনে চলছেন না এই অজুহাতে গঙ্গা তাঁকে পরিত্যাগ করেন। এই বিবাহকে অবশ্য ইতিহাসসম্মত বলে মেনে নেওয়া কঠিন কারণ গঙ্গাকে দেবী বলে মহাভারতে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্জুন[৬১] পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীকে কিছু শর্ত মেনে নিয়ে তাঁর স্বয়ম্বরসভা থেকে বিবাহ করেছিলেন। অর্জুনের[৬২] সঙ্গে মণিপুররাজ চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার বিবাহ বিভিন্ন শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। পরিশেষে, দাশরাজার পালিত কন্যা সত্যবতীর[৬৩] সঙ্গে শান্তনুর বিবাহও নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল না।

সেই যুগে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে ভারতের আদিবাসীদের বিবাহ হত। মধ্যম পাণ্ডব ভীমের[৬৪] সঙ্গে হিড়িম্বার বিবাহকে এইরকম একটি বিবাহের উদাহরণ

হিসেবে ধরতে হবে। হিড়িম্বাকে মহাভারতে রাক্ষসী বলে বর্ণনা করা হলেও আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে অনার্য মহিলা বলে মনে হয়। নাগকন্যা উলূপীও অনার্য রমণী বলেই মহাভারতে ব্যাখ্যাত হয়েছেন এবং তাঁকে অর্জুন স্ত্রী হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। এই ধরনের বিবাহ মহাকাব্যের যুগে নিয়মিত আকার নিয়েছিল কিনা সে বিষয়ে অবশ্য নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

আমরা মহাকাব্য পড়ে আরও জানতে পারি সে ঐ যুগে আমাদের দেশে যৌতুকপ্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। আমরা এই প্রথার অস্তিত্ব বৈদিক যুগেও লক্ষ্য করেছি। আমরা মহাভারত[৬৫] পড়ে জানতে পারি রাজা দ্রুপদ পঞ্চপাণ্ডবকে মূল্যবান জড়োয়া ও সোনার গহনা, রথ, ঘোড়া, যুবতী দাসী বিবাহে যৌতুক দিয়েছিলেন। বিরাট রাজা অভিমন্যুর[৬৬] সঙ্গে উত্তরার বিবাহে মূল্যবান দ্রব্য, খাঁটি সোনার গহনা, দাসী, অশ্ব, গবাদিপশু, রথ ইত্যাদি যৌতুক দিয়েছিলেন। অর্জুন[৬৭] এবং সুভদ্রার বিবাহে যাদবগণ একই ধরনের উপহার প্রেরণ করেছিলেন।

ঋগবেদ এবং অন্যান্য বেদে বলা হয়েছে যে মানুষ তার স্ত্রীর গর্ভ থেকে সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। মনু তাঁর অনুশাসন গ্রন্থে (অধ্যায় নবম, শ্লোক ৩) একই ধরনের ধারণা লিপিবদ্ধ করেছেন। মহাভারতেও[৬৮] এই মতামত সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা হয়েছে। এই সমস্ত গ্রন্থে এই কারণে স্ত্রীকে জায়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ স্ত্রীর গুণাবলী সম্পর্কে মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে যে সমস্ত আলোচনা করা হয়েছে সেইগুলিই আবার মহাভারতের আদিপর্বে সন্নিবেশিত হয়েছে। সুতরাং এই সমস্ত আলোচনা থেকে আমাদের এই ধারণা হয় যে প্রাচীনকালে বিবাহিত মহিলারা সবসময় জনসংখ্যার বৃদ্ধির একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হতেন। অধিকন্তু, আদিপর্বে[৬৯] পতিব্রতা স্ত্রীর স্বামীর সহমৃতা হওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যদিও বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য গ্রহণের সুপারিশও প্রচলিত ছিল এবং এই সম্বন্ধে নানা আলোচনা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে করা হয়েছে। সহমরণপ্রথা অভিজাত রমণীদের মধ্যে প্রচলিত থাকার কথা এই মহাকাব্যে বলা হয়েছে।

রাজা দুষ্মন্তর[৭০] রাজসভায় শকুন্তলা (রাজা তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে) যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছিলেন, তাতে বোঝা যায়, হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁর সবিশেষ দখল ছিল। এই আলোচনা পড়ে আমাদের ধারণা বদ্ধমূল হয় যে প্রাচীন ভারতে অবিবাহিতা মহিলারা পিতৃগৃহে যথাযথ এবং অবাধ শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ করতেন।

উপরে বর্ণিত উদাহরণগুলি ছাড়া অসবর্ণ বিবাহ সমাজে বিশেষ নিন্দার বিষয় বলে মনে করা হত এবং তার জন্য কঠোর শাস্তির বিধানও ছিল। আমরা পুরাণ পড়ে জানতে পারি যে যুবরাজ নাভাগ এক বৈশ্য রমণীকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন বলে তাঁকে বৈশ্য বর্ণে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

উর্বশী এবং পুরূরবার বিবাহ কাহিনী পুরাণেও[৭১] উল্লিখিত হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে ঋগবেদে[৭২] এই উপাখ্যানটির অস্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছি। এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে উর্বশী অপ্সরা ছিলেন সেজন্যে তাঁকে মানবিক নিয়মকানুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না যেহেতু মানবসমাজে এই ধরনের চুক্তিবদ্ধ বিবাহের উদাহরণ আমরা কোন যুগেই পাই না সেইহেতু আমরা এই বিবাহ কোনকালেই স্বীকৃত হয় নি, এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

মহিলাদের বেশী বয়সে বিবাহিত হওয়ার উদাহরণের পাশাপাশি অল্প-বয়স্কা মেয়েদের বিবাহের বিভিন্ন ঘটনা পুরাণে[৭৩] উদ্ধৃত হয়েছে। মেয়েদের অল্পবয়সে বিয়ে দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে ডঃ বার্ণেট[৭৪] বলেছেন, নিম্নবর্ণের মেয়েদের বিয়ে করার প্রবণতা চালু হওয়ায় উচ্চবর্ণের মেয়েদের স্ববর্ণে বিবাহ অসম্ভব হয়ে ওঠে, যেজন্যে মেয়ের বাবারা শিশু বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন যেজন্যে বোধহয় প্রথমদিকে উচ্চবর্ণের মেয়েদেরই প্রথমে শিশুবয়সে বিবাহ শুরু হয় এবং ক্রমশঃ সব বর্ণেই ছড়িয়ে পড়ে। ফলতঃ বিবাহের পরে ঐ বালিকাবধূকে ঋতুস্নান পর্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করতে হত।

ডঃ বার্ণেটের এই মতামত অবশ্য রক্ষণশীল হিন্দুদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের মতে বিবাহেতব্য পরিবারের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যেই এই শিশুবয়সে মেয়েদের বিবাহের প্রথা চালু হয়। কোন মেয়ে যদি ঋতুপ্রাপ্তির পরেও অনেকদিন অবিবাহিত থাকে তাহলে তার চরিত্রহননের বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বিবাহের পরে স্বামীগৃহের অন্তরে প্রবেশ করলে তার সেই ভয় থাকে না। যৌবন প্রাপ্তির আগেই বিবাহ হলে তার এই ধরনের নিরাপত্তার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্যে সনাতন মনোভাবাপন্ন হিন্দুদের ডঃ বার্ণেটের এই বক্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

ডঃ বার্ণেটের যুক্তি আরও একটি কারণে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। সেই কারণটি হল বালিকা বিবাহ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং স্ববর্ণে বিবাহ না করে কোন উচ্চবর্ণের হিন্দু অসবর্ণ বিবাহ করতে

পারতেন না। যেহেতু পুরুষেরা যেকোন বর্ণেরই একাধিক মেয়ে বিয়ে করতে পারতেন সেইজন্যে উচ্চবর্ণে বিবাহযোগ্য পাত্রের অভাব দেখা দিয়েছিল এ কথা চিন্তা করা অমূলক মনে করা যেতে পারে।

বহুবিবাহ যুগে যুগে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক যুগে এর বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। রাজ পরিবারের লোকেরা এবং ব্রাহ্মণদের একাংশ বহুবিবাহে আসক্ত ছিলেন।

পৌরাণিক যুগে মহিলারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতেন। বয়স্কা অবিবাহিত মেয়েদের নিজেদের পছন্দমত স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল। ক্ষত্রিয় রাজকন্যাদের স্বয়ম্বর সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। দেবযানী[৭৫] যখন দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচকে নিজেই বিবাহের প্রস্তাব দেন, তখন তাঁর বয়স যথেষ্ট বেশী হলেও তিনি তখন অবিবাহিতা। যদিও কচ[৭৬] তাঁর এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই যুক্তিতে যেহেতু দেবযানী তাঁর গুরুকন্যা। অতএব তিনি তাঁর ভগিনীস্থানীয়। এই তথ্য থেকে আমাদের ধারণা হয় যে প্রাচীন ভারতে গুরুর কন্যাকে শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীরা নিজের বোনের সমান মনে করতেন। শিবপুরাণ[৭৭] পড়ে যৌতুক প্রথার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেশ ভাল ধারণা হয়।

পরিশেষে আর্যবিবাহের পরম্পরা সম্বন্ধে পুরাণগুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তবে, পুরাণগুলিও উপরোক্ত আট প্রকার বিবাহের অবিকল উদাহরণ উপস্থিত করে না।

বিদর্ভ দেশের রাজা ভীষ্মকের[৭৮] কন্যা রুক্মিণীকে ছেদীরাজ শিশুপালের সঙ্গে বিবাহ হবার সময় সভা থেকে যাদবরাজ কৃষ্ণ বলপূর্বক তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করাকে পণ্ডিতেরা রাক্ষস বিবাহের একটি ঘটনা বলে মনে করেছেন। তেমনি আবার কুরুপতি দুর্যোধনের[৭৯] কন্যাকে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে বিবাহ করলে রাক্ষস বিবাহের একটি উদাহরণ বলে ধরে নেওয়া হয়।

যুবতী ক্ষত্রিয় রমণীরা ঋতুস্নানের পরে স্বয়ম্বরসভায় আগত রাজা এবং রাজপুত্রদের মধ্যে থেকে নিজের পছন্দমত স্বামী নির্বাচন করতে পারতেন। স্বয়ম্বর বিবাহের সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। পুরাণেও এই ধরনের বিবাহের উদাহরণ লিপিবদ্ধ আছে। ব্রহ্মপুরাণে[৮০] শিবকে স্বয়ম্বর-সভা থেকে পার্বতীর স্বামী হিসেবে বেছে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শিবপুরাণে[৮১] রাজা শিলানিধির মেয়ে শ্রীমতীর স্বয়ম্বরের উল্লেখ আছে। তেমনি আবার অগ্নিপুরাণে[৮২] ভীষ্মর কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ম্বরসভা

থেকে অপহরণ করে আনার কথাও বলা হয়েছে। অবশ্য এই সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

মনুর[৮৩] অনুলোম বিবাহ সমর্থন এবং প্রতিলোম বিবাহ মেনে না নেবার কথা আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি। পুরাণগুলিতে এই দুই ধরনের বিবাহ সম্বন্ধে বক্তব্য রাখা হয়েছে। পদ্মপুরাণে[৮৪] রাজা মনুর মেয়ের সঙ্গে ঋষি চ্যবনের বিবাহ উল্লিখিত হয়েছে। বিষ্ণু এবং ভাগবত পুরাণেও রাজা শর্যাতি (মনুর পুত্র) মেয়ের সঙ্গে বৃদ্ধ ঋষি চ্যবনের বিবাহ হয়েছিল বলা হয়েছে। রাজা মনুর মেয়ের সঙ্গে কর্দম মুনির[৮৫] বিবাহের কথাও পুরাণে আলোচনা করা হয়েছে। রাজকুমারী নিজেই কর্দমকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর পিতা মূল্যবান উপহার, গহনা এবং বস্ত্রাদি তাঁর বিবাহে যৌতুক দেন। রাজা যযাতি[৮৬] এবং দেবযানীর মধ্যে বিবাহের আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। এই প্রতিলোম বিবাহের সম্বন্ধে পুরাণে বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে।

যযাতি এবং দেবযানীর বিবাহ প্রতিলোম পর্যায়ে পড়ে বলে আমাদের শাস্ত্রে এই ধরনের বিবাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যযাতি[৮৭] যেহেতু একবার দেবযানীকে হাত ধরে এক কুয়োর মধ্য থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং যেহেতু তখনকার দিনের প্রচলিত লোকমত অনুসারে কোন অবিবাহিতা রমণীর কোন পুরুষ হস্তধারণ করলে পরবর্তীকালে সেই মেয়েকে সেই পুরুষের বিয়ে করতেই হত।[৮৮] এ ছাড়া দেবযানী ও যযাতিকে বিবাহে খুবই ইচ্ছুক ছিলেন। এরপর যযাতি[৮৯] দেবযানীর পিতা শুক্রের[৯০] অনুকূল মতামত গ্রহণ করে দেবযানীকে বিবাহ করেন[৯১]। উপরের এই অসবর্ণ বিবাহগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করে এই ধারণাই আমাদের হয় যে প্রেমজ বিবাহে বর্ণসংস্কার মাথা তুলতে পারত না এবং কোন রাজা যদি এই ধরনের বিবাহে জড়িত হয়ে পড়তেন তাহলে সমাজ এই ধরনের বিবাহে বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। তাছাড়া প্রেমজ বিবাহে মেয়েরা পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে সামর্থ্য এবং গুণাবলী সম্বন্ধে সবচেয়ে আগে নিশ্চিন্ত হতে চাইত।

পুরাণগুলিতে[৯১(ক)] বিবাহের নানা দিক সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। কি ধরনের মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত, কি ধরনের মেয়েকে বিয়ে করা উচিত নয়, এই সমস্ত তত্ত্বাদি পুরাণ[৯২] থেকে সংগ্রহ করা যায়।

পুরাণে[৯৩] আবার স্ত্রীকে কোন নির্দিষ্ট সময়কালের জন্যে পরিত্যাগ করার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের কোন বিধানই পুরাণে নেই। বরাহপুরাণ[৯৪] পড়ে আমরা জানতে পারি, কোললের যুবরাজ

প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজকন্যাকে বিবাহ করে কোন কারণে কিছুকাল পরে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয় নি এবং কয়েক বছর পরে আবার তাঁরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিলেন।

বহুবিবাহ কিংবা একবারমাত্র বিবাহের সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। তবে সাধারণত একবারমাত্র বিবাহের প্রবণতা বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যেত। ধনী শূদ্র ইচ্ছে করলে নিজ বর্ণের একাধিক কন্যা বিবাহ করতে পারতেন। বিভিন্ন বর্ণের কন্যা বিবাহ সম্বন্ধে মনুর বিধান নিচে উদ্ধৃত করা হল ঃ

পাণিগ্রহণ সংস্কারঃ সবর্ণাসপদিস্যত।
অসবর্ণাস্বয়মইনেয়ো বিধিরূদ্বহকরনানি।
শরঃক্ষত্রিয়ায়গ্রাহ্য প্রুদো বৈশ্যকন্যায়া।
বসনস্য দস গ্রাহ্য শূদ্রয়েব্য কৃসতয়েদানে ॥

(মানব ধর্মশাস্ত্র ৩. ৪৩-৪৪। জলি সম্পাদিত, লণ্ডন ১৮৮৭)।

পুরাণগুলিতে[৯৫] বিধান দেওয়া হয়েছে যে একজন বিবাহযোগ্য কন্যা তার স্বামীর সঙ্গে মাতৃকুলের দিক থেকে পাঁচপুরুষ পর্যন্ত এবং পিতৃকুলের দিক থেকে সাতপুরুষ পর্যন্ত কোনরকম সম্পর্কযুক্ত হবে না। গরুড়পুরাণে[৯৬] বলা হয়েছে বিবাহযোগ্য কন্যাকে তার বাবা অথবা পিতামহ অথবা পিতৃকুলের কোন উপযুক্ত ব্যক্তি সম্প্রদান করতে পারবেন। গরুড়পুরাণে[৯৭] বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। এই পুরাণে আরও বলা হয়েছে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য এবং প্রাজাপাত্য বিবাহ ব্রাহ্মণদের জন্য ধার্য, গান্ধর্ব এবং রাক্ষস ক্ষত্রিয়দের জন্য এবং আর্য বিবাহ বৈশ্যদের জন্য বিধিসম্মত।

অগ্নিপুরাণের[৯৮] মতে, একজন ব্রাহ্মণ প্রথমে নিজ থেকে একজন এবং পরে পর্যায়ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রবর্ণ থেকে একজন করে মোট চারজন মহিলাকে বিবাহ করতে পারেন। অনুরূপভাবে একজন ক্ষত্রিয় তিনটি এবং যেকোন বৈশ্য এইভাবে পর্যায়ক্রমে দুইটি অবিবাহিতা কন্যাকে বিবাহ করতে পারবেন। একজন শূদ্র নিজবর্ণ থেকে একটি মেয়েকে বিবাহ করবেন। অবশ্য নিজবর্ণে বহুবিবাহে কোন শূদ্রেরই পক্ষে বাধা ছিল না। অগ্নিপুরাণে[৯৯] উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে শূদ্রকন্যার অনুলোম বিবাহ অনুমোদিত হয়েছে যদিও মনু শূদ্রকন্যার সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মিলন মোটেই ভাল চোখে দেখেন নি। মনু এই অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে কোন দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য) প্রথমে নিজবর্ণে থেকে এবং পরে বর্ণপরম্পরা

একটি করে কন্যাকে বিবাহ করবেন। কিন্তু তাঁর স্ববর্ণে বিবাহিত স্ত্রী তাঁর সঙ্গে ধর্মীয় এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার অধিকার ভোগ করবেন। কিন্তু তাঁর অন্যান্য নিম্নবর্ণে বিবাহিত পত্নীর এই অধিকার থাকবে না।[১০০] মানবধর্মশাস্ত্রের এই সুপারিশ অগ্নিপুরাণে পুরোপুরি গৃহীত হয়েছে। (১৫৪.১)। গরুড়পুরাণে[১০১] পক্ষান্তরে দ্বিজের শূদ্রকন্যা বিবাহ অনুমোদন করে নি। এই পুরাণের মতে, ব্রাহ্মণ প্রথমে স্ববর্ণে এবং পরে আনুপূর্বিক ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবর্ণ থেকে আরও দুইজন মেয়েকে বিবাহ করতে পারবেন। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয় দুইটি এবং বৈশ্য একটিমাত্র কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে। পুরাণগুলিতে অনুলোম বিবাহ সমর্থন করা হলেও প্রতিলোম বিবাহে তীব্র আপত্তি জানান হয়েছে।

উল্লেখ্য, কলিযুগে যেকোন মিশ্রবিবাহ নিষিদ্ধ বলে আদি পুরাণে সুপারিশ করা হয়েছে। রঘুনন্দন এই ব্যাখ্যা আদি পুরাণ থেকে তাঁর উদ্বাহতত্ত্বে[১০২] সন্নিবেশিত করেছেন।

বিধবাদের কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতে বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপারিশ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে (প্রথম খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়) এক বালবিধবার কাতরোক্তি থেকে আমাদের এই ধারণা হয় যে পৌরাণিক যুগে অল্পবয়স্কা বিধবাদের জীবন বোধহয় সবসময় আনন্দের হত না।

ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে যে যে তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে, সেইগুলি সম্বন্ধে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম। বিবাহ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন, বিভিন্ন বর্ণে বিবাহের ধারাবাহিকতা ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে খুবই সুন্দরভাবে বুঝিয়ে লেখা হয়েছে। অসবর্ণ বিবাহে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও যুগে যুগে কিন্তু এই ধরনের বিবাহের প্রয়াসকে বাতিল করে দেওয়া যায় নি। যুগবদলের সঙ্গে সঙ্গে আট রকমের বিবাহ ক্রমশঃই মিলিয়ে যেতে থেকেছে। আজকের দিনে আমরা একটি বিবাহ পদ্ধতির সঙ্গেই পরিচিত। যাইহোক, শতাব্দীর পর শতাব্দী হিন্দুদের বিবাহ সংস্কার সমাজজীবনে পাকাপাকিভাবে শুধু আসন পেতেই বসে নি, এর মৌল ধারাগুলি যে এতকাল ধরে অবিকৃত অবস্থায় থেকে যেতে পেরেছে, সেইটাই বিশেষ বিস্ময়ের ব্যাপার।

সূত্রনির্দেশ

১ Westernmarck E. A.: The History of Human Marriage, (London, 1901) PSO

২ তদেব, পৃ ৫০।
৩ তদেব, পৃ ২৪ এবং ৩৯, ৫০
৪ ঋগবেদ—১.১১২.২৯, ১১৬.১, ১১৭.২০ ইত্যাদি
৫ Mackdonnell & Krith (ED) : The Vedic Index of Names & Subjects, (Lodon. 1912), Vol I, pp 482-83
৬ Westernmarck E. A. : Early beeleefs and thin Social influence, (London, 1932), Ch IX, pp 138-32
৭ মানব ধর্মশাস্ত্র—৩।১২
৮ তদেব —৩।৪৩
৯ ঋগবেদ—১০.৮৫.১৩
১০ Sastri H. C. : The Social Background of the Forms of Marriages in Ancient India, (Cal.), p 143
১১ তদেব, পৃ ৩৮-৩৯
১২ বিষ্ণুপুরাণ (বরদা বসাক সম্পাদিত, কলকাতা, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ) চতুর্থ খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায় ; বায়ুপুরাণ—(পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) ৯১তম অধ্যায়
১৩ The Vedic Index of Names & Subjects, (Vol I), p 3
১৪ Barnett L. D. : Antiquities of India, (Reprint, Cal. 1964) p 144
১৫ ঋগবেদ—১০.৮৫.২৯
১৬ R. C. Majumder (ED), The Vedic Age (Bombay 1969) p 392
১৭ ঋগবেদ—১০.৪০
১৮ ঋগবেদ—১০.২৭.১২, ১০.৮৫.২৬-২৭ ৪৬ ইত্যাদি , তৎসহ Kane : P. U : History of Dharmasastra, (Poona, 1941) Vol 2, PT I, Ch IX, p 439
১৯ তদেব, পৃ ৪৩৯
২০ তদেব, পৃ ৪৩৯-৪০
২১ Westernmarck E.A. : The History of Human Marriage, pp 1-24
২২ ঋগবেদ—১.১২.৭, ৪.৩.২ ইত্যাদি
২৩ ঋগবেদ—১.৬২.১১, ৭১.১, ১০৪.৩, ১৫৫.৮, ১৮৬.৭, ৭.১৮.২, ৭.২৬.৩, ১০.৪৩.১, ১০১.১১ ইত্যাদি

২৪ ঋগবেদ—১০.৮৫.১৩

২৫ তদেব—১০.৮৫.৩৬

২৬ ঐ

২৭ তদেব—১০.৮৫. ৭-৮, ২০, ২৬-২৮, ৪২, ৪৬ ইত্যাদি

২৮ তদেব—১০.৮৫.২৬

২৯ Mackdonnell Keith : Vedic Index of Names & Subjects, Vol I, pp 482-83 (আমরা ঋগবেদের ১.১১২.২০ সংখ্যক শ্লোক পড়ে এই ধারণায় আসি যে বিমদ অল্প বয়সের কুমারী বিবাহ করেছিল)

৩০ Kane : History of Dharmasastra, Vol 2, PT I, Ch IX, p 525

৩১ "মানবধর্মশাস্ত্র—অসপিণ্ডা চযা মাতুর" অসগোত্রা চযা পিতুঃ—৩/৫

৩২ The normal conditions of marriage for the three higher castes were identity of caste and difference of 'gotra' ; that is to say a caste was sub-divided into a number of groups or gotras, each of which was supposed to be discended from a mythical or semi-mythical person, usually a risi or legendary saint and a man normally took for wife a girl belonging to a gotra other than his own and forming a part of the same caste. "Barnett : Antiquites of India, Ch. III, p 142

৩৩ মহাভারত (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, কলকাতা) শান্তিপর্ব, ২৬০.৩

৩৪ মহাভারত (ঐ) ১.৮৭.৭ (তৎসহ মনুস্মৃতি—৫/১৪৩ ও ৯/৩)

৩৫ মহাভারত (ঐ) ১.১১৫

৩৬ মহাভারত (ঐ) ১.৮৯.৩৩-৩৪

৩৭ মহাভারত (ঐ) ১.১১৬.৪৫, ১১-১৫

৩৮ রামায়ণ (গৌড়ীয়, কলকাতা) ১.২৩.২

৩৯ রামায়ণ (ঐ) অরণ্যকাণ্ড, ৫৪তম সর্গ

৪০ রামায়ণ (ঐ) আদিকাণ্ড, ৭৩তম এবং ৭৫তম সর্গ

৪১ মহাভারত (হরিদাস) ১.১০৪

৪২ মহাভারত (ঐ) বিরাটপর্ব, ৪৭তম অধ্যায়

৪৩ ঐ

৪৪ মহাভারত (ঐ) বনপর্ব, ৮১.১-২

৪৫ মহাভারত (ঐ) বনপর্ব, ৯৬তম অধ্যায়

৪৬ মহাভারত (ঐ) বনপর্ব, ৯৭.২

৪৭ মহাভারত (ঐ) বনপর্ব, ১০১তম অধ্যায়

৪৮ মহাভারত (ঐ) ১.৬৯

৪৯ মহাভারত (ঐ) ১.৮৭

৫০ মহাভারত (হরিদাস) আদিপর্ব, ৯০তম এবং ৯৬তম অধ্যায়

৫১ মহাভারত (ঐ) আদিপর্ব, ২১৩ ও ২১৪তম অধ্যায়

৫২ মহাভারত (ঐ) ১.১০৪

৫৩ সূত্রনির্দেশ ৪২ দ্রষ্টব্য

৫৪ মহাভারত (হরিদাস) ১.৯৮.১৬

৫৫ মহাভারত (ঐ) ১.১০৬.৯

৫৬ মহাভারত (ঐ) বনপর্ব, ৪৭তম অধ্যায়

৫৭ মহাভারত (ঐ) ৯৬তম অধ্যায়

৫৮ মহাভারত (ঐ) ১.১০৭

৫৯ রামায়ণ (গৌড়ীয়) ১.৬৯ ও ৭০তম অধ্যায়

৬০ মহাভারত (হরিদাস) ১.৯২

৬১ মহাভারত (ঐ) ১.১৮১

৬২ মহাভারত (ঐ) ১.২০৮.১৫-২৭

৬৩ মহাভারত (ঐ) ১.৯৪ ও ৯৫তম অধ্যায়

৬৪ মহাভারত (ঐ) ১.১৪৯

৬৫ মহাভারত (ঐ) ১.৯১.২৪ ২৬

৬৬ মহাভারত (ঐ) ১. বিরাটপর্ব, ৬৭.৩৬

৬৭ মহাভারত (ঐ) ১.২১৪.৪৪-৫৫

৬৮ মহাভারত (ঐ) ১.৮৮.৩৭

৬৯ মহাভারত (ঐ) ১.৮৮.৪৬

৭০ মহাভারত (ঐ) আদিপর্বের ৮৮তম অধ্যায়

৭১ ব্রহ্মপুরাণ (পঞ্চানন, কলকাতা ১৩১৬ বঙ্গ) দশম অধ্যায় ; বিষ্ণুপুরাণ (বরদা বসাক, কলকাতা ১২৭৭ বঙ্গ) চতুর্থ খণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায় ; বায়ুপুরাণ (পঞ্চানন, কলকাতা ১৩১৭ বঙ্গ) ৯১তম অধ্যায়

৭২ ঋগবেদ—১০.৯৫

৭৩ গরুড়পুরাণ (পঞ্চানন, কলকাতা ১৩১৪ বঙ্গ) ৯৫ অধ্যায়

৭৪ Barnett L.D ; Antiquities of India, p 144

৭৫ মৎস্যপুরাণ (পঞ্চানন, কলকাতা, ১৩১৬ বঙ্গ) ২৮তম অধ্যায়

৭৬ ঐ

৭৭ শিবপুরাণ-রুদ্র সংহিতা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯ অধ্যায়

৭৮ ব্রহ্মপুরাণ—১৯৩ অধ্যায় ; বিষ্ণুপুরাণ—পঞ্চম খণ্ড, ২৬ অধ্যায় ; ভাগবতপুরাণ—দশম খণ্ড, ৫৩ অধ্যায়

৭৯ ব্রহ্মপুরাণ—১০৮ অধ্যায় ; বিষ্ণুপুরাণ—পঞ্চম খণ্ড, ৩৫ অধ্যায় ; ভাগবতপুরাণ—দশম খণ্ড, ৬৮ অধ্যায়

৮০ ব্রহ্মপুরাণ—৩৬ অধ্যায়

৮১ শিবপুরাণ, রুদ্র সংহিতা—প্রথম খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।

৮২ অগ্নিপুরাণ—(পঞ্চানন, ১৩১৬ বঙ্গ, কলকাতা) ১৩.৫
৮৩ মনুসংহিতা—৩.১২
৮৪ পদ্মপুরাণ—(পঞ্চানন, কলকাতা) ৬.১৩২-১৩৩
৮৫ ভাগবতপুরাণ—৩.২২, ১৪-২৯, ২০-২৪
৮৬ মৎস্যপুরাণ—(পঞ্চানন, কলকাতা, ১৩১৬ বঙ্গ) ৩০ অধ্যায়
৮৭ ৩০. ১৮-২০
৮৮ ঐ
৮৯ ৩০. ১৭, ১৯, ২১ ২২, ২৭
৯০ ৩০. ২৫-২৬, ৩৩
৯১ ৩০. ৩২, ৩৪-৩৬
৯১(ক) বিষ্ণুপুরাণ—তৃতীয় খণ্ড, দশম অধ্যায় ; অগ্নিপুরাণ—পঞ্চনন, কলকাতা ; বৃহন্নারদীয়পুরাণ—পঞ্চানন, কলকাতা, ১৩১৫ বঙ্গ, ২৪তম অধ্যায় ; গরুড়পুরাণ—৯৫তম অধ্যায়
৯২ বিষ্ণুপুরাণ—তৃতীয় খণ্ড, দশম অধ্যায় ; বৃহন্নারদীয়পুরাণ—২৪. ১-১৩ ;
৯৩ নারদীয় পুরাণ—২৪. ১৪ ১৫
৯৪ বরাহপুরাণ—(পঞ্চানন, কলকাতা, ১৩১৬ বঙ্গ) ১২৬তম অধ্যায়
৯৫ গরুড়পুরাণ—৯৫তম অধ্যায়
৯৬ ঐ
৯৭ ঐ
৯৮ অগ্নিপুরাণ—১৫৪.১
৯৯ ঐ
১০০ মানবধর্মশাস্ত্র—৯।৮৬
১০১ গরুড়পুরাণ—৯৫.৬
১০২ "দ্বিজা নামসবর্নাস্ কন্যাসু ব পরমসতই।"
রঘুনন্দন তাঁর উদ্বাহতত্ত্বে উদ্ধৃত করেছেন।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে বাঙালী নারীর শিক্ষা-চিত্র

প্রদ্যোত কুমার মাইতি*

সাহিত্যে সমাজ প্রতিফলিত হয় বলেই বলা হয়ে থাকে 'সাহিত্য সমাজের দর্পণ'। সাহিত্যের এই গুরুত্ব স্বীকার করে আমরা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে বিশেষ করে লোকসাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যে স্ত্রী-শিক্ষার যে খণ্ডিত পরিচয় পাই, তা থেকে বর্তমান প্রবন্ধে মোটামুটি মধ্যযুগে অবিভক্ত বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষার চিত্র তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি।

বাঙালীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হল 'হাতে খড়ি' অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়া শুরু করার অনুষ্ঠান। ছেলেদের যথা গোপীচন্দ্র, লখিন্দর, শ্রীমন্ত ও লাউসেনের 'হাতে খড়ি' অনুষ্ঠানের পরিচয় যথাক্রমে 'গোপীচন্দ্রের গান', মনসা, চণ্ডী ও ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া গেলেও স্পষ্টত বেহুলা, খুল্লনা, লহনা প্রভৃতি নারী চরিত্রগুলির 'হাতে খড়ি' অনুষ্ঠানের পরিচয় ঐ সকল কাব্যে পাওয়া যায় না। এর থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে স্ত্রী-শিক্ষা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল না। স্ত্রী-শিক্ষা সাধারণতঃ রাজ-পরিবারের এবং অভিজাত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও কিছু কিছু স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের সাহিত্যিক প্রমাণও পাওয়া যায়। গরীব ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা প্রায় অজ্ঞাত ছিল। তার কারণ হল তাদের অন্ন সংস্থানের জন্য অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতে হত। স্বাভাবিকভাবে সামাজিক উৎকর্ষ সাধনের কোন সুযোগ মিলত না। অবশ্য স্ত্রী-শিক্ষা বিশেষত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে না পারার পেছনে অন্যান্য কারণও ছিল। প্রথমত, মধ্যযুগে মুসলমান আমলে হিন্দুদের মধ্যে পর্দাপ্রথার প্রচলন শুরু হলে নারীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘরের চারদেওয়ালের মধ্যেই জীবনযাপন করতে হত। ফলে প্রাচীন যুগে পাঠশালা বা টোলে গিয়ে মেয়েদের যে পড়াশুনার প্রচলন ছিল, তা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, হিন্দু মেয়েদের কমবয়সে বিয়ে দেওয়ার রীতিও স্ত্রী-শিক্ষার পথে বিশেষ বাধা-স্বরূপ ছিল। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষালাভ কোনক্রমে করার সুযোগ মিলত।

---

*ইতিহাস বিভাগ, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়

স্ত্রী-শিক্ষার পথে এ সকল বাধা থাকা সত্ত্বেও মধ্যযুগে বাংলাদেশে হিন্দু মেয়েদের মধ্যে যে শিক্ষার প্রচলন ছিল তা 'গোপীচন্দ্রের গান', দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের "ঠাকুরমার ঝুলি", আলাওলের "পদ্মাবতী", দোনাগাজী চৌধুরীর "সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল", মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গল", দয়ারামের "সারদামঙ্গল", ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল", রামপ্রসাদ সেনের "বিদ্যাসুন্দর" প্রভৃতি কাব্য থেকে জানা যায়।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর লেখা "গোপীচন্দ্রের গান"-এ পাওয়া যায় গোপীচন্দ্রের জননী ময়নামতী গুরুগৃহে গিয়ে লেখাপড়া করতেন।

"বালক অবধি আর নাহি কাম আন।
সর্বক্ষণ শুনি আমি ভাগবত পুরাণ ॥
এতেক ভাবিয়া, পিতা আপনার মনে।
পড়িবার দিল আমাক দ্বিজ গুরুর স্থানে ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি হস্তে লইলাম খড়ি।
পড়িবার কারণে যাই দ্বিজ গুরুর বাড়ী ॥
এইরূপে শাস্ত্র পড়ি গুরু পাঠশালে।...[১]

উপরোক্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে ময়নামতীর পিত্রালয়ে শাস্ত্রপাঠের ব্যবস্থা ছিল, কারণ অল্পবয়সে ময়নামতী ভাগবত ও পুরাণ শুনে সময় কাটাত। তাই তাঁর পিতা কন্যার লেখাপড়ার প্রতি লক্ষ্য করে পাঠশালায় ভর্তি করে দেন।

প্রথাগত শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহে পাঠশালায় ছেলেমেয়ে উভয়কেই যে একসঙ্গে শিক্ষাদনের রীতি ছিল তারও প্রমাণ রয়েছে। "ঠাকুরমার ঝুলি" গল্পে দেখা যায় রাজকন্যা পুষ্পমালা এবং ঐ রাজ্যের কোটালপুত্র চন্দন একই সঙ্গে পাঠশালায় লেখাপড়া করত।[২] ষোড়শ শতাব্দীর মনসামঙ্গলের কবি বংশী-দাসের কন্যা কবি চন্দ্রাবতীকে আমরা দেখেছি জয়ানন্দ বা জয়চন্দ্রের সঙ্গে একই পাঠশালায় পড়াশুনা করত।[৩] আবার রাজপরিবারের কন্যাকেও যে গুরুর নিকট শিক্ষালাভের জন্য পাঠান হত, তার পরিচয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য থেকে জানা যায়।

"পঞ্চম বৎসর যদি হৈলা রাজবালা
পড়িতে গুরুর স্থানে দিল ছাত্রশালা।
মহান পণ্ডিত হৈল কন্যা গুণবান।"[৪]

এসব সাহিত্যিক প্রমাণ থেকে মনে হয় প্রাথমিক অবস্থায় গুরুগৃহে এক সঙ্গে ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করত। অবশ্য সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবার নিজ নিজ

বাড়ীতেও মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করত। তার পরিচয় অষ্টাদশ শতাব্দীর "সারদামঙ্গল" কাব্যে পাওয়া যায়। এই কাব্য থেকে জানা যায় যে বৈদেব রাজার পঞ্চকন্যার শিক্ষার জন্য জনার্দন ওঝা নামক এক গৃহশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল এবং পঞ্চকন্যার জ্ঞানার্জন স্পৃহা এতই প্রবল ছিল যে তারা বিদ্যাশিক্ষার বিনিময়ে গুরু জনার্দন কর্তৃক গোপন বিবাহ প্রস্তাবেও রাজী হয়েছিল। অপরদিকে সুরেশ্বর রাজ্যের রাজা সবাহুর পুত্র লক্ষধর দেবী সরস্বতীর নির্দেশে ছদ্মবেশে বৈদেব রাজ্যে উপস্থিত হয়ে রাজকন্যাদের ভৃত্যরূপে শিক্ষালাভ করতে থাকে।[৫] আবার কখনও মেয়েরা যে বিশেষ জ্ঞানার্জন করে বিদ্যা-পরীক্ষার ভিত্তিতে স্বামী নির্বাচন করত তার উজ্জ্বল নিদর্শন হল বীর-সিংহের কন্যা বিদ্যা। অন্নদামঙ্গল কাব্যে বিদ্যার পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

"শুন রাজা সাবধানে পূর্বে ছিল এই স্থানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কি হবে ইহার ॥

* * *

পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ ॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক ॥

* * *

বেদান্ত একাত্মবাদী দ্ব্যাত্মবাদী এক।
মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক ॥
বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে।
পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে ॥
সাঙ্খ্যেতে কি হবে সঙ্খ্যা আত্মনিরূপণ।
পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞনন ॥[৬]

অন্নদামঙ্গল কাব্যে বিদ্যার যেমন শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয় পাওয়া গেল, বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর কবিত্বের কথাও আমাদের অজানা নয়। শুধু বাংলা

ভাষায় তিনি কাব্য রচনা করেন নি,[৭] সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল।[৮] তাছাড়া চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীঃ) সমসাময়িক মাধবী নামে এক মহিলা তাঁর জ্ঞানের গভীরতার জন্য পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের হিসাবরক্ষকের দায়িত্ব পান। এমনকি তাঁর জ্ঞানের গভীরতা লক্ষ্য করে শ্রীচৈতন্য তাঁকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। তিনি বাংলা ভাষায় বহু কবিতাও রচনা করেন। 'পদকল্পতরু' নামক বৈষ্ণবপদসংগ্রহ গ্রন্থে তাঁর লেখাও সন্নিবিষ্ট রয়েছে।[৯] ঐ সময়কার বাংলাদেশে আরও কয়েকজন অসাধারণ প্রভাবশালিনী মহিলার আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বৈষ্ণবাচার্য নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবাদেবী, শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতাদেবী, শ্রীনিবাসের স্ত্রী ঈশ্বরীদেবী এবং তাঁর বড় পুত্রবধূ সত্যভামা।[১০] এঁরা সবাই শিক্ষিতা ও শাস্ত্রজ্ঞা ছিলেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত 'ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে' ধনপতির বিদেশে বাণিজ্য ব্যপদেশে অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর প্রথমা স্ত্রী লহনা নিজ সতীন খুল্লনাকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণী বান্ধবী লীলাবতীকে দিয়ে স্বামীর নাম দিয়ে জাল চিঠি লিখিয়ে খুল্লনাকে পাঠায়।

"লহনায়ে বোলে সই নিবেদলু পায়ে।
তুহ্মি পত্র লেখ আহ্মার ভালো মন্দ দায়ে"[১১]

আবার লহনা ও লীলাবতী খুল্লনার উদ্দেশ্যে একসঙ্গে বসে যে চিঠি লিখেছিল তা যে তার স্বামীর চিঠি নয় এবং জাল চিঠি তা খুল্লনা বুঝতে পারে অর্থাৎ খুল্লনা তার স্বামীর হাতের লেখার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিল। এ সকল প্রমাণ করে যে খুল্লনা পড়াশুনা জানত। নিম্নোক্ত কাব্যবর্ণিত অংশ থেকে তা বোঝা যায়।

"দুইজনে একভাবে করেন যুকতি।
কপট প্রবন্ধে পাতি লিখে লীলাবতী ॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি।
অশেষ মঙ্গল ধাম লহনা যুবতী ॥

*　　*　　*

লহনার বচনে খুল্লনা পড়ে পাতি।
হাসয়ে খুল্লনা ছন্দ দেখি ভিন্ন জাতি।।
খুল্লনা বলেন দিদি নাহি গো তরাস।
কে মোরে লিখিয়া পাতি করে উপহাস।।

প্রভুর অক্ষর নহে দেখি ভিন্ন ছন্দ।
কেবা এ লিখিল পত্র করিয়া প্রবন্ধ।[২২]

"চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে" যেমন বণিক পরিবারের মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলনের কথা জানতে পারি তেমনি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দোনাগাজী চৌধুরী 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামল' কাব্যেও বেনে বউর পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। বেনে বউয়ের পরিচয় কবি দিয়েছেন—

"আছিল পণ্ডিত সেই বণিক বনিতা।
সর্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত প্রচুর
পারগ সর্বজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত চতুর।[২৩]

"চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যে বর্ণিত লহনা, খুল্লনা ও লীলাবতীর পত্রলেখা ও পত্রপাঠ যেমন অর্থবহ তেমনি বেনে বউয়ের পাণ্ডিত্যও লক্ষণীয়। উচ্চ কোটি বণিক-সমাজের এবং ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়েদের মধ্যে যে কিছু কিছু লেখাপড়ার প্রচলন ছিল তা উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা চলে। তাছাড়া মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলনের কথা ভারত-চন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য থেকেও জানা যায়। ঐ কাব্যে 'নারীগণের পতি নিন্দা' অংশে এক নারীর উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—

"সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত।"[২৪]

ঐ কাব্যে বর্ণিত এক কবি-পত্নীর উক্তি থেকে স্ত্রী-শিক্ষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

"মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিল বিরস কথা সরস বাখানে॥
* * *
কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
* * *
কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু।।[২৫]

তাছাড়া 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত লাউসেনের মা রঞ্জাবতীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয়ও এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। কর্ণসেনকে বৃদ্ধ আঁটকুড়া বলে রঞ্জাবতীর ভাই মহামদ অপমান করায় কর্ণসেন ব্যথিত হৃদয়ে গৌড় থেকে ফিরে রঞ্জাবতীকে অপমানের কথা জানায়। রঞ্জাবতী কর্ণসেনের বৃদ্ধ বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব পৌরাণিক কাহিনী উল্লেখ করে স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তার থেকেই স্পষ্টই বোঝা যায় রঞ্জাবতী লেখাপড়া জানতেন।

"রাজা দশরথ তপ কৈল কতদিনে।
বুড়া কালে পুত্র হৈল শুনি রামায়ণে ॥
আরাধিলে দেবগুরু দ্বিজ মুনিবর।
অনায়াসে তোমার কোলে হবেক কুঙর ॥"[১৬]

এমনকি "ময়মনসিংহ গীতিকা"য় বর্ণিত মলুয়া, কমলা ও চন্দ্রাবতীর কাহিনী থেকে অনুমান করা চলে যে মধ্যযুগে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল। মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজবংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী রচিত 'মলুয়া' পালাটি থেকে জানা যায় যে কাজীর পেয়াদা কর্তৃক তার স্বামী বিনোদকে ধরে নিয়ে গেলে অসহায় মলুয়া তার পাঁচ ভাইকে চিঠি লিখে এ খবর জানায়—

"কান্দিয়া কাটিয়া মলুয়া কোন কাম করে।
পঞ্চ ভাইয়ে লেখে পত্র আড়াই অক্ষরে ॥
বিনোদ ধরিয়া নিল কাজীর পেয়াদায়।
কাজীর হুকুম কথা লিখে সমুদয় ॥"[১৭]

অন্যত্র,

"ভাইয়ের কাছে পত্র লেখে সন্ধান করিয়া।
যত্ন করি পালা কোড়া দিল উড়াইয়া ॥"[১৮]

আবার 'কমলা'র পালা থেকে জানা যায়, মানিক চাকলাদারের সুন্দরী কন্যা কমলার রূপ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে কারকুন নামক এক যুবক চিকন গোয়ালিনীর মারফৎ প্রেমপত্র পাঠালে কমলা তাতে মুগ্ধ হয়।

"পত্র খুলিয়া কন্যা পড়িতে লাগিল
পড়িতে পড়িতে কন্যা ক্রোধেতে জ্বলিল ॥"[১৯]

'চন্দ্রাবতী' পালা থেকে জানা যায়, জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে প্রেমপত্র লিখলে চন্দ্রাবতী নিরালায় বসে সেই চিঠি পাঠ করতে গিয়ে—

"পত্র পইড়ে চন্দ্রাবতীর চক্ষে বয়ে পানি।
কিবা উত্তর দিব কন্যা কিছুই না জানি ॥
তার পর পড়ে পত্র চক্ষে বয় ধারা।"[২০]

এইভাবে সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের যেমন সাহিত্যিক প্রমাণ পাওয়া গেল, তেমনি সাধারণ শ্রেণীর মধ্যেও স্ত্রী-শিক্ষার সাহিত্যিক প্রমাণও পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ সেনের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে বর্ণিত মালিনী হীরা রাজকুমার সুন্দরের নিকট বাজারের হিসেব দিতে গিয়ে বলেছে—

"খুজরার লেখা জোখা বড়ই উৎপাত।
স্নান করি খাই দাই লেখা দিব শেষে ॥"[২১]

তেমনি সাধারণ ঘরের মেয়ে যোষী কন্যা কেবল শিক্ষিতা নয়, বিদূষীও—

"নবীন যৌবনী কন্যা প্রসঙ্গে বিদুষী
যুক্তি অনুযুক্তা যুক্ত উক্তি অতিরিক্তা
বিলাসী সঙ্গীত ভাষী কাব্য পরিভক্তা
চাতুর্যে মাধুর্যে অতি বাচে অগ্রগণ্য।"[২২]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত 'কালকেতু উপাখ্যানে' ব্যাধ কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরা স্বামীর অবর্তমানে গোধিকারূপিনী চণ্ডীদেবীকে যখন সুন্দরী যুবতীর রূপ ধারণ করতে দেখল, তখন ফুল্লরা তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বলেন যে কালকেতু তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছে এবং তিনি তাদের বাড়ীতেই থাকা স্থির করেছেন। তা শুনে ফুল্লরা দেবী চণ্ডীর উদ্দেশ্যে বলেন—

"নহ কিছু ধনবান দেখি না গবালি খান
হরিয়ে আনিলে কার কান্তা ॥
সীতা হরে দশশির মাল্য তারে রঘুবীর
শচী হর্যেছিল শুম্ভায় ॥
পৃথিবী না সহে ভার বংশ নাশ হৈল তার
হেন বুঝি মরিবার উপায় ॥"[২৩]

অন্যত্র,

"বালী-বানর অধিকারী হরিল ভাইর নারী
যথ হইল বিদিত সংসারে ॥
পূর্ব-কৃত পুণ্য ছিল তাহে বিধি ঘটাইল
সংহারিল রঘুনাথের শরে ॥
নিশাচর অধিপতি হরিলা জানকী সতী
বিকল হইয়া কাম বানে ॥
সাজিলেক রঘুপতি কপিকুল সঙ্গতি
উদ্ধারিলা বধিয়া রাবনে ॥"[২৪]

ফুল্লরার মুখে এ সব পৌরাণিক কাহিনী কেবল কবি-কল্পনা বলা চলে না। এ সকল পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় ঘটনাগুলির সঙ্গে যে নিম্ন-কোটি সমাজের মেয়েরা পরিচিত ছিল তারই ইঙ্গিত বহন করে। সাধারণ শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা-প্রচলন প্রসঙ্গে আরও কিছু সাহিত্যিক প্রমাণ তুলে ধরা যায়। 'ময়নামতীর গানে' নটীদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞানের উল্লেখ থেকেও স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ময়নামতীর গানে হীরামতির ছন্দোবদ্ধ ধাঁধার উল্লেখ প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে।[২৫] তাছাড়া ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত

লাউসেনের প্রতি সুরিক্ষা যে সব কঠিন প্রশ্ন করেছিল, তাও আমাদের আলোচ্য যুগে স্ত্রী-শিক্ষার স্বপক্ষে রায় দেয়।[২৬]

পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন ধরনের যাত্রা, কীর্তন, কথকতা, ব্রতকথা, রূপকথা, পটদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমেও বাঙালী নারীরা যেমন নৈতিক শিক্ষার সুযোগ লাভ করত, তেমনি শাস্ত্রীয়, পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী সম্পর্কে জানার সুযোগ পেত। এই সকল মাধ্যমগুলিও লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করত। বোধকরি সেইজন্যই ব্যাধ-রমণী ফুল্লরা পৌরাণিক কাহিনী উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে পেরেছিল।

মধ্যযুগে হিন্দু নারীদের শিক্ষাপ্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষারও প্রচলনও ছিল। চন্দ্রাবতী, মাধবী, জাহ্নবীদেবী ও বিদ্যা প্রমুখ তার উজ্জ্বল নিদর্শন। উচ্চ শিক্ষার্থীদের দর্শন, ব্যাকরণ, অঙ্ক, নাটক, অলঙ্কার, সঙ্গীতবিদ্যা, কাব্য এবং শাস্ত্র ও পুরাণ-বর্ণিত নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে হত। উচ্চশিক্ষার এই পাঠক্রম ছেলেদের শিক্ষাপ্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্যগুলিতে উল্লেখ রয়েছে।[২৭] অনুমান করা চলে যে এই একই পাঠক্রম মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রচলিত ছিল।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে আসা চলে যে, স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন কেবলমাত্র হিন্দুসমাজের উচ্চ-কোটি শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—তার ব্যাপ্তি সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেও ছিল। অবশ্য আমাদের আলোচ্য যুগে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন যে ছিল তার সাহিত্যিক প্রমাণ না পাওয়া গেলেও অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ছিল তা অনুমেয়।[২৮] হিন্দু মেয়েরা একদিকে যেমন গুরুগৃহে অবস্থিত পাঠশালা বা টোলে গিয়ে পড়াশুনা করত, তেমনি সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের মেয়েদের গৃহশিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হত।

আক্ষরিক শিক্ষা ছাড়া দৈহিক শিক্ষা (প্রসঙ্গত ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত রাজা হরিপালের কন্যা কানাড়া এবং কালু ডোমের স্ত্রী লখাই-এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে), সূঁচের কাজ ও চিত্রাঙ্কন,[২৯] (ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত সুরক্ষার কথা উল্লেখ্য), গান,[৩০] নাচ (বেহুলার কথা স্মরণ করা যেতে পারে), চিত্রাঙ্কন আলপনা[৩১] (এ প্রসঙ্গে ময়মনসিংহ গীতিকায় বর্ণিত কাজলরেখার ভূমিকা স্মরণীয়) ইত্যাদি শিক্ষাদানের সুবন্দোবস্ত ছিল তার সাহিত্যিক প্রমাণও পাওয়া যায়। পর্দাপ্রথা ও বাল্যবিবাহের প্রচলন থাকলেও—মধ্যযুগে বাংলাদেশে হিন্দু মেয়েদের শিক্ষা সমাজে একেবারে উপেক্ষণীয় ছিল না।

সূত্রনির্দেশ

১ গোপীচন্দ্রের গান, (সম্পাদনায়) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃ ৩৭০-৩৭১

২ ঠাকুরমার ঝুলি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ষোড়শ সংস্করণ, বাং সন ১৩৬৪

৩ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : বঙ্গের মহিলা কবি, কলকাতা, বাং সন ১৩৬০, পৃ ১৫

৪ আহমদ শরীফ : মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, মুক্তধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৭৬, পৃ ৩০৩

৫ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ ৭২০

৬ ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, (সম্পাদনায়) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, বাং সন ১৩৫৭, পৃ ২৩২-২৩৩

৭ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ১১ ; সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৪০, পৃ ৪৬১, ৪৭২-৪৭৩ ; দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, ১৯৩৫, পৃ ৯১০ ; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৯৫০, পৃ ২৮১ এবং বাংলার পুরনারী, ১৯৩৯, পৃ ১০৭

৮ দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃ ৯১০

৯ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৩ ; দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৯৫০, পৃ ৩১০ ; Margaret Macnical (Ed.), Poems by Indian Women, New York, 1923, pp 32-33

১০ বিমানবিহারী মজুমদার, গোবিন্দ দাশের পদাবলী ও তার যুগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১, পৃ ৪৫২ ; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, বাং সন ১৩৭৮, পৃ ২৪৫

১১ দ্বিজমাধব : মঙ্গলচণ্ডীর গীত, (সম্পাদনায়) সুধীভূষণ ভট্টাচার্য, ২য় সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫, পৃ ১০৯

১২ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : কবিকঙ্কন চণ্ডী, বসুমতী সংস্করণ, বাং সন ১৩৭০, পৃ ১১০

১৩ আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩২৭

১৪ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, পৃ ২৮৭

১৫ ঐ, পৃ ২৯২

১৬ রূপরাম চক্রবর্তী : ধর্মমঙ্গল (১ম খণ্ড), সম্পাদনায় শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল ও সুনন্দা সেন, এপিক পাবলিশার্স, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৬৩, পৃ ৪৯

১৭ ময়মনসিংহ গীতিকা ছাত্র সংস্করণ, (সম্পাদনায়) সুখময় মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ ৮২

১৮ ঐ, পৃ ৮৬

১৯ ঐ (শেষার্ধ), পৃ ১৩

২০ ঐ (ছাত্র সংস্করণ), পৃ ১৭৪

২১ রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী (বিদ্যাসুন্দর), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ ১৪

২২ দোনাগাজী চৌধুরী : সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল কাব্য থেকে ডঃ আহমদ শরীফের মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, পুস্তক উদ্ধৃত, পৃ ৩২৭

২৩ দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত রচিত অ্যাসপেক্টস অব বেঙ্গলী সোসাইটি ফ্রম ওল্ড বেঙ্গলী লিটারেচার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৫, পৃ ১৯১

২৪ দ্বিজ মাধব : মঙ্গলচণ্ডীর গীত, পৃ ৬২-৬৩

২৫ তমোনেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৯২

২৬ মানিকরাম গাঙ্গুলী : ধর্মমঙ্গল, সুরিক্ষার পালা, দ্রষ্টব্য, সম্পাদনায় বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ ২৬৫-২৭৬ (সর্বশাস্ত্র জানে সেই সুরিক্ষা বেউশ্যা, পৃ ২৭৩)

২৭ দ্বিজ মাধব : প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৩৭-২৩৮ ; মুকুন্দরাম : প্রাগুক্ত গ্রন্থ (বসুমতী সংস্করণ), পৃ ১৭১

২৮ ইলা মুখার্জী, সোস্যাল স্ট্যাটাস অব নর্থ ইণ্ডিয়ান উইমেন, ১৫২৬-১৭০৭, আগ্রা, ১৯৭২, পৃ ৯৪-১০৯

২৯ দশরাম চক্রবর্তী : ধর্মমঙ্গল, (সম্পাদনায়) পীযূষকান্তি মহাপাত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃ ১২৩-১২৪

৩০ বিমানবিহারী মজুমদার, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪৫৩

৩১ ময়মনসিংহ গীতিকা (ছাত্র সংস্করণ), পৃ ১৫৬

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বাংলায় নারী আন্দোলন

প্রভাতকুমার সাহা

১৫শ শতকে সমস্ত ভারতবর্ষে যে ভক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল তারই সূত্র ধরে বাংলাদেশে নারী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের নারী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, ধারা ও সংগঠনকে আধুনিককালের সঙ্গে কোনভাবেই তুলনা করা চলে না। তথাপি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে যে নারী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার গুরুত্ব কোন অংশেই কম ছিল না।

মধ্যযুগের বাংলাদেশ ছিল রঘুনন্দনের স্মৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ। মেয়েরা ছিল অন্তপুরিকা, সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, পুরুষের বহুবিবাহ ইত্যাদি ছিল এই যুগের বৈশিষ্ট্য। জাতিভেদপ্রথা, তান্ত্রিক আচার-আচরণ ইত্যাদি বাংলাদেশে অচলায়তনের মত চেপে বসেছিল। পর্দাপ্রথা বাঙালী নারীকে করে তুলেছিল অসূর্যম্পশ্যা। তাকে বাল্যকালে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন এবং বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন থাকতে হত। নারী-স্বাধীনতা বলে কোন কিছুই ছিল না।

এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভক্তি আন্দোলনের সূচনা, বৃদ্ধি এবং অবলুপ্তি। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও বাংলাদেশের মত ভক্তি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে (বাংলাদেশের ভক্তি আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা "ইতিহাস অনুসন্ধান ১৯৮৭"তে করেছি)। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ভক্তি আন্দোলনের নেতৃবর্গ যেমন নির্গুণ সাধক সম্প্রদায়, কবীর, তুলসীদাস, দাদু দয়াল প্রভৃতি নারীকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তাঁরা নারীকে দূরে সরিয়েই রাখেন নি নারীর প্রতি ঘৃণাও বর্ষণ করেছেন।[১] কবীর লিখেছেন "she is more horrible than hell, and one who is used by all."[২] তুলসীদাসও প্রায় একই কথা বলেছেন। মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল "a woman is worse than a poisonous snake and one has to be aware of their poison. Once she entraps a man it is difficult to be free."[৩] তাই বলা যায় ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে ভক্তি আন্দোলন তার ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্থাৎ সামাজিক সংস্কার ও মুক্ত মনের আবহাওয়া তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ইতিহাস বিভাগ, আমতা কলেজ, হাওড়া

যদিও বা অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়েছিল তা অচিরেই প্রথাগত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। পাশাপাশি যে সূফী ধর্মমত যা এই সময় ভারতবর্ষে ব্যাপক-ভাবে প্রচারিত হয়েছিল এবং যার মধ্যে মুক্ত পন্থা সৃষ্টির অবকাশ ছিল বেশী তাও আউল-বাউলের মাধ্যমে সমাজচ্যুত হয়ে পড়ে। আশ্রয় নেয় সমাজের এক কোণে।[৪] ভারতবর্ষের চিরাচরিত ছবির কোন পরিবর্তন হয় নি।

কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা ছিল ভিন্ন ধরনের। এখানে চৈতন্য আন্দোলন যতটা না ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলন ছিল তার চেয়েও বেশী ছিল সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন। স্বয়ং চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দপ্রভু, বীরচন্দ্র বা শ্রীনিবাস আচার্য কেইন সামাজিক সংস্কারের গুরুত্বকে হ্রাস করে দেখেন নি।[৫] চৈতন্যদেব আচণ্ডালকে হরিনাম দিয়ে সমাজে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। আবার বিধর্মী মুসলমানকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন চৈতন্যদেব এবং পরবর্তী বৈষ্ণব নেতৃবৃন্দ। এর ফলে বাংলাদেশের সমাজে মুক্ত হাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এই মুক্ত হাওয়াকে সুদূর গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। তাই বৈশাখের প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামে গ্রামে খোলকর্তাল সহ হরিনামের আওয়াজ শোনা যেত। এখনও শোনা যায়। এই মুক্তপন্থার ঝোড়ো হাওয়া মধ্যযুগের অচলায়তনকে ভেঙে ফেলতে পারে নি কিন্তু তাতে ফাটলের সৃষ্টি করেছিল।

আর এই মুক্তপন্থার পালে ভর করে মহিলারাও অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং নারী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের নেতৃবর্গ যেখানে মহিলাদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন চৈতন্যদেব সেখানে তাঁদের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। নারায়ণী দেবীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা[৬] বা পুরীতে দেবদাসী লাবণ্যের প্রতি গভীর মমতা[৭] মহিলাদের প্রতি চৈতন্যদেবের গভীর শ্রদ্ধার ইঙ্গিত দেয়। তাঁরা উপলব্ধি করেন সমাজে নারীদের স্থানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁরা বৈষ্ণবসমাজে নারীদের সমানাধিকার দিয়েছিলেন। যোগ্যতা থাকলে গুরুত্বপূর্ণ পদে (অবশ্যই বৈষ্ণব মঠ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে) অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসে এই ঘটনা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল বলেই বাংলাদেশে নারী আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল। বাঙালী মহিলাগণ তাঁদের ক্ষমতার শীর্ষে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলার সমাজকে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন।

যে সমস্ত মহিলা ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন জাহ্নবাদেবী, হেমলতা ঠাকুরাণী, সীতাদেবী, ঈশ্বরী ঠাকুরাণী প্রভৃতি। এদের মধ্যে জাহ্নবাদেবী

এবং হেমলতা ঠাকুরাণীই বাংলার সমাজে বিশেষ পরিচিতা। জাহ্নবাদেবী দেবী ছিলেন নিত্যানন্দের স্ত্রী এবং হেমলতা ছিলেন শ্রীনিবাসের কন্যা। উভয়েই মঠ বা আখড়ার মাধ্যমে নারীপুরুষ-নির্বিশেষে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে শিষ্যতে গ্রহণ করতেন ও হরিনাম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উদারতার বীজ বপন করেছিলেন।

নিত্যানন্দের তিরোধানের পর জাহ্নবাদেবী খড়দহের বৈষ্ণবসমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। জাহ্নবাই সর্বপ্রথম ঈশ্বরী বা গোস্বামীনী বলে পরিচিত হন।[৮] খড়দহে তাঁর পাঠ হলেও তিনি সমস্ত বৈষ্ণবসমাজে নেতৃস্থানীয়া ছিলেন। খেতুরী উৎসবেও তাঁর স্থান ছিল অতি উচ্চে।[৯] আবার বৃন্দাবনের গোস্বামীগণও তাঁকে অতি উচ্চে স্থান দিতেন।[১০] এককথায় তিনি বৈষ্ণবজগতে এবং বাংলায় সামাজিক জগতে নিজের অবিসংবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলেই মনে হয়।

জাহ্নবাদেবী বাংলাদেশে সামাজিক ভেদাভেদ দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সমাজের উপরতলা থেকেই তিনি এ কাজ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। সে যুগে রাঢ়ী এবং বারেন্দ্রী শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল না। জাহ্নবাদেবী এই বাধা ভেঙে দিতে নিত্যানন্দ প্রভুকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। তিনি নিজ কন্যা গঙ্গাদেবীর সঙ্গে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মাধবাচার্যের বিবাহ দিয়েছিলেন।[১১] তাঁর এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তৎসময়ে এবং পরবর্তীকালে রাঢ়ী এবং বারেন্দ্রীর মধ্যে অনেক বিয়ে হয়েছিল। বৈষ্ণব আকরগ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ[১২]

"রাঢ়ী বরেন্দ্রে বিয়ে হৈয়াছে অনেক।
দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক।।"

সে যুগের পক্ষে এই সংবাদ ছিল বিস্ময়কর।

বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে এক বিশেষ সম্প্রদায় বা বৈরাগী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই বৈরাগী সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাংলাদেশে নেহাৎ কম ছিল না। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বেভারিজের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় সেই সময় বিভিন্ন জেলায় তাদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ[১৩]

জেলা	বৈরাগীর সংখ্যা (১৮৭২ খ্রীঃ)	জেলা	বৈরাগীর সংখ্যা (১৮৭২ খ্রীঃ)
বর্দ্ধমান	৩৭,৩৭২	মেদিনীপুর	৯৬,৩৭৮
বাঁকুড়া	১০,২৫০	হুগলী	২৩,৩৭৩
বীরভূম	২৩,২৪৩	নদীয়া	১৬,৮৪৮

(এখানে মাত্র ছয়টি জেলার হিসাব দেওয়া হ'ল)

এই বৈরাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কে বা প্রাকবিবাহ সম্পর্কে উদারতা দেখা যায়। অন্যান্য জাতির (caste) মধ্যে বিবাহ পদ্ধতিতে যে জটিলতা দেখা যায় তা এদের মধ্যে ছিল অনুপস্থিত। এই সম্প্রদায়ের বিবাহ-পদ্ধতি ছিল এইরূপ ঃ বিবাহের পূর্বে চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে মালসা ভোগ ও ফুল দেওয়া হয়। তারপর খোলকর্তাল সহযোগে সংকীর্তন আরম্ভ হয়। এরপর কন্যার অভিভাবক পাত্রীকে ডান হাত ধরে পাত্রের সম্মুখে নিয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে তখন ফুলের মালা ও কাঠের মালা বদল হয়। একেই কণ্ঠী-বদল বলা হয়। বিবাহের এই সরলীকরণের ফলে বৈষ্ণবসমাজে উদারতার সৃষ্টি হয়। বিধবারাও পুনর্বিববাহ করতে পারতেন। দ্বিতীয় স্বামী নির্বাচনে কোনরূপ বাধানিষেধ ছিল না। তবে বিধবাদের বিবাহও কণ্ঠীবদলের মাধ্যমেই হত। বৈষ্ণবসমাজে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বিবাহবিচ্ছেদও হত।[১৪] এর ফলে সমাজে নারীদের হেয় চক্ষে দেখা হত না। সুতরাং বলা যায় জাহ্নবাদেবী নিজ কন্যার বিবাহের মাধ্যমে যে প্রথার প্রচলন করতে চেয়েছিলেন তা বৈষ্ণবসমাজে তো বটেই এমনকি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে (বিশেষত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে) ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জাহ্নবাদেবী এবং হেমলতা ঠাকুরানীর প্রচেষ্টাতেই এই আন্দোলন বোধ করি নারীসমাজে গভীর পরিবর্তন এনেছিল।

মধ্যযুগের নারী আন্দোলনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল নারীশিক্ষার সম্প্রসারণ। জাহ্নবাদেবীই এ সম্পর্কে পথিকৃতের কাজ করেন। তিনি বহু মহিলাকে বাংলা ও সংস্কৃত শেখাতেন। ফলে খড়দহের শ্রীপাটে উন্নত সংস্কৃতমনা গোস্বামীনীর আবির্ভাব ঘটে। এই গোস্বামীনীগণ তাঁদের শিক্ষাকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী এবং অঞ্চলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। অষ্টাদশ ও ঊন-বিংশ শতাব্দীতে খড়দহের মহিলা গোঁসাইগণ কলকাতার সমাজে শিক্ষিকা হিসাবে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।[১৫]

শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানীও বাংলাদেশের সমাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তবে জাহ্নবাদেবীর মত তাঁর প্রভাব এত ব্যাপক ছিল না। কিন্তু তিনি শিক্ষিতা ছিলেন। বৈষ্ণব ইতিহাস সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান ছিল। যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দ গ্রন্থ থেকে তাঁর এই জ্ঞানের কথা জানা যায়। তিনি মানবী বিলাস নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন (পুস্তকটি বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত)। হেমলতা ঠাকুরানী মুর্শিদাবাদ জেলার তেলিয়াবুধুরীতে থাকলেও বিষ্ণুপুরের পাটেও নেতৃত্বে ছিলেন।[১৬] বহু মহিলাকে তিনি শিষ্যা করেন এবং তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করেন। তবে তিনি এবং তাঁর বংশধরেরা

বিষ্ণুপুরের রাজ-অন্তঃপুরের মহিলাদের শিক্ষাদীক্ষার ভার বহন করেছিলেন।[১৮] রাজান্তপুরে তাঁরা মা গোঁসাই নামে পরিচিত ছিলেন। বোধকরি এই থেকে বৈষ্ণবসমাজে গুরুমা সম্প্রদায়ের (Institution) উদ্ভব হয়েছিল। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষায় রাজান্তপুরের মহিলাগণ প্রগতিশীলা হয়ে ওঠেন। মন্দির স্থাপন করেন। এই মহিষীগণ নিজেদের "উন্নতাশায়া"[১৮] এই অভিধায় ভূষিত করেন। বাংলাদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি মহিলাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের অন্দরমহলের মানসিকতায় নিঃশব্দে পরিবর্তন ঘটে যায়। অন্দরমহলে ধর্মগ্রন্থ পাঠের প্রবণতা এই সময় থেকেই বৃদ্ধি পায়।

জাহ্নবাদেবী এবং হেমলতা ঠাকুরানী সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা এবং উদারপন্থার হাওয়া ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন দুইভাবে—গ্রামে গ্রামে আখড়া বা মঠ স্থাপন করে এবং শিষ্য-প্রশিষ্য তৈরী করে। আখড়া স্থাপন করার উদ্দেশ্য ছিল আখড়াতে বিগ্রহ স্থাপন করে স্থানীয় জমিদার বা রাজার নিকট থেকে দেবোত্তর এবং বৈষ্ণবোত্তর সম্পত্তি লাভ করে একে ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করা। দেবোত্তর এবং বৈষ্ণবোত্তর সম্পত্তি লাভের ফলে আর্থিক দিক থেকে আখড়াগুলিকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় নি। তার ফলে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক চর্চায় কোন ভাটা পড়ে নি। হেমলতা ঠাকুরানী এবং তাঁর শিষ্যাদের নেতৃত্বে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বেশ কয়েকটি আখড়া বা মঠ গড়ে উঠেছিল। এগুলি হল অবন্তিকা, মেবালা, দ্বারিকা, কোঠা, লয়ের[১৯] প্রভৃতি। আবার মুর্শিদাবাদ জেলায় বুধুইপাড়াকে কেন্দ্র করে নিয়াল্লিশপাড়া, কুমারপুর, মহুলা রায়পুরে[২০] শ্রীপাঠ গড়ে উঠেছিল। জাহ্নবাদেবীর আখড়া ছিল বোরাকুলি, চুনাখালি, বাজিৎপুর[২১] প্রভৃতি স্থানে। এই আখড়াগুলি গোস্বামীনীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এগুলিতে ঠাকুরসেবা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ যেমন চলত তেমনি শিক্ষাদানের কাজও চলত। তবে প্রাথমিক শর্ত ছিল বোধহয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করা। আশ্রমবাসিনী শিষ্যারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করত। আবার আশ্রমবাসিনী এবং গৃহীশিষ্যাদের বৈষ্ণব জগতের নতুন নতুন তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য মাঝে মাঝেই ভিন্ন আখড়ায় এবং শ্রীপাটে মহোৎসবের আয়োজন করা হত। এই সমস্ত মহোৎসবে বিভিন্ন আখড়ার যশস্বী মহান্তগণ পাট এবং ব্যাখ্যা শোনাতেন। তত্ত্ব কথা আলোচনা হত ইত্যাদি।

এইভাবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালী বৈষ্ণব মহিলাদের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের মধ্যে জাতিভেদপ্রথা শিথিল হয়েছিল, শিক্ষাদীক্ষার প্রসার হয়েছিল এবং পর্দাপ্রথাও শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

হেমলতা ঠাকুরানী পরকীয়া তত্ত্বের উপর গ্রন্থ লিখেছিলেন। বিষ্ণুপুরের মহিষীগণ পদ রচনা করেছিলেন। চন্দ্রাবতী, ঈশ্বরী প্রমুখ বৈষ্ণব মহিলা কবিগণও পদ রচনা করেছিলেন। সপ্তদশ অষ্টাদশ-শতাব্দীতে কুসংস্কার এবং নৈতিকতা শিথিল হয়ে গিয়েছিল তখন বাংলাদেশে বৈষ্ণব মহিলাদের মধ্যে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক সংস্কারের প্রতি আকর্ষণ ও নেতৃত্বদান নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এই পরিবর্তনকে নিঃশব্দ নারী আন্দোলনের ফল বলেই অভিহিত করা বোধহয় সমীচীন হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মহিলারা অর্থাৎ জাহ্নবাদেবী এবং হেমলতা ঠাকুরানী কিভাবে বা কেমন করে বাংলাদেশের সামাজিক সংস্কারে নেতৃত্বলাভ করেছিলেন। প্রথমেই যে ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে তাহল এই সময়ে বাংলাদেশে বৈষ্ণবসমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার মত লোকের অভাব। নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস, নরোত্তম বা শ্যামানন্দের পর বাংলার বৈষ্ণবজগতে নেতৃত্ব দেওয়ার মত লোক ছিল না। ফলে জাহ্নবাদেবী বা হেমলতা ঠাকুরানীর পক্ষে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় নি। আবার জাহ্নবাদেবীর ক্ষেত্রে যেটা সুবিধে হয়েছিল তাহল তিনি ছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর স্ত্রী। সুতরাং সকলের তিনি মান্যা ছিলেন। অনুরূপভাবে হেমলতা ঠাকুরানীও ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা। তিনিও বৈষ্ণবসমাজের মান্যা ছিলেন। তাঁর পক্ষেও নেতৃত্ব গ্রহণে কোন অসুবিধা হয় নি। উভয়েই নিজেরা কোন বৃহত্তর সংগঠন গড়ে তোলেন নি। উত্তরাধিকারসূত্রে যে পাট পেয়েছিলেন তাকেই রক্ষা এবং কিছুটা বর্দ্ধিত করেছিলেন মাত্র। তাছাড়া তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্র এবং শিক্ষাগতাও বাংলার বৈষ্ণবসমাজে তাঁদের নেতৃত্ব নিতে সাহায্য করেছিল। সবশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তৎকালীন স্থানীয় রাজা বা জমিদাররাও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। বনবিষ্ণুপুরের রাজারা হেমলতা ঠাকুরানীর এবং সন্তোষ বা অন্যান্য অঞ্চলের রাজারা জাহ্নবাদেবীকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের এই সাহায্য বাংলার বৈষ্ণবজগতে পরিবর্তন ঘটাতে অশেষ সাহায্য করেছিল।

সূত্রনির্দেশ

১ Proceedings of Indian History Congress, Vol. 48, p 219

২ Ibid

৩ Ibid

৪ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ; ভূমিকা

৫ প্রভাতকুমার সাহা

৬ বৃন্দাবন দাস : শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড

৭ ঐ, অন্ত খণ্ড

৮ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩ খণ্ড, (১৯৬৬), পৃ ৫২০

৯ নিত্যানন্দ দাস : প্রেমবিলাস, বিলাস ১৪ ও ১৫ এবং নরহরি দাস : নরোত্তম বিলাস, বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ, পৃ ৭২-৭৩

১০ ঐ

১১ নিত্যানন্দ দাস : প্রেমবিলাস, বিলাস ১৯

১২ ঐ

১৩ H. Beverige : Census Report 1872

১৪ H. H. Risley : The Trilees & Castes of Bengal, Vol. 2, (Calcutta, 1981) p 341

১৫ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ, পৃ ৫২১

১৬ মানিকলাল সিংহ : পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, পৃ ৩১৫

১৭ ঐ, পৃ ৩৩২

১৮ বিষ্ণুপুরের গোয়ালপাড়ায় অবস্থিত মদনগোপাল মন্দিরের শিলালিপি

১৯ Field Works done on 23. 8. 74, 25. 8, 74, 16. 5. 78, 18. 5. 78, 19. 8. 81, 20. 8. 81, 16. 7. 83 & 18. 7. 83

২১ Field Works done during the Summar Vacation of 1986

২২ Field Works done during the Summar Vacation of 1985

সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয়দের জীবনযাত্রা

শ্রাবণী বসু

বাংলাদেশে ইউরোপীয়গণের আগমন সম্পর্কে সাধারণ ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়—(ক) তারা মুখ্যতঃ বাণিজ্যের জন্য বাংলাদেশে আগমন করেন এবং (খ) খৃষ্টধর্ম সম্প্রসারণ ও প্রচারের জন্য বেশ কিছু ইউরোপীয়গণের আগমন হয়।[১] সাধারণতঃ ইউরোপীয়দের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যে সূত্রগুলো আমরা পেয়ে থাকি, সেগুলো মূলতঃ ইউরোপীয়দেরই লেখা। এক্ষেত্রে দেশীয় সূত্রগুলো ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে কিছু তথ্য তুলে ধরে, যেহেতু বাংলাদেশেই প্রথম ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয় সেইহেতু বাংলা সাহিত্য একটি অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান।

বাংলাদেশে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের কাল সাধারণসম্মত অষ্টাদশ শতাব্দী হলে সপ্তদশ শতকের সূত্রগুলো প্রাক উপনিবেশকালে ইউরোপীয়দের প্রভাব আমাদের আলোচ্য সূত্রগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন "মঙ্গলকাব্য", যদিও সাহেবদের জীবনধারা আলোচনা এইসব মঙ্গলকাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, (যা গ্রাম্য ছড়া, গাথায় অত্যন্ত স্পষ্ট), লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্মই মঙ্গলকাব্য-গুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য, তবুও বেশ কিছু মঙ্গলকাব্যে এক বা একাধিকবার এইসব বিদেশীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এর থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যাচ্ছে এইসব বিদেশীগণ আর শুধুমাত্র বণিক-ব্যবসায়ী নয়, ক্রমশঃ এরা বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলছেন।

বাংলা সাহিত্যের উপাদান থেকে এইসব বিদেশীদের জীবনযাত্রার দুটি দিক আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে—(ক) অত্যাচারী জলদস্যু, অসাধু ব্যবসায়ী, প্রতারক ; (খ) রাজার পৃষ্ঠপোষক, অভিজাতদের সমকক্ষ এবং সমাজের কতকগুলো গঠনমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত।

প্রথমেই উল্লেখ করা যাক প্রাক ঔপনিবেশিককালে তাদের আধিপত্য বিস্তার—প্রথমদিকে এরা ব্যবসার জন্য এদেশে এলেও ক্রমশঃ এরা বাংলাদেশে নিজেদের সুরক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন দূর্গ নির্মাণ আরম্ভ করেন। ঐতিহাসিক

গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

স্টুয়াট থেকে প্রায় সকল ঐতিহাসিক এই কথার উল্লেখ করেছেন।[২] সপ্তদশ শতকের কবি "রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল" কাব্যে এর উল্লেখ আছে—

"ছাড়িল বিজয়পুর হার্মাদের থানা"[৩]

এইভাবে নিজেদের সুরক্ষিত করার পর স্থায়ীভাবে এদেশে তাদের বসতি গড়ে ওঠে, রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে এদের বসতির একটা সুন্দর ছবি আমরা পাই—

"হুজুরা দরগা দেখি ফিরিঙ্গির ঘর"[৪]

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন—

"দক্ষিণে ফিরিঙ্গিপাড়া তার আগুয়া কেতারা
বামদিকে থাকে দণ্ডঝোরা"[৫]

এর থেকে প্রমাণিত হয় সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয়গণ বাংলাদেশে ভালভাবেই তাদের অধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হন।

এবার আসা যাক তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির কথায়—ইউরোপীয়গণ তৎকালীন বাংলার নবাব ও স্থানীয় শাসকগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। প্রতাপাদিত্যের সেনাবাহিনীতে যে তারা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন "চন্দ্রদ্বীপের ঘটককারিকায়" তার উল্লেখ আছে—

পূর্ব্বস্যাং দিশেচৈবাস্তে দুর্ভেদ্যা দুর্গমন্তুতং
ফেরঙ্গবলিভিঃ সম্যক রক্ষিতং কূটযোদ্ধৃভি ।।[৬]

* * *

মামুদং হতমালোক্য মানো দুঃখেন পীড়িতঃ
রূজমাক্রম্য বলিভি র্হাবসী সৈন্য সমাবৃতঃ ।।
রাজপুত্রৈর পগনৈর্দ্দশভিশ্চামিরৈ র্যুতঃ
রূজ সৈন্যগনান্ শূরো নিজ থান বহূন রণে ।"[৭]

এইভাবে ক্রমশঃ তারা বাংলায় অভিজাতদের সমকক্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ফৌজ মিছিলে রাজার ন্যায় প্রথম সারিতে তাদের অংশগ্রহণ করার কথা সপ্তদশ শতকের কবি "রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল" কাব্যে উল্লেখ আছে—

"ফিরাঙ্গি সভার আগে পক্ষরাজ ঘোড়া
শোভা করে হাথ্যার সুবর্ণ জামা জোড়া ।"[৮]

আরাকান রাজসভায় তারা এত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন যে পর্তুগীজ বীর সাবাস্টিয়ান গঞ্জালভেস টিবো আরাকান রাজের কন্যাকে বিবাহ পর্যন্ত করেছিলেন।[৯] আলাওল তাঁর "পদ্মাবতী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

"না পাইল সৎপদ আছে আঙ্গলেস"[১০]

অর্থাৎ তিনি সদ্‌পদ না পাবার জন্য গঞ্জালভেসকে দায়ী করেছেন।

ইউরোপীয় যোদ্ধাগণ তাদের বীরত্বের জন্য রাজাদের আনুগত্য লাভ করলেও, তাদের এই বীরত্ব সাধারণ মানুষের ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দ্বিজরামদেবের "দুর্গামঙ্গল" কাব্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"কামান পাতিয়া আছে ফিরিঙ্গী ফরাস
দেখে কাঁপে কায়, যায় জীবনের আশ ॥
ঘন ঘন গোলা ছোটে চোটে ফাটে মাটি
ক্ষণেকে ক্ষণেকে জায় ঢাকে কাটী।"[১১]

এইসব বিদেশীদের আগমনের ফলে বাংলার সবচেয়ে যা ক্ষতি হয়েছিল তা হল বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা। ক্রমশঃ বাংলার ব্যবসাবাণিজ্য, বহিঃ-বাণিজ্য বিদেশী আগন্তুকদের হাতে চলে যেতে থাকে। অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী এবং এই সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে যাঁরাই কাজ করেছেন তাঁরা সকলেই এই মত পোষণ করেছেন। বড় বড় জাহাজে করে তাঁরা দ্রব্যসামগ্রী আমদানী-রপ্তানী করতেন এবং এর ফলে তাঁরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করতেন। ইউরোপীয়গণের ব্যবসার চিত্র ও তাদের ঐশ্বর্যের কথা আমরা সপ্তদশ শতকের কবি "রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল" কাব্যে পাই—

"হুজুরা দরগা দেখি ফিরিঙ্গীর ঘর
সমুখে জাহাজ বান্ধা কড়ির বন্দর"[১২]

ইউরোপীয়গণের এদেশে এক বিরাট সমস্যা ছিল ভাষা সমস্যা, রামদাস আদকের অনাদি মঙ্গল কাব্যে এর পরিচয় মেলে—

"ফরাঙ্গা ফারাস সাজে নাহি বুঝে বোল"[১৩]

কাজেই আভ্যন্তরীণ ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয়গণকে এদেশীয় কিছু লোকের উপর নির্ভর করতে হয়। এর ফলে সৃষ্টি হয় দালাল শ্রেণী। সপ্তদশ শতকে লিখিত এইরকম এক চুক্তিপত্র থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—

শ্রীকৃষ্ণ

সখি শ্রীধর্ম

শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল, মহাসহেষু—

লিখিত শ্রীকৃষ্ণ দাস ও নরসিংহ দাস আগে আমরা দুই লুকে, করার করিলাম জে কিছু বারে (=কারেও) সুনা, রগায় ও গরখ(ও) রিকরি সকারত ২দ্ব (=দু)'ই রূপাইয়া করি আ আরত দালালি লইব, আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নি, অ মে করা[র] দিলাম স ১১০৩ (৩০১৪ আ) গ্রান—[১৪]

ব্যবসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা এদেশে দাস-ব্যবসা শুরু করেন, যা তাদের

আয়ের অন্যতম উৎস বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মনে করেন।[১৫] সপ্তদশ শতকে রচিত "নসরমালুম" পালা গানে এই চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"নহররে বেচিবারে পাইল বহু দাম
হার্ম্মাদ্যরা চলি আইল যে যার মোকাম।"[১৬]

ক্রমশঃ এই সকল বিদেশীগণ ভীষণ ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন এবং বাংলায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। এমনকি বাংলার সাধারণ মানুষের উপর স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তারা অত্যাচার চালাতে থাকে। এই সকল দস্যুগণের অবিকল প্রতিমূর্তি আমরা "নসরমালুম" পালা গানে পাই। এরা কালো পাগড়ী ও রাঙ্গা কোর্তা পরত, দুরবিন হাতে শ্যেন পাখীর মত বাণিজ্য যাত্রীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। তাদের হাতে থাকত বন্দুক, কোমরে ছোরা। গ্রামীণ গৃহবধূ ধরে নিয়ে যাবার চিত্রও পল্লীগাথায় ফুটে উঠেছে।[১৭] কোন কোনটিতে হৃতা রমণী তাঁর স্বামীকে স্মরণ করে বিলাপ করছেন—"অভাগিনীকে মনে রাখিও। ঘাটে আমার কলসী পড়িয়া রহিল, আমার হাতের কঙ্কন ফেলিয়া আসিয়াছি; আমাকে মনে করিয়া দুঃখ হইলে কঙ্কন ও কলসী তোমার হাত দুখানি দিয়া ছুঁইও"[১৮] ইত্যাদি। সপ্তদশ শতকে রচিত কবি কণ্ঠহার প্রণীত স্ববৈদ্য কুলপঞ্জিকার একটা শ্লোকে জানা যায় মগ ও তার সঙ্গী ফিরিঙ্গিরা বৈদ্যজাতির একজনের পুত্রকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাতে তার বংশ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়—

"মহেশ সেন জাভুর্ড়গোপীনাথাৎ সুতোহ ভাবৎ,
চাটীগ্রাম মসোনীতো বনান্বয় চসূচটর"[১৯]

মগগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে পর্তুগীজরা বাংলায় ব্যাপক অত্যাচার করতে থাকে, মগগণ গ্রাম্য গৃহস্থবধূদের এইসব বিদেশীদের জন্য ধরে নিয়ে যেত, গ্রামীণ গাথায় এই চিত্র ফুটে উঠেছে—

"বাসনায় লইয়া যায়, বৈদেশী বন্ধুর নায়,
আরে, কইও কইও গো খপর গো শ্বশুরের আগে ;—
আমায় যেন তালস করে গাঙ্গের কূলে কূলে রে।"[২০]

বিদেশী জলদস্যুগণ যে কি পরিমাণ অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল সপ্তদশ শতকের কবি আলাওলের পদ্মাবতী গ্রন্থে তা ফুটে উঠেছে—

"কার্যগতি যাইতে পন্থে বিধির ঘটন
হার্ম্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন
বহুযুদ্ধে আছিল শহীদ হৈল তাত
রণক্ষেতে ভোগ যোগে আইলুম এযত"[২১]

এইসব ইউরোপীয়গণের আর একটা বৃহৎ উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টধর্ম সম্প্রসারণ করা। এর জন্য বহু পাদরীর আগমন ঘটে। জ্যারিখের বর্ণনায় দেখা যায় যে সেচ্ছায় বা বলপূর্বক সেইসময় বহু হিন্দু খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এক-দিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামি অন্যদিকে দারিদ্রতা পাদ্রীগণকে দ্রুত ধর্মপ্রচারে সাহায্য করেছিল। পাদ্রীগণের অমায়িক ব্যবহারও দেশীয়গণকে প্রলুব্ধ করেছিল। সপ্তদশ শতকের একজন উল্লেখযোগ্য বাঙালী খৃষ্টান হলেন "দোম আন্তোনিও"। তিনি ছিলেন ভূষণার রাজপুত্র কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেন এবং তাঁর লিখিত "ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদের" মধ্য দিয়ে তিনি হিন্দুধর্মকে খর্ব করে খৃষ্টান ধর্মের সারসত্য প্রদান করেন।[২২] এইভাবে ক্রমশঃ খৃষ্টধর্ম প্রসারের ফলে সর্বধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টায় সপ্তদশ শতকে সহজিয়া বৈষ্ণবদল গড়ে ওঠে। তাদের গানের ভিতর দিয়ে একথা প্রকাশ পায়—

"মগে বলে ফারা তারা, গর্ড বলে ফিরিঙ্গি যারা
খোদা ব'লে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি।"[২৩]

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্ম সকল দিকেই ইউরোপীয়গণ নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। তাদের এই ক্ষমতা বিস্তার দেশীয় শাসকগণ সুনজরে দেখেন নি। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই যে ইউরোপীয়গণকে সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকার দিয়েছিলেন সম্রাট শাজাহান, আওরঙ্গজেব সেই ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধেই অস্ত্র-ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শুধু সম্রাটগণই নন, স্থানীয় শাসকগণও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের ঘটককারিকায় উল্লেখ আছে প্রতাপাদিত্য ফিরিঙ্গীদের শক্তি হ্রাস করেছিলেন—

"ফেরঙ্গ মগ বীর্যাণ্ড যবনস্য বলং তথা'[২৪]

রামচন্দ্রের পুত্র কীর্তিনারায়ণও মেঘনার উপকূল থেকে ফিরিঙ্গীদের বিতাড়িত করে দেন—

"কাত্তিনারায়ণো বীরো মহামানী তদঙ্গজঃ।
জগদেক শূরঃ সোহজি নৌযুদ্ধে সু প্রসিদ্ধকঃ
মেঘনাদোপকূলে স ফেরঙ্গ সৈনিকৈঃ সহ,
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা তীরাৎ সর্বানতাড়য়ৎ"[২৫]

(ঘটকারিকা)

ইউরোপীয়গণ শুধুমাত্র অত্যাচারী এবং জলদস্যুই ছিল না এদের নৈতিক চরিত্রও ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। তাদের ব্যাভিচারী জীবনযাত্রার জন্য এদেশে

"ফিরঙ্গরোগের" সৃষ্টি হয়। কেবলমাত্র ভাবপ্রকাশেই এই রোগের বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। চরক, সুশ্রুত, হারীত প্রভৃতি কোন বৈদ্যকগ্রন্থেই এই রোগের কিছু মাত্র উল্লেখ নেই। সেজন্য নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, পূর্বে এদেশে এ রোগের নামগন্ধও ছিল না, পরে ফিরিঙ্গিগণ এদেশে এসে ঐ রোগের সৃষ্টি করেছিল।

> "গন্ধরোগঃ ফিরোঙ্গ হয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্
> ফিরঙ্গি নো হতি সাসর্গাৎ ফিরিঙ্গিন্যা প্রসঙ্গতঃ ॥
> ফিরঙ্গ সংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যে নৈব যত্তবেৎ
> তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ব্যাধি বিশারদৈঃ ॥"[২৬]

সুতরাং উপসংহারে আমরা একথা বলতে পারি খ্রীষ্টান মিশনারী ও কিছু কিছু ইউরোপীয়দের (বিশেষতঃ ইংরেজদের) ভারতীয়দের সম্পর্কে ব্যক্তিগত সহানুভূতি ছাপিয়ে উঠেছিল লম্পট ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারী রূপ এবং ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই মূলতঃ যে উপনিবেশবাদ বাংলাদেশে কায়েম হয় তার সূত্রপাত বাঙালী জনমানসে যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল উপরোক্ত তথ্য সূত্রগুলো থেকে আমরা তার সম্পর্কে অবহিত হই। এই সূত্রগুলোর গুরুত্ব এখানেই।

সূত্রনির্দেশ

১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ+আধুনিক যুগ) অ্যান অ্যাডভানস্ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া

২ কাম্পোস, হিস্ট্রি অফ দ্যা পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল, লণ্ডন ১৯১৯, পৃ ৪৮ ; বার্ণিয়ার, ট্রাভেলস ইন ইণ্ডিয়া, পৃ ১২২

৩ রূপরাম চক্রবর্তী, ধর্মমঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, কলকাতা ১৩৯৩, পৃ ৩০৫

৪ ঐ, পৃ ৬৭

৫ রূপরাম চক্রবর্তী, ধর্মমঙ্গল, সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, সাহিত্য সভা, বর্ধমান, ১৩৫১, পৃ ৮৯

৬ নিখিল রায়, প্রতাপাদিত্য, কলকাতা, ১৩১৩, পৃ ৩১২

৭ ঐ, পৃ ৩২০

৮ সুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী, ১৩৫২, পৃ ৩৬
৯ বার্ণিয়ার. ট্রাভেলস ইন মুঘল এম্পায়ার, পৃ ১৯৬
১০ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পর্ব, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ ৭৩৪
১১ দ্বিজ রামদেব, দুর্গামঙ্গল, সা-প-প, ৫ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, পৃ ১০
১২ রূপরাম চক্রবর্তী, ধর্মমঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, কলকাতা, ১৩৯৬, পৃ ৬৭
১৩ রামদাস আদক, অনাদিমঙ্গল, ব. সা. প মন্দির, আষাঢ়, ১৩৪৫, পৃ ২০৩
১৪ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ব্রিটিশ মিউজিয়মে কতকগুলি কাগজপত্র. সা. প.প, ৩য় সংখ্যা, সন ১৬২৯, ২৯শ ভাগ, পৃ ১১০
১৫ তপন রায়চৌধুরী, বেঙ্গল আণ্ডার আকবর অ্যাণ্ড জাহাঙ্গীর, কলকাতা, ১৯৫৩, পৃ ২১৫
১৬ দীনেশ সেন, নসর মালুম, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২, পৃ ৪৪
১৭ ঐ, পৃ ৩-৪৪
১৮ দীনেশ সেন, বৃহৎবঙ্গ, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৪২, পৃ ৮১০
১৯ শ্রীসুখবিন্দু সেনগুপ্ত, মগ ও পর্তুগীজের অত্যাচার, ঐতিহাসিক চিত্র, ষষ্ঠ সংখ্যা, পঞ্চম পর্যায়, আশ্বিন, ১৩১৫
২০ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ১ম খণ্ড, পৃ ৪১৮-৪৬৯
২১ আলাওল পদ্মাবতী, আবদুল করিম সম্পাদিত, চট্টগ্রাম বাংলা সাহিত্য সমিতি, ১৯৭৭, পৃ ২৪
২২ দোম আন্তোনিও দো রোজারিয়া, ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ, সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭
২৩ দীনেশ সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৪২, পৃ ৮৯২-৮৯৩
২৪ নিখিল রায়, প্রতাপাদিত্য, কলকাতা, ১৩১৩, পৃ ৩০৫
২৫ ঐ, পৃ ৭৩
২৬ ভাবপ্রকাশ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৮, পৃ ৪৫

মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে কৃষকবিদ্রোহ

কুমুদরঞ্জন দাস

মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে একাধিক কৃষকবিদ্রোহ হয়েছিল, এই বিদ্রোহগুলি বিশেষতঃ দোয়াবের বিদ্রোহ ছিল খুবই ব্যাপক, দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তাক্ত। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে বরণী মন্তব্য করেছেন, "ঐদিন থেকে সুলতান মুহম্মদের সরকার ও সাম্রাজ্য নিষ্প্রভ ও গৌরবহীন হয়।"[১]

কিন্তু কোন আধুনিক ঐতিহাসিক বরণীর বক্তব্যকে গুরুত্ব দেন নি ; বরং তাঁর বিরুদ্ধে অতিশয়োক্তির অভিযোগ করেছেন। অধ্যাপক মহ্‌দি হোসেন অধিকতর তীব্র মন্তব্য করেছেন ; একথা মনে নিশ্চয়ই রাখতে হবে যে বরণী ধ্বংসকাণ্ডের দৃশ্যাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না এবং তাঁর সঙ্গে সম্রাটের তীব্র আদর্শগত বিরোধ ছিল এবং পরবর্তীকালে তিনি তাঁকে সিংহাসন ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছিলেন।…'অত্যাচারিত সম্রাটের' বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ সম্পূর্ণ ও ফলপ্রসূ করার জন্য তিনি তাঁর স্বভাবগত হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষকে উপেক্ষা করে তাদেরকে এক নিপীড়িত জনগোষ্ঠী হিসাবে মঞ্চে এনেছেন।[২] অধ্যাপক নিজামীর মতে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত বরণীর বক্তব্যের প্রথম প্যারাগ্রাফটি ছিল ভুল ও দুর্ভাগ্যজনক।[৩]

বরণী লিখেছেন : "প্রথম প্রকল্পটি যার ফলে অঞ্চলটি ধ্বংস হয়েছিল এবং রায়তরা উচ্ছেদ হয়েছিল তা হল এই। সুলতান মুহম্মদের মনে হয়েছিল যে দোয়াবের ভূমিরাজস্ব এক থেকে দশ এবং এক থেকে বিশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা উচিত। এই প্রকল্পটি কার্যকরী করার জন্য তাঁরা (তাঁর অফিসাররা) ফলপ্রসূ পরিকল্পনাসমূহ তৈরী করেন এবং এমন সব কর আরোপ করেন যা রায়তদের পিঠ ভেঙে দেয়। ঐসব পরিকল্পনা এমন কঠোরভাবে কার্যকরী করা হয় যে রায়তদের মধ্যে যারা দুর্বল ও সহায়হীন তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অপরদিকে, যারা ধনী এবং অর্থ ও সম্পদের অধিকারী তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ফলে শহর ও গ্রামাগুলো ধ্বংস হয়ে যায় এবং কৃষিকাজ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়। দোয়াবের রায়তদের ধ্বংস ও অবলুপ্তির কথা শুনে এবং পাছে

ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান রাজ কলেজ

তাদের উপরও অনুরূপ আদেশ জারী করা হয় এই ভয়ে দুরাঞ্চলের কৃষকরাও বিদ্রোহ করে এবং জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। দোয়াবে চাষের অভাব ও দোয়াবের কৃষকদের বিনাশ এবং হিন্দুস্তানের অন্যান্য স্থান থেকে শস্যবাহী শকটের আগমনের স্বল্পতার দরুন দিল্লী ও তার শহরতলীতে এবং সমগ্র দোয়াবে এক ধ্বংসাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। অনাবৃষ্টিও দেখা দেয়। ফলে দুর্ভিক্ষ এক সার্বিক রূপ নেয় এবং কয়েক বছর স্থায়ী হয়। হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। সমাজ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বহু মানুষ তাদের সব কিছু হারায়। ঐ সময় থেকে সুলতান মুহম্মদের সরকার ও সাম্রাজ্য নিষ্প্রভ ও গৌরবহীন হয়।"[৪]

বরণী আরো লিখেছেন যে বহরম আইবা কিশলু খানের বিদ্রোহ দমনের পর "যে দু'বছর আমীর, মালিক ও সৈন্যগণসহ (যাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা দেবগিরিতে ছিল) সুলতান দিল্লীতে ছিলেন সেই সময়ে অতি উচ্চহারে রাজস্ব আদায় ও বহু অতিরিক্ত আবওয়াব আরোপের দরুন দোয়াব অঞ্চল ধ্বংস হয়ে যায়। স্তূপীকৃত শস্যে হিন্দুরা আগুন লাগিয়ে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেয় এবং তাদের বাড়ি থেকে গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদের বার করে দেয়। সুলতান তাঁর শিকদার ও ফৌজদারদের লুণ্ঠন করার আদেশ দেন, বেশ কিছু মুকদ্দম ও চৌধুরীকে হত্যা করা হয় এবং অনেককে অন্ধ করে দেওয়া হয়, যারা পালাতে সক্ষম হয় তারা দলবদ্ধ হয় এবং জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। এইভাবে অঞ্চলটি জনশূণ্য হয়ে যায়। এই সময়ে সুলতান বরণ অঞ্চলে শাস্তিমূলক অভিযানে বাহির হন এবং সমগ্র বরণ অঞ্চলটিকে লুঠ ও ধ্বংস করার আদেশ দেন। হিন্দুদের (কর্তিত) শীরগুলি নিয়ে এসে বরণ দুর্গের স্তম্ভগুলিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়।"[৫] সর্বশেষে বরণী লিখেছেন, "ঐসব দিনগুলিতে হিন্দুস্তানকে লুঠ করার জন্য সুলতান একটি সৈন্যবাহিনীকে নেতৃত্ব দেন এবং কনৌজ থেকে ডালমৌ পর্যন্ত ধ্বংস করেন। যারা সৈন্যদের হাতে পড়ে তাদেরকে হত্যা করা হয়; কিন্তু অধিকাংশ অধিবাসী পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করে। অবশ্য রাজকীয় বাহিনী জঙ্গল ঘিরে ফেলে এবং জঙ্গলের মধ্যে যাদের খুঁজে পাওয়া যায় তাদেরকে হত্যা করা হয়। এইভাবে ঐ বছরে কনৌজ থেকে ডালমৌ পর্যন্ত অঞ্চল বিধ্বস্ত করা হয়। সুলতান মুহম্মদ যখন কনৌজের কাছে হিন্দুস্তানের বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করতে ব্যস্ত ছিলেন তখন মাবারে তৃতীয় বিদ্রোহটি দেখা দেয়।"[৬]

বরণীর বিবরণে রাজস্ব বৃদ্ধির সঠিক তারিখ ও কারণ উল্লেখ করা হয় নি। অবশ্য তিনি লিখেছেন, সুলতান বিদ্রোহ দমনের পর যে দু'বছর

সুলতান দিল্লীতে ছিলেন সেই সময় তিনি দোয়াবের বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা নেন এবং তিনি যখন কনৌজে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে মাবারের প্রশাসক আসানশাহ বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইবন বতুতা লিখেছেন যে ১৩ রজব, ৭৩৪ হিজরীতে (২০ মার্চ, ১৩৩৪) তিনি যখন দিল্লীতে উপস্থিত হন তখন সুলতান কনৌজে ছিলেন এবং ৪ সওয়াল, ৭৩৪ হিজরী (৮ জুন, ১৩৩৪)তে দিল্লীতে ফিরে আসেন। ৯ জমাদি-উল-আউওল, ৭৩৫ হিজরীতে (৫ মার্চ, ১৩৩৫) সুলতান মাবারের বিদ্রোহ দমনের জন্য দিল্লী থেকে রওনা হন।[৭] সুতরাং বরণী ও ইবন বতুতার বিবরণের ভিত্তিতে বলা যায় যে ৭৩২ হিজরীর (১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম দিকে দোয়াবের রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

কারণের উল্লেখ না থাকলেও বরণীর বিবরণ থেকে একথাও সুস্পষ্ট যে প্রথমে দোয়াবে রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়; বর্ধিত রাজস্ব আদায়ের জন্য কৃষক-দের উপর নির্মম নিপীড়নের দরুন দোয়াবে কৃষক বিদ্রোহ এবং কৃষক ও কৃষির বিনাশ হওয়ায় এবং হিন্দুস্তানের অন্যান্য স্থান থেকে শস্যবাহী শকটের আগমন কমে যাওয়ায় দিল্লী ও তার শহরতলীতে এবং সমগ্র দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ও শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে খরা হওয়ায় দুর্ভিক্ষ সার্বিক রূপ নেয় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হল এই যে অধ্যাপক মহদি হোসেন ও অধ্যাপক নিজামীর মতো প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিক বরণীর বক্তব্যকে অস্বীকার করে তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। অধ্যাপক মহদি হোসেনের মতে প্রধানতঃ দোয়াব অঞ্চলের যুদ্ধপ্রিয় রাজপুত গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে যে বিশাল খোরাসান সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়েছিল তা ভেঙে দেওয়ার ফলে দোয়াবে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। ইতিমধ্যে বহাউদ্দীন গুরশাসপ ও কিশলু খানের বিদ্রোহ এবং উলেমা ও মশায়খদের ঘৃণার ফলে সৃষ্ট উত্তেজিত রাজ-নৈতিক পরিবেশ দোয়াবে একটি গৃহযুদ্ধ শুরু করার পক্ষে খুবই অনুকূল হয়ে-ছিল। এই সময়ে অনাবৃষ্টি হওয়ায় ও মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় এই অবস্থা আরো অনুকূল হয়। দোয়াবের এই নজীরবিহীন সঙ্কটের মোকাবিলার্থে মুহম্মদ তুঘলক এই নিপীড়নমূলক আইন প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ দোয়াবের বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন অধিবাসীদের জীবনযাপনের জন্য তাদের শক্তির প্রতিটি আউন্স কৃষিকাজে ব্যস্ত রাখার মাধ্যমে অরাজকতা ও বিদ্রোহকে প্রতিরোধ করতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন।[৮]

অধ্যাপক নিজামীর মতে বরণীর স্মৃতি তাঁকে প্রতারিত করেছিল এবং তাঁর মৃত পৃষ্ঠপোষকের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আনার জন্য তিনি কারণের

সঙ্গে ফসলকে গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন: "বর্ধিত রাজস্ব ছিল দুর্ভিক্ষের, কারণ নয়।" অধ্যাপক নিজামী আরো লিখেছেন, দোয়াবের ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির দরুন কয়েক বছর ধরে মনসুন ব্যর্থ হতে পারে না। অপরদিকে খুব সম্ভবতঃ দুর্ভিক্ষ সুলতানের সামনে শস্যের বাজার দর অনুযায়ী কৃষকের কাছ থেকে রাষ্ট্রের অংশ দাবি করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প রাখে নি।[৯]

সুতরাং অধ্যাপক হোসেন ও অধ্যাপক নিজামীর মতে আগে অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল এবং এই সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্যই রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, তাদের বক্তব্য সমসাময়িক তথ্যের বিরোধী। দ্বিতীয়ত, তাদের বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্যও নয়। দুর্ভিক্ষের সময়ে শাসকগণ সাধারণতঃ কৃষকের দুর্দশা লাঘব করার জন্য রাজস্ব মকুব, ঋণ দান, অগ্রিম প্রদান প্রভৃতি নানা ত্রাণ-মূলক ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। কিন্তু এইসব ব্যবস্থার পরিবর্তে দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকের কাছ থেকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী হারে রাজস্ব আদায় করা নজীরবিহীন ঘটনা। কেবলমাত্র অর্থনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা অকারণে প্রজাদের শাস্তি দিতে ইচ্ছুক কোন চরম অত্যাচারী শাসকের পক্ষে দুর্ভিক্ষের সময় রাজস্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব। মুহম্মদ তুঘলক এই দুটির কোনটারই সমপর্যায়-ভুক্ত ছিলেন না। সমসাময়িক তথ্যাদি থেকে প্রতিফলিত হয় যে তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ও প্রজাহিতৈষী শাসক।

দোয়াবে রাজস্ব বৃদ্ধির কারণ কি? বরণী কোন কারণের উল্লেখ করেন নি। পরবর্তী লেখকদের মধ্যে বদায়ূনী বলেছেন যে দোয়াবের বিদ্রোহী অধিবাসীদের শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যেই ঐ অঞ্চলের রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়েছিল।[১০] কিন্তু বদায়ুনী তার বক্তব্যের সমর্থনে কোন সূত্রের উল্লেখ করেন নি, ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদের মতে দোয়াবে রাজস্ব-সংশোধন ছিল রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্নির্ধারণের সাধারণ পরিকল্পনার অঙ্গ যা সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশের উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সুলতান প্রবর্তন করেছিলেন, সামরিক সম্পদ সমূহের বৃদ্ধি এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশাসনকে সংগঠিত করার জন্য রাজস্ব সংগ্রহ ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।[১১] ডঃ মহদি হোসেনের মতে বিভিন্ন বিদ্রোহ, উলেমা ও মশায়খদের বিরোধিতা এবং খোরাসান বাহিনী ভেঙে দেওয়ার ফলে তীব্র রাজনৈতিক সঙ্কট বা গৃহযুদ্ধ শুরুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। অনাবৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধির দরুন এই সঙ্কট তীব্রতর হয়েছিল। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সুযোগ যাতে ভেঙে দেওয়া খোরাসান-বাহিনীর

বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন সৈন্যরা না নিতে পারে, অর্থাৎ তারা যাতে জীবন-যাপনের জন্য নিয়ত কঠিন সংগ্রামে ব্যস্ত থাকে এবং বিদ্রোহের কথা চিন্তা করার সময় বা সুযোগ না পায়, তার জন্যই দোয়াবে রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়েছিল।[১২] অধ্যাপক নিজামীর মতে দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধি ছিল রাজস্ব বৃদ্ধির কারণ।[১৩]

আমাদের মতে তীব্র আর্থিক সঙ্কটই ছিল রাজস্ব বৃদ্ধির কারণ। ইবন বতুতা ও বরণীর বিবরণ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে দোয়াবে রাজস্ব বৃদ্ধি ছিল মুহম্মদ তুঘলকের সর্বশেষ পরিকল্পনা, রাজধানী পরিবর্তন, খোরাসান অভিযানের জন্য ৩,৭০,০০০ হাজার সৈন্য নিয়োগ ও এক বছর ধরে তাদের বেতন দান, কারাজল অভিযানের মর্মান্তিক পরিণতি এবং প্রতীক মুদ্রা প্রচলনের চরম ব্যর্থতার দরুন যে বিপুল অর্থের অপচয় হয়েছিল তার ফলে মুহম্মদ তুঘলকের রাজকোষ প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। এই তীব্র আর্থিক সঙ্কট থেকে মুক্ত হবার জন্যই তিনি দোয়াবের রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিলেন।

আপতঃদৃষ্টিতে এই রাজস্ব বৃদ্ধি অযৌক্তিক ছিল না। দোয়াব ছিল অতিশয় উর্বর ও সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল এবং এখানকার কৃষকদের আর্থিক অবস্থা ছিল বেশ স্বচ্ছল। সুতরাং তাদের পক্ষে বর্ধিতহারে রাজস্ব প্রদান অসম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ রাজস্ব বৃদ্ধির একটি পূর্ব নজীর ছিল। আলাউদ্দীন খলজী প্রায় ১২ বছর ধরে বর্ধিতহারে দোয়াব থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করেছিলেন এবং এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্রোহ দেখা দেয় নি। যেসব খুত, মুকদ্দম ও চৌধুরী রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছিল তাদের কঠোর শাস্তি দিতেও কোন বেগ হয় নি।

আলাউদ্দীন খলজী যেক্ষেত্রে সফল হয়েছিলেন সেক্ষেত্রে মুহম্মদ তুঘলক চরম ব্যর্থ হলেন কেন? রাজস্ব বৃদ্ধি করার সময়ে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দোয়াবের কৃষকদের মেজাজ ও মনোভাবের কথা বিবেচনা করা উচিত ছিল। দোয়াবের সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিশালী কৃষকগণ, বিশেষতঃ খুত, মুকদ্দম প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় কৃষকগণ ছিলেন সাহসী, নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা। এরা সরকারী কর্তৃত্ব সহজে মেনে নিতেন না এবং সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে প্রায়ই বিদ্রোহ করতেন। দোয়াবের বিদ্রোহী কৃষকদের দমন করার জন্য সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অভিযান চালান। গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করে, জ্বালিয়ে দিয়ে এবং পাইকারীহারে হত্যা করে তিনি দোয়াবের কৃষকদের দমন করেন। তারা যাতে ভবিষ্যতে সরকারী

কর্তৃত্ব ও আইন মেনে চলে তার জন্য তিনি দুর্ধর্ষ আফগান সেনাপতি ও সৈন্যদের দোয়াবের বিভিন্ন অঞ্চলে মোতায়েন রাখেন।[১৪]

আলাউদ্দীন খলজীর ব্যবস্থাসমূহ থেকে মনে হয় যে তিনি এই বিষয়গুলি গভীরভাবে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি যখন দোয়াবের রাজস্ব বৃদ্ধি করেন তখন তিনি নতুন নতুন রাজ্য জয়, বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন এবং একাধিকবার মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করে সাফল্য ও জনপ্রিয়তার প্রায়শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। সাধারণ কৃষকদের সমৃদ্ধিশালী কৃষক বা খুত, মুকদ্দম ও চৌধুরীদের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। এইসব অর্থবান ও গ্রাম-প্রধানগণ সাধারণতঃ কোন রাজস্ব দিতেন না অথবা তাদের উপর আরোপিত কর সাধারণ কৃষকদের উপর চাপিয়ে দিতেন। আলাউদ্দীন এই উভয়বিধ অন্যায় প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজস্ব সংগ্রহের পরিশ্রম বাবদ সাধারণ কৃষকদের কাছ থেকে খুত, মুকদ্দম ও চৌধুরীগণ যে অতিরিক্ত অর্থ নিতেন তাও তিনি বন্ধ করে দেন। উপরন্তু, আলাউদ্দীন মূল্য হ্রাস এবং নিয়ন্ত্রণ করে কৃষকের বোঝা বেশ খানিকটা লাঘব করেন। সর্বোপরি, সরকারী কর্মচারীরা যাতে ঘুষ গ্রহণ প্রভৃতি দুর্নীতির আশ্রয় না নেয় এবং অযথা কৃষকদের নিপীড়ন না করে সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল।[১৫] এইসব ব্যবস্থার দরুন আলাউদ্দীন সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

মুহম্মদ তুঘলক এই ধরনের কোন ব্যবস্থা নেন নি। তাঁর ব্যর্থ পরিকল্পনাগুলির জন্য জনসাধারণকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হওয়ায় এবং প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কারণে বেশ কিছু অতিশয় শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় সুফী সন্ন্যাসী ও উলেমাকে নিপীড়ন ও হত্যা করায় জনসাধারণের ব্যাপক অংশ সুলতানের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল। উপরন্তু, খোরাসান বাহিনী ভেঙে দেওয়ার দরুন বিপুলসংখ্যক যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র ব্যক্তি বেকার হয়ে যাওয়ায় সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিল এবং এইসব বিক্ষুব্ধ সশস্ত্র ব্যক্তিদের (যাদের একটা বড় অংশ ছিল দোয়াবের অধিবাসী) সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে দোয়াবের স্বাধীনচেতা কৃষকগণ কর বৃদ্ধির প্রস্তাব কিভাবে গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে মুহম্মদ তুঘলক গভীরভাবে বিবেচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। আবার, রাজস্ব বৃদ্ধি করার সময়ে তিনি আলাউদ্দীন খলজীর মতো সম্পদশালী কৃষক ও খুত, মুকদ্দম, চৌধুরীদের থেকে সাধারণ কৃষকদের পৃথক করার ব্যবস্থা রাখেন নি এবং রাজস্ব সংগ্রাহক

কর্মচারীদের দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখার এবং অযথা বলপ্রয়োগ ও নিপীড়ন করা থেকে নিবৃত্ত করার কোন চেষ্টা করেন নি। এমনকি রাজস্ব বৃদ্ধির পরেই অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধির কথাও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হয় নি। দুর্নীতিগ্রস্ত ও অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীদের প্রতিবেদন বিশ্বাস করে সুলতান কৃষকদের দুর্বিনীত ও বিদ্রোহী বলে মনে করেছিলেন এবং প্রতিবাদ ও অসহযোগিতার কারণগুলির অনুসন্ধান না করে তাদের সমূলে বিনাশ করার জন্য ফৌজদারী ও সিকদারদেরকে তাদের গ্রামগুলি পুড়িয়ে দিতে, লুঠ করতে এবং বিদ্রোহী কৃষকদের চরম শাস্তি দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। এই সব চরম নিপীড়ন ও নৃশংসমূলক পদক্ষেপ সত্ত্বেও যখন বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হল না তখন সৈন্যবাহিনীসহ সুলতান স্বয়ং মঞ্চে অবতীর্ণ হন।

অপরদিকে, কৃষকদের নিরূপায় অবস্থা এবং অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার সাহস, দৃঢ়তা ও সাংগঠনিক দক্ষতার সঙ্গে ভেঙে দেওয়া খোরাসান বাহিনীর বিভিন্ন সশস্ত্র দলের সক্রিয় সহযোগিতা যুক্ত হওয়ায় দোয়াবের বিদ্রোহ হয়েছিল ব্যাপক, রক্তক্ষয়ী ও দীর্ঘস্থায়ী। দু' বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় মুহম্মদ তুঘলক শহরাঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হলেও গ্রামাঞ্চলের অনেক জায়গায় বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল এবং ঐসব স্থানে বিদ্রোহীরাই হয়ে উঠেছিল প্রকৃত শাসক। ৮/৯ বছর পরেও ইবন বতুতা আলিগড়ের চারপাশের অধিকাংশ অঞ্চলকে বিদ্রোহী কবলিত দেখতে পান এবং কোনক্রমে তিনি তাদের হাত থেকে নিস্তার পান।[১৬]

দোয়াবে কৃষক বিদ্রোহের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। সুলতান ও তাঁর সৈন্যবাহিনী দোয়াবে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকার সুযোগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত দেশে বিকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি সক্রিয় হয় এবং ক্রমশঃ এই সক্রিয়তা স্থানে স্থানে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। সুদূর দক্ষিণে মাবারের প্রশাসক আহসান শাহ ও তাঁর সহ-যোগীরা দিল্লীর সুলতান শাহীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে মাবারে এক স্বাধীন সুলতানীর পত্তনের কথা ঘোষণা করেন। বিদর, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের অঞ্চলগুলোতেও সুলতানী শাসনব্যবস্থা বিশেষতঃ রাজস্বব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।[১৭] মহারাষ্ট্রে খরজ্ আদায় প্রায় শূন্যে পৌঁছেছিল। এই সময়ে আমীরদের পরিবারবর্গ দেবগিরিতে থাকলেও তারা নিজেরা কনৌজে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই অবস্থার সুযোগ নিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের ইকতাদার, খুত, মুকদ্দম ও কৃষকরা। বিদর, তেলেঙ্গানা প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু প্রশাসক ও সামন্তরা এই সুযোগে তাদের হৃত স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে

সচেষ্ট হন. যা কয়েক বছরের মধ্যেই স্বাধীন বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ণতালাভ করে।[১৮]

দোয়াবের বিদ্রোহ দমনে মুহম্মদ তুঘলকের বহু আমীর, সেনাপতি ও সৈন্য মারা যাওয়ায় তাঁর সৈন্যবাহিনী সংকুচিত ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই নতুন সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করতে হওয়ায় মাবার অভিযানে রওনা হতে প্রায় সাত মাস দেরী হয়েছিল। সেই অবসরে আহসান শাহের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা তাদের ক্ষমতা বহুলাংশে সংহত করতে সক্ষম হয়। দোয়াবে বিদ্রোহের ফলে সুলতানের সম্ভবতঃ অর্থাভাব দেখা দিয়েছিল। একদিকে ব্যাপক বিদ্রোহ, ধ্বংস-লীলা, কৃষক হত্যা ও নিপীড়ন এবং অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের দরুন ঐ অঞ্চল থেকে কোন রাজস্ব পাওয়া যায় নি। অপরদিকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে অভিযানের ফলে প্রচুর অর্থক্ষয় হয়েছিল। উপরন্তু দোয়াবে সুলতানের ব্যস্ততার সুযোগে মহারাষ্ট্রের কৃষকরা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় সুলতানি রাজকোষে অর্থ জমার পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পায়। এইজন্য মুহম্মদ তুঘলক মাবার অভিযানের পথে দৌলতাবাদে পৌঁছেই অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রে নতুন নতুন আবওয়াব আরোপ করেন এবং বলপূর্বক এতো বেশী কর আদায় করেন যে অনেকে মারা যায়।[১৯] অর্থাৎ দোয়াবে সুলতানের ব্যস্ততার সুযোগে মহারাষ্ট্রে কৃষকরা রাজস্ব প্রদান বন্ধ মারফত যে পরোক্ষ বিদ্রোহের পথ ধরেছিল তার প্রতিকারার্থে মুহম্মদ তুঘলক বেশী পরিমাণে রাজস্ব আদায় করার জন্য অত্যাচার চালান। এর ফলে ঐ অঞ্চলে এক তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যা পরবর্তীকালের বিদ্রোহ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল। প্লেগ মহামারীর দরুন সুলতানের সৈন্যবাহিনীতে মড়ক দেখা দেওয়ায় এবং স্বয়ং ঐ মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ায় সুলতান মাবার অভিযান মাঝপথে পরিত্যাগ করে ফিরে আসতে বাধ্য হন। ফেরার পথে তিনি দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠিত করার ব্যবস্থা করেন। মালিক কাবুলকে তেলেঙ্গানা ও কুতলঘু খানকে দেবগিরি তথা মহারাষ্ট্রের শাসনভার দেওয়া হয় এবং বিদরের কর্তৃত্ব শিহাব সুলতানী তথা নসরত খানের উপর অর্পিত হয়। তিন বছরে এক কোটি তঙ্কা দেবার বিনিময়ে তাঁকে ঐ অঞ্চলের রাজস্ব সংগ্রহের ইজারা দেওয়া হয়।[২০] এই সমস্ত পদক্ষেপ থেকে প্রতিফলিত হয় যে ঐ সব অঞ্চলের প্রশাসনিক ও রাজস্ব ব্যবস্থায় অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এইসব পদক্ষেপ সত্ত্বেও ঐ অঞ্চলগুলির শাসনব্যবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি এবং শেষ পর্যন্ত মাবার সমেত সমগ্র দাক্ষিণাত্য মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দোয়াবে মুহম্মদ তুঘলকের ব্যস্ততার সুযোগে বাংলায় ফখরুদ্দীন বিদ্রোহী হন এবং ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে বাংলায় তার স্বাধীন সুলতানী প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। বরণী লিখেছেন যে দোয়াবে সুলতান যখন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে সোনারগাঁয়ের গভর্ণর বহরম খান মারা যান এবং ফখরা অর্থাৎ ফখরুদ্দীন বিদ্রোহী হন।[২১] অর্থাৎ ৭৩৪ হিজরীতে ফখরুদ্দীনের বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। কিন্তু যেহেতু এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত ফখরুদ্দীনের মুদ্রাগুলির সর্বপ্রথম তারিখ হল ৭৩৯ হিজরী/১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং যেহেতু বদায়ুনীও ঐ তারিখের উল্লেখ করেছেন[২২] সেহেতু প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক মনে করেন যে ফখরুদ্দীন ৭৩৯ হিজরীতে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং বরণী ভুল করে লিখেছেন যে দোয়াবের বিদ্রোহের সময়ে ফখরুদ্দীন বাংলায় বিদ্রোহ করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক-গণ একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে লক্ষ্য বা খেয়াল করেন নি, বাংলার লখনৌতি ও সোনারগাঁ থেকে প্রকাশিত মুহম্মদ তুঘলকের নামাঙ্কিত মুদ্রার শেষ তারিখ হল ৭৩৪ হিজরী এবং সাতগাঁ থেকে প্রকাশিত মুদ্রার শেষ তারিখ হল ৭৩৫ হিজরী।[২৩] মুদ্রার এই স্বাক্ষর পরোক্ষভাবে বরণীর প্রদত্ত সময়কেই সমর্থন করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে দোয়াবের বিদ্রোহ মুহম্মদ তুঘলকের শাসনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছিল। এই বিদ্রোহে একদিকে যেমন দোয়াবের বিস্তীর্ণ অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হয়েছিল এবং আর্থিক ও সামরিক দিক থেকে সুলতান অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, অপরদিকে এই বিদ্রোহে সুলতান দীর্ঘকালব্যাপী নিযুক্ত থাকার সুযোগে মাবার ও বাংলায় যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার ফলে ঐ দুটি অঞ্চল সুলতানশাহী থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু, এই বিদ্রোহে উৎসাহিত হয়ে মহারাষ্ট্রের কৃষকগণ রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং তেলেঙ্গানা ও বিদরের হিন্দুরা তাদের হৃত ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। ফলে কিছুদিনের মধ্যে শেষোক্ত অঞ্চল দুটিতে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহারাষ্ট্রে সৃষ্ট অসন্তোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে কয়েক বছর পরে এক বিরাট বিদ্রোহের রূপ নেয়, যা স্বাধীন বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বরণী সঠিক-ভাবেই দোয়াবের রাজস্ব-বৃদ্ধিকে মুহম্মদ তুঘলকের পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন, "ঐ সময় থেকে সুলতান মুহম্মদের সরকার ও সাম্রাজ্য নিষ্প্রভ ও গৌরবহীন হয়।"

সূত্রনির্দেশ

১ জিয়াউদ্দীন বরণী, তারিখ ই-ফিরোজশাহী, কলকাতা, ১৮৬২, পৃ ৪৭৩

২ ডঃ আগা মহদি হোসেন, তুঘলক ডাইনেস্টি, ১৯৬৩, পৃ ২২৪ ২৫, ২২৭

৩ এম. হাবিব ও কে. এ. নিজামী সম্পাদিত, কম্প্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া, ৫ম, পৃ ৫২৪

৪ বরণী, তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, পৃ ৪৭৩

৫ ঐ, পৃ ৪৭৯

৬ ঐ, পৃ ৪৮০

৭ ইবন বতুতা, রেহালা, ইংরেজি অনুবাদ, মহদি হোসেন, পৃ LXIII, ২৪, ১২৫, ১৪০

৮ মহদি হোসেন, তুঘলক ডাইনেস্টি, পৃ ২৩৩-৩৫

৯ এম. হাবিব ও কে. এ. নিজামী সম্পাদিত, কম্প্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, ৫ম, পৃ ৫২৪

১০ বদায়ূনী, মুলতখাব-উত-তওয়ারিখ, ১ম, ২২৮

১১ ঈশ্বরী প্রসাদ, হিস্ট্রি অফ করৌনা টারকস, ১ম, পৃ ৬৭-৬৮

১২ মহদি হোসেন, তুঘলক ডাইনেস্টি, পৃ ২৩৩-৩৪

১৩ এম. হাবিব ও কে. এ. নিজামী সম্পাদিত, কম্প্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া, ৫ম, পৃ ৫২৪

১৪ বরণী, তারিখ ই-ফিরোজশাহী, পৃ ৫৫-৫৯

১৫ ঐ, পৃ ২৮৭-৯১, ৩০২-১২

১৬ ইবন বতুতা রেহালা, ইংরেজি অনুবাদ, মহদি হোসেন, পৃ ১৫৩-৫৮ ; অধ্যাপক অসিত সেন, পিপল এ্যাণ্ড পলিটিক্স ইন আরলি মেডিভ্যাল ইণ্ডিয়া, পৃ ১২১-২৬

১৭ বরণী, তারিখ ই-ফিরোজশাহী, পৃ ৪৭৯-৮১

১৮ আর. সি. মজুমদার সম্পাদিত দি দেলহি সুলতানেট, পৃ ৭৪-৭৭

১৯ বরণী, তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, পৃ ৪৮০ ৮১

২০ ঐ, পৃ ৪৮০-৮১

২১ ঐ, পৃ ৪৮০

২২ এ. করিম, কর্পাস অফ দি মুসলিম কয়েন্স অফ বেঙ্গল, ঢাকা, ১৯৬০, পৃ ৩৬-৩৭ ; বদায়ুনী, মুলতখাব-উত-তওয়ারিখ, ১ম, ২৩০

২৩ এ. করিম, কর্পাস অফ দি মুসলিম কয়েনস অফ বেঙ্গল, পৃ ৯-১১

ফরাসী পর্যটকের চোখে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুজরাটের মুঘল শহর

অনিরুদ্ধ রায়

এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে আমরা সাধারণতঃ ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসী পর্যটকদের বিবরণ আলোচনা করব। এখানে আমাদের মনে রাখা দরকার যে পশ্চিম ইউরোপে কতকগুলি ঘটনা এই সময়ে বা এর অব্যবহিত আগে ঘটেছে যার ফলাফল মুঘল সাম্রাজ্যের উপর পড়েছিল। ২৯ মে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে রেষ্টরেশন হয় যার ফলে দূর সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর সরকারী সাহায্য আসতে শুরু করে। ফরাসীদেশে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর যখন ফ্রণ্ড ও স্প্যানীশ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, তখন কোষাগার প্রায় শূণ্য। সৈন্যরা অস্ত্র নিয়ে ঘরে ফিরে অবাধ লুটতরাজ করছে। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কোলবার্ট ও চতুর্দশ লুই-এর সহায়তায় ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয় যদিও ১৬৬০ থেকে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল। ওলন্দাজ ও পর্তুগীজদের আনা প্রাচ্যদেশীয় জিনিসপত্রের চাহিদা ইউরোপের বাজারে বেড়ে যেতে দেখে ফরাসীরা কোম্পানী শুরু করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসী পর্যটকরা মুঘলভারতে আসেন।

১৬১০ থেকে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দর মধ্যে চোদ্দজন ফরাসী পর্যটকের লেখা পাওয়া যায়। ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দর মধ্যে তিনজন ও ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দর ও ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দর মধ্যে বেশী সংখ্যায় ফরাসী পর্যটকরা আসেন। ১৬১০ থেকে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দর মধ্যে গড়পড়তা একজন ফরাসী পর্যটককে পাওয়া যায় সাড়ে পাঁচ বছরে। কিন্তু ১৬৫৮ থেকে ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দর মধ্যে, অর্থাৎ তের বছরে, আটজন পর্যটককে পাওয়া যায়। এখানে আমরা কোম্পানীর কুঠির দলিল-গুলি ধরি নি কারণ কুঠিয়ালদের বক্তব্য ভিন্ন ধরনের। তারা সাধারণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য লিখছে।

আমরা দেখছি যেসব পর্যটকই জায়গার আগে বা পরে একটি শব্দ যোগ

ইসলামিক হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

করছেন। এ থেকে মনে হয় যে তাঁরা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চল আলাদা করছেন। তাঁরা "শহর" এবং "নগর" বলে "গ্রাম" বা "গ্রামাঞ্চল" থেকে তফাৎ করেছেন।

সবথেকে বেশী তফাৎ করেছেন ফ্রাঁসোয়া মাঁর্তা যেটা আমরা তাঁর সুরাট থেকে গোলকুণ্ডা যাত্রার বিবরণের মধ্যে পাই। ঐ বিবরণ থেকে কতকগুলি শব্দ আমাদের কাছে আসে, যেমন ঃ গ্রামাঞ্চল, গ্রাম, বড় গ্রাম, বাজার-শহর, ছোট শহর, বড় শহর, পাঁচিল ঘেরা শহর, কেল্লাসমেত শহর, ছোট নগর, বড় নগর, পাঁচিল ঘেরা নগর, কেল্লাসমেত নগর। কিন্তু মাঁর্তা আমাদের বলেন নি যে কিসের ভিত্তিতে তিনি ঐ বিভাজন করছেন। এটাও বলছেন না যে ঐ শহরগুলির মানে কি। যেমন গ্রামাঞ্চল ও গ্রামের মধ্যেকার তফাৎ উনি বলছেন যে গ্রামটি আরো বড়.। অন্যদিকে শহর ও বাজার শহরের মধ্যেকার তফাৎ উনি ধরছেন তার কাজকর্মের ভিত্তিতে। কিন্তু মাঁর্তার লেখার মধ্যে থেকে আমরা এমন কোন মাপ পাই না যা থেকে বড় গ্রাম ও শহরের বা বড় শহর ও নগরের মধ্যেকার তফাৎ করা যায়। এটা অবশ্য আমার মনে হয়েছে যে মাঁর্তা ফরাসী দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে এই তফাত করছেন। এটাও হতে পারে যে পারস্যদেশে স্বল্পকালীন সময়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা করছেন। অর্থাৎ যেখানে 'ভিল' ও 'সিতে'র তফাৎ হচ্ছে যে দ্বিতীয়টিতে আত্মরক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে। মাঁর্তার দু হাজার পাতা লেখার বিভিন্ন অংশ থেকে এটাও মনে হয় যে তাঁর কাছে নগর আন্ত-প্রাদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করছে এবং শহরের কাজকর্ম ঐ প্রদেশের মধ্যেকার বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। নগরে বিভিন্ন জাতের ও বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের কথা মাঁর্তা বলেছেন কিন্তু শহরে তাদের কোন উল্লেখ তিনি করেন নি। এর থেকে মনে হয় যে মাঁর্তা শুধু জনসংখ্যার উপরে মাপ ধরছেন না, ওদের কাজকর্মের চেহারাটা তাঁর মাপের মধ্যে রয়েছে।

অন্যান্য সমকালীন ফরাসী পর্যটকরা কিন্তু মাঁর্তার এ বিভাজন ব্যবহার করেন নি। আমরা অন্যান্যদের অন্যরকম বিভাজন করতে দেখি। যেমন পর্যটক থেভনো সুরাটকে শহর বলেছেন যদিও মাঁর্তা একে বলেছেন নগর। কিন্তু থেভনো সমস্ত শহর/নগরকে অবিমিশ্রভাবে শহর বলেছেন। নগরের সঙ্গে তাদের কোন প্রভেদ করেন নি। এর থেকে মনে হয় যে দুটি বক্তব্যর উদ্দেশ্য ছিল আলাদা। পর্যটক আবে কারে বা থেভনো হিন্দুস্তান-এর সাধারণ অবস্থায় বর্ণনা করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে মাঁর্তা ছিলেন ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়াল। ও'র দৃষ্টি ছিল মুঘলভারতে ফরাসী বাণিজ্য

বাড়ানো যার ফলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভিন্নরকম বাণিজ্যিক সম্ভাবনার কথা ভেবেছেন।

আমাদের সমস্ত ফরাসী পর্যটকরাই বিভাজনের কন্তকগুলির বৈশিষ্ট্য লিখেছেন যেগুলো মার্ভার বিভাজনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কয়েকজন পর্যটক এর থেকে ব্যতিক্রম, যার মধ্যে আমরা আবে কারেকে ধরতে পারি। ২২ নভেম্বর ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দর রোজনামচায় তিনি "অলডে" শব্দটি ব্যবহার করেন। এটি পর্তুগীজ "অলডিয়া" থেকে উদ্ভূত যেটির মূলে রয়েছে আরবিক শব্দ "আলদাই" যার মানে হল গ্রাম। কিন্তু পর্তুগীজ শব্দটি বোঝায় •চারপাশের জমি ও তাদের অধিবাসীদের সমেত একটি কেন্দ্র (ভিলা)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কারে লিখেছেন যে নারগল এর "অলডের" একজন যাজক হাজার একু ভাড়া পান এবং এটি ঐ যাজকের অধীন। নারগল দামানের দক্ষিণে। সহজ কথায় বলা যায় যে এটিমাত্র একজন লোকের অধীনে একটি উৎপাদক কেন্দ্রে যার ফলে আমরা এটিকে সাধারণ গ্রাম থেকে আলাদা করতে পারি। কারণ সাধারণ গ্রামে বিভিন্ন ধরনের লোকদের উৎপাদন ও আয় রয়েছে! অলডেকে যদি আমরা বলি মুঘলভারতের ব্যবস্থার মধ্যে পর্তুগীজ ধারণার প্রয়োগ, তাহলেও এর সঙ্গে মুঘলভারতে প্রচলিত জমিদারী প্রথার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা এই যে পর্যটক কারের এই "অলডের" মধ্য দিয়ে আমরা শহরব্যবস্থা ও গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্পর্ক শুরু করতে পারি। বহু পর্যটকরাই শহরের উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নানান বক্তব্য রেখে গিয়েছেন। কিন্তু থেভনোর লেখাতেই আমরা এই সম্পর্কটা দেখতে পাই যার সঙ্গে হয়ত আবুল ফজলের "আইনী-ই আকবরী"র তুলনা করা যেতে পারে।

থেভনো বলছেন যে গুজরাটের শহরগুলির উপর অনেক "বুর্গ" ও 'গ্রাম' নির্ভর করে আছে। উনি অবশ্য বলছেন না যে কিসের জন্য এই নির্ভরতা। কিন্তু এটা থেকে পরিস্কার যে 'বুর্গ' ও 'গ্রাম' শহরের অধীন যার ফলে আমরা একটা পিরামিড আকারের চেহারা পাই। এটি পরিস্কার হয়ে আসে যদি আমরা সমকালীন বরোদার চিত্রটি দেখি।

ফরাসী পর্যটকরা বলেছেন যে বরোদায় প্রচুর বাণিয়া ও কারিগর বাস করে যারা কাপড়, নীল ও লাক্ষা তৈরী করে বাণিজ্য করে। থেভনো বলেছেন যে সিন্দখেদা বুর্গের জমিতে (বরোদার ২৪ মাইল দূরে) প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা হয় যেটা বরোদায় আসে। এর থেকে একটা বলা সম্ভব যে প্রতিটি "বুর্গ"এর নির্দিষ্ট জমি আছে যেগুলি বিশেষ শহরের অধীন।

"আইনী-ই আকবরী" দেখলেও এটাই দেখা যাবে যে প্রতিটি শহরের অধীনে নির্দিষ্ট জমি আছে যার খাজনা ঐ শহরের খাজনার সঙ্গে যোগ দেওয়া হয়। সুতরাং এটা ভাববার অবকাশ নেই যে শহরগুলি বিশাল গ্রামাঞ্চলের মধ্যে আলাদা দ্বীপপুঞ্জের মত ভেসে রয়েছে। বরঞ্চ এটা বলা সঙ্গত হবে যে বিভিন্ন স্তরবিভাগের মধ্যে শহরগুলি রয়েছে। ফ্রাঁসোয়া মার্তোর ৭ জুন ১৬৭০এর একটা বিবরণের মধ্যে একটা পরিস্কার পাওয়া যায়।

মার্তো বলছেন যে ইন্দুর শহরে ইস্পাত তৈরী হয় যেটা এরপর কাছের গ্রাম ইন্দাদোলিবেতে যায় অস্ত্র তৈরী হতে। তারপর ঐ অস্ত্রগুলি সুরাট বন্দর থেকে মধ্যপ্রাচ্যতে যায়। রাজনৈতিক দিক থেকেও আমরা এই স্তরভেদ দেখতে পাই। বরোদার উপরে রয়েছে আমেদাবাদ ও তার উপর রয়েছে মুঘল রাজধানী। সুতরাং মুঘল শাসনব্যবস্থায় প্রতিটি জায়গায় একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

কিন্তু এই উচ্চ-নিম্ন স্তরভেদের একটি ব্যতিক্রম আমরা দেখতে পাই বন্দরগুলির বিষয়ে। গুজরাটের বন্দরগুলির উত্থানপতনের কথা অনেকে বলেছেন এবং ঐসব বক্তব্য থেকে এটাই মনে করা যেতে পারে যে একটি প্রধান বন্দর এই এলাকায় ছিল। যেমন ক্যাম্বে বন্দরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সুরাট বন্দরের উত্থান হয় ও সুরাট গুজরাটের প্রধান বন্দর হয়ে দাঁড়ায়। ঐ সব লেখা থেকে পতনের কারণ বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়—যেমন রাজনৈতিক কারণে পতন। পর্তুগীজ আক্রমণে দিউ বন্দরের পতন। অথবা নদী সরে যাওয়া বা পলিমাটি জমে বন্দরের পতন—যেমন ক্যাম্বে, দামান, বালসার ইত্যাদি। অবশ্য এইসব কারণ নিয়ে বিতর্ক এখনো শেষ হয় নি। অথবা দুই কারণই একসঙ্গে থাকতে পারে। কখনো কখনো আমরা দেখি যে কোন কোন বন্দর এই দুই অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে টিকে রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলা যায়। যেসব বন্দরের পতন হয়েছে, তাদের নিজেদের চারপাশের জায়গার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল না বা ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। ফলে পতন তরান্বিত হয়। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য আছে—যেমন ক্যাম্বে বন্দর। চারপাশের এলাকার উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল এবং বন্দরটির অবস্থা খারাপ হয়ে গেলেও, শহরের উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ও বাণিজ্যের ব্যবস্থা বহুদিন টিকে থাকে। এ ছাড়াও ঐসব বড় বড় বন্দর-শহরের আর একটি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি। ঐসব বন্দর-শহরের আয় সরাসরি কেন্দ্র সংগ্রহ করছে বা তার অধীনে মনসবদার জায়গীর পাচ্ছে। এর ফলে প্রাদেশিক সরকার সামান্য কিছু ছাড়া ঐ আয়তে ভাগ বসাতে পারছে না। যেমন সুরাটের মুৎসুদ্দি ঐ আয় সংগ্রহ

করতেন কিন্তু তাঁর নিয়োগ কেন্দ্র থেকে হত এবং তিনি আমেদাবাদের শাসনকর্তার অধীন নন। এর ফলে শাহবন্দর, মুৎসুদ্দি ও প্রাদেশিক সরকারের অধীনস্ত কর্মচারীদের মধ্যে প্রায়শই গোলমাল হত। এই সব তথ্যগুলি মেনে আমরা দেখব যে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলি বন্দর-শহরে মিলিত হচ্ছে যার ফলে বন্দরের প্রকাশ। অর্থাৎ বন্দর থাকার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত হচ্ছে তা নয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আভ্যন্তরীণ-সামাজিক শক্তিগুলির তাগিদেই তারা থাকছে। বলা প্রয়োজন যে এটা একটা সাধারণ দু'দেশের বাণিজ্য নয়। এ বাণিজ্য আরো জটিল কারণ বহুসময়ই এক দেশের পসরা তৃতীয় দেশে যাচ্ছে দ্বিতীয় দেশের বন্দর হয়ে। সুতরাং জাহাজ চলাচলের অবস্হা প্রকৃত সুখের না হলেও, বাণিজ্য চলবে, বিশেষতঃ যখন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির কোম্পানীরা ভারতের ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে।

মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সরকার বণিকদের বাণিজ্যের কাঠামোতে হাত দিতেন না। ফলে উৎপাদনকারী ও ক্রেতার লেনদেনের ব্যবস্হাতে সরকার কোন সময়ই হাত দেয় নি। বিদেশী কোম্পানীগুলি ঐ মধ্যবর্তী বাণিয়ানকে বাদ দিয়ে সরাসরি উৎপাদনকারীদের কাছে যাবার চেষ্টা করছিল। প্রায় সব বিদেশী লেখকদের লেখায় আমরা ঐসব শহরের বাণিয়ানদের কার্যকলাপের ছবিটা পাই। কিন্তু কোম্পানীগুলির টাকার প্রয়োজন তাদের নিজেদের সরকার মিটাতে পারত না। ফলে বাণিয়ানদের নানান ধরনের কাজের মধ্যে আমরা ঋণ দেবার ব্যাপারটিও পাই—যার মধ্য দিয়ে ঐসব বন্দর-শহরের অর্থ-নৈতিক ছবিটা স্পষ্ট হয়ে আসে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে সপ্তদশ শতাব্দীর সুরাটে টাকা ঋণ পাওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। বরঞ্চ হুগলীতে এর তুলনায় অনেক কষ্ট করতে হত। কিন্তু কাঁচা টাকা পাওয়া সহজ হলেও ঐ এলাকায় বিশেষ সমৃদ্ধি হয়েছিল বলে মনে হয় না। ঐতিহাসিক ওমপ্রকাশের মতে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর বিদেশী লগ্নি পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল চলে যেতে শুরু করে। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার বন্দর শহরের শুল্ক নিয়ে গেলে কাঁচা টাকা ঐ এলাকা থেকে চলে যেত। তৃতীয়ত, ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ক্রমাগত মারাঠা-মুঘল যুদ্ধের ফলে উৎপাদন এলাকা ও বন্দর শহরগুলির যোগ কমে যায়। সুতরাং একদিক থেকে বলা যায় যে বন্দর শহরগুলির রাজনৈতিকভাবে প্রদেশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে থাকলেও, অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রদেশের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে যুক্ত নয়। পরবর্তী যুগে এই দ্বৈতব্যবস্হা মুঘল পতনের পথে সাহায্য করে। শিবাজী ও তার

পরবর্তী মারাঠারা ক্রমাগত ঐসব বন্দর-শহরের উপর আক্রমণ চালিয়েছে কিন্তু বাণিয়ানকে আঘাত করে নি। সব পর্যটকই, মার্তা, থেভনো, কারে ইত্যাদি এই দিকটা লক্ষ্য করেছেন।

ঐ এলাকার সঙ্গে যুক্ত না হবার ফলে, বিভিন্ন বন্দর শহরের শাহবন্দররা বিদেশীদের নিজেদের বন্দরে আসার জন্য নানা প্রলোভন ও প্রয়োজনে ভয় পর্যন্ত দেখাতেন। কারে লিখেছেন যে ব্রোচ বন্দরের শাহবন্দর ফরাসীদের আনার জন্য কতরকম চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে ঐ এলাকায় শাসনব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনের মধ্যেকার যোগ কত কম সেটা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। তবে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিতরের ছোট ছোট শহরগুলি ঐ কাঁচা টাকার লোভ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন বলে মনে হয় না। মার্তা সুরাট থেকে মসুলিপত্তন যাবার সময়ে ঐসব ছোট ছোট শহরের শাসনকর্তাদের সঙ্গে কোন কোন সময় শুল্ক নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন যদিও বিনাশুল্কে মালযাতায়াত করার কেন্দ্রীয় ছাড়পত্র তাঁর কাছে ছিল। এই ধরনের ব্যবস্থার ফলে মুঘল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে দ্বন্দ্বভাব প্রকট হয়ে ওঠে। বিদেশী কোম্পানীগুলি স্বভাবতই এই অবস্থার সুযোগ নিতে চেষ্টা করত যার ফলে স্থানীয় বণিককে এড়িয়ে তারা সরাসরি উৎপাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করতেন। এর ফলে অবশ্য উৎপাদকরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কাছে এসে পড়লেও, বিদেশী বণিকরা বেআইনী শক্তির মাধ্যমে তাদের একচেটিয়া বাণিজ্য করতে পেরেছিলেন। ঐসব বন্দর-শহরে তারা নিজেদের কুঠিগুলি স্থানীয় আইনের বাইরে রাখতে সম্মত হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে তারা এই অধিকারগুলিকে জোর করে চাপাতে থাকেন। যদি ঐ ধরনের বেআইনী শক্তি প্রয়োগ না করা যায়, তাহলে তারা কারিগরদের নিজেদের আস্তানায় নিয়ে যান যার ফলে বিভিন্ন বন্দর-শহরের কুঠিগুলির মধ্যে কারখানা গড়ে ওঠে। অর্থাৎ একদিকে ঐসব শহর বন্দরের কাজকর্মের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ও অন্যদিকে রাজনৈতিক কাঠামো থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এই বে-আইনী শক্তির ব্যবহার ও কুঠিগুলিকে বিদেশী শক্তির হাতিয়ার হিসাবে পরিণত করার চেষ্টার ফলে বিদেশী পর্যটকদের লেখায় আমরা বন্দর-শহরের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ইউরোপীয়ান কোম্পানীগুলির শক্তি সম্বন্ধে নানা আলোচনা পাই। সুরাট শহরের পাঁচিল নিয়ে ও শহরের কেল্লাদারদের সামরিক শক্তি নিয়ে মার্তা বলেছেন—কোচিন শহরের পাঁচিল ঘুরে দেখার

জন্য ও কোথায় কোথায় কত বড় কামান রাখা আছে, সেগুলোর কথাও বলেছেন। ভারতীয়রা যে দুর্গ বা সামরিক শক্তির উপকারিতা সম্বন্ধে উদাসীন ছিল বলা যায় না। কেল্লার চারপাশে ঘুরে বিশেষ ধরনের বসতি ও ব্যবসা ছিল একথা কারুরই অজানা নয়। ফরাসী পর্যটকেরা এ-সম্বন্ধে বেশ কিছু মন্তব্য করে গেছেন যার থেকে বন্দর-শহর সাধারণ শহরের মধ্যেকার তফাৎগুলি ধরতে পারি।

থেভনো যেমন সুরাট বন্দরের মধ্যে ধরেছেন কেল্লা, শুল্কদপ্তর এবং বাজার—যেটা আমরা তাভারনিয়ার-এর লেখাতেও পাই। কিন্তু আমেদাবাদে আমরা অন্য চেহারা পাই। ওখানে কেল্লা, ময়দান, বাজার ও বিচারালয়ের বিভিন্ন বাড়ী একের পর এক ভিড় করে আছে। মাঁর্তো আমেদাবাদে বিভিন্ন ধরনের বাড়ীর গায়ে ঘেঁসে লাগানোর কথা বলেছেন। এ দুটি ছবিতে আমরা দুটি শহরের দুটি আলাদা কাজের কথা দেখি যার ফলে শহর দুটির গঠনকাঠামো আলাদা হয়েছে।

শহরের কাঠামোর মধ্যে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। ইউরোপীয়ান বাড়ীগুলি ভারতীয়দের এলাকা থেকে আলাদা যার ফলে ঐ ইউরোপীয়ান এলাকাগুলি একটা বিদেশী চেহারা নেয়। কিন্তু দামান বা চাউলে এটা যতটা সত্যি সুরাট শহরে এটা ততটা প্রকট নয়। এর থেকে যেটা মনে হয় যে আলাদা থাকার বৈশিষ্ট্য সব জাতিগত গোষ্ঠীই চাইছে। কিন্তু ভারতীয় এলাকায় থাকার জায়গা ও কাজের জায়গা আলাদা নয়। বন্দর-শহর বা শুধু শহরেও আমরা এটাই দেখি। আমরা এটাও দেখছি যে শহরের ধনীগোষ্ঠীরা শুধু ভালো বাসাতে শহরের মধ্যে থাকছে তাই নয়, শহরের বাইরেও তাদের বাগানবাড়ী রয়েছে যেখানে তারা সপ্তাহান্তে যায়। পর্যটকদের লেখা থেকে এটাও জানা যায় যে প্রতিটি বড় শহরেই স্বাস্থ্য ও ময়লা পরিস্কার, পথঘাট ঠিক রাখা, চোর-ডাকাত ধরা ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন বিভাগ ছিল যেটা আমরা সমকালীন ফারসী দলিল থেকে পাই। পর্যটকদের লেখা থেকে এটাও জানা যায় যে গুজরাটের এক শহর থেকে অন্য শহরে যাবার পথও মোটামুটি সুরক্ষিত ছিল।

আমরা ফরাসী পর্যটকদের লেখা থেকে যেসব মন্তব্যগুলি করেছি সেগুলো সমকালীন অন্যান্য ইউরোপীয় পর্যটকদের বক্তব্যের সঙ্গে বা সমকালীন ফারসী দলিলের সঙ্গে মেলানো যেতে পারে। সুতরাং এই মন্তব্যগুলিকে শেষ কথা বলে ধরে না নেওয়াই ঠিক হবে।

সূত্রনির্দেশ

ক : বিভিন্ন ফরাসী পর্যটকদের তালিকা

১ এ. গ্রে (সম্পাদিত) : "ভইয়াজ অফ ফ্রাসোয়া পিরাডলাভাল," হাকলুৎ সোসাইটি, ১৮৮৭-৮৯, তিন খণ্ড

২ জে. বি. হ্যারিস (সম্পাদিত) : "কালেকসন অফ ট্রাভেলস, লণ্ডন, ১৭৫৫, ২ খণ্ড, প্রথম (কমাণ্ডার বোলিয়ুজ' ভয়েজ)

৩ এ. গ্রে (সম্পাদিত) : "দ্য ট্রাভেলস অফ পিয়েত্রো দ্য লাভেলা", ১৮৯২, দুই খণ্ড, দ্বিতীয়, পর্ব ১

৪ সিনিয়র ফ্রাঁসোয়া দ্য লা বুলয়ইএ লগুজ : 'লে ভইয়াজ এ অবজার-ভাসিওন, প্যারিস, ১৬১৩। ওর সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : নিকোলাই মানুচ্চি : "স্তোরিয়া দ মোগোর, লণ্ডন, ১৯০৭, (পৃ ৪২৭-২৮)। লগুজ ঢাকার কাছে দুর্বত্তদের হাতে নিহত হন।

৫ ভি. বল (সম্পাদিত) : জাঁ বাতিস্ত ট্যাভারনিয়াব "ট্রাভেলস ইন ইণ্ডিয়া" ১৮৯৯, ২ খণ্ড

৬ এ. কনষ্টেবল (সম্পাদিত) : ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ার : "ট্রাভেলস ইন দ্য মুঘল এম্পায়ার, ১৬৫৬-১৬৬৮, তৃতীয় সং এর পুনঃপ্রকাশ, দিল্লী, ১৯৭২

৭ সুরেন্দ্রনাথ সেন (সম্পাদিত) : "ইণ্ডিয়ান ট্রাভেলস অফ থেভনো এ্যাণ্ড কারেরি" নিউ দিল্লী, ১৯৪৯

৮ ফার্ডসেট (সম্পাদিত) : "দ্য ট্রাভেলস অফ আবে কারে, ১৬৭২-১৬৭৪", (হাকলুৎ সোসাইটি, তিন খণ্ড, ১৯৪৭। এছাড়া দ্রষ্টব্য : আবে কারে : "ভইয়াজ দেস এ্যাণ্ড ওরিয়েন্টাল প্যারিস, দুই খণ্ড, ১৬৭৯ (আংশিক ইংরাজী অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য : অনিরুদ্ধ রায় (সম্পাদিত) : "সুরেন্দ্রনাথ সেন : ফরেন বায়োগ্রাফিজ অফ শিবাজী", পুনঃপ্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭৭

৯ সুসো দ্য রেনফোর্ট : "হিস্তয়ার দেজ এ্যাণ্ড ওরিয়েন্টাল". লাইডেন, ১৬৮৮

১০ গ্যাব্রিয়েল দেলন : "ভইয়াজ দেজ এ্যাণ্ড ওরিয়েন্টাল", প্যারিস, ১৬৮৮ (ইংরাজী অনুবাদ, লণ্ডন, ১৬৯৮)

১১ এ. মার্তিনো (সম্পাদিত) : "মেময়ার্স দ্য ফ্রাঁসোয়া মাঁর্তা", প্যারিস, ১৯৩১-৩৪, তিন খণ্ড, প্রথম খণ্ড

১২ জ্যাকব ব্লাঙ্কেট দ্য লা হে : "জর্নাল দু ভইয়াজ দে গ্রঁন্দ এ্যাণ্ড", প্যারিস, ১৬৯৮, দুই খণ্ড, প্রথম খণ্ড

১৩ এইচ. ক্রোয়াদভো (সম্পাদিত) : "মেময়ারস দ্য এল. এ. বেলাঞ্জর দ্য লেসপিনে"। ভন্দোম, ১৮৯৫

১৪ লেস্ত্রা : রুলাসিওঁ ও জুর্নাল দাঁ ভইয়াজ নুভেলম্‌ ফে "রোজ এ্যাণ্ড ওরিয়েন্টাল" প্যারিস, ১৬৭৭

খ

১ আবুল ফজল : "আইন-ই আকবরী", (সরকার অনুদিত, ১৯৪৭)

২ এম. পি. সিং : "টাউনস, মার্কেটস, মিন্ট এ্যাণ্ড পোর্ট ইন দ্য মুঘল এ্যাম্পায়ার", নিউ দিল্লী, ১৯৮৫

৩ ভি. এ. জানকি : "কমার্স অফ ক্যাম্বে", বরোদা, ১৯৮০

৪ "দ্য এফেয়ার্স অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফ্যাক্টরী এট সুরাট", ১৬২৪-১৭০০ (ফরাসী দলিল)।

৫ ডবল্যু. এইচ. মোরল্যাণ্ড : "ফ্রম গুজরাট টু গোলকুণ্ডা ইন দ্য রেইন অফ জাহাঙ্গীর" ("জার্ণাল অফ ইণ্ডিয়া হিস্ট্রি", ১৯৩৮, নং ৫০, খণ্ড ১৭, পার্ট ২. পৃ ১৩৫-৫০)

৬ এম. এন. পিয়ার্সন : "মারচান্টস এ্যাণ্ড রুলারস ইন গুজরাট", ক্যালিফরনিয়া. ১৯৭৬

(এই লেখাটির জন্য আমি সন্তোশচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে বিশেষভাবে ঋণী)।

বাংলায় পর্তুগীজ বাণিজ্য

অনিল দাস

পর্তুগীজদের আগে মধ্যযুগের এশীয় বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে B. J. Schrieke[১] মন্তব্য করেছেন যে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকলেও তারা অস্ত্রের আঘাতে স্থলে কিংবা জলে বাণিজ্যিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে ধ্বংস করত না। সে সময় বাংলার ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও শান্তি ও সহযোগিতার বাতাবরণ ছিল।[২] পর্তুগীজরা 'strong arm method'[৩] প্রয়োগ করে ভারত মহাসাগরে রাজানীতি আমদানী করল।[৪] তাদের কামানের গর্জনে বঙ্গোপসাগরও উত্তাল হয়ে হঠল।[৫]

সম্প্রতি এশিয়া ও ভারত মহাসাগরের পটভূমিকায় পর্তুগীজ বাণিজ্য সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।[৬] এই গ্রন্থগুলিতে বাংলার কথা এসেছে প্রসঙ্গত, বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ ঘটে নি। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলায় পর্তুগীজ বাণিজ্য এবং বাংলার অর্থনীতির উপর তার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বাংলায় পর্তুগীজদের ব্যবসাবাণিজ্যের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সরস্বতী নদীতে চড়া পড়ায় পর্তুগীজদের বড় বড় জাহাজ সাতগাঁ বন্দরে ঢুকতে পারত না। তাই সেগুলো নোঙর করত বেতরে।[৭] কেনাবেচা করার জন্য তারা বছরে ৫ থেকে ৬ মাস থাকত। পরের দিকে তারা টানা এক-দু'বছরও থেকে যেত।[৮] তারা সম্রাট আকবরের কাছ থেকে ফরমান লাভ করে হুগলীতে স্থায়ী বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেছিল (১৫৭৯ খ্রীঃ)। কয়েক বছরের মধ্যেই তারা হুগলী ও সাতগাঁর উপর তাদের আধিপত্য কায়েম করেছিল।[৯] তাদের উদ্যোগে হুগলী বাংলার প্রধান বন্দরে পরিণত হয়।[১০] কালক্রমে তারা শ্রীপুর, কার্তাবু, ঢাকা, লুরিকল, ভুলুয়া নোয়াখালি, বরিশাল, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানেও বাণিজ্যকুঠি গড়ে তোলে।[১১] তারা হুগলী থেকে পাটনায় গিয়ে কেনাবেচা করত।[১২] ১৬৩২ সাল পর্যন্ত বাংলার ব্যবসাবাণিজ্যের সিংহভাগ

ইতিহাস বিভাগ, শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়

ছিল পর্তুগীজদের দখলে। ১৬৩২ সালে মুঘল সৈন্যের তাড়া খেয়ে তারা হুগলী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।[১৩] এই সুযোগে স্থানীয় প্রভাবশালী বণিকরা হুগলী বন্দরের দখল নেয়।[১৪]

বাংলায় পর্তুগীজদের ব্যবসাবাণিজ্য বলতে কেবলমাত্র হুগলীর পর্তুগীজদের বাণিজ্যই বোঝায় না। তারা ভারত ও এশিয়ার বিভিন্ন বাণিজ্য ঘাঁটি থেকে হুগলী বন্দরে নিয়মিত জাহাজ পাঠাত। বাংলার আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে এদের বড় রকমের হিস্যা ছিল। প্রকৃতপক্ষে হুগলী বন্দরের মাধ্যমে বাংলার আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য পর্তুগীজদের 'Casa da India' সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। তারা বাংলার বাণিজ্যের পরিধি ও পরিমাণ দু-ই বৃদ্ধি করেছিল। বাংলায় সরাসরি বাণিজ্য গড়ে তোলার আগেই বাংলার এশীয় বাণিজ্যের সঙ্গে পর্তুগীজদের পরিচয় হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশেষত মালাক্কায়। সেখানে বাংলার বণিকরাও ব্যবসা করত।[১৫] মালাক্কায় বাংলার পণ্য বিক্রি করে অন্তত ২৫ শতাংশ লাভ হত।[১৬]

পর্তুগীজরা বাংলার সঙ্গে মালাক্কা তথা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় করেছিল। মালাক্কা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, বান্দা, Amboina, সোলর, টিমর, পেগু প্রভৃতি স্থান থেকে পর্তুগীজদের জাহাজ যেমন হুগলী বন্দরে ভিড়ত তেমনি বাংলা থেকে পর্তুগীজরাও এসব অঞ্চলে পাড়ি জমাত।[১৭] তাদের উদ্যোগে বাংলার বাণিজ্য চীন ও জাপানে বিস্তারলাভ করেছিল। তারা বাংলা থেকে সরাসরি ম্যানিলার সঙ্গে বাণিজ্য গড়ে তুলেছিল। Acapulco থেকে ফিলিপিনে মেক্সিকোর রূপো আমদানী হওয়ায় ম্যানিলার ব্যবসা-বাণিজ্যে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। এই রূপোর আকর্ষণে চীন ও জাপান ইতিমধ্যে ম্যানিলার বাণিজ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল।[১৮] এদিক দিয়ে বিচার করলে বাংলার অর্থনীতিতে ম্যানিলার সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যিক যোগাযোগের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এ বাণিজ্যে বাংলার স্থানীয় বণিকরাও অংশ নিত।[১৯] এক কথায় পর্তুগীজদের উদ্যোগে বাংলার এশীয় বাণিজ্যের পরিধি ও পরিমাণ আগের চেয়ে অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল।[২০] প্রতি বছর গোয়া, কোচিন, মালাবার, মালদ্বীপ ও সিংহল থেকেও বহুসংখ্যক জাহাজ হুগলী বন্দরে ভিড়ত। ১৬২৯ সালে সেন্ট অগাস্টিন নামে একটি জাহাজ কোচিন থেকে হুগলী বন্দরে এসেছিল, তার বাণিজ্যসম্ভারের মূল্য ছিল ৮ লক্ষ টাকা।[২১] বাংলা নিয়মিত গোয়া ও সিংহলকে খাদ্যসামগ্রী যোগান দিত। সিংহল থেকে আমদানী করা হত হাতী, দারচিনি, গোলমরিচ ইত্যাদি।[২২]

পর্তুগীজরা বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণে সুতীবস্ত্র রপ্তানী করত। তাদের

আন্তঃএশীয় বাণিজ্যে বাংলার মসলিন ও থান কাপড়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। তারা মালাক্কা ও ম্যাকাও-এ বাংলার মসলিন ও সাদা থান বিক্রি করে প্রচুর লাভ করত।[২৩] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মসলা ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাত থেকে ওলন্দাজদের হাতে চলে গেলে 'Carreira'এর রপ্তানী পণ্যের তালিকায় বাংলার সুতীবস্ত্র ও সোরার গুরুত্ব বিশেষভাবে বেড়ে গিয়েছিল।[২৪] বাংলার খাদ্যসামগ্রীর উপর ভারত ও এশিয়ার অনেক অঞ্চল নির্ভর করত। বাংলার চালের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশী। চালের দাম ছিল অত্যন্ত সস্তা। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে চিনি, মাখন, ঘি, তেল, আদা, হলুদ ইত্যাদিও পর্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানী করা হত। মানরিকের লেখা থেকে জানা যায় যে, বছরে ১০০টিরও বেশী জাহাজে বাংলার খাদ্যসামগ্রী রপ্তানী করা হত। এ ছাড়াও রপ্তানী তালিকায় নিয়মিত স্থান পেত রেশম, তসর, লিনেন, নীল, চুন, সোরা, লাক্ষা, কার্পেট, বিছানার চাদর, রেশমের হাওদা, সূচীশিল্পজাত দ্রব্য ইত্যাদি।[২৫] পর্তুগীজরা বাংলা থেকে এ সমস্ত দ্রব্য সস্তা দামে কিনে অন্যত্র বিক্রি করে প্রচুর লাভ করত। মালাক্কা, ফিলিপিন, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে বাংলার পণ্যসামগ্রী বোঝাই জাহাজ নিয়ে গিয়ে তারা কখনো কখনো হাজার শতাংশ লাভ করত।[২৬] পর্তুগীজরা বাংলা থেকে ক্রীতদাসদের ভারতের বিভিন্নস্থানে চালান দিত।[২৭]

পর্তুগীজরা বাংলায় যেসব পণ্য আমদানী করত তার বেশীর ভাগটাই আসত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য থেকে। Amboina এবং তার উত্তরে মুলুক্কাস থেকে তারা প্রধানত আমদানী কবত লবঙ্গ। জায়ফল, জৈত্রী ও অন্যান্য দামী মসলা আনা হত মালাক্কা ও বান্দা থেকে। কর্পূর প্রধানত যোগান দিত বোর্ণিও। চীন থেকে আমদানী করা দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রেশম, রেশম বস্ত্র, চীনামাটির বাসন (porcelain) ও আসবাব-পত্র। সাদা ও লাল সুগন্ধি চন্দনকাঠ তারা আমদানী করত সোলর ও টিমর থেকে। মালদ্বীপ থেকে যারা কড়ি আমদানী করত তাদের মধ্যে বাংলা ছিল প্রধান। মালয় থেকে প্রধানত আমদানী করা হত টিন। শঙ্খ নিয়ে আসা হত তিতুকোরিন ও তিনিভেলির উপকূলে পেসকারিয়া থেকে। এসব জিনিস বাংলায় বিক্রি করে প্রচুর লাভ করত পর্তুগীজরা। পাটনায় দামী মসলা, টিন ও চীনের জিনিসের বিশেষ চাহিদা ছিল। দেশীয় বণিকরা বাংলার নিজস্ব দ্রব্যের সঙ্গে আমদানী করা এসব পণ্যও ভারতের অন্যত্র বিশেষত আগ্রা, সুরাট, আজমীঢ় ও মসলিপত্তম প্রভৃতি স্থানে নিয়ে গিয়ে বেশ লাভে বিক্রি করত। ইংরেজদের চিঠিপত্রে বাংলা থেকে গুজরাটে আমাদানী করা পণ্যের মধ্যে শিশা, টিন, গজদন্ত, পারদ, সিঁদুর ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৮]

বাংলায় সব সময়েই আমদানী পণ্যের চেয়ে রপ্তানী প্রণ্যের পরিমাণ ও মূল্য অনেক বেশী হত। এ ছিল বাংলার বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সোনা ও রূপো আমদানীর দ্বারা বাণিজ্যের ভারসাম্য বজায় রাখতে হত। পর্তুগীজরা তাদের বিপুল রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য বাংলায় প্রতি বছর পর্যাপ্ত পরিমাণ রূপো ও সোনা আমদানী করত। আমদানী করা রূপোর বেশীর ভাগটাই আসত জাপান, মালাক্কা ও ম্যানিলা থেকে।[২৯] আরাকান, পেগু ও আচে থেকেও রূপো আমদানী করা হত। সোনা আনা হত প্রধানত চীন ও সুমাত্রা (আখিন) থেকে। রূপোর বাট, সোনা ও এল মিনার স্বর্ণচুর যা পর্তুগাল থেকে গোয়ায় পাঠানো হত তার কিছুটা বাংলায় পৌঁছাত। পশ্চিম এশিয়া থেকেও সোনা ও রূপো আমদানী করা হত। এ ছাড়াও পর্তুগীজরা পেগু থেকে আমদানী করত চুণী, পান্না ও নীলকান্তমণি। হীরে আসত মসলিপত্তম থেকে। মুক্তো প্রধানত আমদানী করা হত মানার (Manar) থেকে। পর্তুগীজদের বাণিজ্য মারফৎ বিভিন্ন ধরনের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাও প্রচুর পরিমাণে বাংলায় প্রবেশ করত—যথা Cruzado, সোনার আসরফি (Xerafine) প্যাগোডা, রৌপ্যমুদ্রা লারিন, রিয়াল ইত্যাদি।‧এ মুদ্রাগুলি প্রধানত আমদানী করা হত ওরমুজ, গোয়া ও মালাক্কা থেকে।[৩০]

১৫৬৭ সালে পর্তুগীজরা সাতগাঁ বন্দর থেকে বছরে ৩০ থেকে ৩৫টি জাহাজে বাণিজ্যদ্রব্য সংগ্রহ করত। হুগলী বন্দর গড়ে উঠার পর তাদের বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। ষোড়শ শতকের শেষদিকে লিনসাটেন বাংলায় পর্তুগীজদের বিপুল বাণিজ্যের ('great traffique') উল্লেখ করেছেন। মানরিকের লেখা থেকে জানা যায় যে, প্রতি বছর চীন, মালাক্কা ও ম্যানিলা থেকে বহুসংখ্যক জাহাজ হুগলীর বন্দরে ভিড়ত। পর্তুগীজরা কেবলমাত্র গোয়া, মালাবার ও মালয় থেকেই বছরে ৬০ থেকে ১০০টি জাহাজ পাঠাত হুগলী বন্দরে। এর থেকে ধারণা করা যায় যে, বছরে প্রচুরসংখ্যক জাহাজ যেমন হুগলী থেকে অন্যত্র যেত তেমনি ভারত ও এশিয়ার বিভিন্ন বন্দর থেকে হুগলীতে আসত।[৩১] বাংলার অর্থনীতির উপর এই বিপুল বাণিজ্যের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

সপ্তগ্রাম বন্দরের পতনের পর এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক উদ্যোগ সরস্বতী নদীর তীর ত্যাগ করে ভাগীরথীর (হুগলী) তীরে এদিক ওদিক ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ছিল। হুগলী নদীর পশ্চিম ও পূর্ব তীরে ব্যবসার নতুন নতুন কেন্দ্র গড়ে উঠছিল—যথা হুগলী, বেতর, সুতানুটি প্রভৃতি। হুগলী বন্দর গড়ে ওঠার পর হুগলী নদীর পশ্চিম পাড় বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

১৫৯৫ সালে (আনুমানিক) সাতগাঁ বন্দরের শুল্কের (বন্দরবন) পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ দাম অর্থাৎ ৩০০০০ টাকা।[৩২] সাতগাঁ বন্দরের তখন অন্তিম অবস্থা, এই শুল্কের বেশীর ভাগটাই সংগৃহীত হত হুগলী বন্দর থেকে পর্তুগীজদের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য বাবদ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সাতগাঁ ও হুগলী দু-ই ছিল পর্তুগীজদের অধিকারে। মনে হয় এ সময় বছরে হুগলীর আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা। যেহেতু এর বেশীর ভাগটাই ছিল পর্তুগীজদের বাণিজ্য সুতরাং এ থেকে তাদের বাণিজ্যের পরিমাণ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। এক সময় তারা আমদানী ও রপ্তানী বাবদ এক লক্ষ টাকা শুল্ক আদায় দিত।[৩৩] এর থেকে এই ধারণা হয় যে, এক সময় বাংলায় বছরে তাদের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল অন্তত ৪০ লক্ষ টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মানরিক বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল পরিমাণ দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।[৩৪]

পর্তুগীজদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বন্দরকে কেন্দ্র করে হুগলী নগর গড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চল তথা বাংলার অর্থনীতির উপর নগরায়ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আকবরের সময় (আনুমানিক ১৫৯৫ খ্রীঃ) সাতগাঁ ও সুলেমানাবাদ সরকারের প্রতি বর্গমাইলের জমা ছিল যথাক্রমে ২৯৮৩ দাম এবং ৭৩৯৭ দাম।[৩৫] বর্তমান আয়তন অনুসারে হুগলী ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের প্রতি বর্গমাইলের জমার হিসেব দাঁড়ায় ২৫,৫২০ দাম।[৩৬] এ থেকে ষোড়শ শতকের হুগলীর নগরায়ণের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে হুগলীর নগরায়ণ ত্বরান্বিত হয়েছিল এবং জমাও বেড়েছিল।

বাংলা তথা ভারতের বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে বুলিয়ানের (bullion) সম্পর্ক নিবিড়।[৩৭] ভারতে সোনা ও রূপো পাওয়া যেত অতি সামান্য। সোনা ও রূপোর প্রায় সবটাই পাওয়া যেত রপ্তানী বাণিজ্যের বিনিময়ে।[৩৮] বহির্বাণিজ্য মারফৎ প্রাপ্ত সোনা ও রূপোর উপরই মুদ্রার উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। মুঘল যুগে তিন প্রকারের ধাতু মুদ্রা প্রচলিত ছিল যথা স্বর্ণমুদ্রা (muhr), রৌপ্যমুদ্রা (Rupiya) এবং তাম্র মুদ্রা (dam)।[৩৯] এ সময়ে বাংলায় মুদ্রার উৎপাদনের উপর ক্রমোবর্দ্ধমান পর্তুগীজ বাণিজ্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বলাবাহুল্য মুদ্রাই অর্থনীতির মুখ্য নিয়ন্তা।

U. P. Treasure Trove এর মধ্যে বাংলার টাঁকশালের মুদ্রাও আছে। রৌপ্যমুদ্রাগুলি ১৫৯৬ থেকে ১৬৩৫ সালের। এই রৌপ্যমুদ্রাগুলি উক্ত সময়ের পর্তুগীজ বাণিজ্য এবং বাংলার অর্থনীতি বিশ্লেষণের ব্যাপারে

প্রাসঙ্গিক। এই মুদ্রাগুলি থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলার টাঁকশালের বাৎসরিক রৌপ্যমুদ্রা উৎপাদনের যে ধারণা পাওয়া যায় তা নীচে উল্লেখ করা হল :[৪০]

সারণী ১

বৎসর	বাৎসরিক গড় উৎপাদন (মেট্রিক টন)
১৫৯৬-১৬০৫	১২.৫৭
১৬০৬-১৬১৫	৮.১৫
১৬১৬-১৬২৫	১২.৬৯
১৬২৬-১৬৩৫	৮৫.৭৬

ঔরঙ্গজেবের আগে রূপোর টাকার ওজন ছিল গ্রেন (grainstroy)। খাদ বাবদ ৪ শতাংশ বাদ দিলে প্রতিটি মুদ্রায় খাঁটি রূপোর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭০.৮৮ গ্রেন (ট্রয়)।[৪১] ১ মেট্রিক টন রূপো প্রায় ৯০৩২৪.৮০ টাকার ওজনের সমান।[৪২] মুদ্রায় (টাকায়) রূপান্তরিত করলে বিভিন্ন সময়ে বাংলার টাঁকশালের বাৎসরিক গড় উৎপাদন দাঁড়ায় নিম্নরূপ :

সারণী ২

বৎসর	বাৎসরিক গড় উৎপাদন (টাকা)
১৫৯৬-১৬০৫	১১,৩৫,৩৮২
১৬০৬-১৬১৫	৭,৩৬,১৪৭
১৬১৬-১৬২৫	১১,৪৬,২২১
১৬২৬-১৬৩৫	৭৭,৪৬,২৫৪

১৫৯৬ থেকে ১৬৩৫ সালের মধ্যে বছরে বাংলার টাঁকশালের রূপোর টাকার গড় উৎপাদন ছিল ২৯.৭৯ মেট্রিক টন অর্থাৎ ২৬,৯০,৭৭৫ টাকা। উক্ত সময়ে গুজরাটের টাঁকশালের রূপোর টাকার গড় বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬০-৮৬ মেট্রিক টন অর্থাৎ ৫৪,৯৭,১৬৭ টাকা। বাংলার তুলনায় গুজরাটের ব্যবসাবাণিজ্যের পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। প্রকৃতপক্ষে ভারতের ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে (বিশেষত বৈদেশিক বাণিজ্য) গুজরাটের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক।[৪৩] বাৎসরিক মুদ্রা উৎপাদনের নিরিখে উক্ত সময়ে গুজরাটের বাণিজ্যের পরিমাণ বাংলার দ্বিগুণ ছিল বলে মনে করা যায়।

যে মুদ্রাগুলি ব্যবহারের ফলে কালক্রমে নির্দিষ্ট ওজন হারিয়ে ফেলত সেগুলিকে গলিয়ে নতুন করে নির্দিষ্ট ওজনের মুদ্রা তৈরী করা হত।[৪৪] মনে হয় এর পরিমাণ বছরের মোট উৎপাদিত মুদ্রার আড়াই শতাংশের বেশী নয়। আড়াই শতাংশ বাদ দিয়ে ১৫৯৬ থেকে ১৬৩৫ সালের মধ্যে বাংলায় যে পরিমাণ নতুন মুদ্রার সংযোজন হয়েছিল তা নীচে উল্লেখ করা হল:

সারণী ৩

বৎসর	বাৎসরিক গড় উৎপাদন (মেট্রিক টন)	বাৎসরিক গড় উৎপাদন (টাকা)
১৫৯৬-১৬০৫	১২.২৫	১১,০৬,৪৭৮
১৬০৬-১৬১৫	৭.৯৫	৭,১৮,০৮২
১৬১৬-১৬২৫	১২.৩৭	১১,১৭,৩১৭
১৬২৬-১৬৩৫	৮৩.৬১	৭৫,৫২,০৫৬

সারণী ৩ অনুসারে ১৫৯৬ থেকে ১৬৩৫ সাল পর্যন্ত মোট ১১৬১.৮ মেট্রিক টন নতুন রৌপ্যমুদ্রার সংযোজন হয়েছিল। মুদ্রার মূল্য প্রায় ১০ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। বাৎসরিক গড় মুদ্রা উৎপাদন দাঁড়ায় প্রায় ২৯ মেট্রিক টন অর্থাৎ প্রায় ২৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এ সময়ে বাংলার বাণিজ্যের সিংহভাগ ছিল পর্তুগীজদের দখলে। ১১৬১ মেট্রিক টন রূপোর অন্তত ৭০ শতাংশ অর্থাৎ ৮১২ মেট্রিক টন রূপো পর্তুগীজদের বাণিজ্য মারফৎ পাওয়া গিয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। এই অনুসারে বছরে তাদের গড় আমদানীর পরিমাণ ছিল ২০ মেট্রিক টন (প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা)। পর্তুগীজদের সোনা ও রূপো আমদানীর অনুপাত ছিল ১ : ৪০।[৪৫] এই অনুযায়ী ১৫৯৬ থেকে ১৬৩৫ সালের মধ্যে তারা অন্তত ২০ মেট্রিক টন সোনা বাংলায় আমদানী করেছিল বলে মনে করা যায়। এই হিসেবে বছরে তাদের সোনা আমদানীর পরিমাণ ছিল প্রায় ০.৫ মেট্রিক টন (প্রায় ৪ লক্ষ টাকা)। ১ মেট্রিক টন সোনা ৯১,৩২৭.২৩টি মোহরের সমতুল।[৪৬] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সোনা ও রূপো ছাড়া বিভিন্ন দ্রব্য (commodity) এবং মুদ্রা (cruzado, প্যাগোডা লারিন, রিয়াল ইত্যাদি) আমদানী করত। এই আমদানীর পরিমাণ সোনা ও রূপোর মোট পরিমাণের ১০ শতাংশের বেশী ছিল না বলেই মনে হয়। এই হিসেবে বছরে তাদের বাণিজ্যের গড় পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা।

এখন দেখা যাক বাংলার অর্থনীতির উপর নতুন মুদ্রার সংযোজন ও সঞ্চালনের কতটা প্রভাব পড়েছিল। ১৫৯৬ থেকে ১৬৪০ সালের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা মোহর এবং তাম্রমুদ্রা 'দাম' এর রৌপ্যমূল্যের পরিবর্তন হয়েছিল। এ সময়ের মধ্যে মোহরের তুলনায় রৌপ্যমুদ্রার মূল্য হ্রাস পেয়েছিল প্রায় ৪৫ শতাংশ। রৌপ্যমুদ্রার intrinsic value হ্রাস পেয়েছিল প্রায় ৩০ শতাংশ।[৪৭] এ সময়ের মধ্যে সোনার মজুত প্রায় ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে মনে করলে ভুল হবে না।[৪৮] সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে তামার ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার ফলে মুদ্রা ('দাম') তৈরীর জন্য তামার টান পড়ে। সপ্তদশ শতকের বিশের দশকের আগে রূপোর টাকা দিয়ে তামার মুদ্রার (দামের) অভাব পূরণ করা হয়।[৪৯] সুতরাং এ সময়ে দাম-এর রৌপ্যমূল্যের তেমন হেরফের হয় নি। বিশের দশক থেকে দাম-এর রৌপ্যমূল্য বাড়তে থাকে। বাংলায় ১৬৪০ সাল পর্যন্ত দাম-এর রৌপ্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল ৪৩ শতাংশ।[৫০] ১৬৩৬ সাল পর্যন্ত গুজরাটে বৃদ্ধির পরিমাণ ৪৮ শতাংশ এবং ১৬৩৭ সাল পর্যন্ত আগ্রায় বৃদ্ধি ঘটেছিল ৫৩ শতাংশ।[৫১]

১৫৯৫ থেকে ১৬৩৫ সালের মধ্যে বাংলায় রৌপ্যমুদ্রার উৎপাদন ৬ গুণের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল। টাকার যোগান ও সঞ্চালন (circulation) বৃদ্ধি পেলেই যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে এমন কথা নয়। যদি টাকার যোগান ও সঞ্চালন বেড়ে যায় এবং পণ্যের যোগান অপরিবর্তিত থাকে তাহলে মূল্যসূচক (price index) ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। বাংলায় রূপোর টাকার যোগান বৃদ্ধি পেতে থাকে প্রকৃতপক্ষে বিশের দশকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে।[৫২] এ সময় থেকে মূল্যসূচকের ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ে 'দাম' অর্থাৎ তামা ছিল মূল্যসূচকের পরিচায়ক। 'দাম-এর রৌপ্যমূল্যে প্রকাশ করলে ১৫৯৫ থেকে ১৬৪০ সালের মধ্যে বাংলায় মূল্যসূচকের বৃদ্ধি ঘটেছিল ৪০ শতাংশেরও বেশী। ১৫৯৫ থেকে ১৬৪০ সালের মধ্যে রৌপ্যমুদ্রার ৬ গুণেরও বেশী উৎপাদন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যসূচক যতটা বাড়ার কথা ততটা বাড়ে নি। তার কিছু কারণও ছিল। নীচে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হল।

১৫৯৫ থেকে ১৬৩৬ সালের মধ্যে বাংলার রাজস্ব বাবদ জমা বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় ৫৫ শতাংশ।[৫৩] কৃষি উদ্বৃত্ত বেড়েছিল সমভাবে। GCA অর্থাৎ চাষবাসের এলাকা সম্প্রসারিত হয়েছিল। নগদে রাজস্ব[৫৪] দেওয়ার জন্য রূপোর টাকার চাহিদা বেড়েছিল। নতুন নতুন নগরের উৎপত্তির ফলে বাজার সম্প্রসারিত হয়েছিল। কৃষি উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আরো বেশী ফসল বিক্রির প্রয়োজন হয়েছিল। এ ব্যাপারে নতুন নগরের বাজারগুলি কাজে লেগেছিল। রূপোর টাকার উৎপাদন

যে বৃদ্ধি পেয়েছিল তার কিছুটা নতুন নগরগুলির বাজারের প্রয়োজন মিটিয়েছিল। কেনাবেচা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে টাকার সঞ্চালনও বেড়েছিল। সুতরাং নগরায়ণ, বাজারের সম্প্রসারণ এবং উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্যের যোগান বৃদ্ধি মূল্য-সূচকের ঊর্ধ্বগতি অনেকটা রোধ করেছিল। উক্ত সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা এবং GNP যে কিছুটা বেড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ১৬০০ থেকে ১৭০০ সালের মধ্যে ভারতে বছরে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ০'১৪ শতাংশ ছিল বলে মনে করা হয়।[৫৫] এই অনুসারে ১৫৯৫ থেকে ১৬৩৫ সালের মধ্যে বাংলার জনসংখ্যার বৃদ্ধি দাঁড়ায় ৫ শতাংশ। স্বাভাবিকভাবে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত মুদ্রার প্রয়োজন হয়েছিল। এ দিক দিয়ে বিচার করলে অর্থনীতির উপর নতুন মুদ্রার সংযোজন ও সঞ্চালনের প্রভাব (১৫৯৫-১৬৩৫) ৬ গুণের অনেক কম হবে। নিঃসন্দেহে এ সময়ের মধ্যে মুদ্রার প্রচলনগতিরও (velocity of money) পরিবর্তন হয়েছিল।

বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্ব এ সময়ে প্রতি বছরই কেন্দ্রে পাঠানো হত কিনা কিংবা পাঠালেও কতটা পাঠানো হত সে সম্পর্কে যথাযথ তথ্য পাওয়া যায় না।[৫৬] মনেহয় হাতী, মসলিন, রেশম বস্ত্র, মূল্যবান পাথর, সোনা ও মোহরের সঙ্গে রৌপ্যমুদ্রাও বাংলা থেকে দিল্লীতে পাঠান হত উদ্বৃত্ত রাজস্ব, (nazar) ও খাস (khasah) বাবদ। ১৬২৭ সালে জাহাঙ্গীর বাংলার সুবাদারকে তার নিজের জন্য ৫ লক্ষ এবং সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের জন্য ৫ লক্ষ টাকা পাঠাতে বলেছিলেন।[৫৭] ১৬৩৫ সালে সুবাদার আজম খাঁও সম্রাটকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন।[৫৮] এ সময় বিভিন্নভাবে বাংলা থেকে যে অর্থ নিঃসরণ হত সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুবাদার ও অন্যান্য কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয়—যথা সোনা, মোহর, টাকা প্রভৃতি বাংলা ছেড়ে যাওয়ার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। এর পরিমাণও কম ছিল না। তাছাড়া ব্যবসায়ীরা নগদ অর্থ বাংলা থেকে ভারতের অন্যত্র নিয়ে যেত। এভাবে সম্পদ নিঃসরণের দ্বারা বাংলার অর্থনীতিতে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত তা পূরণ হয়ে যেত পর্তুগীজদের আমদানী করা সোনা ও রূপোর দ্বারা। বিশেষত তাদের আমদানী করা রূপো মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়ে বাংলার অর্থনৈতিক বিকাশে অনুকূল শক্তি যুগিয়েছিল। তাই অর্থ (সংযোজিত নতুন মুদ্রা) নগরায়ণে, শিল্প উৎপাদনে ও মূলধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল। এই অর্থের বেশীর ভাগটাই কিন্তু অপচয় করা হত অথবা লুকিয়ে রাখা হত।[৫৯] এর ফলে এ সময়ে বাংলার অর্থনীতির উপর প্রতি বছর নতুন মুদ্রা সংযোজনের যতটা প্রভাব পড়া উচিত ছিল তা কখনই পড়ে নি।

সূত্রনির্দেশ

১ ইন্দোনেশিয়ান সোসিওলজিকাল স্টাডিজ, ১ম খণ্ড, পৃ ৭-৮

২ ভারেথমা, টেম্পল, পৃ ৭৯ ; বারবোসা, ডেমস, ২য় খণ্ড, পৃ ১৫৫ ৪৫, পিরেজ, সুমা ওরিয়েন্টাল, ১ম খণ্ড, পৃ ৮৮, ৯২ ; Meilink Roelofsz, এশিয়ান ট্রেড অ্যাণ্ড ইউরোপীয়ান ইনফ্লুয়েন্স, পৃ ৩, ৬৮ ; চাবলানি, দি ইকোনমিক কণ্ডিশন অফ ইণ্ডিয়া ডিউরিং দি সিক্সটিনথ সেঞ্চুরি, পৃ ৬০

৩ সি. আর. বক্সার, দি পর্তুগীজ সিবোর্ণ এম্পায়ার, পৃ ৪৯

৪ অশীন দাশগুপ্ত ও এম. এন. পিয়ারসন সম্পাদিত ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দি ইণ্ডিয়ান ওশ্যান ১১০০-১৮০০, পৃ ৭১, ৮১

৫ কাম্পোস, হিস্ট্রি অফ দি পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল, পৃ ২৬-৩৬

৬ জন কোরিয়া আফনসো সম্পাদিত ইন্দো-পর্তুগীজ হিস্ট্রি : সোর্সেস অ্যাণ্ড প্রবলেমস, ১৯৮১ ; হেনরী সোলবার্গ, বিবলিওগ্রাফি অফ গোয়া অ্যাণ্ড দি পর্তুগীজ ইন ইণ্ডিয়া, ১৯৮২ ; কে. এস. ম্যাথু, পর্তুগীজ ট্রেড উইথ ইণ্ডিয়া ইন দি সিক্সটিনথ সেঞ্চুরি, ১৯৮৩ ; কীর্তিনাথ চৌধুরী, ট্রেড অ্যাণ্ড সিভিলিজেশন ইন দি ইণ্ডিয়ান ওশ্যান, ১৯৮৫ ; অরসরত্নম, মার্চেন্টস, কোম্পানীস অ্যাণ্ড কমার্স অন দি করমণ্ডল কোস্ট, ১৯৮৬ ; দাশগুপ্ত ও পিয়ারসন (১৯৮৭) পূর্বোক্ত ; সতীশচন্দ্র সম্পাদিত দি ইণ্ডিয়ান ওশ্যান, ১৯৮৭

৭ ফ্রেডারিকি, পুর্চাজ, ১০ম খণ্ড, পৃ ১১৪

৮ মানরিক, লয়ার্ড ও হস্টেন, ১ম খণ্ড, পৃ ২৭-২৮

৯ আবুল ফজল, আইন ই আকবরী, অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃ ১৩৭ ; হান্টার, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্টস অফ বেঙ্গল, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩০৭-১০

১০ লাহোরি, পাদশাহনামা, HIED, সপ্তম খণ্ড, পৃ ৩১ ; ইংলিশ ফ্যাক্টরিস ১৬১৮-২১, পৃ ২১৪ ; রিয়াজ, পৃ ২৯ ; ক্রাউফোর্ড, পৃ ১৮৮-৯ ; উইলসন, আরলি এ্যান্যালস অফ দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল, ১ম, পৃ ১০৪-৬

১১ কাম্পোস, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৫-৬, ৮৮-৯ ;

১২ ইংলিশ ফ্যাক্টরিস ১৬১৮-২১, পৃ ২১৩-১৪

১৩ লাহোরি, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০-৩২ ; ইংলিশ ফ্যাক্টরিস ১৬৩০-৩৩, পৃ ৩০৮

১৪ মানরিক ২য়, পৃ ৩১৭ ; হ্যামিলটন, ট্রেড রিলেশনস, পৃ ৩০-৩২ ; ইংলিশ ফ্যাক্টরিস ১৬৪৬-৫০ পৃ ২১৩ ; ডাচ রেকর্ডস, ৬৪ খণ্ড, টি নং DXLVIIA উল্লেখিত বি. পি. পি. ১৯৬৭, পৃ ৮৩ ; রিয়াজ, পৃ ৩০ ; তপন রায়চৌধুরী, জান কোম্পানী ইন করমণ্ডল, পৃ ৭৬

১৫ অনিল দাস, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয় বাণিজ্য ও বাংলার পণ্য, ইতিহাস অনুসন্ধান, ৩য় খণ্ড, পৃ ১১৫

১৬ পিরেজ, ২য় খণ্ড, পৃ ৯৩ ; দি কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া, ১ম, পৃ ১৮ (পরে সি. ই. এইচ. আই বলে উল্লেখ করা হবে।)

১৭ মানরিক, ১ম, পৃ ২৭-২৭ ; তুলনীয় রালফ ফিচ, ফস্টার, পৃ ২৮, ৩৪ ; ফান লিউয়ার, ইন্দোনেশিয়ান ট্রেড অ্যাণ্ড সোসাইটি, পৃ ১২৭-২৯ ; তপন রায়চৌধুরী, বেঙ্গল আণ্ডার আকবর অ্যাণ্ড জাহাঙ্গীর, পৃ ৬৫-৬

১৮ ফান লিউয়ার, পৃ ১২২

১৯ দাশগুপ্ত ও পিয়ারসন, পৃ ১০৬, ১২২

২০ তপন রায়চৌধুরী, পৃ ৬৫-৯, ১৭৯ ; চিচেরভ, ইণ্ডিয়া ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন দি সিক্সটিনথ-এইটটিনথ সেঞ্চুরিজ, পৃ ১১৩-১৪ ; পর্তুগীজ ভয়েজেস, পৃ ২৬৩-৬৪ ; অনিল দাস, ইতিহাস অনুসন্ধান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১০৭-১১৭

২১ মানরিক, ১ম, পৃ ৬, ২৩

২২ দাশগুপ্ত ও পিয়ারসন, পৃ ১১৫, ১২১ ; ওম প্রকাশ, ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, পৃ ২৭

২৩ পেলসার্ট, মোরল্যাণ্ড ও গেইল (জাহাঙ্গীর'স ইণ্ডিয়া), পৃ ৮

২৪ প্রসিডিংস অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, গোয়া, ১৯৮৭, পৃ ২৮৮-৯০

২৫ ফ্রেডারিকি, পুর্চাজ, ১০ম, পৃ ১১৪, ১৩৮ ; লিনসোটেন, ১ম, পৃ ৯৫-৬ ; পাইরারড ১ম পৃ ৩২৭ ; রালফ ফিচ, ফস্টার, পৃ ২৮ ; মানরিক, ১ম পৃ ৬, ২৯, ৩৪ ; পিটার মুণ্ডী, ২য়, পৃ ১৫৬, ৩৬৬ ; ইংলিশ ফ্যাক্টরিস ১৬১৮-২১, পৃ ২১৪ ; তুলনীয় কবিকঙ্কণ, ধনপতির উপাখ্যান, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, পৃ ২০৫, ২৪২ ; নারায়ণ দেব, তমোনাশ দাশগুপ্ত, পৃ ১৭১-১৮১ ; দ্বিজবংশী দাস, পৃ ৩৮০, ৩৯০

২৬ কাম্পোস, পৃ ১১৫

২৭ তপন রায়চৌধুরী, পৃ ৭৪, ২১৫

২৮ মানরিক, ১ম. ২৯-৩১ ; পিটার মুণ্ডী, ২য়, পৃ ৩৬৬ ; ইংলিশ ফ্যাক্টরিস ১৬১৮-২১, পৃ ১৯৫, ১৯৭, ২১৪ ; লেটারস রিসিভড্. ৪র্থ, পৃ ৩৪ ; তুলনীয় কবিকঙ্কণ, পৃ ২০৫, ২৪২ ; নারায়ণ দেব ; ১৭৯-১৮১

২৯ ওম প্রকাশ, পূর্বোক্ত, পৃ ৬

৩০ মানরিক, ১ম, পৃ ২৯ ; কাম্পোস, পৃ ১৫-১৬ ; দাশগুপ্ত ও পিয়ারসন, ১০৮-৯

৩১ ফ্রেডারিকি, পুর্চাজ, ১০ম, পৃ ১১৪ ; লিনসোটেন, ১ম. পৃ ৯০, ৯৫ ,২১৬ ;

মানরিক, ১ম, ২৭-৩১, ১৩৫ ; ২য় ৩৯২ ; মাস্টার, ২য় খণ্ড, পৃ ৭৯ ; তপন রায়চৌধুরী, পৃ ৬৪-৬৫ ; দাশগুপ্ত ও পিয়ারসন, পৃ ১০৭, ১২০-২১

৩২ আইন ই আকবরী, অনুবাদ, ২য়, পৃ ১৪১

৩৩ কাম্পোস, পৃ ৫৬

৩৪ মানরিক, ১ম, পৃ ৬ ; তুলনীয় ইংলিশ ফ্যাক্টরিস ১৬৪৬-৫০, পৃ ৩৩৮

৩৫ শিরিন মুসভি 'দি ইকনমি অফ দি মুঘল এম্পায়ার সি ১৫৯৫ গ্রন্থে উল্লেখিত (পৃ ২৭) সাতগাঁ ও সুলেমানাবাদ সরকারের পরগণাগুলির মোট জমা (নক্দি) (দাম) এবং ইরফান হাবিব, এ্যান এ্যাটলাস অফ দি মুঘল এম্পায়ার গ্রন্থে উল্লেখিত (পৃ vii) সরকারের আয়তন অনুযায়ী এই হিসেব করা হয়েছে।

৩৬ হুগলী জেলার চুঁচুড়া, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, মগরা, বলাগড় ও পাণ্ডুয়ার বর্তমান থানাগুলি ছিল আকবরের সময় সাতগাঁ সরকারের বানওয়া, কোতয়ালি, ফরসৎঘর, আরসা, তোয়ালি, পুরা ও হাথিকাণ্ডা এবং সুলেমানাবাদ সরকারের পাণ্ডুয়া ও নাইয়ারা পরগণার অন্তর্গত। উক্ত পরগণাগুলির মোট জমা ৬৩,৮০,০৮৯ দাম (বন্দরবন বাবদ ১২,০০,০০০ দাম সহ)। উক্ত থানাগুলির মোট আয়তন প্রায় ২৫০ বর্গমাইল। প্রতি বর্গমাইলের জমা দাঁড়ায় ২৫,৫২০ দাম।

৩৭ অনিল দাস, হাউ দি ইনফ্লাক্স অফ বুলিয়ন কেপ্ট দি ইকনমি অফ বেঙ্গল ইন এ ফ্লাক্স, ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, পাতিয়ালা, ১৯৬৭

৩৮ সি ই এইচ আই, ১ম, পৃ ৩৬৩-৬৫ ; ইরফান হাবিব, ব্যাঙ্কিং ইন মুঘল ইণ্ডিয়া, কন্ট্রিবিউশন টু ইকনমিক হিস্ট্রি, ১ম, পৃ ৪-৫ ; IESHR vi, vii, xii

৩৯ আইন ই আকবরী, ১ম, অনুবাদ, পৃ ৩১-৩৩ ; ইরফান হাবিব, এ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইণ্ডিয়া, পৃ ৩৮০ ৮২ ; আকবরের সময় মোহরের রৌপ্য মূল্য ছিল ৯ টাকা এবং ৪০টি তাম্র মুদ্রা (দাম) ছিল ১ টাকার সমতুল।

৪০ শিরিন মুসভি, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫৯

৪১ S H Hodivala, Historical Studies in Mughal Numismatics, pp 235-44 ; CEHI i, p 360

৪২ শিরিন মুসভি, পৃ ৩৬১

৪৩ সি. ই. এইচ. আই, ১ম, পৃ ৩৮৫

৪৪ আইন-ই আকবরী, অনুবাদ, ১ম, পৃ ৩২-৩৩, ৩৫

৪৫ Wallerstein, The Modern World System, p 329

৪৬ শিরিন মুসভি, পৃ ৩৭৬

৪৭ ১৫৯৫ সালে মোহরের রৌপ্য মূল্য ছিল ৯ টাকা। ১৬৪০ সালে এই মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩ টাকা (মানরিক ২য়, পৃ ১২৯)

৪৮ ১৫৯৫ থেকে ১৬৬৬ সালের মধ্যে মোহরের রৌপ্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল ৭৭.৭ শতাংশ এবং রূপোর টাকার intrinsic value কমেছিল ৫০ শতাংশ। সোনার মজুত বৃদ্ধি পেয়েছিল ১০ শতাংশ (সি. ই. এইচ. আই, ১ম, পৃ ৩৭১)

৪৯ শিরিন মুসভি, পৃ ৩৬৮, ৩৯১

৫০ ১৬৪০ সালে রাজমহলে ১ টাকার বিনিময়ে ২৮ 'দাম' পাওয়া যেত (মানরিক, ২য়, ১০২, ১৩৬, ১৭৪ ; ইরফান হাবিব, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৮৯)

৫১ সি. ই. এইচ. আই, ১ম, পৃ ৩৭০

৫২ সারণী ১, ২ ও ৩

৫৩ ১৫৯৫ (আনুমানিক) সালে বাংলার রাজস্ব জমা ছিল (পরগণাগুলির জমার মোট যোগফল) ২৫, ৮৮, ৮৩, ৯৫৮ দাম। (শিরিন মুসভি, পৃ ২৬-২৭)। ১৬২৮-৩৮ সালে জমার পরিমাণ ছিল ৪০, ২৫, ২০, ০০০ দাম (Bayaz-i-khusbu' ; উদ্ধৃত ইরফান হাবিব, পৃ ৪০০)

৫৪ আইন ই আকবরী, ২য় খণ্ড, অনুবাদ, পৃ ১৩৪

৫৫ সি. ই. এই., ১ম, পৃ ৩৬৫

৫৬ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, সম্পাদনা স্যার যদুনাথ সরকার, পৃ ২১৮

৫৭ 'তুজুক ই জাহাঙ্গীরী'তে উল্লেখ আছে যে, প্রতি বছর (হরসাল) এই টাকা পাঠাতে হত। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে, একজন সুবাদার মাত্র একবারই এই অর্থ দিতেন।

৫৮ ঐ

৫৯ মানরিকের লেখা (২য় খণ্ড, পৃ ১২৮-৩২) থেকে জানা যায় যে, গৌড়ের একটি দেওয়াল ভেঙে ৩ কোটি টাকার লুকানো মুদ্রা ও দামী পাথর পাওয়া গিয়েছিল।

ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ঃ অহিংস পথ থেকে সহিংস পথে গান্ধীজীর অনুবর্তন

কল্যাণকুমার সরকার

"···The Gandhian principle of non-violence is very contradictory, combining active protest with tolerance of the enemy.···There is a purely utopian aspect to Gandhi's non-violence, connected to religious dogmatism and to an ascetic approach to life."—R. A. Ulyanovsky.[১]

ভূমিকা

ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী—মহাত্মা গান্ধীজী। তিনি ছিলেন অহিংস নীতির পূজারী। তিনি বলেছেন, "Non-violence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed."[২] এই কারণেই জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে তিনি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে অহিংস গণ-আন্দোলনে (Non-violent mass-movement) পরিণত করেছিলেন।

অহিংসা সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অহিংসা বলতে গান্ধীজী স্বার্থচেতনা ও আত্মপরতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে বিপথগামীকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সুপথে পরিচালিত করার উপায়কেই বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, "Ahimsa doses not simply mean non-killing. Himsa means causing pain to or killing any life out of anger, or from a selfish purpose, or with the intention of injuring it. Refraining from so doing

---

অধ্যাপক, ঝাড়গ্রাম রাজ সরকারী কলেজ

is ahimsa,"[৩] তাঁর প্রচারিত এই অহিংসার ধারণা, 'ক্ষতিহীণতার নেতিবাচক অবস্থা মাত্র নয়, বরং এটা হল এমনকি দুষ্কৃতির প্রতিও ভালোবাসার, ভালো করার ইতিবাচক অবস্থা।'[৪] তিনি তাই অহিংসা প্রসঙ্গে জোরালোভাবে বলেছেন, "কুকর্মকে সুকৃতী দিয়েই দূর করতে হবে, কুকর্ম দিয়ে নয়, অন্য কথায়, দৈহিক শক্তিকে অনুরূপ শক্তি দিয়ে নয়, আত্মা-শক্তি দিয়েই এর বিরোধিতা করতে হবে।"[৫]

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অহিংস ও সহিংস পথের দ্বন্দ্ব এবং গান্ধীজী

গান্ধীজী এই অহিংস আত্মিক শক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে ভারতবর্ষের উপর দু'শো বছরের সাম্রাজ্যবাদী জমিদারির ভোগদখলকারী ব্রিটিশশক্তিকে এ'দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অহিংস গণ-আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত করতে পারলেই তার সরকার ভারত-সাম্রাজ্য ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে, এবং ভারতবর্ষ তখন স্বাধীনতা লাভ করবে। কিন্তু গান্ধীজীর এই বিশ্বাসের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের কিছু নেতা একমত ছিলেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, অহিংস নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বা আলাপ-আলোচনার সমঝোতা সরকারকে ভারত-সাম্রাজ্য ছেড়ে যেতে বাধ্য করতে পারবে না। তাই সরকারকে এব্যাপারে বাধ্য করার জন্য তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র-সংগ্রাম শুরু করার কথা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বোসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিই গান্ধীজীর অহিংস গণ-আন্দোলনের বিকল্প হিসাবে সশস্ত্র সংগ্রামমুখর আন্দোলনের কথা বারে বারে বলেছিলেন। কারণ তিনি একান্তই বিশ্বাস করতেন যে, "কোনরূপ সংগ্রাম ছাড়াই শক্তিশালী ব্রিটিশ সরকার এমনকি ডোমিনিয়নগত স্বায়ত্তশাসন (ভারতবর্ষকে) দিয়ে দেবে—এ ধরনের আশায় কেবলমাত্র উন্মত্ততা বা মূর্খামিই কাউকে উদ্দীপিত করতে পারে।"[৬]

কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র বোস যখন বুঝতে পারলেন যে, এ ব্যাপারে গান্ধীজীর সমর্থন ও সাহায্য পাওয়া যাবে না, তখন তিনি প্রাথমিক-ভাবে হতাশ হয়ে পড়েন, এবং এই হতাশা কাটিয়ে ওঠার জন্য স্বাধীনতার লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্যলাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। অবশেষে বিদেশের সামরিক সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে বিদেশের অর্থাৎ জাপান-

জার্মানের দারস্থ হতে বাধ্য হন। মূলতঃ তাঁর সংগ্রামী আন্দোলন-প্রবণতার প্রতি গান্ধীজীর অনীহা ও অসমর্থনের জন্যই তাঁকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বার্থে বৈদেশিক সাহায্যের আশায় স্বদেশ ত্যাগ করতে হয়।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজীর অহিংস চেতনার পরিবর্তন

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লক্ষ্যে স্বদেশ ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র বোসের জাপান-জার্মানে উপনীত হওয়ার এই অসীম সাহসিক ও গভীর দেশপ্রেমোচিত ঘটনা গান্ধীজীর মনোজগতে এক আলোড়ন তোলে। এ ঘটনা তাঁর কাছে যেন এক চূড়ান্ত বিস্ময় থেকে পরম শ্রদ্ধায় পরিণত হয়, যা তাঁকে সুভাষচন্দ্র বোসের সংগ্রামী কর্মপন্থার প্রতি ক্রমশঃই আগ্রহান্বিত করে তোলে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এপ্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবেই লিখেছেন, "আমি···লক্ষ্য করছিলাম যে, জার্মানে সুভাষ বোসের আগমন গান্ধীজীর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর আগে তিনি বোসের অনেক কাজকেই অনুমোদন করতে পারেন নি, কিন্তু এখন আমি (অর্থাৎ আজাদ) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন দেখতে পেলাম। তাঁর অনেক মন্তব্যই আমাকে এটা বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, ভারতবর্ষ থেকে অন্তর্ধানের ব্যাপারে সুভাষ বোস যে সাহস ও দৃঢ়-চিত্ততার প্রাচুর্য দেখিয়েছেন, সে-সবের তিনি উচ্চপ্রশংসা করেছেন। সুভাষ বোসের প্রতি তাঁর এই প্রশংসা সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) সম্পর্কে তাঁর মানসিকতাকে অবচেতনভাবেই প্রভাবিত করেছিল।"[৭] এবং এইজন্যই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করার যে প্রস্তাব সুভাষচন্দ্র বোস উত্থাপন করে আসছিলেন, তা এবারে যেন গান্ধীজীর কাছে অর্থবহ হয়ে উঠল। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন,

> "(মুক্তি-সংগ্রামের) বিবেচনাটিই আমাকে ২২ বছর ধরে ভাবিয়ে তুলেছে। আমি শুধু অপেক্ষার পর অপেক্ষাই করেছি বিদেশী জোয়ালকে ছুঁড়ে ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় অহিংস শক্তি সঞ্চয় করার মুহূর্ত পর্যন্ত। কিন্তু আমার মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটেছে। আমি মনে করি যে, আমি আর অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারি না। যদি অপেক্ষাই করতে হয়, তাহলে আমাকে শেষ দিন পর্যন্তই অপেক্ষাই করতে হতে পারে। যে প্রস্তুতির জন্য আমি প্রার্থনা করে গেছি এবং কাজও করে গেছি, সেই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ নাও হতে পারে, এবং এর মধ্যেই আমি হয়তো যে লেলিহান আগুন আমাদের

সকলকেই ভয় দেখিয়ে চলেছে তার দ্বারা আবৃত ও আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারি। এই কারণেই আমি ঠিক করেছি যে, স্পষ্টতই অনিবার্য ঝুঁকি সত্ত্বেও আমি অবশ্যই জনগণকে দাসত্ব রুখতে আহ্বান জানাবো।"[৮]

হ্যাঁ, ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের জোয়াল উপড়ে ছুঁড়ে ফেলার জন্যই গান্ধীজী চূড়ান্ত ঝুঁকি নিয়ে ভারতস্থ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর গণ-আন্দোলন ('ভারত ছাড়ো') গড়ে তোলার ডাক দিলেন এবং এভাবেই সরে এলেন তাঁর এতদিনের সযত্নে লালিত অহিংস মানসিকতা থেকে। কয়েকটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে গান্ধীজীর মানসিকতার এই পরিবর্তনকে আমরা লক্ষ্য করেছি ; সেই ঘটনাগুলিকে সংক্ষেপে এবার আমরা আলোচনা করব।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতি গান্ধীজীর অহিংস নীতির বিচ্যুতি

১৯৩৯। জার্মান আক্রমণ করল পোল্যাণ্ডকে। শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জাপান, জার্মান ও ইতালী একপক্ষে। অপরপক্ষে ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়া। এই যুদ্ধের প্রথমদিকে গান্ধীজী ব্রিটিশ শক্তির পক্ষেই ছিলেন। তাই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিনি তাকে বিব্রত করতে চান নি। তিনি বলেছিলেন, ব্রিটিশপক্ষকে আঘাত করে "আমি এই মুহূর্তে ভারতের মুক্তির কথা চিন্তা করছি না।"[৯] কারণ হয়ত এটাই যে, জাপান-জার্মান-ইতালিই অহিংস ও সশস্ত্র আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে প্রথমে যুদ্ধ শুরু করেছে, ব্রিটেন নয়।

কিন্তু স্বাধীনতার স্বার্থে সুভাষচন্দ্র বোসের স্বদেশ ত্যাগ (১৯৪০) এবং জাপান-জার্মানের সামরিক সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণের বিস্ময়কর ঘটনায় গান্ধীজী দারুণভাবে অভিভূত হন। তার উপর ব্রিটিশ সরকারও ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনরূপ সমঝোতায় আসতে রাজী না হওয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়েই তিনি যুদ্ধে বিব্রত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। মৌলানা আজাদ গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর এক সাক্ষাৎকারের (১৯৪২) ভিত্তিতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "যুদ্ধের শুরুতে আমি ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে সংগঠিত বিরোধিতার পক্ষপাতি ছিলাম। গান্ধীজী তখন আমার সঙ্গে একমত হন নি। কিন্তু এখন তিনি তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। (অর্থাৎ ব্রিটিশ-বিরোধিতার পক্ষপাতি হয়ে উঠেছিলেন) ফলে আমি নিজে এখন

(১৯৪২ সালে) এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ি। ভারতীয় সীমান্তে যখন শত্রুসেনা (জাপানী-সৈন্য) উপস্থিত, তখন ব্রিটিশশক্তি কোন সংগঠিত প্রতিরোধমূলক আন্দোলনকে সহ্য করবে—এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। গান্ধীজীর এক অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল যে, তারা তা সহ্য করবে। তিনি মনে করতেন যে, ব্রিটিশ-শক্তি তাঁকে তাঁর ইচ্ছামতো পথে আন্দোলন গড়ে তুলতে দেবে।"[১০]

এইজন্যই গান্ধীজী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। গান্ধীজীর এই ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনমুখী তৎপর মানসিকতা যা যুদ্ধটির শুরুতে তাঁর মোটেই ছিল না, সে-সম্পর্কে মৌলানা আজাদ আরও লিখেছেন, "গান্ধীজীর মনোভাব ছিল এইরকম যে, যেহেতু ভারতীয় সীমান্তে যুদ্ধ চলছে, সেহেতু যে-মুহূর্ত (জাতীয়তাবাদী) আন্দোলন শুরু হবে, তখনই (ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে) ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তিতে আসবে। এমনকি তা যদি নাও ঘটে, তবু তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের দ্বারপ্রান্তে জাপানী সৈন্যের আগমন ঘটায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ (আন্দোলনের বিরুদ্ধে) কোনপ্রকার রূঢ় পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করবেই। তিনি মনে করতেন যে, এটাই কংগ্রেসকে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলতে সময় ও সুযোগ করে দেবে।"[১১]

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর এই আন্দোলনমুখী সক্রিয় মানসিকতার মধ্য দিয়ে সরকারকে আঘাত না করার ব্যাপারে তাঁর এতদিনের অনুসৃত ও সযত্ন-লালিত অহিংস নীতি থেকে তাঁর বিচ্যুতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সহিংস পথে আগ্রাসী জাপানের প্রতি গান্ধীজীর সমর্থন

শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে গান্ধীজী জাপান-জার্মানের ঘোর বিরোধী ছিলেন, যেহেতু এরা সহিংস পথে গোলা-বারুদ আর হত্যালীলার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪১ সালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাক্রমে, বিশেষ করে জাপান-জার্মানের সামরিক সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম শুরু করার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র বোসের উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ-ব্যাপারে তাঁকে জাপান-জার্মানের আন্তরিক প্রতিশ্রুতি দান ইত্যাদির ফলে গান্ধীর মনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টি হয়, তাঁর জাপান-জার্মানবিরোধী মানসিকতা ক্রমশঃ দূর হয় এবং তিনি এবার জাপানকেই বরং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে সহায়ক বলে ভাবতে শুরু করেন, যতই জাপান এই যুদ্ধে সহিংস আগ্রাসন

চালিয়ে থাকুক না কেন ; কারণ তার ঐরকম আগ্রাসনের চাপ পড়লেই ব্রিটিশ সরকার তার ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হবে। তার উপর ভারত-বাসীরা যদি ঠিক একই সময়ে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে, তাহলে তো কথাই নেই। ভারতকে স্বাধীনতা দিতে সরকার বাধ্য হবেই। তাই গান্ধীজীর কাছে গণ-আন্দোলনই কাম্য হয়ে উঠল। গান্ধীজীর এই 'রণং দেহি' প্রবণতা ও জাপানের প্রতি নমনীয়তা সম্পর্কে মৌলানা আজাদ সুস্পষ্টভাবেই লিখেছেন,

> ১৯৪২ সালের জুন মাসে আমি তাঁর (গান্ধীজীর) সঙ্গে ওয়ার্ধাতে সাক্ষাৎ করতে যাই এবং তাঁর সঙ্গে পাঁচদিন থাকি। তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনায় আমি লক্ষ্য করি যে, শুরু হওয়ার সময় তিনি যে মানসিক অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন।
>
> ...আমি তাঁকে আরও বলেছিলাম যে, আমার দৃঢ় প্রত্যয় হল এই যে, জাপানীরা একবার ভারতের মাটিতে পা রাখলে আমাদের অধীন প্রতিটি উপায়ের মধ্য দিয়ে তাদের বিরোধিতা করাই হবে আমাদের পবিত্র কর্তব্য...
>
> আমি এটা লক্ষ্য করে বিস্মিত হই যে, গান্ধীজী আমার সঙ্গে একমত হলেন না। তিনি আমাকে সাধারণ কথাতেই বলেছিলেন, যে যদি জাপানী সৈন্য কখনও ভারতবর্ষে আসে, তাহলে তারা আমাদের শত্রু হিসাবে আসবে না, আসবে ব্রিটিশের শত্রু হিসাবেই। তিনি বলেছিলেন যে, ব্রিটিশরা যদি এখনই (ভারতবর্ষ) ত্যাগ করে, তাহলে তিনি বিশ্বাস করেন যে, জাপানের ভারতবর্ষকে আক্রমণ করার কোন কারণ থাকবে না...
>
> ...তিনি জোর দিয়েই বলেছিলেন যে, ব্রিটিশকে অবশ্যই ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে হবে—কংগ্রেসের এই দাবী তোলার সময় এসে গিয়েছে। যদি ব্রিটিশরা তা করতে সম্মত হয়, তাহলে আমরা জাপানকেই বলতেই পারি যে, ভারতে (যুদ্ধের জন্য) তাদের আর এগিয়ে আসার দরকার নেই।[১২]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গান্ধীজীর মানসিকতার এই যে ক্রমপরিবর্তন, সেক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র বোসের সঙ্গে জাপানের নেতৃত্বের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতবর্ষ ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র বোস জাপানে উপস্থিত হলে জাপানের প্রধানমন্ত্রী

মিঃ তোজো (Mr. Tojo) তাঁকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানান এবং তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানী সাহায্যের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাপানী আইনসভায় (Diet) এই ঘোষণা করেছিলেন যে, "ভারতবর্ষ থেকে এ্যাঙলো-স্যাক্সন প্রভাব, যা ভারতীয় জনগণের কাছে শত্রুস্বরূপ তা নির্মূল করতে ও বর্জন করতে এবং ভারতবর্ষকে প্রকৃত অর্থে পূর্ণস্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম করার ব্যাপারে জার্মান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"[১৩]

এই প্রতিশ্রুতি মতই জাপানী সৈন্য (সুভাষচন্দ্র বোস, রাসবিহারী বোস ও ক্যাপটেন মোহন সিংয়ের) আজাদ হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে 'দিল্লী চলো' অভিযানে অগ্রসর হয়, যা গান্ধীজীকে জাপানের প্রতি নমনীয় করে তোলে। অবশ্য জাপানের প্রতি নমনীয় হওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৪৪ সালের সালের ৬ জুলাই তারিখে রেঙ্গুন বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'গান্ধীজীর প্রতি' শীর্ষক এক ভাষণে গান্ধীজীর কাছে জোরালো আবেদন করেন—

> মহাত্মাজী, পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের শত্রুরা জাপানের বিরুদ্ধে ক্রোধোন্মত্ত ও ভয়ংকর প্রচার চালিয়ে আসছে…
>
> …লোকে বলত যে, ভারতবর্ষের ব্যাপারে জাপানে স্বার্থসর্বস্ব উদ্দেশ্য ছিল। যদি তাই থাকত, তাহলে সে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দিল কেন ? স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের হাতে কেন সে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ সমর্পণ করল ? কেনইবা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের পোর্টব্লেয়ারে মুখ্য কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত আছেন জনৈক ভারতীয় ? সবচেয়ে বড় কথা, কেনইবা পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপান তাদের নিঃশর্তে সাহায্য করেছে।
>
> …জাপান নিজে থেকে আমাদের উপর সাহায্য চাপিয়ে দিতে চায় নি।…আমরাই জাপানের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছি।
>
> …ভারতীয়দের স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যবাহিনী এখন ভারতের মাটিতে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে…
>
> হে জাতির জনক ! ভারতের স্বাধীনতার এই পবিত্র যুদ্ধে আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা কামনা করি।[১৪]

এ-সমস্ত কারণে গান্ধীজীর জাপানবিরোধী মানসিকতা দূর হয়। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান-জার্মান-ইতালির সম্মিলিত অক্ষশক্তির জয়ের সম্ভাবনাটি

তাঁর কাছে ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে হয় নি, বরং এটাই তাঁর মনে হয়েছিল যে, "If the Japanese ever came to India, it would come not as our enemies but as the enemy of the British."[১৫] এবং জাপান-জার্মানের অক্ষশক্তির আগ্রাসনের চাপে ব্রিটেন-আমেরিকার মিত্রশক্তির পরাজয় ঘটবে বলেও তাঁর মনে হয়েছিল ; ফলে ভারতের স্বাধীনতাও ত্বরান্বিত হবে বলে তাঁর ধারণা। মৌলানা আজাদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "Gandhiji by now inclined more and more to the view that the Allies could not win the war······In discussions with him, I felt that he was becoming more and more doubtful about an allied victory."[১৬] শুধু তাই নয় গান্ধীজী তাঁকে আরও বলেছিলেন, "It (i. e. the war) might end in the triumph of Germany and Japan."[১৭]

এদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে গান্ধীজী সশস্ত্রপথে আগ্রাসী জাপান-জার্মানের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পরবর্তীকালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহে গান্ধীজীর এই বিরোধিতা অনেকটাই হ্রাস পায়। বিশেষ করে যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকারের উপর জাপান-জার্মানের সশস্ত্র সংগ্রাম ও সহিংস আগ্রাসনকেই গান্ধীজী অনেক বেশী কাম্য বলে মনে করেছিলেন, যেহেতু এর মধ্য দিয়েই ভারতের স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত হবে। ফলে কোন কর্মসম্পাদনে লক্ষ্য ও উপায় (end and means)—উভয়ের সততার মহতী আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হলেন : এবং তা হলেন ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থেই।

ক্রীপ্‌স মিশনের প্রতি গান্ধীজীর সমঝোতাহীন মানসিকতা

প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে ধীরে ধীরে সংগ্রামী মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনরূপ সমঝোতায় আসতে চান নি। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন—"I am not going to be satisfied with anything short of complete freedom."[১৮]

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভারতবর্ষের সমর্থন ও সাহায্য ব্রিটিশ সরকারের একান্তভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কারণ ক্রমঅগ্রসরমান জাপান তখন সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, আন্দামান প্রভৃতি এলাকা দখল করে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে এসেছে। এমত অবস্থায় জাপানকে প্রতিহত করার

জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতের সাহায্য ও সমর্থন প্রয়োজনবোধ করল এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত সমস্যাটির সমাধানের জন্য লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ সরকার স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সের নেতৃত্বে একটি আপসরফা মূলক কমিশন (যা সংক্ষেপে হল 'ক্রীপ্‌স মিশন') ভারতবর্ষে প্রেরণ করে। গান্ধীজী এই মিশনের বক্তব্য বা প্রস্তাবে কর্ণপাত করলেন না; বরং ভারতের স্বাধীনতাকে ক্রমপ্রলম্বিত করার এক ছদ্মপ্রয়াস বলে এই মিশনকে তিনি সরাসরি এড়িয়েই গেলেন। কারণ এই ক্রীপ্‌স মিশনের প্রস্তাবে যুদ্ধশেষে ভারতকে স্বশাসিত ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়ার কথা থাকলেও এতে না ছিল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি, না ছিল যুদ্ধ চলাকালে ভারতের জন্য 'দায়িত্বশীল জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি।[১৯] কথিত আছে, এই কারণেই ক্রীপ্‌স মিশনকে তিনি 'a post-dated cheque on crushing bank' বলে সমালোচনা করেছিলেন।[২০]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজী এতকাল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমঝোতাপন্থী হিসাবেই সমালোচিত হতেন। কিন্তু যুদ্ধচলাকালে স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি সমঝোতার নীতি আদৌ মানেন নি, সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন মিঃ ক্রীপ্‌সকে সমাদর করেন নি এতটুকু, বরং যুদ্ধ-বিব্রত সরকারের কাছ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আদায় করার জন্যই বদ্ধ-পরিকর হয়ে উঠেছিলেন এবং এ জন্য সরকারের উপর জাপানের সহিংস আগ্রাসনকেও সমর্থন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের প্রমাণিত দুর্বলতা ও জাপানের অগ্রগতি ছাড়াও সুভাষচন্দ্র বোসের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি গান্ধীজীর সপ্রশংস মনোভাব স্বাধীনতার প্রশ্নে সরকারের প্রতি তাঁর সমঝোতাহীন মানসিকতা ক্রীপ্‌স মিশন সংক্রান্ত তাঁর বিরোধী প্রবণতাকে দৃঢ় করে তুলেছিল।[২১]

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর সংগ্রামী মানসিকতা

গান্ধীজী ক্রীপ্‌স মিশনকে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে একটা চূড়ান্ত ভাঁওতা বলে মনে করেছিলেন বলেই ঐ মিশনের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনায় বসেন নি; কারণ 'পূর্ণ স্বাধীনতার' স্বার্থে সরকারের সঙ্গে কোনরকম আপস না করতে তিনি দৃঢ় ছিলেন।[২২] স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর এই ব্রিটিশ-বিরোধী কঠোর মানসিকতা সম্পর্ক মৌলানা আজাদ লিখেছেন, "গান্ধীজীর মন এখন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার চূড়ান্ত অবস্থান থেকে সংগঠিত গণ-আন্দোলনের চূড়ান্ত অবস্থানের দিকে সরে আসছিল। এই পরিবর্তনের ঘটনাটি আগেই শুরু হয়ে

গিয়েছিল, কিন্তু মিঃ ক্রীপ্‌স ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পরই একমাত্র তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। "(১৯৪২ সালের) জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ওয়ার্ধাতে (কংগ্রেসের) ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন ছিল। আমি ৫ জুলাই তারিখে সেখানে পৌঁছে যাই এবং সেখানে গান্ধীজীই আমাকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কথা এই প্রথমবারের মত বলেন।··· তিনি বারে বারে বলতে থাকেন যে, ব্রিটিশকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে হবে—কংগ্রেসের এ দাবী তোলার ঠিক সময় এসে গিয়েছে।"[২৩]

লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এবার যে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন, সেই আন্দোলন পরিচালনা করার ব্যাপারে তিনি হিংসা ও অহিংসা অথবা সশস্ত্র ও নিরস্ত্র পদ্ধতি সম্পর্কে আর খুব একটা স্পর্শকাতর থাকলেন না ; আন্দোলনের প্রয়োজনে যে-কোন পদ্ধতিই গ্রহণ করা যেতে পারে। তাই তাঁর প্রস্তাবিত (বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো') গণ-আন্দোলনের অহিংসা নিয়মতান্ত্রিক পথে শুরু হওয়ার কথা ঠিক হলেও[২৪] তাতে হিংসা বা সশস্ত্র সংগ্রাম রীতির প্রয়োগ সর্বপ্রকারে নিষিদ্ধ হবে—এমন কোন নির্দেশ ছিল না, বরং আন্দোলনকে বিরতিহীনভাবে পরিচালনা করার জন্য আন্দোলনকারী জনগণ পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে—ঐরকমই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জওহরলাল নেহরু বলেন, এই আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজীর নির্দেশ ছিল এই যে, "জনগণ সবরকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকবে।"[২৫] এ ব্যাপারে গান্ধীজীর স্পষ্ট নির্দেশ, "Act as if you are free" অর্থাৎ 'এমনভাবে তোমরা কাজ কর, যেন তোমরা স্বাধীন।'[২৬] গান্ধীজীর সঙ্গে কথাবার্তার ভিত্তিতে মৌলানা আজাদ ঠিক একই মনোভাবের কথা লিখেছেন, মিঃ ক্রীপ্‌স ভারতবর্ষ থেকে চলে গেলে গান্ধীজীর মনোভাবে আমি বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করি। এখন (তাই) গান্ধীজীর মন···সংগঠিত গণ-আন্দোলনের চূড়ান্ত অবস্থানের দিকে সরে আসছিল···। আমি বিশ্বাস করতে পারি নি যে ভারতীয় সীমান্তে যখন শত্রুসেনা (জাপানী সৈন্য) উপস্থিত, তখন ব্রিটিশ-শক্তি কোন সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলনকে সহ্য করবে। গান্ধীজীর অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল যে, তারা তা সহ্য করবে।···আমি যখন তাঁকে এই প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মসূচী ঠিক কী হবে তা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করি, তখনও কিন্তু তাঁর কোনও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। আমাদের আলোচনাকালে একমাত্র যে বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছিলেন তাহল এই যে, পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলিতে জনগণ সেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করলেও এইবারটি কিন্তু তা করবে না। তারা

গ্রেপ্তারের বিরোধিতা করবে এবং তাদের যদি সরকারের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে দৈহিকভাবে বলপ্রয়োগ করে বাধ্য করা হয়, তাহলেই একমাত্র তারা তা করবে।[২৭] 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজীর এই একই মানসিকতার কথা উল্লেখ করেছেন প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ঃ "কুইট ইণ্ডিয়া টু গড অর অ্যানার্কি" একটি মন্ত্র।···এবারকার আন্দোলন জেলযাত্রায় নয়। জেলযাত্রা অতিশয় নরম। ওর চেয়ে কঠিন কিছু করার দরকার ছিল।··· গান্ধীজীর ঢালা হুকুম ছিল, "করো, নয়তো মরো।"[২৮]

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪২ সালের ('ভারত ছাড়ো') গণ-আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে গান্ধীজী নিয়মতান্ত্রিকতার ঊর্ধ্বে উঠে যথেষ্ট কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি (মৌলানা আজাদকে) পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এবারের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণ করবে না, বরং করবে এর বিরোধিতা, পুলিশী অভিযানের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কীভাবে এই প্রতিক্রিয়া করা হবে? খালি হাতে নিরস্ত্রভাবে তো সশস্ত্র পুলিশকে প্রতিহত করা যায় না। তাই পুলিশী অভিযান ও গ্রেপ্তারকে প্রতিরোধ করতে হবে—এই নির্দেশের মধ্য দিয়ে গান্ধীজী একথাই বুঝিয়েছেন যে, পুলিশী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদেরও শক্তির আশ্রয় নিতে হবে।[২৯] এই কারণেই ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট তারিখের মধ্যরাতে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণের পর তিনি তো এক ভাষণে দেশবাসীকে মরণ-পণের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য রোমাঞ্চকর 'Do or die' বা 'কর না হয় মর' নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন—

> তোমরা প্রত্যেকে এই মুহূর্ত থেকে নিজেদের স্বাধীন পুরুষ বা নারী বলে মনে করবে এবং এমনভাবে কাজ করবে যেন তোমরা স্বাধীন···। পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কম কোন কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হচ্ছি না······(স্বাধীনতার জন্য) আমরা করব, না হয় মরব। হয় আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করব, না হয়, সে-চেষ্টাতেই মৃত্যুবরণ করব।[৩০]

স্বাধীনতা আন্দোলনের রোমাঞ্চকর উন্মাদনা সৃষ্টিকারী (গান্ধীজীর) এই 'করব, না হয় মরব' বা 'Do or die' নির্দেশের মধ্যেই সংগ্রামী বা সশস্ত্র পন্থা অবলম্বনের স্পষ্টই ইঙ্গিত রয়েছে, সন্দেহ নেই। কারণ এই নির্দেশে স্বাধীনতার স্বার্থে সংগ্রাম করে তবেই মারা যাওয়ার কথা নিহিতভাবে বলা হয়েছে, বিনা সংগ্রামে ভীরুর মত মারা যাওয়ার কথা নয়। এবং সত্যি-সত্যিই "গান্ধীজীর এই 'করব, না হয় মরব' মানসিকতা সাধারণ জনগণের মনে

এই ধারণা সৃষ্টি করেই ছিল যে—আমরা মরব, তবে মরব ভারতের স্বাধীনতার জন্য কিছু কাজ করেই এবং এই 'কিছু কাজ' নিশ্চিতভাবেই অহিংস ঘটনা নয়, বরং তা বস্তুতঃ সহিংসই বটে।"[৩১] কারণ অহিংস নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সহজেই পুলিশের বশ্যতাস্বীকার করতে হয়, প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ ছাড়াই গ্রেপ্তারবরণ করতে হয়। ফলে পুলিশী অত্যাচারের মুখে পড়তে হয় না, মৃত্যুর সম্ভাবনাও থাকে না। আবার অহিংস কাজ বা সাংবিধানিক আন্দোলনে লিপ্ত থাকার জন্য আদালতের বিচারে ফাঁসিদণ্ড হওয়ারও তেমন অবকাশ নেই। কারণ এই আন্দোলন-প্রক্রিয়াটি তেমন উগ্র ও চরমপন্থী বা হিংসাত্মক বা অন্তর্ঘাতমূলক নয়। ফলে এক্ষেত্রেও মৃত্যুর সম্ভাবনাও তেমন নেই।

তাহলে প্রশ্ন হতেই পারে যে, স্বাধীনতার স্বার্থেই কোন্ ধরনের কাজ করলে তবেই মৃত্যু নিশ্চিত? স্বাভাবিকভাবেই উত্তর হবে, সশস্ত্র সংগ্রামমূলক বা অন্তর্ঘাতমূলক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই রয়েছে মৃত্যুর ঝুঁকি। যেহেতু এ কাজের জন্যই পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর নির্মম দমন-পীড়নের মুখে পড়তে হয়, এবং তাতেই তাদের মৃত্যু ঘটতে পারে। আবার স্বাধীনতার লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম বা অন্তর্ঘাতমূলক কাজের জন্য আদালতে বিচারকের বিচারে আন্দোলন-কারীদের ফাঁসিদণ্ড হলেও হতে পারে। তাতে তো মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং স্বাধীনতার জন্য কিছু কাজ করে তবেই মরব—এ কথার মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে এমন কাজই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য করব—এই বক্তব্যটিই নিহিত আছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'করব, না হয় মরব' নির্দেশের 'মরব' শব্দটির দ্বারা কোনমতেই 'আত্মহত্যা করব'—এ কথা বোঝাচ্ছে না; এবং গান্ধীজীও কখনই তা বোঝাতে চান নি। আসলে 'মরব' বলতে এখানে স্বাধীনতার স্বার্থে এমন ধরনের সংগ্রামী কাজ করব অথবা এমন তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তুলব যাতে পুলিশের অত্যাচারে মৃত্যু হতে পারে, আদালতের ফাঁসিদণ্ডে মৃত্যু হতে পারে অথবা কারাকক্ষের অমানবিক ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেও রোগাক্রান্ত হয়েও মৃত্যু হতে পারে। তাই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কিছু 'করব, না হয় মরব'—গান্ধীজীর এই উত্তেজক নির্দেশের সঙ্গেই ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে আছে হিংসার পথ তথা সংগ্রামের আদর্শ অনুসরণ করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এবং সাধারণ জনগণের কাছেও এই নির্দেশ সশস্ত্র গণ-আন্দোলনের আহ্বান হিসাবেই চিহ্নিত ও আদৃত হয়েছিল। তাইতো ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সারা ভারতে যতটা না অহিংস পথে পরিচালিত হয়েছিল, তার চেয়ে বেশীই হয়েছিল সহিংস পথেই, সংগ্রামমুখর পদ্ধতিতেই। এটাই ঐতিহাসিক সত্য।[৩২]

শুধু তাই নয়, এমনকি গান্ধীজীও স্বয়ং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যে হিংসা বা সংগ্রামী শক্তির আশ্রয় নেওয়া হবে, তার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন গড়ে তোলার প্রায় মাসখানেক আগে ১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই তারিখে ওয়ার্ধাতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটির অধিবেশনে এই আন্দোলনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তাব পাশ করা হলে গান্ধীজী দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন, "এই প্রস্তাবে আন্দোলন প্রত্যাহারের অথবা আলাপ-আলোচনার সমঝোতা শুরু করার কোনও অবকাশ নেই। আর একবার সুযোগেরও কোন প্রশ্নই ওঠে না। মোটের উপর এটা একটা প্রকাশ্য বিদ্রোহ।"[৩৩]

প্রসঙ্গক্রমে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, গান্ধীজী নিজেই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে 'বিদ্রোহ' বা 'বিপ্লব' বলে চিহ্নিত করেছেন, বলেছেন এটা হল 'প্রকাশ্য বিদ্রোহ', প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। শুধু এটুকুই নয়, তিনি এই আন্দোলনের সমর্থনে আরও মারাত্মক কথা বলেছেন এই আন্দোলনের সমর্থনে যা সহিংস বা সংগ্রামী পন্থা অবলম্বনেরই স্পষ্ট ইঙ্গিতস্বরূপ। এই আন্দোলন পরিচালনা সম্পর্কে তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন—

> আন্দোলনটিকে শান্তভাবে পরিচালিত করার ব্যাপারে আমি যতটা সম্ভব প্রতিটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থাই গ্রহণ করব ; কিন্তু আমি যদি দেখি যে, তাতে ব্রিটিশ সরকার অথবা মিত্রশক্তিবর্গের উপর কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে না, তাহলে আমি চরমতম সীমায় পৌঁছাতে দ্বিধা করব না।[৩৪]

গান্ধীজীর এই বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন 'অহিংস' পথেই শুরু হবে ; তবে পরিস্থিতির প্রয়োজনে এই আন্দোলন 'চরমতম সীমা' অর্থাৎ সহিংস বা সংগ্রামী শক্তির আশ্রয় নেওয়া হবে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এ প্রসঙ্গে পরিষ্কারভাবেই লিখেছেন—

> "গান্ধীজীর কথাবার্তা সহজেই এই ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এই আন্দোলন সহিংস বা অহিংস যাইহোক না কেন, তা কিন্তু হবে (ব্রিটিশ শক্তিকে পরাস্ত করার) শেষ সংগ্রাম।"[৩৫]

এই কারণেই তিনি স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থে শেষ বারের মত চূড়ান্ত যুদ্ধ করার জন্য ভারতবাসীদের আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'Do or die,—'কর, না হয় মর।' গান্ধীজীর এই উত্তেজক আহ্বানে ('ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে) অহিংসার সঙ্গে সহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রামের চেতনা মিলেমিশে একাকার হয়ে

গেছে। এদিক থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংস পথ থেকে সহিংস পথে গান্ধীজীর অনেকটাই অনুবর্তন ঘটেছিল, বলাই বাহুল্য।

গান্ধীজী কি অহিংসার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলেন?

সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম যে, ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে গান্ধীজী তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের চাপে তাঁর এতদিনের অহিংস মানসিকতা থেকে সরেই এসেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হতেই পারে যে, গান্ধীজী যদি অহিংস মানসিকতা থেকে সরেই এসে থাকেন, তাহলে ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে তিনি কীভাবে অহিংসার মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন? কেমন-ভাবেই তিনি সেদিন নিরস্ত্রভাবে সেই সংঘর্ষ বন্ধ করতে খ্রীষ্টের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন দাঙ্গাবিধ্বস্ত জনগণের কাছে?[৩৬]

এসব প্রশ্ন নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাই এদের সঠিক উত্তর প্রয়োজন।

বলাই বাহুল্য যে, ১৯৪৬ সালটি হল ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্ববর্তী সমস্যাসঙ্কুল বছর। সেই সময় ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রস্তাবিত ১৯৪৮ সালের আগের সময়টুকুর জন্য ভারতীয়দের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে আহ্বান জানান। কিন্তু মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ পৃথক পাকিস্তানের দাবীতে সে আহ্বানে সাড়া দিল না। তাই জহরলাল নেহরু কংগ্রেসী-মন্ত্রীসভা গঠন করেন।[৩৭] এ ঘটনায় মুসলিম লীগ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হয়, এবং ১৬ আগস্ট (১৯৪৬) তারিখটিকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন' (Direct action day') হিসাবে পালন করে এবং হিন্দু-নিধন যজ্ঞে মেতে ওঠে।[৩৮] বাংলাদেশে তখন মিঃ সুরাবর্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের সরকার। বাংলাদেশের কলকাতা ও শহরতলীতে সেদিন থেকে পরপর কয়েকদিন ধরে হত্যালীলা চলে।[৩৯] এর পর পরই ঘটে যায় পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। শত শত লোক মারা যায়। নোয়াখালি যেন রক্তস্নাত হয়ে ওঠে। তারপরে দাঙ্গা বাধে ত্রিপুরা ও বিহারে।

হিন্দু-মুসলমানের সেই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাঝে দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। মহাত্মা গান্ধী শান্তি স্থাপনের আশায় খালি পায়ে একাই বেরিয়ে পড়লেন দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালির পথে পথে। হিন্দু ও মুসলমান জনগণকে নিরস্ত্র করতে এবং হিংসার পথ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে আনতে

তিনিই যেন সেই সময় অহিংসার মূর্ত প্রতীক যীশুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, থামাতে চেষ্টা করেছিলেন সেই দাঙ্গা, ভ্রাতৃনিধন যজ্ঞ,[৪০] যদিও তা থামাতে তিনি সম্পূর্ণ সফল হন নি।[৪১]

হ্যাঁ, নোয়াখালির এই ঘটনায় (১৯৪৬) গান্ধীজীর অহিংস মনোভাবের পরিচয় যথেষ্টই মেলে, সন্দেহ নেই। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, এই মনোভাব তিনি পোষণ করেছেন ভারতবর্ষের দুই ভ্রাতৃপ্রতীম সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের ক্ষেত্রে, সেই অহিংসার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা থামাতে। কিন্তু স্বদেশের দুটি সম্প্রদায় বা কিছু সম্প্রদায়ের দাঙ্গা থামানো এক কথা, আর ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করা আর এক কথা। ভারতবর্ষের সংহতি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের স্বার্থে তিনি চিরকালই অহিংস ব্রত বজায় রেখেছিলেন, এবং তিনি জীবন উৎসর্গও করেছিলেন (১৯৪৬ সালে)। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে প্রথম দিকে তাঁর অহিংস নিয়মতান্ত্রিক মনোভাব থাকলেও তদানীন্তন (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রয়োজনে সেই মনোভাব তিনি পরবর্তীকালে আর বজায় রাখতে পারেন নি, আর পারেন নি বলেই তিনি ঘোষণা করে ফেলেছিলেন, স্বাধীনতার জন্য কাজের কাজ কিছু 'করব, না হয় মরব।'

আসলে তদানীন্তন পরিস্থিতির চাপে জীবনের শেষ দিকে গান্ধীজীর কাছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করাই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, এজন্য তিনি হিংসা-অহিংসা বা সশস্ত্র-নিরস্ত্র আন্দোলনের ছুঁৎমার্গিতা ঝেড়ে ফেলে দেন এবং এই বিশেষ লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন বলেই ভারত বিভাজনের নীতি পর্যন্তও তিনি অবশেষে মেনে নিলেন, বিনিময়ে পাওয়া খণ্ডিত স্বাধীনতাকেও তিনি স্বীকার করে নিলেন, হাজার হলেও তা স্বাধীনতা তো বটেই, হোক না বিভাজনের কারণে খণ্ডিত।

সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বার্থেই একমাত্র গান্ধীজী অহিংসার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, অন্য কোন স্বার্থে নয়, অথবা নয় অন্য কোন বিষয়েও; বরং অন্য সব বিষয়েই তিনি অহিংস আদর্শে একনিষ্ঠ ছিলেন একথা বলা যায়।

উপসংহার

আলোচ্য প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, ভারতের সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও জাতীয় সংহতির স্বার্থে গান্ধীজী চূড়ান্ত পরিমাণে অহিংস

মানসিকতা আমৃত্যু বজায় রেখে গেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বার্থে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তিনি তাঁর অহিংস নিয়মতান্ত্রিক মানসিকতা আগাগোড়া বজায় রাখতে পারেন নি, বরং সরে এসেছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস প্রমুখের সংগ্রামী মানসিকতায়; তাইতো তিনি মরণপণের শেষ মুক্তিসংগ্রাম হিসাবে ডাক দিয়েছিলেন 'ভারত ছাড়ো' গণ-আন্দোলনের।[৪২] এখানেই অহিংস পথ থেকে সহিংস সংগ্রামী মুক্তি আন্দোলনের পথে তাঁর ঐতিহাসিক অনুবর্তন, সন্দেহ নেই; এবং সে অনুবর্তন শুধু ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থেই, জাতীয় মুক্তি লাভের কারণেই। এবং এটাই এক ঐতিহাসিক সত্যতা বলাই বাহুল্য। মূল প্রবন্ধটি অত্যন্ত দীর্ঘ। আলোচ্য প্রবন্ধটি সেটির অতি সংক্ষিপ্ত রূপ। ফলে বিষয়বস্তুকে এই প্রবন্ধে পর্যাপ্তভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হল না এজন্য লেখক দুঃখিত।

সূত্রনির্দেশ

১ A. R. Ulyanovsky-এর 'Mohandas Karamchand Gandhi', দ্রষ্টব্য Ulyanovsky (ed.) "Fighters for National Liberation", Progressive Publishers, Moscow, 1984, p 15

২ দ্রষ্টব্য R. K. Prabhu (ed), "Two Memorable Trials of Mahatma Gandhi, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1963, p 63

৩ দ্রষ্টব্য Buddhadeva Bhattacharyya, "Evolution of the Political Philosophy of Gandhi", Calcutta Book House, Calcutta, 1969, p 295

৪ তদেব, বঙ্গানুবাদ আমাদের কৃত

৫ দ্রষ্টব্য Chandra Shankar Shukla, "Gandhi's View of Life", Bharatiya Vidya Bhavan, 1954, p 72; বঙ্গানুবাদ আমাদের কৃত

৬ দ্রষ্টব্য Ramesh Chandra Majumdar, "History of the Freedom Movement in India", Vol. III, Firma K L M Pvt. Ltd., Calcutta, 1977, p 261; বঙ্গানুবাদ ও বন্ধনী আমাদের কৃত

৭ Moulana Abul Kalam Azad, "India Wins Freedom", Orient Longman, Delhi, 1978, p 41; বঙ্গানুবাদ ও বন্ধনী আমাদের কৃত

৮ দ্রষ্টব্য অন্নদাশঙ্কর রায়, "গান্ধী", এম সি সরকার এণ্ড সন্স কোঃ লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ ১১৪ ; বঙ্গানুবাদ ও বন্ধনী আমাদের কৃত

৯ দ্রষ্টব্য Complete Works of Mahatma Gandhi (C. W. M. G.) Vol. LXX, p 162 ; বঙ্গানুবাদ আমাদের কৃত

১০ M. A. K. Azad, তদেব, পৃ ৭৪ : বন্ধনী ও বঙ্গানুবাদ আমাদের কৃত

১১ তদেব, pp 75-6 ; বঙ্গানুবাদ ও বন্ধনী আমাদের কৃত

১২ তদেব, pp 72-4 ; বঙ্গানুবাদ ও বন্ধনী আমাদের কৃত

১৩ দ্রষ্টব্য Ramesh Chandra Majumdar, তদেব, পৃ ৫৮৬ ; বঙ্গানুবাদ আমাদের কৃত

১৪ S. C. Bose, 'To Mahatma Gandhi', a condensed version of Netaji's speech Broadcast from Rangoon Radio on 6th July, 1944. দ্রষ্টব্য, International Netaji Seminar : 23rd-26th January 1973—উপলক্ষে Netaji Research Bureau কর্তৃক প্রকাশিত Official Souvenir, Calcutta, 1973

১৫ দ্রষ্টব্য M. A. K. Azad, তদেব, প ৭৩

১৬ তদেব, পৃ ৪১

১৭ তদনুরূপ

১৮ দ্রষ্টব্য Kalyan Kumar Sarkar, "The Quit India Movement in the District of Nadia", Barnali Prakashani, Calcutta, 1988, p 28

১৯ তদেব, pp 25-6

২০ তদেব, পৃ ২৬

২১ দ্রষ্টব্য M. A. K. Azad, তদেব, পৃ ৪১

২২ Kalyan Kumar Sarkar তদেব, পৃ ২৮ .

২৩ দ্রষ্টব্য M. A. K. Azad, তদেব, pp 73-4 ; বঙ্গানুবাদ আমাদের কৃত

২৪ দ্রষ্টব্য Kalyan Kumar Sarkar, তদেব, পৃ ২৮

২৫ আলোচ্য প্রসঙ্গে গান্ধীজীর মনোভাব সম্পর্কে জওহরলাল নেহরুর পূর্ণাঙ্গ বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য Ramesh Chandra Majumdar, তদেব, পৃ ৫৪৬

২৬ দ্রষ্টব্য Kalyan Kumar Sarkar, তদেব, পৃ ২৮

২৭ M. A. K. Azad, তদেব, পৃ ৭২ ও ৭৪ ; বঙ্গানুবাদ ও বন্ধনী আমাদের কৃত

২৮ অন্নদাশঙ্কর রায়, তদেব, পৃ ১১২-৩

২৯ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ক্ষমতাবান পুলিশের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের শক্তি বা হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করাকে গান্ধীজী

সমর্থন করেছেন। তিনি অন্যায়ভাবে প্রযুক্ত বৃহত্তর শক্তি বা হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক শক্তি বা হিংসাকে 'Leonine Violence' নামে চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Kalyan Kumar Sarkar, তদেব, পৃ ৩০

৩০ দ্রষ্টব্য Kalyan Kumar Sarkar, তদেব, পৃ ৮৭ ; বঙ্গানুবাদ ও বন্ধনী আমাদের কৃত

৩১ Kalyan Kumar Sarkar, তদেব, পৃ ৮৮ ; বঙ্গানুবাদ আমাদের কৃত

৩২ ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন অহিংস পন্থার চেয়ে সহিংস অন্তর্ঘাতমূলক পন্থাতেই বেশী জোরালো হয়ে উঠেছিল। এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত ও নিটোল বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Kalyan Kumar Sarkar, তদেব, pp 29-31

৩৩ দ্রষ্টব্য Ramesh Chandra Majumdar, তদেব, পৃ ৫৩২ ; বঙ্গানুবাদ ও নিম্নরেখামুদ্রণ আমাদের কৃত

৩৪ তদনুরূপ ; বঙ্গানুবাদ আমাদের কৃত

৩৫ Ramesh Chandra Majumdar, তদেব, পৃ ৫৩২ ; বঙ্গানুবাদ ও বন্ধনী আমাদের কৃত

৩৬ অহিংস আদর্শ থেকে গান্ধীজীর বিচ্যুতি সংক্রান্ত বক্তব্যের প্রসঙ্গে এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ১৯৮৯ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গান্ধী ভবনে' অনুষ্ঠিত পঃ বঃ ইতিহাস সংসদের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধটি আলোচনার সময় কতিপয় মাননীয় সদস্য এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বর্তমান লেখকের বক্তব্য অবশ্য ছিল যে, শুধুমাত্র ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থেই গান্ধীজী অহিংস নীতি থেকে সরে আসেন। এই প্রশ্নগুলির জন্য বর্তমান লেখক প্রশ্নকর্তা-সদস্যগণের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ; যেহেতু এইসব প্রশ্নই এ প্রবন্ধের 'গান্ধীজী কি অহিংসার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলেন ?'—এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি লিখতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

৩৭ দ্রষ্টব্য সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামাণিক, "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি", শ্রীভূমি, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ ১৮৭

৩৮ দ্রষ্টব্য Nemai Sadhan Bose, The Indian National Movement : An Outline, Firma K L M, Calcutta 1965, p 135

৩৯ তদনুরূপ, আরও দ্রষ্টব্য সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামাণিক, তদেব, পৃ ১৯৭-৮

৪০ দ্রষ্টব্য Nemai Sadhan Bose, তদেব, পৃ ১৩৬

৪১ তদনুরূপ, আরও দ্রষ্টব্য অন্নদা শংকর রায়, পৃ ১৪৮-৯

৪২ দ্রষ্টব্য Kalyan Kumar Sarkar, তদেব, pp 23-38

সতীদাহ প্রথার নিরিখে হুগলী জেলা ও রামমোহন

সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সতীদাহ প্রথা আমাদের সমাজের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। স্ত্রী-জাতির অমর্যাদা ও হিন্দুসমাজের নৃশংসতার এটি একটি চরম নিদর্শন। সতীদাহকে হুগলী জেলার সঙ্গে সম্পর্কিত করার প্রধান কারণ আজকের বিলুপ্তপ্রায় 'সতীদাহ' সবচেয়ে বেশী ঘটেছিল এই জেলায়। বিলুপ্তপ্রায় শব্দটি প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও এর বেশ কিছু নজীর পাচ্ছি—১৯১৩, ১৯৭৫, ১৯৭৮, ১৯৮০, ১৯৮১ ও ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্তভাবে মাঝে মাঝে সতীর চিতা জ্বলে উঠছে। এমনকি সেদিনও রাজস্থানের কানোয়ার বধূ 'সতী' হয়েছেন। যদিও পরিসংখ্যানের বিচারে ঘটনাটি এমন কিছু নয় কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিকোণ ও সভ্যতার অগ্রগমনের বিচারে এর তাৎপর্যকে উপেক্ষা করা যায় না।

এত গেল সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আলোচনা করার আগে আমাদের পেছন ফিরে তাকাতে হবে। আমাদের দেশের বর্তমানকে বুঝতে গেলে প্রাচীনকে জানা প্রয়োজন—কারণ নব্যসমাজ প্রাচীন সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। এমনকি বর্তমানের সামাজিক সমস্যাগুলিরও অনেক সময় একটা যোগসূত্র দেখা যায় প্রাচীন সমাজের সমস্যাগুলির সঙ্গে। ভারতবর্ষে সতীর আগুন কিন্তু রামমোহনের সময় প্রথম জ্বলে নি। এই প্রথা বহু পুরনো—প্রায় ২৩০০ বছর আগে থেকেই সতীর চিতা বহ্নিমান। খৃষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখনই ভারতবর্ষে এই প্রথা রীতিমত প্রচলিত। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে পাঞ্জাবে এ প্রথার প্রচলন ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক ডিডোরাস সিকুলাই-এর লেখায় তার পরিচয় পাই।[১]

খৃষ্টপূর্ব ৩১৭ অব্দে ভারতে প্রথম সতীদাহর ঘটনা (যেটি পাঞ্জাবের কাথিয়ানদের মধ্যেই ঘটে) ঘটলেও ৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে সতীদাহর বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ইতিহাস বিভাগ, সরোজিনী নাইডু কলেজ

বৈদিক যুগে সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিল কিন্তু তার সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। তাই দেখি সতী বা সহমরণের কথা ঋগ্বেদে উল্লেখ নেই। তবে অথর্ববেদে সহমরণের দুটি উল্লেখ রয়েছে ঃ "একটি জীবিত নারীকে মৃতের বধূ হতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; আর 'এই নারী তার স্বামীর লোকে যাচ্ছে এ একটি প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করছে [অথর্ববেদ, ১৮।৩।৩,১] অনুমান হয়, আর্যরা প্রাগার্যদের মধ্যে এটির প্রচলন লক্ষ্য করে। লক্ষ্যণীয় সতীদাহ, বহুপতিত্ব ইত্যাদি সমাজের অপ্রচলিত কিছু কিছু নীতি অথর্ববেদেই পাওয়া যায়। একটা কারণ সম্ভবত এই যে অথর্ববেদ সংকলিত হয় আর্য-প্রাগার্য সংমিশ্রণের শেষ পর্বে। তাই প্রাগার্য কিছু নীতি আর্যসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হবার চিহ্ন বেশী আছে এতে, যে রীতি আর্যরা প্রথম নেয় নি, যেমন সহমরণ তাও প্রতিবেশী সমাজে লক্ষ্য করে উল্লেখ করেছে অথর্ববেদ।[২]

বেদের অন্যত্র এবং তার পরের সাহিত্যেও সতীদাহের কোন নজীর নেই। মহাভারতে সতীপ্রথা লক্ষ্য করা যায়। মাদ্রী, দেবকী, মদিরা, ভদ্রা ও রোহিনী সহমৃতা হন। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বেদবতীর মাতার সতী হওয়ার বর্ণনা আছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সহমরণ প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল বোধহয় মহাভারত রচনাকালের মধ্যে। (অর্থাৎ আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে)

প্রাচীন যুগ থেকেই সহমরণ ভারতবর্ষের রাজারাজড়া ও অভিজাত পরিবারগুলিতে রীতিমত প্রচলিত। এ প্রথা প্রথমদিকে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, চণ্ডাল, তাঁতি, নাপিত, রাজমিস্ত্রীদের মধ্যেও তা প্রচলিত হয় তবে সতীদাহ প্রথা ভারতবর্ষের একচেটিয়া কোন ব্যাপার ছিল না। সাধারণভাবে বিশ্বের সব প্রাচীন ধর্ম ও জাতির মধ্যেই স্বামীর চিতায় পত্নীর আত্মাহুতি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া গ্রীস, থেস, মিথিয়া, মিশর, অ্যাসিরিয়া, লিডিয়া, ব্যাবিলন, চীন, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতিবর্গের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক কানের মতে, প্রাচীন জার্মান, স্লাভ ও অন্যান্য জাতির মধ্যে সহমরণ প্রচলিত ছিল।[৩] অধ্যাপক আলটেকর মনে করেন, প্রাচীন বিশ্বে এ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, গল, গথ, কেল্ট প্রভৃতি ইন্দো-ইউরোপীয় এবং সিথিয়ান ও চীনদেশে এ প্রথা ছিল সাধারণ নিয়ম।[৪] অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসামও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।[৫]

সাধারণভাবে সহমরণের উৎস খুঁজতে গেলে বলতে হয় যে প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগেও অনেকের মধ্যে এইরকম একটা ধারণা ছিল যে

মৃত্যুর পরবর্তী কোনও অধ্যায় আছে যেখানে মৃতের প্রয়োজন হয় জীবিতকালের মতনই সব কিছুর। সাধারণ মানুষজনের কবরের সঙ্গে দেখা গিয়েছে বাসন-কোসন, খাবার-দাবার—যার মধ্যে মুরগীও বাদ যায় নি। রাজরাজড়ারা মৃত্যু হলে তো কথাই নেই। তার সেই মরণোত্তর অধ্যায়েও নাকি প্রয়োজন হত স্ত্রী, সভাসদ, ভৃত্য, ধনরত্ন, গহনা আরও নানাবিধ জিনিসপত্র মায় ঘোড়া পর্যন্ত। সুতরাং রাজার স্ত্রীকে অনেক সময় আত্মবলিদান করতে বাধ্য করা হত। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে রানীর মৃত্যুর পর রাজাইবা কেন সহমরণে যাবে না। উত্তরটা সহজ। সমাজ প্রধানত পুরুষশাসিত হওয়ায় পুরুষ স্বার্থবিরুদ্ধ নিয়মকানুন বিশেষ হতে দেখা যায় নি।[৬] মনেহয় সতীপ্রথার জন্মের পিছনে আছে পুরুষাধিকারের ঘোষণা—'নারীপুরুষের সম্পত্তি—তাদের কোন স্বাতন্ত্র নেই।'

দুঃখের কথা এই যে, পৃথিবীর আর সব দেশে যখন সহমরণের প্রথা নির্মূল হয়ে গিয়েছিল অথবা তার প্রকোপ কমে গিয়েছিল তখন ভারতবর্ষে যেন এই প্রথাটি একেবারে জাঁকিয়ে বসেছিল।

আনুমানিক ৪০০ খৃষ্টাব্দ থেকেই বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যে সতীদাহর বেশ উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমস্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে বাৎসায়ণ, ভাস, কালিদাস ও শূদ্রকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মা স্বামীর আরোগ্যলাভ অসম্ভব জানতে পেরে আগুনে ঝাঁপ দেন। একই সময়ে নেপালের রানী রাজ্যবতীও সতী হয়।[৭] ৭০০—১১০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সতীর সংখ্যা উত্তর ভারতে বিশেষ করে কাশ্মীরে বৃদ্ধি পায়। কল্হনের রাজতরঙ্গিনী থেকে জানা যায় কাশ্মীরের রাজপরিবারের মধ্যে সতীদাহ বিশেষভাবে প্রমাণিত ছিল। কেবলমাত্র বিবাহিত স্ত্রীরাই নয় উপপত্নীরাও রাজাদের সঙ্গে সহমরণে যেত। ১১০০ খৃষ্টাব্দে রচিত কথাসরিৎ সাগর থেকে জানা যায় কাশ্মীরে প্রায়ই সতীদাহ হত। অল্টেকারের মতে মধ্য এশিয়ার নিকটবর্তী হওয়ায় সাইথিয়ানদের সতীপ্রথাও কাশ্মীরের রাজপরিবারে গৃহীত হয়।[৮]

১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যেও খুবই কম সতীদাহর ঘটনা পাওয়া যায়। বিভিন্ন লিপি থেকে পল্লব, চোল ও পাণ্ডেয় রাজপরিবারের মধ্যে ৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সতীদাহের ঘটনা পাওয়া যায় না।[৯]

গুপ্তোত্তর ও মধ্যযুগে সতীপ্রথার প্রচলন এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটে। নারায়ণ দেব ও কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গল', দ্বিজমাধব ও মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল', ঘনারামের 'ধর্মমঙ্গল' এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' এর প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়।

কেবলমাত্র ভারতীয় সাহিত্য, ইতিহাস বা নথিপত্রেই যে সতীদাহ প্রথার তথ্যপ্রমাণ সীমাবদ্ধ রয়েছে তা নয়, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণের মধ্যেও এর বেশ উল্লেখ পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন, হিউয়েনসাঙ, আলবেরুণী, মার্কোপোলো, ইবনবতুতা, নিকোলকণ্টি, বার্নিয়ের, টাভার্নিয় প্রমুখরা তাঁদের ভ্রমণকাহিনীতে আলোচ্য প্রথার উল্লেখ করেছেন। আলবেরুণী তার মূল্যবান গ্রন্থ ভারততত্ত্বে লিখেছেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারত না। তার জন্য তখন দুটি মাত্র পথ খোলা থাকত—হয় আমরণ বিধবা হয়ে থাকা নয়তো অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দেওয়া। বৈধব্য জীবনের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিধবারা দ্বিতীয় পথই বেছে নিতেন।

মুসলমান শাসকরা এ প্রথা বন্ধ করতে না পারলেও সীমিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় সুলতানদের মধ্যে মহম্মদ বিন তুঘলক সর্বপ্রথম সতী-দাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেওয়ার আগে শাসকদের অনুমতি গ্রহণের নিয়ম স্থির করেন। নারীঘাতী প্রথাটিকে উৎসাহ না দিয়ে তার বিরুদ্ধে সমাজের চেতনা বৃদ্ধির জন্য তিনি এই নিয়মটি চালু করেন। হুমায়ুনও এ ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছেন। আবুল ফজলের এ-প্রথা সম্পর্কে প্রামাণ্যগ্রন্থ 'আকবরনামা' থেকে জানা যায় যে আকবর নাকি তাঁর রাজত্বকালে ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি জেলায় এবং শহরে বলপূর্বক সতীদাহ যাতে না হয় তার জন্য ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করেছিলেন। জাহাঙ্গীর শুধু পিতার পথ অনুসরণ করেন নি উপরন্তু নিয়মলঙ্ঘনকারীদের প্রতি শাস্তিদানের ব্যবস্থাও করেন। শাহাজান বিশ্বস্তভাবে তাঁর পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ করেন। আঞ্চলিক শাসনকর্তার বিশেষ অনুমতি ব্যতীত তখন সতীদাহ হত না। আর শিশুসন্তান থাকলে অনুমতিপত্রের বিনিময়ে সন্তানদের শিক্ষার জন্য সম্রাট মহিলাদের জীবনধারণের উপদেশ দিতেন।

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর থেকে ফিরে এসে সতীদাহ বন্ধ করবার জন্য আওরঙ্গজেব আদেশ দেন। কিন্তু তাঁর আদেশ খুব অল্প পরিমাণেই কার্যকরী হয়। সেই আদেশ পুরোপুরি কার্যকর না হলেও শাসনকর্তাদের সতর্ক পর্যবেক্ষণের ফলে অনেক মহিলার জীবন রক্ষা পায়।[১০]

হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করার ফলে মুসলমানদের মধ্যেও সহমরণের প্রবণতা দেখা যায়। আইন-উল-মুলকের মৃত্যুর গুজব শুনে তাঁর স্ত্রী হিন্দু-বিধবার মত সহমরণে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[১১]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের রেশ টেনে আমরা যদি আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে আসি তবে দেখতে পাব আধুনিক যুগের বেশ কিছু পত্রপত্রিকা এই কুৎসিত

প্রথাটির সমালোচনায় মুখর। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ মার্চ ও ৫ জুন তারিখের সমাচার দর্পণের খবর থেকে জানা যায় যে এই বীভৎস ভয়াবহ প্রথা সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশে আবার বাংলাদেশের মধ্যে হুগলী জেলাতেই ছিল সবচেয়ে বেশী।

হুগলী জেলায় সহমরণের আধিক্যের কারণ হিসেবে বলা যায় যে সে-সময়ে বাংলায় গঙ্গার পশ্চিম ধারে 'ত্রিবেণী' ও 'নিমাইতীর্থ' ছিল প্রসিদ্ধ পূণ্যতীর্থ। এখানের পূণ্যশ্মশান বারাণসীর মনিকর্ণিকার ঘাটের ন্যায় বলে বিবেচিত হত। কাশীতে মৃত্যুর ন্যায় এইস্থানে মৃত্যুও ছিল এক মহা-পূণ্যজনক ব্যাপার। দূরদূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে এসে বহু ক্লান্ত সতী সেই-খানকার গঙ্গায় স্নান করে, তাঁর গহনাদি বিলিয়ে দিয়ে স্বামীর জ্বলিত শবটি আলিঙ্গন করে অগ্নিতে প্রাণ সমর্পণ করেছেন। নতুন বস্ত্র পরে অথবা বিয়ের কনের সাজে তাঁর সৌভাগ্যচিহ্ন আলতা, সিঁদুর, শাঁখা ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে সতী চলতেন শ্মশানের উদ্দেশ্যে—সঙ্গে বাদ্য, বাজনা, শঙ্খধ্বনিসহ আত্মীয় প্রতিবেশীদের এক শোভাযাত্রা চলত। হিন্দু বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যেই সহমরণ বেশী দেখা যেত। তবে হুগলী জেলায় প্রায় সমস্ত জাতের মধ্যেই সতীদাহের ঘটনা পাওয়া যায়।

সেই সময় কৌলীন্যপ্রথাজনিত বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল—এক বর অনেক কনের রাজস্ব করত। একগাছি পৈতের জোরে বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণরা ৫০, ৬০, ৭০টি বিবাহ করত—সংখ্যাটি অনেক সময় ১০০ ছাড়িয়ে যেত। কৌলিন্যপ্রথার ব্যাপক প্রভাবের জন্য এ অঞ্চলে সতীপ্রথার কতটা প্রসার ঘটেছিল—তা হুগলির ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্মিথ ৫. ২. ১৮২৭-এ সরকারের কাছে প্রদত্ত বিবরণীতে তথ্য সহযোগে দেখান—হুগলী, বর্দ্ধমান ও নদীয়া—এই তিনটি জেলায় ৪,৫০০০ ব্রাহ্মণ ও ৩,০০০০ কায়স্থ পরিবারের বাস। এদের মধ্যে ১,২০০০০ কুলীন ব্রাহ্মণ এবং ৬০,০০০ কুলীন কায়স্থ। কৌলীন্য-প্রথা এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এইসব কুলীনদের মৃত্যু হলে বহুসংখ্যক পত্নী সতী হতেন। কৌলীন্যপ্রথা, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব, গঙ্গার অবস্থিতি—এসব নানা কারণে হুগলীতে সতীপ্রথার এত আধিক্য ছিল।[১২]

১৮১৫ থেকে ১৮২৭ সালের মধ্যে এ জেলায় ১২৪৩টি সতীদাহের ঘটনা ঘটে। অন্যান্য জেলার তুলনায় এ জেলাতে সতীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। শতকরা ৫০ ভাগ ঘটনা উচ্চজাতের মধ্যেই ঘটে। সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, তেলী, গোয়ালা, তাঁতী, বাগদী, বেনিয়া ও নাপিতদের মধ্যে সতীর সংখ্যা দেখে মনে হয় হুগলী জেলায় এ সমস্ত নিচুজাতের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

হুগলী জেলা ঐ সময়ে (১৮১৫ থেকে ১৮২৭) ব্যবসা ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিত থাকায় সংখ্যার দিক দিয়ে সতীদাহর ক্ষেত্রে অন্য সমস্ত জেলাকে পেছনে রেখে হুগলী শীর্ষস্থান অধিকার করে। একদিকে সতীদাহর ধর্মীয় ও সামাজিক দিকগুলি যেমন সমাজের অবস্থাপন্ন লোকদের এক অংশকে প্রলুব্ধ করেছিল অপরদিকে ধনী লোকের বিধবাদের সম্পত্তির প্রশ্নও কোন অংশে কম প্রলোভনের বিষয় ছিল না।[১৩]

ঊনিশ শতকে হুগলী জেলায় অভিনব ও বিচিত্র ধরনের সতীদাহের ঘটনার নজীর আমরা পেয়েছি বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতা থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রত্যন্ত সময়ের দু-একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ওয়ার্ড সাহেবের জবানীতে জানা যায় যে শ্রীরামপুরের তিন মাইল পূর্বে সুখচরে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে একবার একটি অভূতপূর্ব সতীদাহ হয়। পরলোকগত এক কুলীন ব্রাহ্মণের ৪০ জন স্ত্রী ছিলেন, তার ৪০টি পত্নীর মধ্যে ১৮টি জীবিত ছিলেন। যে ১৮টি জীবিত ছিলেন তারা সকলেই স্বামীর সঙ্গে সতী হয়েছিলেন। সেই চিতার দৈর্ঘ্য ছিল আনুমানিক দশ বারো গজ।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দেও হুগলী জেলায় বাশনাপাড়ায় প্রায় অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। এক কুলীন ব্রাহ্মণের একশত স্ত্রী ছিল। কুলীনের মৃত্যু হলে সাঁইত্রিশ জন স্ত্রী সহমৃতা হন। উপর্যুপরি তিন দিন ধরে তার চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত ছিল।[১৪]

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি সমাচার-দর্পণে চন্দননগরের একটি অভিনব সতীদাহের ঘটনার খবর জানা যায়। একটি তরুণী তার ভাবী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দেয়। চন্দননগরের এক তরুণের সঙ্গে তরুণীটির বিবাহ স্থির হয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ বিয়ের আগের দিন কলেরায় তরুণের মৃত্যু ঘটে। মেয়েটি এই খবর পেয়েই ঘোষণা করে যে, সে তার ভাবী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবে। শেষ পর্যন্ত সকলের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে তরুণীটি তার পূর্বঘোষণা অনুযায়ী সহমৃতা হন।

১৮২৫-এর ২০ নভেম্বর হুগলীর ধনেখালিতে স্থানীয় জমিদার রামলোচন মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করলে তার চারজন স্ত্রী পার্বতী, হরপার্বতী, রাওয়ারি ও চিত্রা স্বেচ্ছায় সহমরণে যায়।[১৫]

চুচঁড়ায় গঙ্গাচরণ সরকারের পিতা পরলোকগমন করলে তাঁর মাতা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হন। গঙ্গাচরণ 'ক্যাঁকশীয়ালী' ঘাটের বটবৃক্ষকে সম্বোধন করে সতীদহ সম্বন্ধে একটা কবিতা ১৬ বৈশাখ ১২৯১ সালের সাধারণীতে

প্রকাশ করেন। সতীদাহের চিত্রটি প্রদর্শন করার জন্য কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল ঃ

"আরো তুমি এই স্থানে দেখিয়াছ সন্নিধানে, কত সতী লয়ে মৃত পতি।
স্বামীভক্তি অনুনলে, চিতায় জ্বলন্তানলে, হাস্যমুখে হইয়াছে সতী ॥
তবু তব জানা আছে, অনুত্যজে তব কাছে, পতি শয়ে যেসব রমণী।
তার মাঝে এক সতী, পতিব্রতা গুণবতী, এ দীনের ছিলেন জননী ॥
বহুকাল হ'ল গত, বৎসর অর্দ্ধেক শত তদুপরি আর পাঁচ ছয়।
গতাসু হলেন পিতা, মাতা হন সহমৃতা, শৈশবেতে আমি নিরাশ্রয় ॥[১৬]

স্বেচ্ছায় যেমন সতী হয়েছেন আবার জোর করে সতী হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়। উলার মুক্তারাম নামে এক ব্যক্তি পরলোকগমন করলে তার ত্রয়োদশজন ভার্যা সহমৃতা হন। কিন্তু শেষ দু'জন শূর্ণার্ঘ্য দেওয়ার সময় মন্ত্রপাঠ-কালে প্রাণভয়ে পালাতে চেষ্টা করলে পুত্র বলপূর্বক ধরে এনে মাদের চিতায় ফেলে দেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত রমানাথ এ ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন।[১৭]

বাংলাদেশের শেষ আইনসম্মত সতীদাহ এই হুগলী জেলাতেই ঘটেছিল। ঘটনাটি যেমন চমকপ্রদ তেমনি নাটকীয়। এটি একটি অনুমরণের দৃশ্য ছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন হ্যালিডে সাহেব। প্রত্যক্ষ-দর্শী হিসেবে তাঁর বিবরণ আমাদের কাছে যথেষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক। সতী-দাহের মুহূর্তে হ্যালিডে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে-চুচঁড়ায়—সতীদাহ বে-আইনী ঘোষিত হবার কয়েকদিন আগে। হ্যালিডে স্বয়ং সহমরণে উন্মুখ নারীকে এই কাজ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন এবং এই ধরনের স্বেচ্ছামরণের কষ্ট ও যন্ত্রনা যে কি দুর্বিসহ সে সম্পর্কে উক্ত মহিলাকে অবহিত করার চেষ্টা করেন। হ্যালিডে সাহেবের অনুরোধ ও সুপরামর্শের উত্তরে সদ্যবিধবাটি প্রজ্বলিত প্রদীপ শিখায় নিজের আঙুল স্বেচ্ছায় পুড়িয়ে সাহেবকে দেখিয়েছিলেন ঐ নারীর প্রত্যয়, দৃঢ়তা, অঙ্গীকার এবং পারলৌকিক বিশ্বাসের গভীরতায় আশ্চর্য হয়ে শেষপর্যন্ত হ্যালিডে সহমরণের আদেশ দিতে বাধ্য হন, বাংলাদেশের শেষ আইনসম্মত সতীদাহ এইভাবে হুগলী জেলাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১৮]

তবে সতীদাহের যেসব ঘটনাগুলিতে স্ত্রীরা স্বেচ্ছায় প্রাণবিসর্জন দিয়েছেন অর্থাৎ বহু প্রচেষ্টার পরও যাদের নিরস্ত করা সম্ভব হয় নি সেগুলির গভীরে যদি আমরা প্রবেশ করি তবে দেখবো এর পেছনের চিত্রটা একটু অন্যরকম। কিছু ক্ষেত্রে যদিও স্ত্রীরা স্বামীর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা বা আনুগত্যবোধ থেকে এ

পথ বেছে নিতেন তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ কথা সত্যি ছিল না। ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থগুলি বিধবাদের এক কঠিন নিয়মের শাসনে বেঁধে রেখেছিল। শৈশব থেকেই মেয়েদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া হত যে পতিই সাক্ষাৎ দেবতা এবং পতিপরায়ণতাই তাদের একমাত্র ধর্ম। পতির সহিত সহমরণই সেইজন্য বঙ্গরমণীগণ তাদের জীবনের একমাত্র কাম্য বলে বিবেচনা করতেন এবং তাদের জীবন সার্থক জ্ঞান করতেন। যে স্ত্রী সহমরণে যান তিনি স্বামীকে সর্বপ্রকার পাপ থেকে উদ্ধার করেন—এরচেয়ে সৎ সাহস ও বীরত্বের কর্ম আর নেই। পতির পুণ্যে তার স্বর্গবাস, পাপে নরক গমন। পরাশর-সংহিতায় আমরা এমন কথাও পাই যে মানবদেহে সাড়ে তিন কোটি লোম আছে যে নারী স্বামীর সহিত সহমৃতা হন অর্থাৎ স্বামীর অনুগমন করেন তিনি সাড়ে তিন কোটি বৎসর স্বর্গবাস করেন। অন্ধ কু-সংস্কার ছাড়াও বৈধব্য-জীবনের অসহ্য যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেক মেয়েরা স্বেচ্ছায় সতী হতেন। নিঃসন্তান বিধবার ভরনপোষণের দায়িত্ব কে নেবে, সে প্রশ্নও অনেক সময় সহমরণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া নিঃসন্তান সম্পদশালিনী বিধবার মৃত্যু হলে সম্পত্তি গ্রাস করা মানে সহজেই এই ভেবেও আত্মীয়স্বজন ও সমাজপতিরা বিধবাকে সতী হতে ইন্ধন যুগিয়েছেন ঐতিহাসিক অল্টেকার বংশমর্যাদা রক্ষার জন্যও যে মেয়েরা সতী হয়েছেন তা নিজভগ্নীর কথা উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন। তাছাড়া বোধকরি বিধবাদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাবও সতী হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

তবে নারীজাতির এই দুরবস্থার অবসান ঘটাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পুরুষেরাই। সতীদাহের এই মর্মন্তুদ দলিল পড়তে পড়তে আমাদের মন যখন বেদনার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসে তখনই সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে দৃঢ়-পদক্ষেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন এই হুগলী জেলারই রাধানগরের আলোকদূত রাজা রামমোহন রায়।

সতীদাহ প্রথার বীভৎসতায় সেদিনের ভারতবর্ষ যখন লাঞ্ছিত রামমোহন সেদিন নারীত্বের এই অপমান নীরবে সহ্য করতে পারেন নি। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর তিনি সর্বশক্তি দিয়ে এ প্রথার বিরোধিতা করতে থাকেন এবং প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে নামেন। ১৮১৮ ও ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর রচিত 'সহমরণ-বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ'-এ শাস্ত্র ও যুক্তির ধারালো অস্ত্রে সতীদাহ সমর্থকদের সমস্ত যুক্তি ছিন্নভিন্ন করে ভরতবর্ষের নারীকে মুক্তির পথ দেখালেন তিনি। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এ প্রথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন উপায়ে জনমত গঠনে প্রয়াসী হলেন। এ জন্য

ঘরেবাইরে তাঁকে ভোগ করতে হল অশেষ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সহমরণ বিষয়ে আর একখানি গ্রন্থ লেখেন। হুগলী জেলার এই মানুষটি সভাসমিতি করে, পুস্তিকা প্রকাশ করে, রাজদরবারে আবেদন করে শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে কায়মনোবাক্যে সতীপ্রথার বিরুদ্ধতা করে গেছেন।

সতীদাহ নিবারণ ব্যাপারে জনমত গঠন ও শাস্ত্রীয় বিচার দ্বারা সতীদাহ প্রথার অশাস্ত্রীয়তা প্রকাশ্য প্রতিবাদনের জন্য রামমোহনকে সতীদাহ নিবারণী আন্দোলনের জনক বলা যায়।[১৯]

রামমোহনকে দেখে তাই গোঁড়া হিন্দুসমাজের পৃষ্ঠপোষকরা সতীদাহ প্রথাকে কায়েম রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টায় নামলেন। শুরু হল সতীদাহ-বিরোধী বাদানুবাদ ও আন্দোলন। অভিজাতশ্রেণী আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভক্ত হয়ে যান। স্বাভাবিকভাবেই রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

রামমোহনের নেতৃত্বে বাঙালি সমাজ যখন সতীদাহ প্রথার সমালোচনায় মুখর সেই সময় ১৮২৮-এর জুলাই মাসে এদেশে এলেন বেণ্টিঙ্ক। ১৮২৯-এ রামমোহনের সঙ্গে তাঁর কথা হল।

সতীপ্রথা নিবারণের জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি তবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে রামমোহনের মতামত জানতে চাইলেন ব্রিটিশ সরকারের নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিষয় চিন্তা করে রামমোহন আইন করে এ প্রথা নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে মত দিতে পারলেন না। এখানে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে মানুষ এ প্রথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন উপায়ে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, ঘরে বাইরে ভোগ করেছিলেন অশেষ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা এই মানুষই আইন করে এ প্রথা নিবারিত হোক তা চান নি কেন? আসলে রামমোহন উগ্রপন্থায় বিশ্বাস করতেন না। আইন করে রাতারাতি সামাজিক পরিবর্তন আনতে তিনি চান নি। সমাজসংস্কার ব্যাপারে আইন ও সংঘর্ষের পথে না গিয়ে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত শুভবুদ্ধির উপরই তিনি বেশী নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু রামমোহন না পারলেও বেণ্টিঙ্ক কিন্তু পিছিয়ে গেলেন না। বেণ্টিঙ্ক সামরিক কর্মচারী ও অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ৪ ডিসেম্বর ষোল নম্বর রেগুলেশন অনুসারে সহমরণ প্রথা ব্রিটিশভারতে সর্বপ্রথম আইনবিরুদ্ধ এবং আদালতগ্রাহ্য চরমদণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করলেন।

এই আইন পাশ হওয়ামাত্রই প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণ এই আইনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করলেন। বহু উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী

হিন্দু এই বিরুদ্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর বাহাদুর, গোপীমোহন দেব প্রভৃতি। রামমোহন আইনের দ্বারা সহমরণ রহিত করার আপত্তি করলেও এই আইন পাশ হবার পর তাহার পুরোপুরি সমর্থন করলেন।[১০]

যখন সতীপক্ষীয় ও সতীবিরোধীদের প্রচণ্ড লড়াই চলছিল তখন রামমোহন ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে পৌঁছলেন ও লর্ড ল্যান্সডাউনের সঙ্গে দেখা করে সতী বিষয়ে নিজের মতামত জ্ঞাপন করে সতীবিরোধীদের আবেদনপত্র দান করে হাউস অব লর্ডস-এ পেশ করালেন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি সম্পর্কে প্রিভি কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ১১ জুলাই ১৮৩২এ সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে সতীপক্ষীয়দের আবেদন নাকচ করে দেবার রায় ঘোষিত হয়। আইন করে সতীপ্রথা নিবারিত হল। রামমোহন জয়ী হলেন।

রামমোহন সতীপ্রথার বিরুদ্ধে এত বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন তার অন্যতম প্রধান কারণ এই হৃদয়হীন প্রথার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়। হুগলীর রঘুনাথপুরের অশোকতলা মহাশ্মশানের হৃদয়হীন সব ঘটনা ও তাঁর ভ্রাতৃজায়া অলকমঞ্জরীর স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় দহন তিনি কোনদিনই মুছে ফেলতে পারেন নি মন থেকে। অশোকতলা শ্মশানের নিষ্ঠুর সহমরণ দৃশ্য রামমোহনকে সহমরণ প্রথা নিবারণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সুতরাং একথা ভাবা মোটেই অসঙ্গত নয় যে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করার আগেই হুগলী জেলায় যে ক' বছর ছিলেন সেই ক' বছরই সতীদাহের মর্মান্তিক বীভৎসতা স্বচক্ষে দেখবার অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল।

সতীদাহ বন্ধ করার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আর একটি প্রশ্ন, অর্থাৎ অসহায় বিধবাদের সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নটি সমাধান করবার সময় পান নি রামমোহন। মৃত্যু তাকে অপহরণ করেছিল।

সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদে রামমোহন রায়ের ভূমিকার মূল্যায়ণে বিতর্কের প্রশ্ন নেই—কিন্তু প্রশ্ন একটাই—সহমরণ আইনত বন্ধ হলেও এর মূল উৎপাটিত হয়েছে কি? বাস্তবে হয় নি যেহেতু এর জ্বলন্ত নজীর আমরা বিংশ শতাব্দীতে বেশ কয়টি পেয়েছি।

ভারতীয় জনমত আজ দ্বিধাবিভক্ত। সৌভাগ্যের বিষয় হল সতী হলে বাধা দিতে নারাজ এই মনোভাবসম্পন্ন মানুষেরা নগণ্য হয়ে পড়েছে। এরা নগণ্য হলেও সতীর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা বা সতীর মহিমা প্রচার করাকে ধর্মে হস্তক্ষেপের নামান্তর বলতে চাইছে। অর্থাৎ সতী হওয়াকে এই নির্দিষ্ট-

সংখ্যক মানুষেরা ধর্মের অঙ্গীভূত করে একে অধিকারের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছে। এই প্রবণতাটি দেশের ও সমাজের পক্ষে মারাত্মক ও বিপজ্জনক বলা যেতে পারে। এই দুর্ভাগ্যজনক ও উদ্বেগপূর্ণ সমাজ-পরিবেশে যে-কোন আশার ইশারা নেই এমন বলা যায় না। ভারতের সাধারণ শিক্ষিত মানুষ এই প্রথার বিপক্ষে অভিমত প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁরা রূপ কানোয়ারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রত্যাশা করেন না। মহিলাদের নানা সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এগিয়ে এসেছে সংবাদপত্রসমূহ, সমাজসেবী সংস্থাগুলো, বিভিন্ন জীবিকার অন্তর্গত নানাশ্রেণীর মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলো। নতুনতর প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সক্রিয় ভূমিকাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করবার মত।

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সকলেই জানি যে আইন করে সামাজিক ব্যাধি দূর করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে পণপ্রথার কথা বলা যেতে পারে। আইন করে এ প্রথা নির্মূল করা সম্ভব হয় নি। 'সতী' প্রথার ক্ষেত্রেও আইন রক্ষাকবচ হয়ে উঠতে পারে নি। আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য কয়েকটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, আইনের কঠোরতম প্রয়োগ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা বিশেষ জরুরী। এরজন্য প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও সক্রিয়তা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার সম্প্রসারণ এই সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণের সহায়ক হতে পারে ; কেননা শিক্ষা বয়ে আনবে মানসিক মুক্তি। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ ব্যাপারে বারবার সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে সামাজিক এই ব্যাধির মূল উৎপাদনের মূল অস্ত্রই হল শিক্ষা। তৃতীয়ত, জনমত জাগ্রত করবার জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে এবং জনসাধারণকে সতীপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অংশীদার করতে হবে। চতুর্থত, শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপর নির্ভর করলে চলবে না, সামাজিক শিক্ষার দ্বারা নারীর আত্মমর্যাদা বোধের উন্মেষ ঘটানোর প্রচেষ্টাও প্রয়োজন। পঞ্চমত, বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে নারীর স্বনির্ভরতার সংস্থান রাখার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। রাষ্ট্রীয় মূল স্রোতের সঙ্গে নারীর অধিকার ও অস্তিত্বকে মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। সমগ্র সমাজপরিবেশে নারীর মর্যাদা ও মূল্য সম্পর্কে বোধ ও চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। সমগ্র জনসংখ্যা থেকে নারীসমাজকে নিবিক্ত করে পূর্ণতর সমাজ গঠনের কল্পনা শুধু অবাস্তব নয় তা প্রগতির পরিপন্থী। যে সমাজ নারীর মর্যাদাকে অস্বীকার করে সে সমাজ উন্নত হতে পারে না।

রাজা রামমোহনের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার দায় এখন সমগ্র ভারতবাসীর।

সূত্রনির্দেশ

১ সতী, স্বপন বসু, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৮২, কলকাতা, পৃ ৩

২ ভারত ইতিহাসে নারী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা ; "প্রাচীন ভারতে নারী", সুকুমারী ভট্টাচার্য, পৃ ১, ২, ৮, ৯

৩ History of the Dharmasastra, P. V. Kane, Vol II, Part 1, পৃ ৬২৫

৪ Position of Women in Hindu Civilisation, A. S. Altekar, 1956, পৃ ১১৬

৫ The Wonder that was India, A. L. Basham, Orient Longman, 1963, পৃ ১৮৭

৬ সতীদাহ ভারতের কলঙ্ক, রঞ্জনা মুখোপাধ্যায়, দেশ, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃ ৪২

৭ The Position of Women in Hindu Clvilisation, A. S. Altekar, 1956, পৃ ১২৩

৮ ঐ, ১২৬-২৭

৯ ঐ, ১২৮

১০ A Note on Sati in Medieval India, সুশীল চৌধুরী, Proceedings of the History Congress, রাঁচি, ১৯৬৪, খণ্ড ২ ও ৩, পৃ ৮০ ৮২

১১ ঐ, পৃ ৮৩

১২ সতী, স্বপন বসু, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৮২, কলকাতা, পৃ ৪৯

১৩ বাংলায় সতীদাহ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ণ, বিনয় ভূষণ রায়, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ ৪৯, ৫২

১৪ হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, সুধীর মিত্র, প্রথম খণ্ড, পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় মিত্রাণী সংস্করণ, ১৯৬২, কলকাতা, পৃ ১৯৯

১৫ সতী, স্বপন বসু, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৮২, কলকাতা, পৃ ৬২

১৬ হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, সুধীর মিত্র, প্রথম খণ্ড, পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় মিত্রাণী সংস্করণ, ১৯৬২, কলকাতা, পৃ ২০১

১৭ ঐ, পৃ ১৯৯

১৮ সতীদাহ, গোরাচাঁদ মিত্র, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৮৪, কলকাতা, পৃ ২৯-৩১

১৯ হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, সুধীর মিত্র, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬২, কলকাতা, পৃ ২০৯

২০ বিদ্যাসাগর, বাংলা শব্দের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি, [কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা], রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৩৭৬, প্রকাশক, সুরজিৎচন্দ্র দাস, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা ১৩, পৃ ১২৮, ১২৯

পানীয় জল ঃ পশ্চিমবঙ্গের কারখানা ও বিদেশী সরকার

মৃণালকুমার বসু

জলই জীবন এ কথা যেমন সর্বজনগ্রাহ্য সত্য তেমনি এ কথাও সত্য যে পানীয় জল সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা মোটামুটি সাম্প্রতিককালেই তৈরী হয়েছে। জলের গুরুত্ব অসীম হলেও পানীয় জলের উৎসের প্রতি উদাসীনতা এমনকি চরম অবহেলা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। পরস্পরবিরোধী মানসিকতা শুধু ঊনিশ শতকের ব্যাপার তা নয় আজও পানীয় জল ও তার উৎসের প্রতি আচরণ মোটামুটি অপরিবর্তিত। নদীমাতৃক বাংলার বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাতীরবর্তী এলাকায় জলের সহজলভ্যতা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কোনও পক্ষকেই এর গুরুত্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত করে নি। জলের পরিশুদ্ধতা সম্পর্কে আধুনিক ধারণা বিদেশীদের কাছ থেকে পাওয়া হলেও ঔপনিবেশিক আমলে সমাজের সামান্য অংশকেই স্পর্শ করেছিল। পানীয় জলের গুরুত্ব বিষয়ে কলকাতা ছাউনি এলাকা ও গঙ্গাতীরবর্তী কারখানা কর্তৃপক্ষের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

পুণ্যসলিলা গঙ্গার জলই পানীয় জলের প্রধান উৎস তাই নয় গঙ্গার জল সহজে নষ্ট হয় না বলে এর বিশুদ্ধতা বজায় রাখার সচেতন প্রয়াস ছিল না। ঊনিশ শতকের দুটো উদাহরণ দিলে তখনকার বড়লোক ও শিক্ষিত বাঙালীর পানীয় জলের সঞ্চয়ের ব্যাপারটা সহজে বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পৈতৃক জোড়াসাঁকো বাড়িতে জল রাখার বন্দোবস্তের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরই সমসাময়িক নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসুর বর্ণনা অনেক বিস্তৃত। এ বিষয়ে তিনি লিখছেন, "পানীয় জল সঞ্চয় করবার প্রশস্ত সময় ছিল, মাঘ মাস। ঐ সময় গঙ্গার জল অতি পরিস্কার ও সুস্বাদু হয় ;...বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দশমীর দিন গৃহস্থেরা খালি জালা আবার পূর্ণ করিয়া নিতেন।...ভারীর মেজাজ সেদিন জোর ভারী। তিন পয়সা পর্যন্ত ভারের দর উঠে পড়ত। এই জল বৎসরাবধি থাকলেও কোনরূপ নষ্ট হত না—একটা পোকাও দেখা দিত

ইতিহাস বিভাগ, শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ

না···পেট ফাঁপলে বা প্রস্রাব বন্ধ হলে জালার তলার পাঁক একটু তলপেটে লাগিয়ে দিলে অল্পক্ষণেই উপশম হত"···।[১] বর্ণনা থেকে গঙ্গাজলের দুটি চরিত্রের কথা জানা যাচ্ছে। এক, দীর্ঘদিন ব্যবহারযোগ্যতা; দুই, এর রোগহরণ ক্ষমতা। তখন দু-একটি কারখানা গড়ে উঠলেও ব্যাপকভাবে গঙ্গাতীরের শিল্পায়ন ঘটে নি। বিশ শতকের গোড়ায় ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে গেলেও পানীয় জলের উৎস সম্পর্কিত ধারণার ব্যাপক রদবদল ঘটে নি।

এ যুগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরের পুরসভা গড়ে উঠলেও পুরকর্তৃপক্ষদের পক্ষে সবক্ষেত্রে পরিস্রুত পানীয় জল দেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। আর্থিক ক্ষমতাও যেমন ছিল না তেমনি চাহিদাও ছিল না। এর উপরে জলের উৎসকে শুদ্ধ রাখার চেষ্টাও ছিল না। কিন্তু গোটা ঊনিশ শতক জুড়ে এমনকি তার পরে ব্যাপক মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঔপনিবেশিক সরকারকে চিন্তাগ্রস্ত করেছিল। ফলে, ঔপনিবেশিক সরকার ছাউনি এলাকায় অবস্থার উন্নতির জন্য উঠে পড়ে লাগেন। ব্যাপক পরিবর্তন না হলেও অবস্থা বদলাতে শুরু করে। অন্যদিকে দেশী সমাজের উপর রদবদলের হাওয়া তেমন লাগে নি। না লাগার কারণও যথেষ্ট ছিল। নদীর দু'ধারে শ্মশান থাকায় সহজেই নদীর জল দূষিত হত। সব শহরের নোংরা নর্দমার জল নদীতেই ফেলা হত। এর উপরে সেদিনের সস্তাগণ্ডার যুগেও বেশীর ভাগ লোকেরই দাহ করার মত উপযুক্ত পয়সা না থাকায় মৃতদেহ নদীতে ফেলে দেওয়া হত। জোয়ার ভাটার টানে সে সব মৃতদেহ গঙ্গায় ভেসে বেড়াত। খোদ কলকাতাতেই এটা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ফলে অন্য শহরের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি হালিশহরের কাছে মল্লিকবাগে যমুনা নদীতে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হত যাতে সহজে সেগুলো গঙ্গায় যেতে পারে।[২] মৃতের আত্মার পক্ষে ব্যবস্থাটা ভাল হলেও জীবিত মানুষের পক্ষে ব্যাপারটা সুবিধের ছিল না। এ নিয়মের কোনও পরিবর্তন শতাব্দীর শেষের দিকে বিশেষত শ্রীরামপুর থেকে হাওড়ার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নি। এ সময়ে শ্রীরামপুরের এক মহকুমা শাসক নিয়মিত গঙ্গায় শব দেখেছেন। ফলে পানীয় জল হিসেবে গঙ্গাজলের উপর সাহেবের কোনও আকর্ষণ ছিল না। গড়পড়তা শিক্ষিত বাঙালী ও শিক্ষিত ইংরেজদের ধারণা এ ব্যাপারে একেবারেই আলাদা রকমের। জল যেখানে সুলভ সেখানে দূষণের এত রকমের ঝামেলা ফলে দূরের অবস্থা ছিল অনেক খারাপ।

মনে রাখা দরকার কলকাতা-হাওড়াতেও জীবনচর্চার ধারা গ্রামজীবন থেকে একেবারে আলাদা ছিল না। তবুও নতুন ধারণা ক্রমশ ছড়াচ্ছিল। যেখানে

জলের অভাব সেসব এলাকায় সমস্যা অনেক জটিল। এর উপরে শহরগুলোর বাসিন্দাদের মানসিকতাও বড় বাধা ছিল। শহরে বসবাসকারী ভদ্রলোকেরা তাঁদের গ্রামের বাড়িকেই আসল ঠিকানা বলে মনে করতেন। শহরে বসবাস সত্ত্বেও শহরের প্রতি মমত্ববোধ ও একাত্মবোধ তাই কম। বিখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর শ্বশুরমশায় দু'জনেই বাঁকুড়ার বাসিন্দা। রামানন্দবাবুর কর্মস্থল এলাহাবাদ। সে সময়ে তাঁর শ্বশুরমশায় বাঁকুড়াতে মাটির বাড়িতে বাস করতেন কিন্তু ও'দা গ্রামে তাঁর পাকা বাড়ি ছিল।[৩] ঊনিশ শতকের শেষে ও বর্তমান শতকের গোড়ায় বাঁকুড়া বেশ পরিষ্কার শহর কিন্তু কলের জল নেই। কলকাতার মতই শহরের লোক পুকুরের কিম্বা কূয়োর জলে কাজকর্ম সারত। কিন্তু পানীয় জলের জন্য নির্ভর করত গন্ধেশ্বরী বা গোঁদাই নদীর জলের উপর। কিন্তু সারা বছর নদীতে জল থাকে না। তাই নদীর বালি খুঁড়ে পেতলের ঘড়ার মুখে কাপড় লাগিয়ে জল ছেঁকে সেই জল খাবার জন্য বাড়িতে নিয়ে যেত। শ্রমসাধ্য এই কাজটি মেয়েদেরই জন্য নির্দিষ্ট ছিল। রামানন্দবাবুর বাড়িতেও এভাবেই জল আসত।[৪]

পানীয় জলকে ব্যবহারযোগ্য রাখার বড় শত্রু ছিল চাষের কাজ। চাষীর কাছে ভাল পানীয় জলের চেয়ে অনেক বেশী দরকার চাষের জল। শ্রীরামপুর মহকুমাতে যখন ইডেন খালের জল সরস্বতীতে ছাড়ার ব্যবস্থা হল তখন পানীয় জলের সুবিধার কথা সরকারের মাথায় ছিল। কিন্তু চাষীরা সাগ্রহে এগিয়ে এল বহতা স্রোতের জলে তাদের পাট কেচে পরিষ্কার করতে।[৫] সুপেয় পানীয় জল নয় চাষের আয় অনেক বেশী দরকারী।

শুধু তাই নয়, জীবনযাত্রার পরিচিত ছকে সামান্যতম পরিবর্তন করার অনিচ্ছা পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবহার পথে মস্ত বাধা। এ ব্যাপারটা শিল্পাঞ্চলের তুলনায় বাইরেই বেশী স্পষ্ট। ঊনিশ শতকের শেষে বর্ধমান শহরে কলের ব্যবস্থা চালু হলে তখনকার বর্ধমানের উকিল ও হিন্দু রক্ষণশীলতার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি বাংলা সাহিত্যে পঞ্চানন্দ বা পাঁচু ঠাকুর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি এসব সাহেবী ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল বহু বিশাল পুষ্করিনী বা সায়র শোভিত বর্ধমানে কলের জলের প্রয়োজনীয়তা নেই। শিক্ষিত বা অশিক্ষিতের তফাৎ নয় মানসিকতার দিকটা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জোরালো বাধা ছিল।[৬]

সামরিক ছাউনি এলাকায় ও কলকাতার কাছাকাছি শহরগুলোর যেখানে ঔপনিবেশিক স্বার্থে কারখানা তৈরী হয়েছিল সেখানে পরিশ্রুত পানীয় জলের

প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল। সাম্রাজ্য রক্ষা ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির অগ্রাধিকার ছিল। তাই কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম বা ব্যারাকপুরের সামরিক ছাউনিতে জলের সুব্যবস্থা হয়েছে অনেক আগে। সাধারণ শহরের তুলনায় এখানের অবস্থা অনেক ভাল। ছোট শহরের পুরসভা আবার যেসব ছিটেফোঁটা সুবিধে দিত গ্রামে সে-সব ভাবাই যেত না। পানীয় জলের ব্যবস্থা অথবা পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার পরিবর্তন মহামারীতে মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে খুবই দরকারী ছিল। এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বিস্তৃত তথ্য পাওয়া খুবই শক্ত। তবুও হাওড়া-হুগলীর বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করে স্বাস্থ্যদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি দেখিয়েছিলেন যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘনবসতিপূর্ণ শহর-কারখানা এলাকায় মহামারীর আক্রমণ সাংঘাতিক হতে পারে যেমন ঠিকই তেমনি এখানেই সঠিক ব্যবস্থার ফলে উন্নতির সম্ভাবনা খুবই বেশী। ১৯০১-১৯৩২ সালে হুগলীর গ্রাম্য এলাকা খানাকুলে গড়পড়তা কলেরায় মৃত্যু হাজারে ৩·২১ জন। কিন্তু কারখানা অধ্যুষিত শ্রীরামপুর-ভদ্রেশ্বরে ১·৯৪ জন। কিন্তু ১৯৩৪-৩৫ সালে খানাকুল এলাকায় সংখ্যাটা কমে দাঁড়ায় ২·৩১ জনে অথচ শ্রীরামপুর-ভদ্রেশ্বরে মাত্র ০·১১ জনে।[৭] স্বায়ত্ত-শাসনের সুবিধে পেয়েছিল কারখানা ও ছাউনি এলাকা, অন্য শহরে যেমন বর্ধমান বা হুগলী-চুঁচুড়াতে আধুনিক জীবনের সুযোগসুবিধে এসেছিল মূলত স্থানীয় ধনীদের বদান্যতায়। দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে বিপুল ব্যয়ে এ সুযোগ পাওয়া সহজ ছিল না।

কারখানা এলাকাগুলোতেও সহজে আধুনিক পুরজীবনের সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হয় নি। তবুও অন্য জায়গার তুলনায় অনেক বেশী সুবিধে ছিল। বিদেশী আমলাদের আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সস্নেহ প্রশ্রয় অবস্থার পরিবর্তনে সহায়তা করে। উনিশ শতকের শেষের দিকে যখন গঙ্গার নাব্যতা এখনকার চেয়ে অনেক বেশী তখনও সাহেব আমলাদের কাছে গঙ্গার জল আদর্শ পানীয় ছিল না। শ্রীরামপুরের এক মহকুমা শাসকের কাছে সিকি মাইল চওড়া গঙ্গাকে দূষিত স্রোত বলে মনে হত।[৮] দ্রুত বেড়ে ওঠা শ্রীরামপুর শহরে পানীয় জলের ব্যবস্থাও নতুন পয়ঃপ্রণালী তৈরী করা খুবই জরুরী। ১৮৮১-১৮৯১ সালের মধ্যে শ্রীরামপুরের লোকসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৪০ ভাগ পরের দশ বছরে বেড়েছে চব্বিশ ভাগ।[৯] বিশ শতকের গোড়াতেও সরকার পয়ঃপ্রণালী তৈরী করার কথা বললেও পুরসভার পক্ষে অর্থভাবের জন্য কিছু করা সম্ভব হয় নি।[১০] শুধু পানীয় জলের ব্যবস্থা করাই কঠিন কাজ।

তবুও কারখানা এলাকাতে সক্রিয় তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। শ্রীরামপুর পুরসভা শহরের মানুষের পানীয় জলের জন্য কয়েকটি পুকুরকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। এর উপরে স্থানীয় পাটকলের কর্তৃপক্ষের সহায়তায় পরিশ্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য নির্দিষ্ট পুকুরগুলোয় পাটকলের বয়লারের ফোটানো জল ঢালা হত।[১১] অবশ্য সাধারণ মানুষের জন্য ব্যবস্থাটা পর্যাপ্ত মনে হলেও পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। শ্রীরামপুরের মহাকুমা শাসক জল ফুটিয়ে খেতেন। দূষণমুক্ত পানীয় জলের জন্য এতটা বাড়াবাড়ি সাহেবের দেশী চাপরাশীদের চোখে ক্ষ্যাপামো বলে মনে হত।[১২] কলকাতার দুঃস্থ প্রতিবেশী হাওড়া শহরের পানীয় জলের ব্যবস্থা শ্রীরামপুরের চেয়ে মোটেও ভাল নয়। সেখানে পানীয় জলের উৎস গঙ্গার ঘোলা জল ও পুকুরের জল। ফলে মহকুমা শাসক হিসেবে কারস্টেয়ার্স প্রতিদিন লোক পাঠিয়ে কলকাতা থেকে কলের জল সংগ্রহ করতেন।[১৩] মনে রাখতে হবে তখন হাওড়া পুরসভার নিজের বাড়ি, জঞ্জাল পরিষ্কার করার ট্রাম এমনকি বেতনভুক সম্পাদক ছিল।

বিশ শতকে বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পানীয় জল ও পয়ঃ-প্রণালী ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। জলের কলের সূত্রপাত কলকাতায় ঘটে তবু পুরোনো অভ্যাস সহজে বদলায় নি। তবু কলকাতা-হাওড়া ও কারখানা এলাকাগুলোয় পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রসারিত হয়। কলকাতা পুরসভা পানীয় জল সংগ্রহ করতেন কলকাতা থেকে দূরে পলতায়। একমাত্র কারণ ইংরেজদের কাছে এখানের জল যথেষ্ট ভাল নয়। বিশেষভাবে এর দ্বারা শিক্ষিত গড়পড়তা ভারতীয় ও ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য চোখে পড়ে। কলকাতা, হাওড়ায় জলের ব্যবস্থা চালু হওয়ায় কাছাকাছি পুর-সভাগুলো উপকৃত হয়েছিল। কাশীপুর-চিৎপুর, মানিকতলা, গার্ডেনরিচ ও সাউথ সুবার্বান পুরসভা পানীয় জল পেত কলকাতা থেকে। আবার কামারহাটি পুরসভা জল পেত কাশীপুর-চিৎপুর থেকে। কারখানা কর্তৃপক্ষ বিশেষত পাটকল ও রেল কর্তৃপক্ষের কাছেও স্থানীয় কিছু মানুষ পানীয় জলের জন্য নির্ভরশীল ছিলেন। কাঁচরাপাড়ার কিছু মানুষ পানীয় জল পেতেন রেল কর্তৃপক্ষের (কাছ থেকে)।[১৪] পাটকল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার জাল কম ছড়ানো নয়। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের রিষড়া, শ্রীরামপুর, কোন্নগর, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানী এলাকার বহু মানুষ জল পেতেন পাটকলের কাছ থেকে। ঠিক তেমনি পূর্বতীরে বরানগরের লোকে জল নিতেন পাটকলের থেকে। টিটাগড়, গারুলিয়া, ভাটপাড়া ও নৈহাটি শহরের অনেকেই জল পেতেন

বিনা পয়সায় পাটকল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। অবশ্য এর ফলে কারখানা কর্তৃপক্ষের ঔদার্যের চেহারার সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে তাদের আধিপত্যের দিকটাও। নিজেদের এলাকার পুরসভাগুলোর উপর কারখানা কর্তৃপক্ষের সবল আধিপত্য দাবিয়ে রেখেছিল পুরকর্তাদের।

কলকাতা থেকে দূরে পানীয় জল সংগ্রহ করার ফলে নিরাপদ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়েছিল ভাবা ঠিক নয়। হাওড়া পুরসভা পানীয় জল সংগ্রহ করতেন শ্রীরামপুর থেকে। কিন্তু কলকাতা থেকে দূরে হলেও ঘন-বসতি, কারখানার উপস্থিতি, দারিদ্র্য-অপরিচ্ছন্নতার নিবিড় যোগাযোগ ও কুঅভ্যাস হাওড়া পুরসভার দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। হাওড়ার পানীয় জলের মান নীচুস্তরের। অবস্থার উন্নতি করার জন্য হাওড়া পুরসভা স্যানিটারী কমিশনারের দ্বারস্থ হন। তিনি শ্রীরামপুর এলাকা বিশেষত গঙ্গার ধার সরেজমিনে পরীক্ষা করেন। শ্রীরামপুর পুরসভা নিজেদের জলের কলের সুব্যবস্থা করতে অক্ষম কিন্তু হাওড়া পুরসভাকে সবরকম সুবিধা দিতে বাধ্য কেননা সরকারী মহলে হাওড়ার প্রতিপত্তি শ্রীরামপুরের তুলনায় অনেক বেশী। স্যানিটারী কমিশনার তদন্ত করে দেখলেন যে হাওড়া পুরসভা শ্রীরামপুরের গঙ্গার যে অংশ থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে সেখানেই শ্রীরাম-পুরের নর্দমার জল গঙ্গায় পড়ে। শুধু তাই নয়, গঙ্গানদীতীরই সকলের নিত্যকর্মের স্থান। পদস্থ সরকারী আমলার উষ্মার যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি জানালেন যে পুলিশ দিয়ে এসব বন্ধ করা দরকার। বক্তব্য সঠিক, কিন্তু দেশীয় মানুষ বিশেষত কারখানা শ্রমিকদের জন্য পাল্টা ব্যবস্থা করা অনেক কঠিন কাজ। তাছাড়া তিনি শ্রীরামপুর পুরসভার নিকাশী ব্যবস্থা রদ-বদলের পরামর্শ দিলেন। নর্দমার জল গঙ্গায় না ফেলে শ্রীরামপুরের উল্টো-দিকে ডানকুনির বিস্তীর্ণ জলাভূমি এলাকায় ফেলে দেওয়াই সঠিক। অবশ্য যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য বিশেষত শক্তিশালী হাওড়ার পুরকর্তৃপক্ষের দাবীকে সোজাসুজি অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। শ্রীরামপুর পুরসভা এসব সমালোচনা বিবেচনা করে দোষ স্বীকার করে নেন। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্তৃপক্ষকে তাঁরা জানিয়ে দেন যে নিকাশী ব্যবস্থার পরিবর্তন করা তাঁদের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে অসম্ভব। পানীয় জলের ব্যবস্থা করতেই পুরসভা জেরবার। অবশ্য সরকারী অনুদান পেলে কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে। কর্তৃপক্ষ শ্রীরামপুরের বক্তব্য সঠিক বলে মেনে নিলেন।[১৫]

সহজেই বলা যায় যে, পুরপ্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পুরজীবনের সুযোগসুবিধা দেওয়া সম্ভব হয় নি। কলকাতার আশেপাশে

বিশেষত ছোট কারখানা শহরে পানীয় জলের জন্য যেটুকু উদ্যোগ নেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল শিল্পবঞ্চিত পুরসভাগুলোতে সেটুকু সুবিধা দেওয়ায় সম্ভব হয় নি। পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও অগ্রগতি ছিল যথেষ্ট মন্থর। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা নিজেদের স্বার্থরক্ষায় যতটা তৎপর জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে তার ভগ্নাংশ মাত্র করতেও উৎসাহী নয়। তবুও ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে তাদের ধ্যানধারণা প্রভাবিত করেছিল এ দেশের মানুষদের। তবু দারিদ্র্য, কুশিক্ষা ও প্রথাগত জীবনচর্যার ধারা সহজে বদলে যায় নি।

সূত্রনির্দেশ

১ অমৃতলাল বসু, পুরাতন পঞ্জিকা, মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৩০, পৃ ৬৮৯

২ ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৪৬, ভল্যুম ২, পৃ ৪০৭

৩ শান্তা দেবী, পূর্বস্মৃতি, কলকাতা, ১৯৮৩ পৃ ২০

৪ ঐ, পৃ ২৬-২৭

৫ রবার্ট কারস্টেয়ার্স, লিটল ওয়ার্ল্ড, লণ্ডন, ১৯১২, পৃ ১৫১

৬ ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, পৃ ৪৬৫

৭ জি. এল. বাটরা, হেলথ বুক · হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট, পৃ ৪৩

৮ কারস্টেয়ার্স, ঐ, পৃ ১৫২

৯ সেন্সাস, ১৯০১, পৃ ২৮

১০ মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেণ্ট, ডিসেম্বর, ১৯১৩, প্রসিডিংস বি, নং ১২৫-১২৬, পঃ বঙ্গ লেখ্যাগার

১১ কারস্টেয়ার্স, ঐ, পৃ ১৫২

১২ ঐ, পৃ ১৫৩

১৩ ঐ, পৃ ২০২

১৪ মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেণ্ট, ডিসেম্বর, ১৯১৯, প্রসিডিংস বি, নং ৩৫৪-৩৫৯, পঃ বঙ্গ লেখ্যাগার

১৫ ঐ, ডিসেম্বর ১৯১৩, প্রসিডিংস বি, নং ১২৫-১২৬, পঃ বঙ্গ লেখ্যাগার

ঔপনিবেশিক যুগে সাঁওতাল সংস্কৃতির উপর হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবের রূপ

সংহিতা চক্রবর্তী

যে অঞ্চলের সাঁওতাল আদিবাসীদের সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি সেখানে তাদের প্রতিবেশীরা ছিল মূলত হিন্দুসমাজভুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। যদিও দুটি ভিন্ন সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যবাহী সমাজ যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ঘটে থাকে, ভারতবর্ষে সাধারণত দেখা গেছে যে তথাকথিত, নিম্নতর সংস্কৃতিবাহী গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত উচ্চতর সংস্কৃতির ধারক ও বাহক গোষ্ঠীর ধ্যানধারণা ও আদর্শ অনুকরণ করেছে। কিভাবে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের সংস্কৃতি থেকে সাঁওতালরা বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করেছে এটিই হল আমার আলোচ্য বিষয়। হিন্দু-সংস্কৃতির উপর সাঁওতাল-সংস্কৃতির প্রভাব নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করব না।

কেবলমাত্র পূর্বভারতে নয়, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও আদিবাসীদের দ্বারা হিন্দু-সংস্কৃতি থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। এই নিয়ে বিদগ্ধজন ইতিপূর্বে বহু আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে David Hardiman-এর নাম করা যায়। তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল দক্ষিণ গুজরাটের 'দেবী আন্দোলন'।[১] ঔপনিবেশিক যুগে বাংলা ও বিহারের সাঁওতাল আদিবাসীরা কিভাবে হিন্দু সংস্কৃতি থেকে বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করেছিল এর মধ্যেই এই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে এবং আমি প্রধানত দুটি প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করব।

প্রথমত, কেন এই সাঁওতালরা হিন্দু-সংস্কৃতি থেকে কোন কোন উপাদান গ্রহণ করেছিল? দ্বিতীয়ত, বৃহত্তর হিন্দু-সমাজ থেকে সাংস্কৃতিক উপাদান

গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াটিকে কি শ্রদ্ধেয় নির্মলকুমার বসু কথিত 'হিন্দুধর্মের আদিবাসী আত্মীকরণ প্রক্রিয়া' বলে অভিহিত করা যায় ?

এই প্রশ্ন দুটির উত্তর খুঁজতে গেলে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আদিবাসী সমাজের মধ্যে যারা সর্দারস্থানীয় তারা কিন্তু সাংস্কৃতিক উপাদান-গুলি গ্রহণ করেছিল। আমি এখানে সাঁওতাল সমাজের সাধারণ মানুষ কেন সচেতনভাবে হিন্দু সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি গ্রহণ করেছিল সে-কথাই আলোচনা করব।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে সাঁওতালরা কেন প্রধানত হিন্দু সংস্কৃতির দ্বারস্থ হল ? ইসলাম অথবা 'খ্রীষ্টধর্মের' প্রতি তারা আকৃষ্ট হল না কেন ? এর কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে ইসলাম ধর্ম আদিবাসীদের এমনভাবে প্রভাবান্বিত করে থাকে যে তাদের প্রাচীন রীতিনীতির আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এক কথায় তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি হারিয়ে ফেলে তারা এই ধর্মের নিয়মকানুনের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে নিজ-স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেয়। অপরদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মে জোর করে ধর্মান্তরিত করার প্রবণতা নেই বললেই চলে। এই ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কাজ করে যদিও শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত আদিবাসীরা আদিম রীতিনীতি ত্যাগ করে অথবা সেগুলিকে 'ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত করে'। তাদের দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটলেও তারা মনে করে যে প্রকৃতপক্ষে কোন পরিবর্তনই ঘটে নি।[২]

দ্বিতীয়ত, যদিও সাঁওতালরা পাঁচশ' বছরের বেশী সময় ধরে মুসলমানদের সংস্পর্শে এসেছে তবুও তারা মুসলমানদের পছন্দ করত না। তারা মুসলমান-দের 'হীনতাসূচক' 'তুরুক' নামে অভিহিত করত। 'প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে মুসলমাদের "দুর্নীতিপূর্ণ ও অপবিত্র অঞ্চলে" বাসকালে তাদের পূর্বপুরুষেরা অত্যন্ত নির্যাতিত হয়েছিল। অতএব মুসলমান-সংস্পর্শ ত্যাগ করাই তাদের পক্ষে যুক্তিপূর্ণ।' সেই কারণে সাঁওতালদের সামনে মাত্র দুটি পথই খোলা ছিল—হিন্দুধর্ম অথবা খ্রীষ্টধর্মের শরণাপন্ন হওয়া।[৩]

এবার সাঁওতাল-জীবনে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে খ্রীষ্টান মিশনারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু সাঁওতাল-অধ্যুষিত অঞ্চলে খ্রীষ্টবর্ণের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে সাঁওতালরা সর্বপ্রথম প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরেই প্রকৃতপক্ষে সাঁওতালরা খ্রীষ্টান

মিশনারীদের কার্যকলাপের আওতায় আসে। এই সময়ে সাঁওতালরা অর্থ-নৈতিক এবং অন্যান্য কারণে অত্যন্ত দুঃখদুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। তারা ছিল স্থানীয় মহাজন ও জমিদারদের প্রায় কুক্ষিগত। এইসব ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান মিশনারীরা সাঁওতালদের সহায় হয়ে দাঁড়ান। তাঁরা সাঁওতালরা যাতে ন্যায়-বিচার পায় সেই বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন। এছাড়া সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতি এবং তাদের চিকিৎসা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মিশনারীদের দান উল্লেখযোগ্য।

খ্রীষ্টান মিশনারীদের এই সমস্ত জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের ফলে সাঁওতাল খ্রীষ্টান এবং অ-খ্রীষ্টান উভয়েরই অনেক উপকার সাধিত হয়। এরই ফলস্বরূপ সাঁওতালরা ধর্মান্তরিত হবার প্রেরণা পায়। অ-খ্রীষ্টান সাঁওতালরা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী সাঁওতালদের সন্তানসন্ততিরা মিশনারীদের শিক্ষা-গ্রহণের ফলে যে অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে সমর্থ হচ্ছে সেই সম্পর্কে সচেতন হয়। অতএব একথা বলা যায় যে মহাজন এবং জমিদারদের অত্যাচারেই সাঁওতালরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়। ইংরেজ সরকারের উপর ইউরোপীয় মিশনারীদের যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাও তাদের ধর্মান্তরিত হবার একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৪]

কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে মুষ্টিমেয় মিশনারী ও ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান-দের নিয়ে গঠিত সমাজটি কোন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত হতে পারে নি। Troisi[৫] দেখিয়েছেন যে যদিও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল-দের মধ্যে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল, তবুও কার্য-ক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক সাঁওতালই খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। অতএব তাদের ধর্মের উপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ছিল খুবই সীমিত। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Troisi প্রধানত প্রথম যুগের খ্রীষ্টান মিশনারীদের গোঁড়ামির কথা উল্লেখ করেছেন। সামগ্রিকভাবে এই কথা বলা যায় যে, 'খ্রীষ্টধর্ম অত্যন্ত নিয়মানুগ হওয়ায়' এটি সাঁওতালদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয়েছিল এবং তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধকে ক্ষুণ্ণ করে গোষ্ঠীবন্ধনকে শিথিল করে দিচ্ছিল। অতএব সাঁওতালসমাজে কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায় কারণ এর পরিণাম হত সাঁওতাল জীবনের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একক জীবনযাপন করা।

খ্রীষ্টধর্মের পাশাপাশি হিন্দুধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে যে এই ধর্ম অপেক্ষাকৃত উদার এবং এতে বিধিনিষেধের শাসনও ততটা নেই।

এটি সাঁওতালদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং রীতিনীতির স্বাতন্ত্র্য বজায়ের পক্ষে বাধার সৃষ্টি করে নি। হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাস এবং ক্রিয়া-কলাপ সাঁওতাল ধর্মের বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ না করেও বেশ খাপ খেয়ে যায়। এছাড়া 'লৌকিক' হিন্দুধর্মের প্রভাব যথেষ্টভাবে বিস্তারলাভ করায় সাঁওতালরা তাদের অজ্ঞাতেই এটি দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা রণজিৎ গুহের মতটি আলোচনা করতে পারি। রণজিৎ গুহ[৬] মনে করেন যে নিম্নবর্গের লোকেরা 'প্রচলিত ব্যবস্থার' পরিবর্তন ঘটাতে গিয়ে 'নেতিবাচক চেতনার' প্রতিফলন ঘটিয়েছে এবং যারা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল তাদের ক্ষমতাসূচক নিদর্শনগুলি ধ্বংস অথবা আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করেছে। তিনি মনে করেন যে ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল 'হুল' এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই মতবাদটি তর্কাতীত নয়। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক সুরেশ সিং[৭] এই মতটি সমর্থন করেন নি।

কোন বিশেষ মতকে পুরোপুরি সমর্থন না করেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতবর্ষের আদিবাসীরা তাদের প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলি দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হয়েছে এবং এই প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে হিন্দুগোষ্ঠীরই প্রাধান্য ছিল। অতএব স্বাভাবিকভাবেই সাঁওতালরা দীর্ঘসময় ধরে হিন্দুদের সংস্পর্শে বাস করায় 'সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভাষাগত এবং ধর্মীয়' ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দু-সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দুদের সঙ্গে এই সংসর্গ কোনরকম 'মূলগত পরিবর্তন' ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সাঁওতালদের 'খারোয়ার আন্দোলন'ই প্রকৃতপক্ষে তাদের হিন্দুধর্মের দিকে ঠেলে দেয়। এটি অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে 'খারোয়ার আন্দোলন' এমন সময় শুরু হয় যখন সাঁওতালদের দুঃখদুর্দশার আর সীমা ছিল না এবং আইনের সাহায্যে অথবা হাতিয়ার নিয়ে সংগ্রাম করে এই দুরবস্থার প্রতিকার করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৮] Troisi[৯] মনে করেন যে ১৮৫৫ সালের বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে সাঁওতালরা 'বোঙ্গাদের' ক্ষমতায় একেবারেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। ইতিপূর্বেই তাদের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখদুর্দশা ও নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে তারা অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য 'যে কোন পথ' অবলম্বন করতে আগ্রহী হয়েছিল। ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্ম এই তিনটি পথের মধ্যে তারা কেন প্রথম দুটিকে অবলম্বন করে নি তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। Troisi-র মতে[১০] 'সাঁওতালদের অবস্থা বিচার করলে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং অত্যন্ত সম্মানিত বৃহত্তর

হিন্দু সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি গ্রহণ করার যুক্তিটি বোঝা যায়।' তারা বিশ্বাস করত যে এর ফলে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, হিন্দুদের তুলনায় তাদের যে হীনতা তা হ্রাস পাবে এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। Martin Orans 'অত্যাচীরর রীতিনীতি' অনুসরণ করার ঘটনাটিকে বলেছেন "rank concession syndrome"। এর অর্থ 'সামাজিক-ভাবে হীনতা স্বীকার করে নেওয়া'।

সাঁওতালরা তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বৃহত্তর হিন্দু সমাজের রীতিনীতি অনুকরণ করে থাকতে পারে কিন্তু এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি হিন্দুদের তুলনায় তাদের সামাজিক হীনতা স্বীকার করে নেওয়ার পরিচায়ক কিনা এবিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে। আমি এখানে তাদের হিন্দু রীতিনীতি অনুকরণ করার দু'একটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করে আমি পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চেষ্টা করব।

খারোয়ার আন্দোলনটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সত্যিই সাঁওতালরা হিন্দুদের কাছ থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপকরণ সংগ্রহ করেছিল যেমনঃ 'সাঁওতাল দেবতা-গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন হিন্দু দেব দেবীর অনুপ্রবেশ', 'সাঁওতাল উৎসব-সূচীর মধ্যে "পট" ও "ছট" উৎসবের সংযোজন', 'কুক্কুট ও শূকরের মাংস বর্জন', 'মদ্যপান পরিত্যাগ', নিরামিষ আহার ও গঞ্জিকা সেবন, নিত্য 'শুদ্ধিস্নান' এবং 'উপবীত ধারণ'।[১১] 'একটি সংস্কৃত ধর্মের মাধ্যমে' সাঁওতালদের 'জাতীয় ঐক্য, পরিশুদ্ধি এবং আর্থিক উন্নতি' বাড়িয়ে তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নই ছিল খারোয়ার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।[১২] মালদহের জিতু সাঁওতালের আন্দোলনেও (১৯২৪-১৯৩২) আমরা একই-ভাবে হিন্দু সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রহণের প্রবৃত্তি দেখতে পাই।

'সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে'র এই জাতীয় উদাহরণগুলিকে নির্মলকুমার বসু 'হিন্দুধর্মের আদিবাসী আত্মীকরণ প্রক্রিয়া'র প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন।[১৩] এই মতবাদকে সঠিকভাবে বিচার না করলে আমি যে দুটি প্রশ্ন তুলেছি তার উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। এই প্রসঙ্গে এম. এন. শ্রীনিবাসের সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াটিরও আলোচনা করা কর্তব্য কারণ 'যথেষ্ট পার্থক্য' থাকা সত্ত্বেও এই দুটি ধারণার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিল লক্ষ্য করা যায়।[১৪]

সংক্ষেপে বলতে গেলে নির্মলকুমার বসু[১৫] মনে করেন যে হিন্দুসমাজে জাতিভেদ ব্যাপারটিকে যতটা অচল-অটল বলে মনে করা হয় আসলে তা নয়, আদিবাসী গোষ্ঠীরাও এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। তিনি দেখিয়েছেন

যে, হিন্দুসমাজে প্রত্যেক 'জাতি'র জন্য একটি বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত এবং সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল 'উত্তরাধিকারসূত্রে-প্রাপ্ত একচেটিয়া-অধিকার-ভুক্ত প্রতিযোগিতাশূণ্য ব্যবসায়িক সংঘ'। এই ব্যবস্থা সফল হওয়ার ফলে দরিদ্র আদিবাসী সম্প্রদায় সহজেই অপেক্ষাকৃত সার্থক উৎপাদন ব্যবস্থার আওতায় এসে পড়ত এবং দ্বিতীয়ত, হিন্দুসমাজের নীচুতলায় স্থান পাওয়া সত্ত্বেও কখনই বিদ্রোহের চিন্তা করে নি। বসু বলেছেন যে, যখনই কোন আদিবাসী সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যজাতির সংস্পর্শে এসে নির্দিষ্ট বৃত্তিধারী জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে তখনই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে উত্তরোত্তর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আদর্শে গড়ে নেবার প্রবল প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ তাঁর মতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নততর গোষ্ঠীর সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে থাকে।

এই মতটির পাশাপাশি সংস্কৃতায়ন সম্পর্কে এম. এন. শ্রীনিবাসের ধারণাটি আলোচনা করতে গেলে আমরা দেখতে পাব যে, তিনি তাঁর বিখ্যাত 'Social Change In Modern India'[১৬] গ্রন্থে বলেছেন যে, সংস্কৃতায়ন হচ্ছে 'এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা কোন "নিচু" হিন্দুজাতি, অথবা আদি-বাসীগোষ্ঠী বা অন্যান্য গোষ্ঠী উন্নততর কোন জাতি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, "দ্বিজাতি"কে অনুসরণ করে নিজ আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, আদর্শ এবং জীবনধারাকে পরিবর্তিত করে। সাধারণভাবে এই পরিবর্তনের ফলে তারা এতদিন পর্যন্ত স্থানীয় গোষ্ঠীতে তাদের যে স্থান ছিল তা অপেক্ষা জাতি-স্তরে উচ্চস্থানের দাবী করে থাকে। এই দাবী "পূর্ণ হবার" আগে বেশ কিছু সময়, প্রকৃতপক্ষে, এক বা দুই প্রজন্ম, কেটে যায়। কখনো বা কোন জাতি এমন স্থান দাবী করে থাকে যা তার প্রতিবেশীরা মেনে নিতে আপত্তি করে।'

নির্মলকুমার বসু এবং এম. এন. শ্রীনিবাস উভয়েরই মত কিন্তু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। সুরেন্দ্র মুন্সী[১৭] নির্মলকুমার বসু এবং এম. এন. শ্রীনিবাস উভয়েরই মতবাদের ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও আরও অনেকে তাঁদের মতবাদের সমালোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে সুরেশ সিংএর নাম করা যায়।[১৮] তিনি মনে করেন যে 'প্রকৃতপক্ষে আদিবাসীরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থার আওতায় এসে পড়েছিল।' তাঁর মতে তারা 'আদিবাসী-অঞ্চল পর্যন্ত, ক্রম-প্রসারিত এক ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি আরও মনে করেন যে 'এই আত্মীকরণ প্রক্রিয়ায় হিন্দুত্বের স্থান খুবই নগণ্য।' David Hardiman-ও[১৯] 'দেবী আন্দোলন' নিয়ে আলোচনা কালে এম. এন. শ্রীনিবাসের মতবাদের কিছু কিছু ত্রুটির উল্লেখ করেছেন

এবং Torisi[২০] বলেছেন যে বিভিন্ন আদিবাসী ধর্ম যে 'যথেষ্টভাবে হিন্দুধর্মে আত্মীভূত হয়েছিল' এই প্রসঙ্গে সংস্কৃতায়নের সূত্রটি প্রযোজ্য হলেও আদিবাসী ধর্মগুলি একেবারেই লোপ পেয়ে গিয়েছিল এটা কিন্তু অতিশয়োক্তি।

উপরোক্ত অভিমতগুলি আলোচনা করার পরেও কেন আদিবাসীরা হিন্দু সংস্কৃতি থেকে উপকরণ গ্রহণ করেছিল এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব রয়েই যায়। প্রকৃতপক্ষে আদিবাসীরা সচেতনভাবে বেছে বেছে হিন্দু-সংস্কৃতির কিছু কিছু উপকরণ গ্রহণ করেছে এবং নিজেদের পূর্বের ধর্মীয় রীতিনীতি ইত্যাদিও যথাসম্ভব বজায় রেখেছে।

উপরোক্ত প্রশ্নটির উত্তর আমি পূর্বেই দেবার চেষ্টা করেছি। এক কথায় বলতে গেলে, এই আচরণ ছিল তাদের সমাজের উপর নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতের ফলশ্রুতি। এই ঘাত-প্রতিঘাত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল অর্থনৈতিক কিন্তু এর সাংস্কৃতিক দিকটিকেও অস্বীকার করা যায় না। আদিবাসীরা উন্নততর সংস্কৃতির তুলনায় তাদের হীনতা ও পরাজয়ের জন্য তাদের অনুন্নত আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপকেই দায়ী করেছিল। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক যুগে তারা অত্যন্ত স্বল্পসময়ের মধ্যে নতুন নতুন শক্তির সম্মুখীন হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপকে সংস্কৃত করে বিভিন্ন প্রকার তাড়নার সম্মুখীন হবার শক্তি অর্জন করতে চেয়েছিল এবং নিজেদের মর্যাদাও বাড়াতে চেয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর আগেই কিছুটা পাওয়া গিয়েছে। নির্মলকুমার বসুর 'হিন্দুধর্মের আদিবাসী আত্মীকরণ প্রক্রিয়া'র দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আদিবাসীরা যে তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ বিসর্জন দিয়ে হিন্দুসমাজের জাতিভেদ-প্রথার অন্তর্ভুক্ত হতে উন্মুখ ছিল একথা এম. এন. শ্রীনিবাসের সংস্কৃতায়নের সূত্রটিও প্রমাণ করতে পারে নি। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাঁওতালদের আন্দোলনগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হিন্দুধর্মের আচার-ব্যবহার অথবা রীতিনীতি গ্রহণ করলেও সাঁওতাল-ধর্মের আপন বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষিত হয়েছে।[২১] অতএব একথা বলা যায় যে, সাঁওতালদের জীবন এবং সংস্কৃতির উপর হিন্দু প্রভাব খুবই শক্তিশালী ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তা কখনই তাদের স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। তাছাড়া ঔপনিবেশিক যুগে সাঁওতালদের সংস্কৃতির উপর হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবের রূপটি বিচার করতে গিয়ে হিন্দুধর্মের পাশাপাশি খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না, তেমনই অস্বীকার করা যায় না হিন্দুধর্মের উপর আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাবের বিষয়টি।

সুতরাং শত ঝঞ্ঝাবাতেও সাঁওতালরা তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করেছে হিন্দুসমাজের পাশাপাশি। তাদের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তারা চিরকালই সচেতন এবং এই সচেতনতাই রক্ষা করবে তাদের আপন সংস্কৃতিকে রক্ষাকবচের মত। তারা 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'[১২] কিন্তু হারিয়ে যাবে না কোনদিনই।

সূত্রনির্দেশ

১ David Hardiman, 'Adivasi Assertion in South Gujarat : the Devi Movement of 1922-3' in Ranajit Guha (ed.), "Subaltern Studies", Vol III, (Delhi, Oxford University Press, 1984)

২ H. H. Risley, Introductory Essay,—"Caste In Relation To Marriage", "The Tribes And Casts of Bengal", Vol I, (Firma K. L. Mukhapadhvay, Calcutta, 1981, Reprint)

৩ J. Troisi, "Tribal Religion : Religious Beliefs and Practices among the Santals", (Manohar Publications, First Published 1979), Chapter VII

৪ Ibid

৫ Ibid

৬ Ranajit Guha, "Elementary Aspects of Peasant Insurgency In Colonial India", (Delhi, Oxford University Press, 1983), Chapter 2, 'Negation'

৭ K. S. Singh, "Tribal Society In India : An Anthropo-historical Perspective", (Monohar, 1985), Chapter 7, p 150

৮ J. Troisi, 'Social Movements among the Santals' in M. S. A. Rao (ed.) "Social Movements In India", Vol II, Sectarian, Tribal and Women's Movements, Part I, Section II, (Monohar, 1979), Chapter 6

৯ J. Troisi, Tribal Religion, Chapter VII

১০ J. Troisi, 'Social Movements among the Santals' in M. S. A. Rao (ed.) "Social Movements In India", Vol II, Part I, Section II, Chapter 6

১১ Ibid, J. Troisi, "Tribal Religion", Chapter VII

১২ J. Troisi, 'Social Movements among the Santals' in M. S. A. Rao (ed.), "Social Movements In India", Vol II, Part I, Section II, Chapter 6

১৩ N. K. Bose, "Culture And Society In India", (Asia Publishing House, Bombay, First Edition 1977, Reprinted 1977), Chapter XII

১৪ Surendra Munshi, 'Tribal absorption and Sanskritisation in Hindu society' in "Contributions to Indian Sociology (N S)", Vol. 13, No 2, (1979)

১৫ N. K. Bose, "Culture And Society In India", Chapter XII

১৬ M. N. Srinivas, "Social Change In Modern India", (Allied Publishers, Bombay, (C) 1966), Chapter I

১৭ S. Munshi, 'Tribal absorption and Sanskritisation in Hindu society'

১৮ K. S. Singh, 'Colonial transformation of the tribal society in middle India', Occasional Papers on tribal development—22, (Ministry of Home Affairs, New Delhi, 1978)

১৯ David Hardiman, 'Adivasi Assertion in South Gujarat : the Devi Movement of 1922-3'

২০ J. Troisi, Tribal Religion, Chapter VII

২১ Ibid

২২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গীতাঞ্জলি', "রবীন্দ্র রচনাবলী", জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড-কবিতা, (পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮)

বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :

ক) Martin Orans, "The Santal : A tribe in Search of a Great Tradition", (Wayne State University Press, Detroit, 1965)

খ) Tanika Sarkar, 'Jitu Santal's Movement in Malda, 1924-1932 : A Study in Tribal Protest' in Ranajit Guha (ed.) "Subaltern Studies" IV, (Delhi, Oxford University Press, 1985)

* অপ্রকাশিত এম. ফিল্ গবেষণাপত্রের (১৯৮৫) অংশবিশেষ

উত্তরবঙ্গে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের গোড়ার কথা

সুবোধচন্দ্র দাস

ঊনিশ শতকের নবজাগরণ এবং সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠার পিছনে মুদ্রণযন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বঙ্গদেশ প্রসঙ্গে মুদ্রণযন্ত্রের ইতিহাস ও তার বিকাশ নিয়ে এ যাবৎ মূল্যবান যে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যেমন স্মরজিৎ চক্রবর্তীর 'দি বেঙ্গলী প্রেস' ও চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন' তাতে জেলা বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে মুদ্রণযন্ত্রের ভূমিকা মূল্যায়ণ নিয়ে কোন লেখা প্রকাশিত হয় নি। তাই এই প্রবন্ধে সমগ্র উত্তরবঙ্গের মুদ্রণযন্ত্রের বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর ভূমিকার মূল্যায়ণ করতে চেয়েছি মাত্র। বিষয়টি যেহেতু একেবারেই অনালোচিত তাই নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার ভিত্তিতেই বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। এতে শুধু মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের ইতিহাস ক্রমানুসারে পাওয়া যাবে। টেকনিক্যাল ব্যাখ্যা কিছু পাওয়া যাবে না।

উত্তরবঙ্গের প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি কখন, কোথায় স্থাপিত হয়েছিল তা স্পষ্ট করে বলা কঠিন। তবে এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে উত্তরবঙ্গের প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি ১৮৭০ সালে দার্জিলিং শহরে স্থাপিত হয়েছিল।[১] এই মুদ্রণযন্ত্রটি থেকে 'দার্জিলিং নিউজ' নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এই মুদ্রণযন্ত্রটিই ছিল উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম মুদ্রণযন্ত্র। উত্তর-বঙ্গের প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি কিন্তু ইংরাজী ছিল। কারণ 'দার্জিলিং নিউজ' ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। দার্জিলিঙের চা-করগণ এই পত্রিকার ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে উত্তরবঙ্গের প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্রটি কোথায় স্থাপিত হয়েছিল ?

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্রটি স্থাপিত হয়েছিল দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে।[২] এটি রাজ-সরকারের উদ্যোগে ১৮৭৫ সালে স্থাপিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই মুদ্রণযন্ত্রটি

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথমে বিভাগীয় শহর জলপাইগুড়িতে ১৮৬৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল। বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার জন্য অ-বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গের প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি স্থাপিত হয়েছিল মালদহ শহরে ১৮৮৮ সালে।[৩] এটির নাম ছিল কৃষ্ণকলী প্রেস। মালদহের প্রবাদপুরুষ জাতীয়তাবাদী নেতা, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী রাধেশচন্দ্র শেঠ এই মুদ্রণযন্ত্রটি স্থাপন করেছিলেন। দার্জিলিঙের চা-করদের ও কোচবিহার রাজ-সরকারের মুদ্রণযন্ত্র থেকে মালদহের রাধেশ শেঠ-এর কৃষ্ণকলী প্রেসটির উদ্দেশ্য, চরিত্র সবদিক থেকেই ভিন্নরূপ ছিল। চা-করেরা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ও মুনাফার জন্যই মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেছিলেন। কোচবিহার রাজ-সরকার সরকারী কাজকর্মের প্রয়োজনে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু রাধেশ শেঠ-এর উদ্দেশ্য ছিল মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করে, সাময়িক সংবাদ পত্রিকা প্রকাশ করে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটানো। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এই ছাপাখানাটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

বেসরকারী ও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গের প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি স্থাপিত হয়েছিল বিভাগীয় শহর জলপাইগুড়িতে ১৮৯৫ সালে।[৪] এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। এটির নাম ছিল 'জলপাইগুড়ি প্রেস'। ১৮৯৮ সালে মালদহে কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী ও বঙ্গলাল ঘোষের যৌথ মালিকানায় 'ধন্বন্তরী' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল।[৫] এই ছাপাখানা থেকে 'মালদহ সমাচার' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এই পত্রিকাটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমসাময়িক ছিল।

এই দশকেই দার্জিলিঙের আর্যসমাজ হিন্দী ভাষায় 'মাসিক সমাচার পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন।[৬] এই পত্রিকাটি কোথায় ছাপা হত তা জানা যায় না। দার্জিলিঙে ছাপা হয়ে থাকলে বলা যেতে পারে হিন্দী মুদ্রণযন্ত্রও উত্তরবঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল। নেপালী ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের গৌরব দার্জিলিঙের। ১৯০১ সালে দার্জিলিঙে একটি নেপালী মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।[৭] কারণ রেভারেণ্ড গঙ্গাপ্রসাদ প্রধানের সম্পাদনায় ১৯০৯ সালে 'গোর্খা খবর কাগজ' নামে একটি নেপালী সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এটি কোথা থেকে ছাপা হত জানা যায় না। তবে পত্রিকা ছাপা হলেই সেখানে মুদ্রণযন্ত্র ছিল এই অনুমান সঠিক নয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯১৪ সালে মালদহ জেলার কলিগ্রাম নামক গ্রাম থেকে 'গম্ভীরা' নামে একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এটি কিন্তু ছাপা হত কলকাতার 'মেটকাফে প্রিণ্টিং ওয়ার্কস'।[৮] তবে সাহিত্য পত্রিকা কলকাতা থেকে সম্ভব হলেও সংবাদ সাপ্তাহিক পত্রিকা

কলকাতা থেকে ছাপানো অসুবিধাজনক ছিল। কারণ হুকার সাহেব এর তথ্য থেকে জানা যায় কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যেতে সময় লাগত প্রায় ৯৮ ঘণ্টা।[৯] ইহাতেই বোঝা যায় যাতায়াতে সময় লাগত আট দিনের মত।

বিশ শতকের প্রথম দশকে এবং স্বদেশী আন্দোলন পর্বে স্বদেশী উদ্যোগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যৌথ কোম্পানীর ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গে বেশ কয়েকটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। ১৯০৫ সালে বালুরঘাটে 'বালুরঘাট ট্রেডিং প্রিন্টিং ওয়ার্কস' নামে একটি প্রেস স্থাপিত হয়েছিল।[১০] প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী আইনজীবী কমলেন্দু চক্রবর্তী লিখেছেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবেই এই প্রেসটি স্থাপিত হয়েছিল।

স্বদেশী উদ্যোগের আদর্শে জলপাইগুড়িতে ১৯১২ সালে 'রয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড' নামে একটি প্রেস স্থাপিত হয়েছিল।[১১] দার্শনিকপ্রবর আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের ছাত্র জলপাইগুড়ির নগেন্দ্রনাথ সিকদার বি. এল., এই প্রেসের অন্যতম শেয়ারহোল্ডার ছিলেন। স্বদেশী উদ্যোগের আদর্শে মালদহেও এ সময় একটি প্রেস স্থাপিত হয়েছিল। 'গৌড়দূত' পত্রিকা প্রকাশের জন্য মহাত্মা লালবিহারী মজুমদার এই প্রেসটি স্থাপন করেছিলেন। এটি অ-বাণিজ্যিক আদর্শে তৈরী হয়েছিল। প্রেসটি আজও তাঁর উত্তরপুরুষের সযত্নে চলছে। এই সময়েই অর্থাৎ ১৯১২ সালে দার্জিলিঙে 'বোস প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন প্রয়াত সূর্যকান্ত বোস।[১২] এই ছাপাখানা থেকেই 'দার্জিলিং টাইমস' নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এই প্রেসটি এখনো বর্তমান।

এই দশকেই দার্জিলিং জেলার কালিম্পং মহকুমায় একটি ছাপাখানা ছিল বলে খবর পাওয়া যায়। ১৯১৮ সালে পরশমণি প্রধানের সম্পাদনায় 'চন্দ্রিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা এই ছাপাখানা থেকেই প্রকাশিত হত।[১৩] অ-বাণিজ্যিক ভিত্তিতে জলপাইগুড়ি শহরে ১৯২০ সালে 'বীণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস' স্থাপিত হয়েছিল।[১৪] এর উদ্যোক্তা ছিলেন আইনজীবী জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল, কবিরাজ সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, আইনজীবী জগবন্ধু সরকার ও শান্তি-নিধান রায়। মূলত পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই বীনা প্রিন্টিং ওয়ার্কসের জন্ম হয়েছিল। সে সময় জলপাইগুড়িতে কোন পত্রিকা ছিল না। ১৯২৪ সালে 'জনমত' সাপ্তাহিক পত্রিকা জ্যোতিষচন্দ্র সান্যালের সম্পাদনায় এই প্রেস থেকেই প্রকাশিত হত। তা আজও অব্যাহত আছে।

১৯২৪ সালে মালদহে একটি প্রেস স্থাপিত হয়েছিল 'রাহমানিয়া' নামে।[১৫] মালদহের ব্যক্তিত্ব খানসাহেব আবদুল গণি ছিলেন এই প্রেসের

স্থাপয়িতা। এই প্রেস থেকে গণি সাহেবের সম্পাদনায় 'মালদা আখবার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। আখবার ফার্সী শব্দ। এর অর্থ সংবাদপত্র। এটি মালদা মুসলিম সমাজের মুখপত্র ছিল। এই প্রেসটি ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত টিকেছিল। তবে অন্য নামে।

১৯২৭ সালে জলপাইগুড়িতে স্থাপিত হয়েছিল The Planter's Press Limited।[১৬] এটিও পত্রিকা প্রকাশের জন্য স্থাপিত হয়েছিল। 'ত্রিস্রোতা' সাপ্তাহিক পত্রিকা সুরেশচন্দ্র পালের সম্পাদনায় প্রথমে রয়াল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস থেকেই প্রকাশিত হত। কয়েক বছর প্রকাশের পরে সুরেশবাবু বুঝতে পেরেছিলেন যে নিজের প্রেস না থাকলে সাপ্তাহিক প্রকাশ করা খুবই অসুবিধাজনক। তখন তিনি প্রেস স্থাপনের কথা চিন্তা করেন। এবং অবশেষে The Planter's Press Limited স্থাপিত হল। এই প্রেসের ডিরেক্টর ছিলেন পূর্ণচন্দ্র রায় ও রাজেন নিয়োগী। এই প্রেস স্থাপনে আর যাঁরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন আইনজীবী তারানাথ ঘটক, ভবকিংকর ব্যানার্জী প্রমুখ।

জলপাইগুড়িতে মুসলিম চাকরদের উদ্যোগে 'কোহিনূর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড' নামে একটি প্রেস স্হাপিত হয়েছিল।[১৭] এখান থেকেই 'নিশান' পত্রিকা প্রকাশিত হত। এটি ১৯১৬ সালে স্থাপিত হয়েছিল। নবাবের পরিচালনাধীন ১৬টি বাগানের ছাপার কাজ এখানেই হত। এই প্রেসটি বহু-দিন পূর্বেই বন্ধ হয়ে গেছে।

বিশ শতকের বিশের দশকে জলপাইগুড়িতে 'সরলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড' থেকেই খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'মুক্তিবাণী' পত্রিকাটি প্রকাশিত হত।[১৮] এই প্রেসটি এখনো টিকে আছে। রমাপ্রসন্ন সাহা ছিলেন পেশায় আইনজীবী। তিনি ১৯২৬ সালে 'ইউনিয়ন প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা স্হাপন করেছিলন।[১৯] এই প্রেস থেকেই সাপ্তাহিক 'মালদহ হিতৈষী' পত্রিকা প্রকাশিত হত। সাংস্কৃতিক বিষয়ক চর্চাই ছিল এই পত্রিকাটির মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে পত্রিকাটি দীর্ঘায়ু হয় নি।

ত্রিশের দশকের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রেস হল মডার্ণ আর্ট প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড।[২০] ১৯৩৪ সালে এটি স্থাপিত হয়েছিল। এই প্রেসটি স্হাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন আইনজীবী সন্তোষকুমার বসু এম. এ. বি. এল.। আরো যাদের সহযোগিতায় এই প্রেসটি স্হাপিত হয়েছিল তাঁরা হলেন ডাক্তার অবনীধর গুহনিয়োগী, চুনীলাল রায়, সৌরীন বসু, অতুল রায়, পবিত্রকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ। জাতীয় কংগ্রেসের কর্মকাণ্ডের প্রচারই

ছিল এই প্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রেস থেকেই প্রীতিনিধান রায় সম্পাদিত মাসিক 'দেশবন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হত। এই প্রেসটিও এখনো টিকে আছে। তবে অন্য নামে।

চল্লিশের দশকে দার্জিলিং শহরের কালিম্পং ও কার্শিয়াঙে বেশ কয়েকটি নেপালী ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল। এসব ছাপাখানা থেকে সংবাদ ও সাময়িকপত্র পত্রিকা প্রকাশিত হত। এই দশকের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা শিলিগুড়িতে প্রেস স্থাপন। এটির নাম ছিল 'আঞ্জুমান' প্রেস।[২১] এছাড়া ১৯৪৫ সালে কোচবিহারের প্রত্যন্ত মহকুমা মাথাভাঙ্গায় 'দুর্গানাথ প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল।[২২] এই প্রেস থেকে অনিল দাসের সম্পাদনায় 'জ্যোতি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত।

এই দশকের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা হল দার্জিলিং থেকে তিব্বতী ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এই পত্রিকা ছাপা থেকে অনুমান করা যেতে পারে তিব্বতী প্রেসও দার্জিলিঙে একটি ছিল।[২৩]

এই মুদ্রণযন্ত্রগুলি বিশেষত জলপাইগুড়ি ও মালদায় ত্রিশের দশকে সরকারী রোষে পড়েছিল। জলপাইগুড়ির বীনা প্রিন্টিং প্রেস প্রায়ই থানা-তল্লাসী হত। জলপাইগুড়ির অপর প্রেস সরলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে সরকার Deposit দাবী করেছিলেন। বালুরঘাটের ট্রেডিং প্রেসকেও সরকার জরিমানা করেছিলেন। আসলে এইগুলো থেকে ইংরাজসরকারবিরোধী নিষিদ্ধ প্রচার-পত্র, পুস্তিকা ছাপা হত। এগুলো গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হত। যেমন কৃষক তুমি গরীব কেন ?[২৪]

উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে বিশ শতকের ছাপা-খানার অধিকাংশই স্থাপিত হয়েছিল সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রকাশের জন্য। জাতীয়তা ও সংস্কৃতির প্রেরণা থেকেই ছাপাখানাগুলি যে স্থাপিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ যাঁরা ছাপাখানায় মালিক তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষিত এবং খ্যাতনামা আইনজীবী। এই ছাপাখানাগুলি থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

সূত্রনির্দেশ

১ West Bengal District Gazetteers, Darjeeling, Amiya Kumar Banerjee etc., p 582

২ **West Bengal District Gazetteers, Cooch-Behar, Durga Das Majumder, p 162**

৩ মালদহের রাধেশচন্দ্র, হরিদাস পালিত, পৃ ১৫

৪ সুরধুনী, শারদীয়া সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ১৩৯৩, 'জলপাইগুড়ি জেলার মুদ্রণ ও প্রকাশন', আনন্দগোপাল ঘোষ

৫ স্মরণিকা, ১৪শ বর্ষ, নবম সম্মেলন, ১৯৮৭, সম্পাদক এম. আতাউল্লাহ্

৬ General Progs, September, 1889

৭ ইতিহাস অনুসন্ধান ২, সম্পাদক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পৃ ২৯

৮ সুরধুনী, পূর্বোক্ত, পৃ ২

৯ শিলিগুড়ি আজ ও আগামীকাল, সম্পাদক দুর্গা সাহা, পৃ ৪

১০ বিচিত্রা. কমলেন্দু চক্রবর্তী

১১ সুরধুনী, পূর্বোক্ত

১২ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার : আশীষ বোস. দার্জিলিং

১৩ অনুসন্ধান ২, সম্পাদক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পৃ ২৯

১৪ সুরধুনী, পূর্বোক্ত

১৫ মালদহের পত্র-পত্রিকার ইতিহাস, মধ্য পর্ব, সুধীরকুমার চক্রবর্তী

১৬ সুরধুনী, পূর্বোক্ত

১৭ ঐ

১৮ ঐ

১৯ স্মরণিকা, পূর্বোক্ত

২০ সুরধুনী, পূর্বোক্ত

২১ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, কালী ধর, শিলিগুড়ি

২২ ঐ, নগরবাসী সাহা, মাথাভাঙ্গা

২৩ Darjeeling District Gazetteer, p 582

২৪ 'জলপাইগুড়ি শহরে প্রগতি আন্দোলনের এক দশক' (১৯৩৮-১৯৪৭), ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, ডানপথ, নভেম্বর ১৯৮৯, শিলিগুড়ি

নীলমণি চক্রবর্তী ও খাসিয়া-পাহাড়ে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার ঃ ১৮৮৯-১৯১৬

গৌতম নিয়োগী

উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে পর্বকে সচরাচর 'বাংলার নবজাগরণ'রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তার প্রকৃতি ও চরিত্র, সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রভূত পরিমাণ ভিন্নমত ও বিতর্ক বিদ্যমান থাকলেও অদ্যাবধি দেশে-বিদেশে ভারত-ইতিহাসের ঐ কালসীমা যে যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।[১] সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপান্তরের চারিত্রিক দুর্বলতা যেমন ছিল, তেমনি তৎসত্ত্বেও তার তাৎপর্যও অনস্বীকার্য, তবে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বর্তমানে আমাদের অন্বিষ্ট নয়। একদিকে, প্রথমত, এই জাগরণপর্ব ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার গতি ছিল সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, সীমাবদ্ধতার বড় একদিক হল এই পরিবর্তন ছিল মূলত হিন্দু, শহুরে, মধ্যবিত্ত ও 'এলিট' শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ, যে দেশীয় পাতিবুর্জোয়াশ্রেণীকে বাংলা পরিভাষায় আমরা 'ভদ্রলোক' বলে পরিচয় দিয়ে থাকি। অন্যদিকে, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত ও প্রসার, খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশেষত ভাবাদর্শের সংস্পর্শ ও তার অভিঘাত এবং সর্বোপরি নানা ধরনের দেশীয় ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের সূচনা ও সম্প্রসারণ আমাদের সমাজে প্রধানত ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে এবং কিছু পরিমাণে ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে। নতুন ও পুরাতন আদর্শ ও ভাবধারার সংঘর্ষে, তৎকালীন বস্তুগত পটভূমিকায় দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যত আধুনিকতার যাত্রা শুরু হল। সংস্কারকদের মূল লক্ষ্য ছিল গোঁড়ামি দূর করে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালানো বা যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা, মানবিকতার দ্বারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক রীতি ভেঙে দেওয়া, সার্বজনীনতা দ্বারা সংকীর্ণতার

ইতিহাস বিভাগ, রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া

অবসান। সংস্কার আন্দোলনগুলি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় নয়। তবে একথা স্বীকৃত যে সংস্কার আন্দোলনগুলির সূত্রপাত হয়েছিল বাংলায়; পরে তা ভারতের অন্য অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। অধ্যাপক সুশোভন সরকার 'ভারতের আধুনিকতার জাগরণে বাংলার ভূমিকা'কে ইউরোপীয় নবজাগরণ বা রেনেশাঁস আন্দোলনে ইতালীর ভূমিকার তুলনীয় বলেছেন।[২] যাইহোক, বাংলার জাগরণ বা তথাকথিত নবজাগরণ নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে, ভারতীয় ঊনিশ শতকীয় জাগরণের শতকরা নব্বই ভাগই তো বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে লেখা।[৩] কিন্তু আদৌ যা তেমনভাবে আলোচিত হয় নি, তাহল বাংলার বাইরে বাংলার নবজাগরণের প্রভাব। কিভাবে বাংলার ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন বাংলার বাইরে তার প্রত্যয় নিয়ে পৌঁছুল, তার কী প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব বা অন্য প্রদেশের, বিশেষ করে বিহার, উড়িষ্যা বা আসামের মত নিকট প্রতিবেশীরা বাংলার প্রগতিশীল চিন্তার দ্বারা কতখানি এবং কিভাবে আকৃষ্ট হলেন, কেনই বা, এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঐতিহাসিকদের কাছে তেমন প্রাধান্য পায় নি। এই ফাঁক অংশত পূরণের জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

ঊনিশ শতকে বাংলার জাগরণের প্রভাব আসাম প্রদেশে কিভাবে পড়তে শুরু করে তাই আমার আলোচ্য। তবে দুটি সীমাবদ্ধতা বলে নিতে চাই। এক, আসামে সমাজসংস্কার আন্দোলনের পূর্ণ পরিচয় একটি প্রবন্ধে তো দেওয়া যায় না, তাই আমি 'কেস্-স্টাডি' হিসেবে শুধু ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনই বেছে নিয়েছি। দুই, আসামে ব্রাহ্ম আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে গেলে এই প্রবন্ধের আয়তনে কুলোবে না, তাই আমার বিবেচনায় যিনি খাসিয়া পাহাড়ে (বর্তমান মেঘালয় রাজ্যের অন্তগত) ব্রাহ্মধর্ম ও সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা সেই নীলমণি চক্রবর্তীর জীবন ও কর্মই এই প্রবন্ধে বেছে নেওয়া হয়েছে। খাসিয়া, জয়ন্তীয়া এবং গারো এই তিনটি পাহাড় নিয়ে বর্তমান মেঘালয়, যা আমাদের আলোচ্য সময়-পরিধিতে আমাদের আসামের অন্তর্গত ছিল এবং নীলমণি চক্রবর্তী ছিলেন কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক প্রচারক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করে নিতে চাই যে ব্রাহ্ম আন্দোলনের ইতিহাস সুপরিচিত বলেই রামমোহন রায় কর্তৃক সমাজ প্রতিষ্ঠার (১৮২৮) সময় থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর পর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় পর্যন্ত ইতিবৃত্ত, তার নানা পর্ব-পর্বান্তর, অর্থাৎ রামমোহনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ, তারপর কেশবচন্দ্র

সেনের নেতৃত্ব, ব্রাহ্মসমাজে দু'বার ভাঙন (যথাক্রমে ১৮৬৬ এবং ১৮৭৮) 'আদি' ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে এসে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা এবং পরে তার থেকে আবার 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'—এসব আলোচনা করি নি।[৪] তবে যা বলা দরকার তা হল প্রথমাবধি ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন শুধু ধর্মান্দোলন ছিল না, সমাজ ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক সর্বাঙ্গীন মুক্তি আন্দোলন রূপে অগ্রসর হয়েছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আমলেই অর্থাৎ ১৮৭৮এর পর আসামে ব্রাহ্ম আন্দোলন ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়।

এর আগেই অবশ্য ১৮২৫ থেকে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই বাংলার নবজাগরণের প্রত্যক্ষ প্রভাব আসামে পড়তে শুরু করে বলে সঙ্গত-ভাবেই ডঃ অমলেন্দু গুহ মনে করেন।[৫] ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূক্ত সমাজ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের নেতৃত্ব দেন পদ্মহাস গোস্বামী (? — ১৮৭৯) এবং গুণাভিরাম বড়ুয়া (১৮৩৭-১৮৯৪)।[৬] আসামে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটতে শুরু করে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের পর যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসন ঐ প্রদেশ দখল করে, তবুও ইংরেজি শিক্ষায় প্রভাব ছিল নগণ্য এবং ইংরেজি মধ্যবিত্ত শ্রেণীও খুবই সীমিত ছিল; তবে খ্রীষ্টান মিশনারীদের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য ধর্ম, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির বিরোধ ও অভিঘর্ষণ শুরু হয়।[৭] তবে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে ভারতীয় প্রত্যুত্তর এই ধরনের অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যায় আসামে নবজাগরণের উদ্ভব বিশ্লেষণ করলে ভুল হবে। আসামে জাগরণের উদ্‌গাতা যেমন হালিরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮০২-৫২), জাগেগারাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮০৫-১৮৩৮), আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮২৯-৫৯) এবং মণিরাম দেওয়ান (১৮০৬-৫৮), তাঁরা সকলেই প্রধানত ভারতীয়দের প্রেরণা দ্বারাই উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত।[৮] এবং সেই সঙ্গে একথাও বলতে হবে যে সংস্কার ও প্রগতিশীল রূপান্তরের চেতনা ও অভীপ্সা অনেকটাই বাংলার ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের প্রভাবে।

ব্রাহ্মধর্ম মূলত সংস্কারবাদী এবং প্রচলিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পরিবর্তে ঔপনিষধিক হওয়ায় প্রচার ছিল এর অন্যতম প্রধান অঙ্গ, তবু ১৮২৮ থেকে ১৮৬৬ পর্যন্ত আসাম প্রদেশে ব্রাহ্মধর্মের কোন প্রচার হয় নি। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐ সমাজের প্রচারক অঘোরনাথ গুপ্ত ১৮৬৯-এ আসামে প্রথম ধর্মপ্রচারে যান। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে এর আগেই অনেক ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরিবার বা ব্যক্তি শ্রীহট্ট (১৮৬২), কাছাড় (১৮৬৫) এবং শিবসাগর (১৮৬৬) প্রভৃতি স্থানে বসবাস করে ব্রাহ্মধর্ম

মতে উপাসনা, ধর্মালোচনা, সঙ্গীতচর্চা বা নানা সমাজসংস্কারমূলক কাজ শুরু করেন।[৯] ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সাধু অঘোর নাথের আসাম সফরকালেই পদ্মহাস গোস্বামী এবং গুণাভিরাম বড়ুয়া ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন।[১০] সেই সময় থেকে ধীরে ধীরে কিভাবে নওগাঁ, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী, তেজপুর, গুয়াহাটি প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, কিভাবে স্থানীয় হিন্দু এবং উপজাতীয় সম্প্রদায় ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে কতটুকু পরিমাণ সমাজসংস্কার আন্দোলন শুরু হয় এবং তার প্রতিক্রিয়াই বা কি, এসব প্রশ্ন চিত্তাকর্ষক তবে এখানে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।[১১] কিভাবে তেমনি ১৮৭৮-এর পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল নেতৃবর্গ আসামে চা-শিল্পে নিযুক্ত 'কুলি'দের শোষণের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং ভারতীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, সেই প্রসঙ্গত দূরে সরিয়ে রাখছি।[১২] কারণ আপার আসাম বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা নয়, এমনকি সুরমা উপত্যকা বা শ্রীহট্ট, কাছাড়, করিমগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল নয়, খাসিয়া পাহাড়ে কিভাবে খাসিয়া জাতির মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনই আমাদের মূল আলোচ্য।

খাসিয়া পাহাড়ে ব্রাহ্ম আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নীলমণি চক্রবর্তী যখন ঐ স্থানে গিয়ে 'খাসিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তার আগে থাকতেই জমি প্রস্তুত হতে শুরু করে। আসামের নওগাঁ (১৮৭০), গুয়াহাটি (১৮৭০) এবং তেজপুর (১৮৭০)-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 'শিলং ব্রাহ্ম-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন কিছু প্রবাসী বাঙালি।[১৩] এরা সবাই কর্মসূত্রে সেখানে গিয়েছিলেন। এই সমাজে শাস্ত্রালোচনা, উপাসনা ও নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে পারস্পরিক ভাব বিনিময় হত। এতে শুধুমাত্র সামান্য কয়েকজন বাঙালি ব্রাহ্ম ছিলেন যাঁরা, তারাই যে যোগ দিতেন তা নয়, হিন্দুসমাজে অনেকেই, এমনকি স্থানীয় খাসিয়াদেরও অনেকে আসতেন।[১৪] এদের মধ্যে দু'জন খাসি যুবক জোব সলোমন এবং রাধন সিং বেরি প্রথম ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন।[১৫] তাঁরা পূর্বেই খ্রীষ্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে এসে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসার পর খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করেন। এই দুই খাসিয়া ব্রাহ্ম যুবকের উৎসাহে এবং স্থানীয় পাঁচ-ছয়জন ব্রাহ্ম বাঙালির দ্বারা শিলং শহরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'মৌখর ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬] এই প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন তারিণীচরণ নন্দী। তারিণীচরণ এবং রাধন সিং কিছু ব্রহ্মসংগীত

খাসিয়া ভাষায় অনুবাদও করেছিলেন।[১৭] এই মৌখর ব্রাহ্মসমাজে প্রতি শনিবার খাসিয়া ভাষায় উপাসনা করা হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে সংক্ষিপ্ত অনুবাদে একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, পৌত্তলিকতার অসারতা, জাতিভেদ প্রথার কুফল এবং শিক্ষার প্রসার ও দেশীয় সমাজের নানাবিধ সামাজিক কুরীতি ও কুসংস্কার দূর করে সমাজোন্নতি বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হতে থাকে এবং আলোচনাও চলে। ক্রমে স্থানীয় খাসিয়ারা আসতে থাকেন বেশী মাত্রায়। খাসিয়া পাহাড়ের শেলা (চেরাপুঞ্জির কাছে) অঞ্চলের বেশ কিছু খাসিয়া ব্যক্তি শিলং ব্রাহ্মসমাজের কাছে এক পত্র লিখে জানতে চান যে তাঁরা ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী এবং এ বিষয়ে কার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে বা কী কী বই পড়তে হবে।[১৮] শিলং ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ এই পত্রটি কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য-নির্বাহক সভার কাছে পাঠিয়ে দেন।[১৯] তখন ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি আনন্দমোহন বসু (প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার, প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা, আইনজীবী এবং সাধুচরিত্র হিসেবে খ্যাত) এবং সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত (সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক)। তারপর কার্যনির্বাহক সভা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে উদ্ধার করি ঃ[২০]

> In view of the desire of the Khasis themselves to know what Brahmoism is, the Executive Committee felt-that it was incumbent upon them to take steps for the establishment of a Brahmo mission in the Khasi hills. At first there was some difficulty in finding a worker. But it was soon overcome, as Babu Nilmoni Chakraborty, a candidate for ordination as a missionary of the Sadharan Brahmo Samaj, expressed his willingness to proceed to the Khasi hills. The Executire Committee at once resolved to send him to Shillong to report upon the state of things there.

অতঃপর নীলমণি চক্রবর্তী শিলং অভিমুখে যাত্রা করেন এবং খাসিয়া পাহাড়ে নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে পৌঁছেই কাজ শুরু করেন। কয়েক মাস পরে

তাঁর মতামত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভায় পাঠান এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে শিলং তথা খাসিয়া পাহাড়েই থেকে গিয়ে কাজ করবার নির্দেশ দেন এবং সেই নির্দেশের পরেই ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'খাসিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়।[২১] নীলমণি চক্রবর্তী নিজেই জানিয়েছেন যে 'নব্যভারত' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করে তিনি প্রথম খাসিয়াদের সম্বন্ধে আগ্রহী হন এবং পরে শ্রীহট্টের জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর এই অনুরাগ তীব্রতর হয়।[২২] প্রথমে গুরুচরণ মহলানবিশ এবং হেরম্বচন্দ্র মৈত্র—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই দুই নেতার শিলং যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাঁরা অপারগ হলে, নীলমণি এগিয়ে আসেন। খাসিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন ঃ[২৩]

> "...এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'লো খাসিয়া মিশন যা এখন তার এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে। এই সমাজ নানা উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে গেছে, যার মধ্যে ১৮৯৭ সালের সেই মহাপ্রলয়ংকর ভূমিকম্পও আছে, যা সমাজেব প্রভূত সম্পত্তি ক্ষতি করেছিলো। কিন্তু সমাজের প্রথম আচার্য ও প্রচারক এখনো তাঁর পদে বহাল আছেন এবং খাসিয়া পাহাড়ের জনগণের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির উৎসরূপে তাঁর লক্ষ্যে অটুট থেকে সাফল্য অর্জন করেছেন।"

আনুমানিক ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার দেয়ারক গ্রামে নীলমণি চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মাতার পরিচয় বা জন্ম তারিখ অনেক খুঁজেও পাই নি, তিনি নিজেও লেখেন নি। তবে বাল্যকালেই নীলমণি পিতা-মাতাকে হারিয়েছিলেন। নিম্ন-মধ্যবিত্ত, গ্রামীণ এবং ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান নীলমণি কাকার কাছে মানুষ। তাঁর আত্মকথা পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই এক মানুষের ছবি. যিনি শৈশব থেকেই ধর্মপ্রাণ, নিজের মনের নিঃসঙ্গতা এবং দুঃখবোধ কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত যৌবনে যিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে মনের শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। স্কুল শিক্ষা শেষ করে কলেজে ভর্তি হয়েও অর্থাভাবে তা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। গোঁড়া এবং রক্ষণশীল ধর্মে তাঁর কিশোর বয়সেই অনাস্থা জন্মায় এবং যৌবনে দু-চারটি সরকারি বেসরকারি অফিসে চাকরি করবার পর শেষ পর্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ব্রত গ্রহণ করেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে দীক্ষাগ্রহণের পর। জীবনের

তিরিশ বছর বয়সে এক সঙ্কটমুহূর্তে তিনি খাসিয়া পাহাড়ে পৌঁছেছিলেন এবং তারপর দীর্ঘ সাতাশ বছর ঐ পাহাড়ে পাহাড়ে খাসিয়াদের মধ্যেই ধর্ম ও সমাজসংস্কারে কাটিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।[২৪]

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২ জুন নীলমণি কলকাতা ত্যাগ করেন এবং ধুবড়ীর মধ্যে দিয়ে জলপথে গুয়াহাটি পৌঁছন। তখন রেলপথ বা স্থলপথে যাওয়ার উপায় ছিল না। গুয়াহাটি থেকে ডাক বিভাগের গরুরগাড়িতে নানা বিপদের মধ্যে দিয়ে দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করে শেষপর্যন্ত ১২ জুন শিলং পৌঁছন।[২৫] প্রথম থেকেই তিনি অল্প কিছু প্রবাসী বাঙালির সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যত খাসিদের মধ্যে কাজ করতে উৎসাহী ছিলেন।[২৬] ফলে তাকে অনেক কষ্ট করে স্থানীয় ভাষা শিখতে হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি খাসিয়া ভাষায় গভীর বুৎপত্তি অর্জন করেন। কথোপকথন এবং খাসিয়া ভাষায় উপাসনা করতে পারতেন অনায়াস দক্ষতায়। তিনি গিয়ে উঠেছিলেন এক বাঙালির বাড়িতে, তবে অচিরাৎ খাসিদের মধ্যেই থাকবার জন্য তিনি মনস্থ করেন। যাদের মধ্যে কাজ করবেন সেই পাহাড়ী উপ-জাতির মানুষরা যাতে তাঁকে আপনজন মনে করতে পারে এবং তাদের দুঃখদুর্দশা ও সামাজিক সমস্যা যাতে তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারেন। এই ব্যাপারে জোব সলোমন তাকে বিশেষ সাহায্য করেন।[২৭] শিলং ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রধানত বাঙালিদের প্রাধান্য, কিন্তু শিলং-এ মৌখর ব্রাহ্মসমাজে খাসিয়াদের যাতায়াত বেশী ছিল। নীলমণি তাই মৌখরে থাকতে শুরু করেন। অল্পকালের মধ্যে পাহাড়ী জনসাধারণ তাকে নিজেদের প্রকৃত বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। নীলমণি চক্রবর্তী ও খাসিয়া মিশন হরিহরাত্মা হয়ে যায়।

খাসিয়া মিশনের প্রধান কেন্দ্র ছিল শিলং-এ কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তা চেরাপুঞ্জি শহরে স্থানান্তরিত হয় যখন ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ওখানে মৌরেই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৯] তারপর নীলমণি তাঁর সহযোগী স্থানীয় খাসিয়াদের সহযোগিতায় খাসিয়া পাহাড়ে নানাস্থানে অনেক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। যেমন ঃ নংগ্রিম (১৮৯২), মৌসমাই বা নংথাম্মাই (১৮৮৯), শেলাপুঞ্জি (১৮৮৯) এবং লাইট কেনসিউ (১৮৯১)।[৩০] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত "খাসি জাতি ও খাসি মিশন" শীর্ষক একখানি সমসাময়িক পুস্তিকায় (১৮৯৩) ঐসব অঞ্চলের বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজগুলির উদ্দেশ্য ও নানাবিধ কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রভূত তথ্য জানা যায়।[৩১] ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন যে "সেই থেকে ব্রাহ্ম আন্দোলন ব্যাপ্তি ক্রমাগত হতে থাকে,

শেষপর্যন্ত ব্রাহ্ম জনগণের সংখ্যা পাঁচশো ছাড়িয়ে যায়।"[৩২] এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ১৮৯২এ খাসিয়া পাহাড়ে ব্রাহ্ম ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ১৫০। শাস্ত্রীমশাই আরো লিখেছেন, "বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা ছিল বারো" এবং তাঁর মন্তব্য ঃ[৩৩]

> Brahmoism may be fairly said to have taken root amongst these people. Almost all these branch Samajes have a variety of institution attached to them for propagatory and other work, all carried on by the Khasis themselves, a great proof of the success of the Mission,

এই বারোটি আঞ্চলিক ব্রাহ্মসমাজ কেন্দ্র ছিল ঃ মৌরেই (চেরাপুঞ্জি), নংগ্রিম, মৌসমাই বা নংখাম্মাই, মাওলঙ, সাসারাত, নংওয়ার, মাওসতো, সোহলাপ, ওয়ালঙ এবং মৌখর। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে নীলমণি চক্রবর্তীর খাসিয়া পাহাড় ত্যাগ করার আগে আরো চারটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

খাসিয়া জাতির মধ্যে ব্রাহ্ম আদর্শ প্রচার, পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজ মন্দির স্থাপন এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মুখ্য স্থপতি ছিলেন নীলমণি চক্রবর্তী কিন্তু সৌভাগ্যবশত এই কাজে তিনি একা ছিলেন না। বেশ কিছু বাঙালি এবং খাসিয়া মানুষ তাঁর সহায়ক হয়েছিলেন। এদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে ঃ রাজচন্দ্র চৌধুরী, নবগোপাল দত্ত, শিবনাথ দত্ত, রাইচরণ দাস, বৰ্দ্ধন রায়, প্রকাশচন্দ্র দেব, উ রাধন সিং বেরি, উ থম সিং, উ বুসন সিং, বসন্তকুমার শর্মা রায়, উ সিমিয়ান উ সিংহানিক, উ বিক্ষো, উ হালি সিং, উ হিন্দ্রামণি, উ বরকিষেণ প্রমুখের। পরবর্তীকালের কর্মী ও নীলমণির সংগৃহীত ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজনের নাম বিশেষ উল্লেখ্য। একজন শ্রীহট্ট জেলার বাঙালি, নাম উমেশচন্দ্র চৌধুরী এবং চারজন খাসিয়া, নাম সুরজমণি রাই, রোহিনীকান্ত রাই, অশ্বত্থমা রাই এবং বঙ্গভূষণ রাই। এদের প্রত্যেকের সাহায্যে নীলমণি চক্রবর্তী শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি, খাসিয়া পাহাড়ে ব্রাহ্মসমাজের পতাকাতলে ধর্ম ও সমাজসংস্কারে অগ্রসর হন।[৩৪]

নীলমণি চক্রবর্তী গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে কোন উপজাতি বা আঞ্চলিক মানুষদের মধ্যে কাজ করতে গেলে, তাদের সঙ্গে মিশে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতি করতে গেলে তাদের ভাষা, বর্ণ, অক্ষর, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার, সামাজিক অবস্থা, চরিত্র ও ব্যবহার, শিক্ষার অবস্থা এবং চেতনার স্বরূপ বোঝা দরকার।[৩৫] তিনি

প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালাভে অগ্রসর হন।[৩৬] ফলে তাঁর আমলে (১৮৮৯-১৯১৬) খাসিয়া মিশন শুধু ধর্মসংস্কারে নয় স্থানীয় জনগণের সর্বাঙ্গীন মুক্তি প্রচেষ্টায় অগ্রসর হয়। প্রত্যেকটি ব্রাহ্মসমাজই ধর্মীয় আলোচনা ও উপাসনা ছাড়াও শিক্ষাবিস্তার, অবৈতনিক ঔষধপত্র ও চিকিৎসা বিভাগীয় কাজ, মদ্যপানের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত ছিল কারণ খাসিয়া জাতির প্রধান সামাজিক সমস্যা ছিল শিক্ষার অভাব, চিকিৎসার অভাব এবং অতিরিক্ত পাণদোষ। অথচ বাংলাদেশের মত বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ, বিধবাদের উপর নির্যাতন, সতীদাহ, বড় আকারে বহুবিবাহ ইত্যাদি সমস্যা ছিল না।[৩৭] তাই রামমোহন, বিদ্যাসাগর বা কেশবচন্দ্র সেনের চাইতে নীলমণি চক্রবর্তীর কাজ ছিল ভিন্ন। নারীজাতির অবস্থাও খাসিয়া পাহাড়ে অনেক দিক থেকে সমতলভূমির চেয়ে বেশী ভালো ছিল। অবশ্য শিক্ষার আলোকের অভাব ছাড়াও আর একটি বড় অন্ধকার দিক ছিল খাসিয়াদের নানা দৈববিশ্বাস, অলৌকিকতা, লোকধর্মের নানা কুসংস্কারের বদ্ধমূল অন্ধ মানসিকতা।[৩৮] এইসব সামাজিক সমস্যা দূর করে সংস্কারে প্রথম ব্রতী হয় ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনগুলি কিন্তু তাদের পিছনে ধর্মান্তর প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল এবং ঔপনিবেশিক সরকার তাদের সহায়ক ছিল। নীলমণি ও তাঁর সহযোগীদের ন্যূনতম সম্পদ ও লোকবল ও সময়বিশেষে শাসকদলের সঙ্গে বিবাদের মধ্যে দিয়ে কঠোর প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল।

নীলমণি চক্রবর্তীর চিন্তাধারা ও রচনাদি থেকে একথা স্পষ্ট যে কলকাতা থেকে সুদূর খাসিয়া পাহাড়ে গিয়ে একা অপরিচিত পরিবেশে কাজ করবার মূল প্রেরণা ছিল গভীর অধ্যাত্মভাব এবং একমেবাদ্বিতীয়ম ব্রহ্মবাদ প্রচার। তাঁর আদর্শ ছিল 'Fatherhood of God and brotherhood of man'; সেই সঙ্গে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মূল আদর্শ থেকে কখনোই তিনি বিচ্যুত হন নি। অর্থাৎ ধর্মের আধ্যাত্মিক ভাব তাঁর একমাত্র লক্ষ্য নয়, বরং সামাজিক-সাংস্কৃতিক-নৈতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক, এক কথায় সার্বিক মানবমুক্তি ও উন্নয়নই ছিল তাঁর কাম্য। মৌয়েই, নংগ্রস এবং নংখ্লাম্মাই শাখা সমাজগুলি খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটি করে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তিনি।[৩৯] তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলে কলকাতার মত 'সঙ্গত সভা' গঠন করা হয়েছিল, যেখানে শিক্ষার প্রসার এবং সামাজিক সমস্যা দূর করার জন্য আলোচনা হত নিয়মিত। একইভাবে দরিদ্র জনগণের মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ ও বিনামূল্যে ওষুধ-দান তাঁর সমাজসেবা কর্মেরই অঙ্গ। এজন্য নীলমণি নিজে বই পড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-

বিদ্যা আয়ত্ত করেন এবং পরে তাঁর প্রিয় শিষ্য খাসিয়া যুবক বঙ্গভূষণ রাইকে কলকাতায় ডাঃ মোহিনীমোহন বসুর হোমিওপ্যাথিক স্কুলে শিক্ষালাভের জন্য পাঠান। শিক্ষালাভ করে বঙ্গভূষণ খাসিয়া পাহাড়ে গিয়ে নিজ জাতির মধ্যে কর্মে তৎপর হন কিন্তু অকালমৃত্যু তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটায়।[৪০] নীলমণি নিজে খাসিয়া ভাষায় অনেক পুস্তক রচনাই শুধু করেন নি, পাহাড়ী জাতির মধ্যে সাহিত্যপ্রেম ও উন্নত রুচি গঠনের ব্যাপারেও বিশেষ ভূমিকা নেন।[৪১] অতিরিক্ত মদ্যপানে স্বভাব নষ্ট করার জন্য তিনি এক আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং কলকাতার পূর্বসূরী প্যারীচরণ সরকারের কায়দায় চেরাপুঞ্জিতে 'খাসি হিলস্ টেমপারেন্স অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করে সরকারের সঙ্গে চিঠিপত্র-আবেদনের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করেন।[৪২] তদানীন্তন আসামের শিক্ষিত শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি 'টাইমস অফ আসাম' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে চেরাপুঞ্জি বা শিলং থেকে নীলমণি চক্রবর্তী কলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাংলা ও ইংরাজি মুখপত্র, 'তত্ত্বকৌমুদী' এবং 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার'-এ মাঝে মাঝে লিখতেন।[৪৩] বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে খাসিয়া পাহাড়ে কৃষিব্যবস্থা উন্নতির জন্যও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং 'ডিরেক্টার অফ জেনারেল কমার্শিয়াল ইনটালিজেন্স'এর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ চিঠি চালাচালির পর শেষপর্যন্ত ক্ষুদ্র চাষীরা তাদের উৎপাদিত শস্যের জন্য উপযুক্ত দাম পেতে শুরু করে।[৪৪] নীলমণি চক্রবর্তীর নিজের স্বীকারোক্তি দিয়ে আমরা এই অংশের উপসংহার টানতে পারি : "It is a part of my religion to do good to others and to help these who are in distress."[৪৫] যতদিন খাসিয়া পাহাড়ে ছিলেন, নীলমণি এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়ে ধর্ম ও সমাজসংস্কারে ব্রতী ছিলেন।

আমরা আজ যদি নীলমণি চক্রবর্তীর জীবন ও কর্মের দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে খাসিয়া পাহাড়ে তাঁর ধর্ম ও সমাজ সংস্কারগুলির মূল্যায়ণ করতে অর্থাৎ সাফল্য ও ব্যর্থতা অনুসন্ধান করতে পারি। নিঃসন্দেহে তাঁর কর্মোদ্যোগের চূড়ান্ত পর্বেও ছিল সীমাবদ্ধ, যদিও অকিঞ্চিৎকর নয়। ১৮৯১ আদমসুমারী অনুসারে খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ের মোট আয়তন ৬১৫৭ মাইল এবং লোকসংখ্যা ১,৯৭,৯০৪।[৪৬] এর মধ্যে ১৯১৬-তে নীলমণি চলে আসার আগে সামান্য অংশই সংস্কারের আলো স্পর্শ করতে পেরেছিল। এই সীমা-বদ্ধতার কারণগুলি ধরা কঠিন নয়। প্রথমত, শিক্ষার প্রসার সমেত অনেক ব্রাহ্মসংস্কারই সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার সর্বদা এগিয়ে আসেন নি। বরং ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চাপ পাহাড়ী

জনগণের ঘাড়ে বোঝার মত চেপে ছিল। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার প্রসার খুব কম ঘটায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী খাসিয়াদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি, যে শ্রেণী নিজেরা সমাজসংস্কারে এগিয়ে আসতে পারে। অজ্ঞতা ও অশিক্ষার সঙ্গে চেতনার অভাব অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তৃতীয়ত, ধর্ম ও সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের কাজ শুরুর অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ কাজ শুরু করেছিল এবং নীলমণি চক্রবর্তীর পক্ষে অনেক কম লোকবল ও অর্থবল নিয়ে ক্ষমতাবান মিশনারীদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। সর্বশেষে বলা যায় যে, খাসিয়া পাহাড়ে উপজাতিদের সমাজে অনগ্রসরতা দূর করার প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল পশ্চাদমুখী প্রবণতা এবং স্থানীয় জনগণের নিজস্ব লৌকিক অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে থাকা। কিন্তু এইসব দুর্বলতাগুলি সত্ত্বেও যে অবস্থায় নীলমণি চক্রবর্তী সুদূর কলকাতা থেকে এসে অজানা-অচেনা পরিবেশে ভিন্ন ভাষাভাষী এক পাহাড়ী গোষ্ঠীর মধ্যে আপন স্বার্থ ভুলে কাজ করে গেলেন তা অতুলনীয়। একদিকে খাসিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা ও নানা শাখা সমাজ তৈরী করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা, ভারতীয় হিন্দুধর্মের ঔপনিবেশিক বা বেদান্তিক একেশ্বরবাদ প্রচার, মানবতাবাদ ও সার্বজনীন, জাতিভেদহীন, অপৌত্তলিক ধর্মপ্রচার খাসিয়াদের মধ্যে এক মুক্ত, আধুনিক অথচ দেশীয় ঐতিহ্যানুসারী ধর্মের আলো দেখায়। অন্যদিকে, তার নানা সমাজসংস্কার, মনের অজ্ঞানতা ও চেতনার স্তর উন্নত করা, শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার, সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা ইত্যাদি কাজে, নৈতিক চরিত্র উন্নত করার কাজে, এককথায় উন্নততর সত্য জীবনযাপনে উৎসাহী করার কাজে নীলমণি চক্রবর্তীর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সেই কারণেই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই আত্মত্যাগী সংস্কারক যখন চিরতরে খাসিয়া পাহাড় ছেড়ে আসেন, তখন সর্বধর্ম ও জাতিনির্বিশেষে মানুষজন একত্রিত হয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছিল এক প্রকাশ্য সভায়।[৪৭] আমরা আজ এই বিস্মৃত সংস্কারকে ইতিহাসের পাতায় তুলে ধরবার সামান্য প্রয়াস করলাম।[৪৮]

সূত্রনির্দেশ

১ এই বাংলার জাগরণ নিয়ে পর্যাপ্ত সাহিত্যের মধ্যে সাধারণভাবে কিছু নমুনা দেওয়া হল: সুশোভন সরকার, বেঙ্গল রেনেশাঁস এ্যাণ্ড আদার এসেস্, নতুন দিল্লী, ১৯৭০; অতুলচন্দ্র গুপ্ত (সম্পা.) স্টাডিজ ইন দ্য বেঙ্গল রেনেশাঁস, কলকাতা, ১৯৫৮; নিমাইসাধন বসু, ইণ্ডিয়ান

অ্যাওয়েকেনিং অ্যাণ্ড বেঙ্গল, কলকাতা, ৩য় সং, ১৯৭৬ ; অমিতাভ মুখার্জী, রিফর্ম অ্যাণ্ড রিজেনারেশন ইন বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৬৮ ; ডেভিড কফ, ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালইজম অ্যাণ্ড দ্য বেঙ্গল রেনেশাঁস, কলকাতা, ১৯৬৯ ; কালীকিংকর দত্ত, দ্য ডন অফ রেনেশান্ট ইণ্ডিয়া, বোম্বাই, ১৯৬৪ ; এ. এফ. সালাউদ্দিন আহমেদ, সোসাল আইডিয়াজ অ্যাণ্ড সোশাল চেঞ্জ ইন বেঙ্গল, লিডেন, ১৯৬৫ ; চার্লস হেইমস্যাথ, ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালইজম অ্যাণ্ড হিন্দু সোশাল রিফর্ম, প্রিন্সটন, ১৯৬৪ ; বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, কলকাতা, ১৯৭৯ (২য় সং) ; যোগেশচন্দ্র বাগল, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, কলকাতা, ১৯৬৩ ; গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), অ্যাওয়েকেনিং ইন বেঙ্গল ইন আর্লি নাইনটিনথ সেঞ্চুরি, কলকাতা, ১৯৬৫ এবং ঐ (সম্পা.), বেঙ্গল আর্লি নাইনটিনথ সেঞ্চুরী, কলকাতা, ১৯৭৮ ; রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসি অ্যাণ্ড দ্য বেঙ্গল রেনেশাঁস, বোম্বাই, ১৯৬৫

২ সুশোভনচন্দ্র সরকার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩

৩ উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম কয়েকটি হল ভি. রামকৃষ্ণ, সোশাল রিফর্ম ইন অন্ধ্র, নতুন দিল্লী, ১৯৮৩ ; সুমন্ত নিয়োগী, ব্রাহ্মসমাজ মুভমেন্ট অ্যাণ্ড ডেভেলোপমেন্ট অফ এডুকেশন : এ কেস স্টাডি অফ বিহার, পাটনা, ১৯৮৬ এবং অমলেন্দু গুহ, "ইমপ্যাক্ট অফ বেঙ্গল রেনেশাঁস অন আসাম". দ্র, এসেস ইন অনার অফ প্রোফেসর সুশোভনচন্দ্র সরকার (সম্পা. বরুণ দে এবং অন্যান্য), নতুন দিল্লী, ১৯৭৬

৪ সাধারণভাবে ব্রাহ্ম আন্দোলনের ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য শিবনাথ শাস্ত্রী, হিস্টরি অফ দ্য ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা, ২য় সং, ১৯৭৪ ; প্রশান্তকুমার সেন, দ্য বাইওগ্রাফি অফ এ নিউ ফেথ, দু' খণ্ড, কলকাতা, ১৯৫২-৫৪ ; যোগানন্দ দাস, "দ্য ব্রাহ্ম সমাজ" দ্র অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪৭৯-৫০৫, ডেভিড কফ, ব্রাহ্মসমাজ অ্যাণ্ড দ্য শেপিং অফ দ্য মডার্ন ইণ্ডিয়ান মাইণ্ড, প্রিন্সটন, ১৯৭৯ এবং কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, ব্রাহ্ম রিফর্ম মুভমেন্ট, কলকাতা ১৯৮৩। সর্বাধুনিক গবেষণা, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, 'অ্যাটিটুডস্ টুয়োর্ডস রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড কালচার ইন নাইনটিনথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল : এ কেস স্টাডি অফ দ্য ব্রাহ্মসমাজ, ১৮২৮ ১৮৭৮' (অপ্রকাশিত গবেষণা পত্র) জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লী, ১৯৯০

৫ অমলেন্দু গুহ, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ ৪৬২-৪৭৬

৬ শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫১৮-১৯

৭ আসামে প্রথম ছাপাখানা প্রবর্তন (১৮৩৬), প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশ (আনন্দরাম শর্মা কর্তৃক অনূদিত বাইবেল) বা প্রথম সাময়িকপত্র অরুণোদয় (১৮৪৬) প্রকাশ ইত্যাদি খ্রীষ্টান মিশনারীদের দান। আসামের

এই খ্রীষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে বাংলার মিশনারীদেরও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। দ্র, অমলেন্দু গুহ, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬২-৪৭৬

৮ তদেব

৯ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক প্রতিবেদন বা অ্যানুয়েল রিপোর্ট (১৮৯২) এবং (১৯১১)। অপিচ, সোফিয়া ডবসন কলেট. দ্র ব্রাহ্ম ইয়ারবুক ফর ১৮৭৭, লণ্ডন ১৮৭৮

১০ শিবনাথ শাস্ত্রী. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫১৮-১৯ ; অঘোরনাথ গুপ্তের জীবনালেখ্য হিসেবে প্রামাণিক গ্রন্থ : চিরঞ্জীব শর্মা, সাধু অঘোর নাথের জীবনচরিত, কলকাতা, ৩য় সং, ১৯১১, (প্রথম প্রকাশ, ১৮৮১)

১১ এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইল। দেখা যেতে পারে, শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ ৫১৮-১৯

১২ গৌতম নিয়োগী (সম্পা.), পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত ; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শতবার্ষিকী সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮২। দ্র, সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত অতিরিক্ত টীকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১৩ বার্ষিক প্রতিবেদন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৮৯২

১৪ নীলমণি চক্রবর্তী, আত্মজীবনস্মৃতি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা, ২য় সং, ১৯৭৫, পৃ ৭৫ ; এই বইটি তদানীন্তন আসাম ও খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পাহাড়ের মানুষদের জীবনযাত্রা ও সমাজ সম্পর্কে প্রভূত তথ্য জানার স্বর্ণখনি। প্রথম প্রকাশ, প্রবাসী অফিস, কলকাতা, ১৯২০। গ্রন্থটি অতঃপর শুধুমাত্র 'আত্মজীবনস্মৃতি' নামে উল্লিখিত হবে

১৫ তদেব, পৃ ৯০

১৬ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে গৌতম নিয়োগী, "এ ব্রাহ্ম রিফর্মার ইন মেঘালয় (১৮৮৯-১৯১৬) : এ স্টাডি ইন দ্য লাইফ অ্যাণ্ড ওয়ার্ক অফ নীলমণি চক্রবর্তী", নর্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া হিস্টরি অ্যাসোশিয়নের দশম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ, শিলং, ১৯৮৯। প্রবন্ধটি ঐ সংস্থার কার্যবিবরণীতে প্রকাশিতব্য

১৭ আত্মজীবনস্মৃতি, পৃ ৭৫

১৮ গৌতম নিয়োগী, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

১৯ শিবনাথ শাস্ত্রী, হিস্টরি, পৃ ৩১৮-১৯, ৪৩৭

২০ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৮৮৯

২১ তদেব। অপিচ, শিবনাথ শাস্ত্রী, হিস্টরি, পৃ ৩১৯, ৪৩৭

২২ আত্মজীবনস্মৃতি, পৃ ৭৬-৭৭

২৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ ৩১৯

২৪ এই অনুচ্ছেদটি উৎস নীলমণি চক্রবর্তীর আত্মজীবনস্মৃতি

২৫ তদেব, পৃ ৮৪--৮৯

২৬ তদেব, পৃ ৯০-৯৪

২৭ তদেব

২৮ তদেব

২৯ শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩৭

৩০ খাসিয়া জাতি ও খাসিয়া মিশন (কলকাতা, ১৮৯৩)। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ প্রকাশিত

৩১ তদেব

৩২ শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩৮

৩৩ তদেব

৩৪ খাসিয়া জাতি ও খাসিয়া মিশন, পূর্বোক্ত

৩৫ আত্মজীবনস্মৃতি, পৃ ১১১

৩৬ খাসিয়া জাতি ও খাসিয়া মিশন

৩৭ আত্মজীবনস্মৃতি, ২২ অধ্যায়, পৃ ৯৫-১০০

৩৮ তদেব, ২৩ অধ্যায়, পৃ ১০১-১০৬

৩৯ খাসিয়া জাতি ও খাসিয়া মিশন ; শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩৮

৪০ তদেব, পৃ ৪৩৯ ; আত্মজীবনস্মৃতি, পৃ ১৩৩

৪১ তদেব, পৃ ১০৯

৪২ তদেব, পৃ ১৪৮-১৫৪

৪৩ ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, ১১ আগস্ট, ১৯০১ ; আত্মজীবনস্মৃতি, পৃ ১৫৫, ১৮৯-৯০

৪৪ তদেব, পৃ ২০১

৪৫ তদেব, পৃ ২১৩

৪৬ তদেব, পৃ ২৪৪

৪৭ তদেব, পৃ ২২৩

৪৮ গৌতম নিয়োগী, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ। স্থানাভাবে বহু তথ্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া গেল না

উনিশ শতকে করদ রাজ্য কোচবিহারে শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে একটি সামাজিক চিত্র

ছন্দা চক্রবর্তী

উনিশ শতকের মধ্যভাগে কোচবিহার করদ রাজ্যটি যখন ইংরেজ শাসনাধীনে সরাসরি আসে তখনই প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্যে শিক্ষার প্রচলন শুরু। এর পূর্বে এখানে শিক্ষার প্রচলন ছিল না বললে ভুল হবে। কিন্তু শিক্ষার ধারা বলতে যা বোঝায় তা কোচবিহারে ছিল না। যে সকল তথ্যাদি পাওয়া যায় তা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হলেও, এইটুকু বলা যায় যে বিদ্যাচর্চা কেবলমাত্র রাজপরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কোচবিহারের রাজপরিবার সংস্কৃত শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন এবং সংস্কৃত শিক্ষাকে উৎসাহ প্রদানের জন্য সংস্কৃত টোলগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করতেন।[১] এই বিষয়ে চতুর্দশ শতাব্দীর মহারাজা দুর্লভনারায়ণের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজসভায় হেম সরস্বতী, হরিহর বিপ্র এবং কবিরত্ন সরস্বতী সভাকবি ছিলেন। পরবর্তীকালে বিপ্রসিংহ (১৪৯৭-১৫৩৩), নরনারায়ণ (১৫৩৩-১৫৮৭), লক্ষ্মীনারায়ণ (১৫৮৭-১৬২৭) বীরনারায়ণ (১৬২৭-১৬৩১) এবং প্রাণনারায়ণ, (১৬৩২-১৬৬৫) রাজন্যবর্গ ও দুর্লভনারায়ণের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং বিদ্যাচর্চাকে উৎসাহিত করতেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ (১৭৮৩-১৮৩৯) নিজেই ছিলেন সংস্কৃত এবং ফার্সি ভাষার পণ্ডিত। তাছাড়া মহারাজা সুলেখক এবং খ্যাতিমান কবি হওয়ায় তাঁর রাজসভায় বহু জ্ঞানী ও গুণীজনের সমাবেশ হত। সংস্কৃত শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্যে এই রাজ্যের রাজারা তাঁদের রাজ্যের ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে অন্যত্র, যেমন পার্শ্ববর্তী রংপুরের টোলগুলির পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্য করতেন। ১৮৩২ সালে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ একটি মনোরম গৃহ প্রদান করেন এই শর্তে যে সংস্কৃত ভাষা প্রসারের জন্য এই গৃহটি ব্যবহৃত হবে।[২] জ্ঞানীগুণী জনের সমাদার ও সংস্কৃত ভাষার বিকাশ ও উৎকর্ষসাধনে মহারাজগণের গভীর

রীডার, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

আগ্রহ থাকলেও ঊনিশ শতকের মধ্য ভাগের পূর্ব পর্যন্ত এই শিক্ষা ছিল রাজপরিবারের এবং বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্ব-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টা বা উদ্যম গ্রহণ করা হয় নি।

১৮৬৪ সালের ২৬ জানুয়ারি কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এইদিনে ইংরেজ কর্তৃক মনোনীত কর্ণেল হট্‌ন কোচবিহার রাজ্যের কমিশনার নিযুক্ত হন। হট্‌ন সাহেব প্রশাসনিক কাঠামোর যথেষ্ট পরিবর্তন আনয়ন করেন। এছাড়া রাজ্য শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি বহুবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করেন। অন্যান্য খাতে খরচ কমিয়ে কর্ণেল হট্‌ন জনকল্যাণমূলক কাজে এবং শিক্ষাখাতে প্রচুর অর্থবিনিয়োগ করেন। তৎকালীন বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের পশ্চাতে ইংরেজের যে উদ্দেশ্য কাজ করেছিল কোচবিহার তার ব্যতিক্রম ছিল না।

কোচবিহার রাজ্যে শিক্ষাবিস্তার কতটা সাফল্যলাভ করেছিল তা জানতে হলে তার পশ্চাতে সেখানকার সামাজিক পরিস্থিতিটি জানা প্রয়োজন। এই নিবন্ধে আমি হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় ও কোচবিহার রাজ্যের স্থানীয় বাসিন্দার মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতি কতদূর হয়েছিল সেদিকে লক্ষ্য রাখব।

ঊনবিংশ শতকে এই রাজ্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ শিক্ষা-বিস্তারের উপযোগী ছিল না। ১৮৭২ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী কোচবিহার রাজ্যের ১,৭৬,৩৯৬ জন পুরুষ অধিবাসীর মধ্যে ১,৬০,২১২ জন ছিল কৃষকশ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীটি বিদ্যাচর্চায় একেবারেই আগ্রহী ছিল না।[৩] আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে কোনও মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে ওঠে নি। জনগণের মধ্যে বিদ্যাচর্চার অভাব এর অন্যতম কারণ। একদিকে রাজপরিবার ও তাদের পোষ্যবর্গ এবং অন্যদিকে কৃষক সম্প্রদায়। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার মতন অপর কোন শ্রেণী ছিল না।[৪] ক্রমশ বহিরাগতদের আগমনের ফলে একটি মধ্যবিত্তশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। কোচবিহার রাজ্যের প্রশাসনিক কাজ করার উপযুক্ত ব্যক্তির প্রাপ্তি-সম্ভাবনা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে না থাকায় বঙ্গদেশ থেকে আগত নির্বাচিত শিক্ষিত বাঙালীদের দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় কোচবিহারে এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হল যাকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

কোচবিহার রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল মিশ্রিত। এদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ছিল কোচ বা রাজবংশীদের।[৫] এছাড়া এখানে কিছুসংখ্যক মেচ, গারো, মোরাও উপজাতিগণ বাস করত। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে কোচ বা

রাজবংশীর সঙ্গে মেচ, গারো ও মোরাঙ উপজাতিগণের মিলিত জনসংখ্যা ৯৩.৪৬ শতাংশ। এছাড়া বাংলা, আসাম ও তরাই অঞ্চল থেকে কিছু-সংখ্যক বহিরাগতেরও বাস ছিল। মুসলমান জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ। রাজবংশীগণ প্রধানত কৃষিজীবী হওয়ায় কৃষিকেই তারা অগ্রাধিকার দিত এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় নি। এইজন্যে জমিতে বীজ বপনের সময় বিদ্যালয়গুলিতে কোন ছাত্র পাওয়া যেত না। এমনকি লেখাপড়ার জন্যে বেশী পীড়াপীড়ি করলে বা অধিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হলে তা ছাত্রদিগের অভিভাবক-গণের অসন্তোষ এবং ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়াত।[৬] এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদেশের গ্রামগুলির অবস্থানে যেরূপ ঘন সন্নিবেশের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় কোচবিহারের গ্রামগুলির ক্ষেত্রে তার যথেষ্ট অভাব ছিল। ফলে গ্রামীণ জীবনের মধ্যে যে যৌথ জীবন-ভাবনা এবং কর্মপ্রচেষ্টা আকাঙ্ক্ষিত, কোচবিহারের গ্রামগুলি সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। শিক্ষার উপযোগিক মূল্য অনুধাবন করতে তাদের যথেষ্ট সময় লেগেছিল।[৭]

১৮৬৪ সালে কর্ণেল হটন শিক্ষাবিস্তারের জন্যে যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করেন রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তাঁর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তা বেশ ভালভাবেই এগিয়ে যেতে থাকে। বিলম্বে শিক্ষা প্রসারের কর্মসূচী গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোচবিহার রাজ্য বাংলার অন্যান্য জেলার তুলনায় পিছিয়ে থাকে নি। ১৮৭৫-৭৬ সালে হুগলী ও বর্ধমান জেলায় জনসংখ্যার ১.৯ এবং ১.৬ শতাংশ বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশোনা করত। সেই তুলনায় কোচবিহারে বিদ্যালয়গুলিতে উপস্থিতির হার ছিল ১.৩ শতাংশ। তাছাড়া ঢাকা, যশোর, পাবনা, কামরূপ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার তুলনায় কোচবিহারের স্থান অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। এই সকল স্থানে জনসংখ্যার .৯, .৯, .৭, .৭ এবং .৬ শতাংশ বিদ্যালয়ে পড়ত।[৮] আবার যেখানে প্রতি হাজার জন-সংখ্যার ভিত্তিতে ২৪ পরগণায় ২১.২, মেদিনীপুরে ১৯.৫ এবং বাঁকুড়ায় ১৯.২ বিদ্যালয়ের সন্ধান পাওয়া যায় সেখানে কোচবিহার রাজ্যে বিদ্যালয় সংখ্যা ছিল ১৬।[৯] নদীয়া, বীরভূম, হুগলী ও বর্ধমানের তুলনায় এ রাজ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষাবিস্তারে মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতাই এইটি সম্ভব করে তুলেছিল। শিক্ষার অগ্রগতি ও পরিধি বাড়ানোর জন্য রাজকোষ থেকে মুক্তহস্তে প্রতি বৎসর আর্থিক অনুদান দেওয়া হত। এই কারণে এই রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারের যে সুযোগসুবিধা ছিল তা ইংরেজশাসিত অন্য কোনও রাজ্যে

বা অঞ্চলে ছিল না। কোচবিহার রাজপরিবার শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যয়নির্বাহে কোন কার্পণ্য করেন নি। ১৮৭৫-৭৬ সালে রাজ্য পরিদর্শনকালে কমিশনার মন্তব্য করেন—There is no lack of funds for expenditure on useful purposes···, roads, schools, charitable dispensaries, the public library and other public institutions,"[১০] রাজপরিবার ছাড়াও স্থানীয় জোতদার [গোবরাছড়ার বৈকুণ্ঠনাথ মুস্তাফী (১৮৬৬), মেখলীগঞ্জের বিশেশ্বরনাথ সিং ও জহরমহল অসওয়াল এর নাম উল্লেখযোগ্য (১৮৯৩)] এবং কিছুসংখ্যক কৃষকদের মধ্যে ক্রমশ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ ক্রমশঃ শিক্ষা সচেতন হওয়াতে তাদের মধ্যে শিক্ষার জন্য ব্যয় করার প্রবণতা বাড়তে থাকে। ১৮৮৪-৮৫ সালে এই রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে মোট ব্যয় হয় ২,৯২৫ টাকা ৯ আনা ২ পয়সা। এর মধ্যে রাজপরিবারের অনুদান ছিল ২,৪৭৬ টাকা ১২ আনা ২ পয়সা। বাকিটি অর্থাৎ ৪৪৮ টাকা ১৩ আনা ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের দান। ১৮৯৮-৯৯ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে মোট ব্যয় ৮,৯৮৫ টাকা ১৩ আনার মধ্যে স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্যের অংশ ছিল ৪,৪৮৫ টাকা ১৩ আনা। মাথাভাঙ্গা মহকুমা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার সময় (১৮৭৬ এর পূর্বে) স্থানীয় অধিবাসিগণ এক হাজার টাকারও বেশী অনুদান দিয়েছিলেন।[১১] পরে ১৮৯৩-৯৪ সালে তাঁদেরই প্রচেষ্টায় ৭০০০ টাকা ব্যয়ে স্কুলের পাকা ঘর নির্মিত হয়।

রাজপরিবারের আর্থিক সাহায্যের ফলে রাজ্যে বিদ্যালয়ের এবং ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৬৪ সালে যেখানে মাত্র একটি বিদ্যালয় সেখানে ১৮৭৫-৭৬ সালে বিদ্যালয় সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮২ এবং ছাত্র সংখ্যা ৭২৩৮। ১৮৯৯-১৯০০ সালে মোট বিদ্যালয় এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৫২ এবং ১২,০০০।[১২] উনিশ শতকে কোচবিহার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে—মাথাভাঙ্গা, মেখলীগঞ্জ, দিনহাটা ও সদর মহকুমায় সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্প্রসারিত হয়। এই সকল বিদ্যালয় ছাড়াও একাধিক শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় (১৮৭৩ ও ১৮৭৫ সালে) ও একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় (১৮৮৮ সালে)।

জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী ১৮৭৩-৭৪ সালে বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র এক-শতাংশ এবং প্রতি ৪,০৩৪ জন ছাত্রের জন্য ছিল একটিমাত্র বিদ্যালয়। ১৮৭৬ সালে এই সংখ্যা বেড়ে বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা ১·৩ শতাংশ হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ছাত্রসংখ্যা ও বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলেও শিক্ষার প্রসার কোচবিহারে ঘটেছিল অত্যন্ত ধীরগতিতে।

কোচবিহারের সাধারণ মানুষ হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে কতখানি এব্যাপারে সচেতন বা আগ্রহী হয়ে উঠেছিল তার একটি বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শিক্ষার বিস্তার কোচবিহার-সমাজকে কতখানি বলিষ্ঠ করেছিল তারও একটি বিবরণ দরকার।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার কতদূর হয়েছিল তা নিম্নে প্রদত্ত সারণী থেকে পরিস্ফুট হয়।

	হিন্দু ছাত্রসংখ্যা	মুসলমান ছাত্রসংখ্যা	মোট ছাত্রসংখ্যা
১৮৮৪-৮৫	৬,২০৫	২,৮৭০	৯,২৬০
১৮৮৯-৯০	৫,৬৯৫	২,৮৫৩	৮,৬৮০
১৮৯৪-৯৫	৭,১৭৯	৩,৯৯৯	১০,৫৬৫
১৮৯৮-৯৯	৭,৬৭২	৩,৪৮০	১১,২৮৩[১৩]

মুসলমান সমাজ হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। এই পিছিয়ে পড়া বড় বেশী করে লক্ষ্য করা যায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে। খুবই অল্পসংখ্যক মুসলমান ছাত্র উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে যেমন জেনকিন্স, মেখলীগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা মহকুমা বিদ্যালয় বা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ত। নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি থেকে একটি স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে।

জেনকিন্স বিদ্যালয়

	মোট ছাত্রসংখ্যা	মুসলমান ছাত্রসংখ্যা
১৮৬৬-৬৭	১১৬	৭
১৮৭৬-৭৭	১৮০	১৬
১৮৮৪-৮৫	২৮৫	৩৩
১৮৯৮-৯৯	২৮৪	২৩[১৪]

মেখলীগঞ্জ বিদ্যালয়

	মোট ভর্তি সংখ্যা	মুসলমান ছাত্রের ভর্তি সংখ্যা
১৮৯৪	১৪	১
১৮৯৯	৫০	১৭
১৯০০	৬১	২৩[১৫]

১৮৬৬-৬৭ সালে অর্থাৎ মেখলীগঞ্জ স্কুলটি স্থাপিত হওয়ার এক বছর পরে মোট ছাত্রসংখ্যা ৫১ জনের মধ্যে মাত্র ৫ জন ছিল মুসলমান। দশ বছর পরে

অর্থাৎ ১৮৭৬-৭৭এ কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। মোট ১২০ ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ২৬ জন ছিল মুসলমান।

ভিক্টোরিয়া কলেজে উচ্চশিক্ষায় রত মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ছিল নগণ্য। ১৮৮৮-৮৯ সালে ৬৮ জনের মধ্যে ৫ জন, ১৮৯৩-৯৪ সালে ১১১ জনের মধ্যে ৩ জন, ১৮৯৭-৯৮ সালে ১১২ জনের মধ্যে ২ জন এবং ১৮৯৯ সালে ১৫৯ জনের মধ্যে মাত্র ২ জন মুসলমান ছাত্র ছিল।[১৬] এই অনগ্রসরতার পেছনে ছিল রক্ষণশীল মনোভাব, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অনীহা এবং উন্নত জীবন-চেতনার অভাব। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে ইহাদের উপস্থিতির হার ভাল ছিল। যেমন ১৮৭৬-৭৭ সালে মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মোট ৮,৯৪৫ ছাত্রসংখ্যার মধ্যে মুসলমান ছাত্র ছিল ৩,০১৬। ১৮৮২ সালে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহে যেখানে মুসল-মান ও হিন্দু ছাত্রসংখ্যার অনুপাত ১ : ১২, মধ্য বিদ্যালয়গুলিতে তাহাদের অনুপাত ছিল ১ : ২.৪। অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রগণ বাংলা বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশুনা করত। ঊনিশ শতকের শেষ দশকে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতার কারণ অনুমানসাপেক্ষ এবং সেটি সম্ভবত এই যে নবার্জিত ইংরাজী বিদ্যা আর্থিক সমৃদ্ধির সূচনা করেছিল। মধ্য বাংলা ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে সীমিত ছিল অধিকাংশ মুসলমান ছাত্র-দের লেখাপড়া। তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা স্যার এলফ্রেড ক্রফ্ট এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন—"The kuowledge of even a little English was a valuable acquisition to those whose education ends at a middle standard." এই কারণে বোধহয় কোচবিহারের গোবরাছড়া, খড়খড়িয়া, হলদিবাড়ি, পারমেখলীগঞ্জ ও উপনচৌকির মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। যেকোন কারণেই হোক না কেন কোচবিহার মুসলমানদের মধ্যে এই সচেতনতা সত্যই প্রশংসনীয়।

হিন্দু ছাত্রগণের একটি সামাজিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয়গুলিতে মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য ছিল। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। ১৮৯২ সালে বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চশ্রেণীভুক্ত পরিবারের ছাত্রসংখ্যার স্বল্পতা দেখে বিদ্যালয় পরিদর্শক মন্তব্য করেন—"It is my humble conviction that a greater part of even those fifty two are children of foreigners."[১৭] দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা বা মেখলীগঞ্জের মহকুমা বিদ্যালয়গুলিতে বেশীর ভাগ ছাত্রই ছিল বাঙালী এবং আমলাদের আত্মীয়স্বজন। জমিদার, জোতদার,

তালুকদার, ডাক্তার, উকিল ও চাকুরীজীবীদের সন্তানেরাই এই সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে কোচবিহারের অধিবাসীগণের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উপস্থিত প্রামান্য তথ্যাদির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এ রাজ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে শিক্ষার প্রভাব ছিল খুব কম, বিশেষ করে ইংরাজী শিক্ষা যে অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কোচবিহারে বেশ কিছুদিন আগে এসে স্থায়ীভাবে এ রাজ্যে বসবাস করছিলেন তাদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার কম হয়েছিল। এই বিস্তারলাভ না করার কারণ আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং সংরক্ষণশীলতা।[১৮] দিনহাটা মহকুমা বিদ্যালয়ে কোচবিহার স্থানীয় ছাত্রদের সংখ্যা ছিল এই প্রকার: ১৮৮৬তে ৭২ জন ছাত্রের মধ্যে ৫১ জন, ১৮৮৭তে ৮৪ জনের মধ্যে ৫৯ জন, ১৮৮৮তে ৯৫ জনের মধ্যে ৬২ জন, ১৮৮৯এ ১১২ জনের মধ্যে ৭৪ জন ও ১৮৯১এ ১৩৬ জনের মধ্যে ৭২ জন।[১৯] বাকিরা বাইরে থেকে কোচবিহারে আসা চাকুরীজীবীদের সন্তান। দিনহাটা অপেক্ষা মেখলীগঞ্জের বিদ্যালয়ে স্থানীয় ছাত্রদের সংখ্যা ছিল বেশী। এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী বিভাগেও স্থানীয় ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জেনকিন্স বিদ্যালয়ের নথিপত্র প্রমাণ করে যে এই বিদ্যালয়ে ১৮৭৬-৭৭ সালে ১৮০ জন ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ৭৮ জন এবং ১৮৮৮-৮৯এ ৫০২ জনের মধ্যে ১৮২ জন ছিল স্থানীয় ছাত্র।[২০] এই সংখ্যার বেশ কিছু অংশ ছিল "রাজগণ"; [কোচবিহার মহারাজদের অবৈধ সন্তান। এদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের ইচ্ছানুসারে ১৮৬৪ সালের রাজগণদের বিদ্যালয়ে এবং পরে মহাবিদ্যালয়ে অল্প খরচে বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করা হয়।] যেমন, যে ৭৮ জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে ৩৪ জন ছিল রাজগণ অর্থাৎ যারা রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত বাকি ৪৪ জন মাত্র সাধারণ ঘরের সন্তান। শতকরা হিসেবে কোচবিহারের স্থানীয় ছাত্রদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮৯৭-৯৮ সালে ২১ শতাংশ, ১৮৯৮-৯৯ সালে ২৭ শতাংশ ও ১৯০৯-১০ সালে ২৪ শতাংশ। বিশেষত, যারা সরকারি অফিসে চাকরী করত তারা তাদের ছেলেদের জেনকিন্স বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য পাঠাত। উদ্দেশ্য একটিই, ইংরাজী উৎকৃষ্টরূপে আয়ত্ত করে ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরী করা। ইংরাজীর গন্ধ'না থাকলে চাকরীর সুবিধে হত না। বাংলা বা সংস্কৃত জানা লোক সেই সময় সর্বত্রই ইংরাজী জানা ব্যক্তির অপেক্ষা কম বেতন পেত।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও একই উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত। ১৮৮৮ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আন্তরিক ইচ্ছায় কোচবিহারে ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপিত হয়। পরবর্তী উনিশ বৎসর যাবৎ রাজকোষ দ্বারাই এই কলেজের যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা হত। কলেজে পড়ার জন্য জাতিধর্মনির্বিশেষে কোনও ছাত্রের নিকট হতে কোনরূপ অর্থ নেওয়া হত না। যখন থেকে এই কলেজ স্থাপিত হয় তখন থেকেই এখানে স্নাতোকোত্তর বিভাগ চালু করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত সকল বিভাগের সঙ্গে আইনে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত এই মহাবিদ্যালয়ে পড়ান হত। ক্রমশ এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান একটি উন্নত ধরনের মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯০০ সালে এই কলেজে ১৬৮ জন ছিল। ১৮৯৯ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত এই কলেজ থেকে ১৯৯ জন আই-এ, ৭৩ জন বি-এ এবং ১৯ জন বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।[২১]

ভিক্টোরিয়া মহাবিদ্যালয়ে বিনা খরচায় লেখাপড়ার সুযোগ থাকার তৎকালীন বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থান থেকে ছাত্রগণ এখানে আসত উচ্চ শিক্ষা-লাভের জন্য। এখানে একটি ছাত্রের জন্য যেরুপ খরচ পড়ত তা বাংলা-দেশের সরকারি কলেজের খরচের তুলনায় কম ছিল। কিন্তু খরচ যাই হোক না কেন কোচবিহারের স্থানীয় ছাত্র খুবই অল্পসংখ্যক এই মহা-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। ১৯০০ সালে কলেজের ১৬৮ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৯ জন ছিল কোচবিহারী। ১৮৯৬ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে কলেজে বার্ষিক গড়পড়তা ছাত্র ছিল ১৪৪ জন এবং এই ১৪৪ জনের মধ্যে মাত্র ৭ কি ৮ জন ছিল কোচবিহারের আদি বাসিন্দা। যে সকল তথ্যাদি পাওয়া যায় তা থেকে প্রমাণিত হয় যে ১৮৯৬ থেকে ১৮৯৯ সালে শিক্ষা-ক্ষেত্রে মহাবিদ্যালয়ে যে মোট ব্যয় হয়েছিল (৫৯,৪৯১ টাকা ২ আনা ৯ পয়সা) তার সিংহভাগ (প্রায় ৪৯,৮৪৩ টাকা) খরচ হয়েছিল বাইরে থেকে আগত অর্থাৎ ঢাকা, পাবনা, যশোর, ২৪ পরগণা এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার ছাত্রদের জন্য। রাজ্যের বসবাসকারী ছাত্র খুব অল্প-সংখ্যক এই মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করাতে খুব স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন জাগে—এই কলেজ মারফত কোচবিহার রাজ্যটি কতদূর উপকৃত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ রাজ্যের স্থানীয় জনসাধারণ এই মহাবিদ্যালয় দ্বারা লাভবান হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপনের জন্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় সংকোচ করা হয়। ১৮৯৮-৯৯ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বলা হয়েছিল যে বহিরাগত ছাত্রদের

জন্য এইরূপ ব্যয়নির্বাহ করা সমীচীন কিনা; বিশেষ করে যখন অর্থের স্বল্পতার জন্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা সম্ভবপর হচ্ছিল না। যে কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা স্থানীয় কোচবিহারীদের আদৌ কাজে লাগছিল না সেই কলেজকে রাজকোষ হতে প্রচুর ব্যয়ে টিকিয়ে রাখার কি প্রয়োজন?[২২] কিন্তু ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতির পিছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করছিল সেই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই মহাবিদ্যালয়টিকে বাঁচিয়ে রাখা হল।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই রাজ্যের একটি সামাজিক চিত্র দৃষ্টি-গোচর হয়। উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ঐ শতাব্দীর শিক্ষা-বিস্তারের সামগ্রিক চিত্রটি অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধের যাত্রাটির গতি উত্থানপতনের মধ্যে দিয়েও অব্যাহত ছিল। ১৮৭৫-৭৬ সালের ২৮২টি স্কুল ও ৭২৩৪টি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৮৯৯ সালে ৩৪ যথাক্রমে ৩৪৭ ও ১১,২৮৩তে দাঁড়ায়। ১৮৮১ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ২৫,৫৩১ থেকে ২৫,২৭৩এ পৌঁছয়। ১৮৯৮-৯৯ সালে মোট জনসংখ্যা ছিল ৩০২,৪৫৭। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষা-গ্রহণ করার উপযোগী ছাত্রসংখ্যার ১৪·৩ শতাংশ পড়াশোনার সুযোগ পায়। শিক্ষাপ্রসারের সীমারেখা যতটা হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। ১৮৯৫-৯৬ সালে বিদ্যালয়-পরিদর্শক যে মন্তব্যটি করেছিলেন তা বোধ-হয় বহুলাংশে সত্য। তিনি বলেন "......Education in Coochbehar is still a luxury."[২৩] অবশ্য মনে রাখা দরকার যে কোচবিহারের স্থান পার্শ্ববর্তী ইংরেজশাসিত অঞ্চলগুলি—যেমন: রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি অপেক্ষা ভালো ছিল। এই জেলাগুলির ছাত্রসংখ্যার হার যথাক্রমে এইরকম—১৮%, ১৭·৪%, ১৫·৪% এবং ১৮·৩%।[২৪]

কোচবিহারের রাজপরিবার এবং ইংরেজ সরকারের নবপ্রবর্তিত শিক্ষা-মূলক প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার প্রয়োগ সত্ত্বেও সামগ্রিকতার বিচারে তা আশানু-রূপ ফললাভ করে নি। ইংরাজী শিক্ষা বঙ্গদেশে একটি নতুন যুগের সূচনা করে কিন্তু তার ঢেউ কোচবিহারে এসে পৌঁছতে পারে নি এবং এখানের সামাজিক কাঠামো প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেল। শিক্ষার প্রসারহেতু যে সামাজিক গতিশীলতা আসে তা থেকে কোচবিহার বঞ্চিত হল। এ রাজ্যের কৃষিভিত্তিক ও অনুন্নত জনসাধারণের নিকট ইংরাজী শিক্ষা আকাঙ্ক্ষিত আকর্ষণ সৃষ্টি করতে না পারায় সমাজের উচ্চস্তরে পৌঁছনোর পথগুলি তাদের কাছে রুদ্ধ থেকে গেল। শিক্ষা এমন এক ভিত্তি সৃষ্টি করতে

পারল না যার উপর রচিত হতে পারত একটি সুসংহত সমাজ। কোচবিহারে শিক্ষার প্রভাব স্থানীয় বাসিন্দার উপর বিশেষ রেখাপাত করতে পারে নি বলে উনিশ শতকে এখানে মধ্য বিত্তসমাজ গড়ে ওঠে নি। বহিরাগত সুবিধাভোগী শ্রেণীর ক্রমসম্প্রসারণের ফলে সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও স্থানীয় অধিবাসীরা অনেকটা কোনঠাসা হয়ে যায় এবং একজাতীয় প্রতিকূল মানসিক প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়ে পড়ে। ফলে উচ্চবিত্ত ও তথাকথিত সংস্কৃতিবান শ্রেণীর সঙ্গে তাদের একটি দুরতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এর ফলে তারা পিছিয়েপড়া শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই ধরনের হীনমন্যতার ফলে তারা ক্রমে ইংরাজ বিদ্যালয়গুলি থেকে দূরে সরে গেল। রাজবংশীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কিছু পরিমানে হয়ে থাকলেও, মেচ, মোরাঙ ইত্যাদি উপজাতিসমূহ প্রায় সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত রয়ে গেল। শিক্ষার আলোক সমাজের সর্বস্তরে প্লাবিত হয়ে সকলকে সমানভাবে সচেতন করে তুলুক, ইহা তৎকালীন বিদেশী সরকারের নিকট আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। কোচবিহারের শিক্ষানীতি ইংরাজী সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর ভিত্তিতে রচনা হয়; তাই রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা থাকা সত্ত্বেও উনিশ শতকের দিনগুলিতে কোচবিহার দ্রুতপদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে শিক্ষা-দীক্ষায় একটি উন্নত সমাজে পরিণত হতে পারল না।

সূত্রনির্দেশ

১ মজুমদার ডি, গেজেটিয়ার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কোচবিহার, পৃ ১৭১

২ প্রসিডিংস অফ লেফটেনান্ট গভর্ণর অফ বেঙ্গল, আগস্ট ১৮৬৬, জেনারেল ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন নং ৩১

৩ হান্টার, স্ট্যাটিসটিকাল একাউন্ট অফ দ্য স্টেট অফ কোচবিহার। ভলিউম ১০, পৃ ৩৩১

৪ এনুয়াল এডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট, কোহবিহার ১৮৮১-৮২, পৃ ৪

৫ হান্টার, পৃ ৩৪৬-৩৪৭

৬ এনুয়াল এডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট, কোচবিহার ১৮৮১-৮২, পৃ ৩

৭ ঐ, ১৮৭৩-৭৪, পৃ ২০

৮ প্রসিডিংস অফ লেফটেনান্ট গভর্ণর অফ বেঙ্গল, পলিটিকাল ডিপার্টমেন্ট, জানুয়ারী ১৮৭৭

৯ এনুয়াল এডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট, কোচবিহার ১৮৭৬-৭৭

১০ ঐ, ১৮৭৫-৭৬

১১ ঐ, ১৮৯১-৯২, পৃ ৩৫

১২ ঐ, ১৮৯৮-৯৯, পৃ ৪৬

১৩ ঐ, ১৮৮৪-৮৫, পৃ ৪১ ; ১৮৮৯-৯০, পৃ ৩৯ ; ১৮৯৪-৯৫, পৃ ৪৮ ; ১৮৯৮-৯৯, পৃ ৫৭

১৪ ঐ,

১৫ স্কুল রেকর্ড, "এডমিসন রেজিস্টার"

১৬ এনুয়াল এডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট, কোচবিহার ১৮৮৮-৮৯, পৃ ৪৩ ; ১৮৮৮-৮৯, পৃ ৪৩ ; ১৮৯৩-৯৪, পৃ ৪৯ ; ১৮৯৭-৯৮ ; ১৮৯৮-৯৯, পৃ ৬০

১৭ ঐ, ১৮৯১-৯২, পৃ ৪৩

১৮ চৌধুরী হরেন, দ্য কোচবিহার স্টেট, পৃ ১২১-১২২

১৯ স্কুল রেকর্ডস, দেওয়ান সি ডি দত্তের বিবরণ, জানুয়ারী ২০, ১৮৮৬ ; জানুয়ারী ১২, ১৮৮৮ ; জে সি চক্রবর্তীর বিবরণ, ভিসিটরস বুক, ডিসেম্বর ২৩, ১৮৯১

২০ এনুয়াল এডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট, কোচবিহার ১৮৭৬-৭৭, ১৮৮৮-৮৯

২১ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডার, ভিক্টোরিয়া কলেজ, ১৮৯৯-১৯০১

২২ এনুয়াল এডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট কোচবিহার

২৩ ঐ, ১৮৯৫-৯৬, পৃ ৫২

২৪ ঐ, ১৮৯৯-৯৮, পৃ ৪৭

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ও বাঙালী মেয়েরা

সোমা মুখোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে বাঙালী মননে যে বিস্ময়কর প্রস্ফুরণ ঘটে, তাকে নবজাগরণ আখ্যায় ভূষিত করা যায় কিনা, এ নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক রয়েছে। তথাপি এই প্রস্ফুরণের ইতিবাচক দিকটিও উপেক্ষনীয় নয়। তার একটি হল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার আন্দোলন।

বর্তমান প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, এই আন্দোলনের অভিঘাতে একদিকে সমাজে সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলা এবং অন্যদিকে বিশেষ করে নিম্নবর্গের স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বনকারী মহিলাদের মনে কিভাবে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে নব্যশিক্ষিত পুরুষেরা নিজেদের দেশীয় মহিলাদের সঙ্গে ইউরোপীয় মহিলাদের চাক্ষুস পার্থক্যদৃষ্টে এবং সমকালীন ইংলণ্ডের নারীমুক্তি আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সংস্কারের প্রেরণালাভ করেছিলেন।[১] যে পুরুষসম্প্রদায় ইতিপূর্বে অশিক্ষিত স্ত্রী নিয়ে তৃপ্ত ছিলেন, এবং স্বামীস্ত্রী সম্পর্ক সম্বন্ধে আদৌ ভাবিত ছিলেন না, তারা এই প্রথমবারের মত স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের একটা অভাব অনুভব করলেন। উদাহরণস্বরূপ রামমোহন রায়ের কথা বলা যায়। মহিলাদের হীনাবস্থা উপলব্ধি করে যিনি সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিলেন—'স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনকালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন ?... আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন ?'[২] তিনি কিন্তু তার দুই স্ত্রীর কাউকে শিক্ষিত করতে পারেন নি। আবার যিনি তাঁর কর্মোদ্যমের দ্বারা নারীজাতির দুঃখদুর্দশা মোচনের চেষ্টা করেন, সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ব্যক্তিগত

' গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনে অশিক্ষিত স্ত্রী নিয়ে সুখী হতে পারেন নি। প্রসন্নকুমার ঠাকুর অবশ্য এ বিষয়ে কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর কন্যা সারদাসুন্দরী দেবীকে 'জেনানা শিক্ষা' পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষিত করেছিলেন।[৩]

এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কেশবচন্দ্র সেন, বিজয় গোস্বামী, অঘোরচন্দ্র গুপ্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতৃবর্গ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বিষয়ে পাশ্চাত্য ধারণা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তারা লক্ষ্য করেন যে, কিঞ্চিৎ শিক্ষাদান ব্যতীত স্ত্রীদেরকে উন্নততর জীবনসঙ্গিনী হিসাবে তৈরী করা অসম্ভব। স্ববিরোধিতায় পূর্ণ উক্ত ব্যক্তিবর্গ এই অর্থে প্রগতিশীল ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদেরকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, আবার 'অবরোধ প্রথা' অস্বীকার করে মহিলাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে না চেয়ে, নিজেদের রক্ষণশীল মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৯০ সালের 'তত্ত্বোবোধিনী পত্রিকা'র একটি প্রবন্ধে, নব্যশিক্ষিত বাঙালী যুবকের নতুন চাহিদাগুলোর একটি তালিকা তুলে ধরা হয়েছিল এইভাবে—'নব্যসম্প্রদায় চায় যে স্ত্রীটি বাঙ্গালা বেশ জানে, ইংরাজীতে কথাবার্তা কহিতে পারে, সেলি-বায়রণ পড়িতে পারিলে তো সোনায় সোহাগা। পিয়ানো বাজাইতে জানে, চিত্রবিদ্যায় নিপুণতা থাকে এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে পারে। স্ত্রীতে এইসব গুণ থাকিলে তবে তাহাদের মন উঠে এবং হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয়।'[৪] অর্থাৎ এই সমস্ত সংস্কারকামী ব্যক্তিবর্গ বাস্তবক্ষেত্রে নিজেদের জগৎকে কিছুমাত্রায় আধুনিক করতে চেয়ে, তাঁদের স্ত্রীদেরকে একধরনের দেশী মেমের আদলে গড়তে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নায়িকা 'বিমলা' যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শিক্ষিত হয়ে, অর্থোপার্জন করে, মহিলারা পুরুষসমাজের সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ান, এটা তাঁদের মনঃপুত ছিল না।

অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম হলেও তখনকার পুরুষদের মত মহিলারাও মনে করতেন যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল, ভালো স্ত্রী তৈরী করা এবং ভালো স্বামী লাভ করা। তৎকালীন মহিলা সাহিত্যিক জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মতে, একমাত্র শিক্ষাই তেমন আধুনিক স্ত্রী তৈরী করতে পারে যা আধুনিক স্বামী চান।[৫] জ্ঞানদানন্দিনী এবং কৃষ্ণভাবিনী দাসের মতে, মহিলাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য গৃহকর্ম, রন্ধন, সন্তানপালন এবং পরিবারের সদস্যদের সন্তোষবিধান। সুতরাং তাঁরা এমন শিক্ষাকেই আদর্শ বলে অভিহিত করেন, যা মহিলাদের এই গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করে।[৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেও, বিংশ শতাব্দীর নারীমুক্তি আন্দো-

লনের আদর্শের সঙ্গে এই মহিলাদের আদর্শের তেমন কোন সাদৃশ্য ছিল না। সে পর্যায়ে মহিলারা একথা ভাবেন নি যে শিক্ষা পেয়ে তাঁরা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাবেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা তখনো তাঁদের কাম্যবস্তুতে পরিণত হয় নি। পক্ষান্তরে একান্নবর্তীতাই ছিল তাঁদের আদর্শ। বিবাহ, শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়ায়, উক্ত মহিলারা বুঝতেন যে, শিক্ষা হল এক ধরনের প্রশিক্ষণ, যার মাধ্যমে তাঁরা আচার, আচরণ এবং অন্য কতকগুলো গুণ আয়ত্তে এনে, সমাজনির্ধারিত আধুনিক স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন। শতাব্দীর শেষ দু' দশকে চন্দ্রমুখী বসু, কামিনী সেন, কুমুদিনী দাসী, সরলা ঘোষাল প্রমুখ কতিপয় মহিলা চাকুরী গ্রহণ করলেও, সেকালের মহিলারা মনে করতেন না যে, অর্থ-নৈতিক স্বাবলম্বন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। তথাপি এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ রোকেয়া সাখওয়াৎ বেগমের ন্যায় স্বল্পসংখ্যক মহিলারা অনুভব করেন যে, মহিলারা যদি তাঁদের জীবিকার জন্য পুরোপুরি পুরুষদের উপর নির্ভর করেন, তাহলে তাদের কখনোই মুক্ত করা যাবে না। রোকেয়া কেবল শিক্ষকতা ও চিকিৎসাবৃত্তির মত তথাকথিত অভিজাত পেশাকেই মেয়েদের পক্ষে উপযোগী বলে মনে করেন নি, বরং তাঁর মতে কৃষিকাজ ও ব্যবসাও তাদের পক্ষে সমান উপযোগী।[৭] কিন্তু এতো শুধুই ব্যতিক্রম।

আসলে এ যাবৎ যেসব মহিলাদের নিয়ে নবজাগরণের পুরোধারা স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন করছিলেন, তারা সকলেই সম্ভ্রান্ত ঘরের। একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যা হওয়ায় এঁরা সকলেই শিক্ষাকে দেখেছিলেন একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। পুরুষপ্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় আলোকপ্রাপ্ত হয়ে এঁরা, মহিলাদেরকে ঐতিহাসিক ভূমিকায় বন্দী করে রাখার উদ্দেশ্যে প্রণীত পরিকল্পনায় ষোল আনা সম্মতি জানিয়েছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই এঁরা নিজেদের একটি নির্যাতিত শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের দ্বার শুধুমাত্র সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলারাই নয়, নিম্নবর্গের স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বনকারী মহিলারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। একদিকে গ্রামীণ বাংলার অর্থনৈতিক অবনতি এবং অন্যদিকে কলকাতায় উন্নতমানের নাগরিক সভ্যতার পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, গ্রাম বাংলার অগণিত মানুষ এই শতাব্দীতে কলকাতায় বসতি গড়েন। স্ব স্ব বৃত্তি অব-লম্বনকারী ও স্বাধীন উপজীবিকার ঐসব মহিলারা, তৎকালীন নগরসংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের নিকট এরাই পৌঁছে দিতেন বাইরের সমাজসংস্কৃতি। এঁদের মধ্যে বৈষ্ণবীদের কথা সর্বপ্রথম আলোচ্য।

১৮৩০এর দশকে রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরোধিতায় মিশনারি প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে যায়। তখন ধনী পরিবারের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রলোক অন্তঃপুরে আপন পরিবারের স্ত্রী-কন্যাদের শিক্ষাদানের জন্য অর্থব্যয় করে শিক্ষিত বৈষ্ণবী বা ইংরেজ মহিলাদের নিযুক্ত করেন। এটি 'জেনানা শিক্ষা' পদ্ধতি নামে পরিচিত ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্ত্রী, তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সারদাসুন্দরী প্রমুখ এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বর্ণকুমারী দেবীর ভাষায় "প্রতিদিন প্রভাতে স্নানবিশুদ্ধা, শুভ্রবসনা, গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না।...ইঁহার চমৎকার বর্ণনাশক্তি ছিল, কথকতা ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন।"[৮] শুধু অন্দরমহলে শিক্ষাদান করেই নয় পুরুষদের মত এঁরাও আপন আপন কবিদল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। ১৮২৮এর ২২ নভেম্বরের সমাচার দর্পণে ভবঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালার এক চিঠির প্রতিলিপি থেকে জানা যায় কিভাবে এই বৈষ্ণবীর দল তাঁদের উপর দৌরাত্ম করেছিলেন—'তাহারা প্রায় সকল পরবে লোকের বাটিতে৽নাচিয়া কবি গাহিত, কিন্তু তাহা সদরে কোন উপায় করিয়া নেড়ীর দায় হইতে রক্ষা পাইয়াছি'।[৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, দেহোপজীবীনীদের ব্যবসার বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৩র মহানগরীর ৪০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে বারাঙ্গনাদের সংখ্যা ছিল ১২,৪১৯, ১৮৬৭তে তা হয় ৩৩,০০০।[১০] এইসব বারাঙ্গনারাও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা শিক্ষিত হয়ে বাঙলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন তার যথেষ্ট নজির রয়েছে। এঁদের মধ্যে নটী বিনোদিনী রচিত 'আমার কথা' নামক আত্মজীবনী সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষুদ্র আত্মজীবনীতে তিনি প্রায় আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতেই অগ্রসর হয়ে বলেন "বারাঙ্গনাজীবন কলঙ্কিত ঘৃণিত বটে? কিন্তু সে কলঙ্কিত ঘৃণিত কোথা হইতে হয়?...ভাবিতে হয় এ জীবন প্রথম ঘৃণিত করিল কে?...অনেকেই পুরুষের ছলনায় ভুলিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিয়া চিরকলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া অনন্ত নরক যাতনা সহ্য করে। সে সকল পুরুষ কাহারা? যাহারা সমাজ মধ্যে পূজিত আদৃত তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নন কি?"[১১] সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর এই অঙ্গুলীচালনাকে ভালো চোখে দেখেন নি তাঁর গুরু স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। আমার কথার ভূমিকাতে গিরিশচন্দ্র জানিয়েছিলেন 'নিজ জীবনীতে উক্তরূপ কঠোর লেখনীচালন না হইলেই ভালো ছিল।'[১২] বিনোদিনীর পাশাপাশি তারাসুন্দরী, মানদাসুন্দরী প্রমুখেরাও সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। রচনাশৈলীর দিক থেকে উন্নত হলেও

তৎকালীন ভদ্রলোকেরা এক ধরনের আশংকায় এঁদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেছেন। এবার আমরা দেখবো সেই আশংকাটা কী ছিল?

নিম্নবর্গের মহিলাদের সমস্ত রচনাই ছিল তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনী নিয়ে। তাই তৎকালীন সমাজসংস্কারকেরা বিধবা-বিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা বাল্যবিবাহ প্রভৃতি উচ্চবর্গের নারীসমাজের যে সমস্যাগুলো নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন, তা নিম্নবর্গের মহিলা লেখিকাদের একেবারে স্পর্শ করে নি। পক্ষান্তরে তাঁরা তাঁদের লেখনীর দ্বারা উচ্চবর্গের মানুষদের আক্রমণ করেছিলেন। অন্যদিকে এঁদের স্বাধীন জীবনযাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে, অন্তঃপুরের অসূর্যম্পর্শা মহিলারা যদি পুরুষকর্তৃত্ব নস্যাৎ করে, বহির্জগতে পা রাখেন, সেই আশঙ্কার নব্যশিক্ষিত ভদ্রলোকেরা বিশেষভাবে ভীত হয়েছিলেন। তাই ১৮৫৬ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ বারাঙ্গনাদের বসতি কলকাতার নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করার জন্য বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে আন্দোলন শুরু করেন।[১৩] বারাঙ্গনাপ্রথার মূল কারণগুলো অবসান না করে, তাদের অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখার ধারণাটা যেন তৎকালীন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। আবার এই বারাঙ্গনারাই যখন শিক্ষিত হয়ে সাহিত্যচর্চা করতে এগিয়ে এসেছেন তখন ঐ ভদ্রলোকরাই তাতে প্রতি পদক্ষেপে বাধাদান করেছেন। ১৮৭৩ সালে নবীনকালী নামে এক বারাঙ্গনার আত্মজীবনী 'কামিনী কলঙ্ক' যখন হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় সমালোচিত হয়, তখন কেশব সেনের 'Indian Mirror' পত্রিকা তাকে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করে।[১৪] আবার ১৮৭৪ সালে যখন অভিনেত্রী 'গোলাপ' গোষ্ঠবিহারী নামের এক 'ভদ্রলোককে' বিবাহ করেন, তখন এই বিরোধিতা প্রবল আকার ধারণ করে। মনোমোহন বসুর মধ্যস্থ পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি শ্লেষাত্মক গানও ছাপা হয়।[১৫] বলাবাহুল্য এই মহিলাই বিবাহের পর সুকুমারী দত্ত নামে পরিচিত হয়ে 'অপূর্বমতী' নামের বেশ ভালো একটি নাটক লেখেন। এটি মহিলাদের প্রথম নাটক।[১৬]

নিম্নবর্গের মহিলারা যাতে শিক্ষিত হতে না পারেন, ভদ্রলোকেরা তার সমস্ত ব্যবস্থাই করেছিলেন। ১৮২৩-২৮ সালের মধ্যে চার্চ মিশনারি সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় মিস মেরী অ্যানকুক অন্তত ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[১৭] এইসব বিদ্যালয়ে সম্ভ্রান্তবংশীয় মেয়েদের বদলে 'বাগদী, ব্যাধ, বেদে, বৈরাগী ঐসব নিম্নশ্রেণীর মেয়েরাই যেত। ভদ্রলোকেদের বিরোধিতায় ঐসব বিদ্যালয় ১৮৩০এর দশকে বন্ধ হয়ে যায়। 'আমার কথা'র ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, 'বিনোদিনীর নিকট শুনিয়াছি তাহার একটি

কন্যাসন্তান হয়। সেই কন্যাটিকে শিক্ষাদান করিবে। বিনোদিনীর বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে কন্যা নীচকুলোদ্ভবা—এই আপত্তিতে কোন বিদ্যালয়ে গৃহীত হয় নাই। যাহাদিগকে বিনোদিনী বন্ধু বলিয়া জানিত কন্যার শিক্ষা-প্রার্থী হইয়া তাহাদের অনুনয়-বিনয় করে, কিন্তু তাহারা সাহায্য না করিয়া বরং সে কন্যার বিদ্যালয় প্রবেশে বাধাপ্রদান করিয়াছিল শুনিতে পাই।'[১৮]

শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ সবচেয়ে বেশী আক্রমণ করেছিলেন বৈষ্ণবীদের। ১৮৬০এর দশকে বাঙালী মহিলাদের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তৈরি করে অন্তঃপুরিকাদের পড়ানোর জন্য নর্ম্যাল স্কুলের সৃষ্টি হয়। বৈষ্ণবীরা জীবিকা-নির্বাহের জন্য এই স্কুলে শিক্ষানবিসি করেন। ভদ্রসমাজের আক্রমণ যে কি তীব্র হয়েছিল তা ১৮৬৬ সালে সোমপ্রকাশের একটি চিঠি থেকে স্পষ্ট হয়—'ঢাকায় একটি নর্ম্যাল বিদ্যালয় হইয়াছে, কিন্তু তথায় প্রায় বৈষ্ণবীর সংখ্যা অধিক। আমরা ইঁহারদিগকে অবমাননা করিতেছি না, কিন্তু বলিতেছি, বৈষ্ণবীদিগের উপরে সর্বসাধারণের ভক্তি অতি অল্প। এ অভক্তির বিশেষ কারণ আছে এবং লোকে এ শ্রেণীর শিক্ষকের নিকটে যদি কন্যাগণকে না পাঠান, তাহা হইলে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। যাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া গৃহের অলংকার স্বামীর সুখ ও সন্তানগণের চরিত্রের আদর্শ হইবে! তাহাদিগের শিক্ষকতা এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের কাজ···বৈষ্ণবীদিগের প্রতি চরিত্রঘটিত···আপত্তি আছে'।[১৯] বৈষ্ণবীদের প্রতি চরিত্রঘটিত অভিযোগ নিয়ে হাওড়া বিভাগের বিদ্যালয় উপ-পরিদর্শক, মাধবচন্দ্র শর্মা 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসন'এর কাছে একটি বয়ানে মন্তব্য করেন।[২০]

ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার এই মহিলারা তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য সহকারে, শিক্ষিত মহিলা সাহিত্যশিল্পের পাশাপাশি একটা সমান্তরাল কিন্তু অনেকটা বিপরীত মেজাজের ধারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের এই বিকল্প সাহিত্যে, অনেকটা তির্যক প্রতিবাদের কায়দায় আক্রমণ করা হয়েছিল, সমাজের উপরতলাকার ভদ্রশিক্ষিত ব্যক্তি এবং তাদের প্রবর্তিত নিয়মকানুনগুলো। সর্বশক্তিমান 'মহাদেব' তাই এঁদের রচনায় গাঁজাখোর অকর্মন্য বুড়ো শিব। আবার সাংকেতিক উপায়ে মেয়ে-পুরুষের সম্পর্ককে উল্টে দেখাতেন এরা নিজস্ব রচনায়। যেমন চিৎপাত শিবের বুকের উপর কালীর নৃত্য। বক্তব্যের স্বাধীনতা এবং অকপট সত্য কথায় তাঁদের লেখা এমনই পরিপূর্ণ ছিল যে ভদ্রসমাজের কাছে অচিরেই তা চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। সমাজ থেকে এঁদেরকে সরিয়ে দেবার জন্য, শিক্ষিত পুরুষেরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

পুরুষদের পাশাপাশি একাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন শিক্ষিতা মহিলারাও। এঁরা এদের মার্জিত লেখনীর দ্বারা পূর্বোক্ত মহিলাদের কণ্ঠরোধ করতে উদ্যোগী হন। লোকসাহিত্যের রাধাকৃষ্ণের অবৈধ প্রণয় বা স্বাধীনা স্ত্রীর স্বচ্ছন্দচারিতার পরিবর্তে স্বামী ও সন্তানের প্রতি আজীবন আনুগত্য ও দায়িত্বপালনই এঁদের রচনার মূল সুর হয়ে দাঁড়াল। অন্তঃপুরে বন্দী পুরুষনির্ভর উক্ত মহিলাদের লেখায় তাই প্রতিবাদের কোন ভাষা পাওয়া যায় না। লোকসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বন করে স্বামী বা প্রেমিককে যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হত, শিক্ষিতা মহিলারা তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে স্বামীর কাছে স্ত্রীর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের আদর্শ তুলে ধরলেন। কবি ও বিদূষী মহিলা হিসেবে সুপরিচিত প্রিয়ম্বদা দেবী দাবী করেন যে 'সেই শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যা স্ত্রীকে স্বামীর প্রিয়া, পরিচালিকা ও শিষ্যে পরিণত করে।' তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা মহিলা সাহিত্যিকদের রচনায় ব্যক্তিগত সুখদুঃখটাই বড় করে দেখা দেয়। লোকসাহিত্যের হাস্যরস, অকপট সারল্যে জীবনের সত্যতাকে তুলে ধরার ক্ষমতা ছিল না এঁদের। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বোধহয় অগ্রাহ্য করা যায় না। স্বাবলম্বী না হওয়ার দরুন জীবনধারণের জন্য এদের সম্পূর্ণভাবে পুরুষদের উপর নির্ভর করতে হত। তাই নিম্নবর্গের মহিলাদের মত বুড়ো স্বামী হিসেবে শিবের গাঁজাখুরি দিয়ে রসিকতা বা বিদ্রুপাত্মক কবিতা লিখে পুরুষদের আক্রমণ করার সাহস এঁদের ছিল না। পুরুষদের দ্বারা শিক্ষিত হয়ে তাঁদের মনোরঞ্জন করতে পারে এমন লেখা লিখে এঁরা, পুরুষদের সন্তোষবিধান করতে চাইতেন। আর এই কারণেই তাঁরা হয়েছিলেন 'রুচিবান' আর নিম্নবর্গের খেটেখাওয়া মহিলারা 'অশিক্ষিত'। অথচ যে ধরনের সময় ও অর্থব্যয় করে নবজাগরণের পুরোধারা তাঁদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তার একাংশ যদি শেষোক্তদের জন্য করা হত তাহলে হয়ত এই আন্দোলন আরো বেশী শক্তিশালী হতে পারত। পরিশেষে তাই একটি প্রশ্ন কি জাগে না যে সমাজের সবচেয়ে বৃহৎ অংশটিকে শিক্ষার আলোক থেকে দূরে সরিয়ে রেখে নবজাগরণ আন্দোলন কি সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছিল ?

সূত্রনির্দেশ

১ গোলাম মুরশিদ, সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, (১৮৫৪-৭৬), প্রথম সংস্করণ, ঢাকা বাংলা অ্যাকাডেমি

২ রামমোহন রায়, রামমোহন গ্রন্থাবলী, পৃ ২০৫

৩ গোলাম মুরশিদ, পূর্বোক্ত

৪ বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, কলকাতা, ১৯৮০ ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৩৬৩

৫ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্ত্রীশিক্ষা, ভারতী, আষাঢ়, ১২৮৮, পৃ ২৬৩

৬ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, পূর্বোক্ত, কৃষ্ণভাবিনী দাস, স্ত্রীলোকের কাজ ও কাজের মাহাত্ম, ভারতী ও বালক, ভাদ্র, ১২৯৮, পৃ ২০৭

৭ রোকেয়া সাখওয়াৎ হোসেন, স্ত্রী জাতির অবনতি, রোকেয়া রচনাবলী, পৃ ৩০

৮ স্বর্ণকুমারী দেবী, আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার

৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সংকলিত ও সম্পাদিত), সংবাদপত্রের সেকালের কথা, কলকাতা ১ম খণ্ড, পৃ ১৪৪

১০ কলকাতার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ও কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি, ডঃ (মিসেস) ঊষা চক্রবর্তী, Condition of Bengali Women Around the Second half of the 19th Century, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ ১৬

১১ আমার কথা ও অন্যান্য রচনা, বিনোদিনী দাসী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত, সুবর্ণরেখা, পৃ ৬২

১২ ঐ

১৩ দ্রষ্টব্য, বিনয় ঘোষ, (সংকলিত ও সম্পাদিত) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ ২৪৪

১৪ উদ্ধৃত, হিন্দু পেট্রিয়ট, অক্টোবর ১৩, ১৮৭৩

১৫ দ্রষ্টব্য, মনোমোহন গীতাবলী, কলকাতা, ১২৯৩, পৃ ২৪১

১৬ নীতা সেন সামর্থ, তিনশ' বছরের কলকাতা : নারীদের ভূমিকা, দেশ, মার্চ ১৭, ১৯৯০, পৃ ৫৩

১৭ গোলাম মুরশিদ, সংকোচের বিহ্বলতা : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণীর প্রতিক্রিয়া, (১৮৪৯-১৯০৫)

১৮ বিনোদিনী দাসী, আমার কথা ও অন্যান্য রচনা

১৯ বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৬

২০ Bela Dutta Gupta (Bd), Sociology in India, Calcutta, 1972

প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিশেষ উৎস

১ প্রাঙ্গন বিহারিণী রসবতী : উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে মহিলাশিল্পী, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ, একবিংশতি বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ ১০০-১২৭

২ গোলাম মুরশিদ, সংকোচের বিহ্বলতা, আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণীর প্রতিক্রিয়া (১৮৪৯-১৯০৫), ঢাকা, বাংলা অ্যাকাডেমি

৩ গোলাম মুরশিদ, সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক (১৮৫৪-৭৬), প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৪, ঢাকা, বাংলা অ্যাকাডেমি, পৃ ২৫২-৩০৬

৪ মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, নারীমুক্তির সেকাল একাল, দেশ, মার্চ ১৯, ১৯৮৮

৫ ডঃ জ্ঞানেশ মৈত্র, নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য

৬ সুধীর চক্রবর্তী, গানের কলকাতা, দেশ, বিনোদন, ১৯৮৯

৭ চিত্রা দেব, ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল

৮ নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বাঙালী জীবনে রমণী, আত্মঘাতি বাঙালী, মিত্র ঘোষ প্রকাশনী

৯ তপন রায়চৌধুরী, ইউরোপ রিকনসিডার্ড পারসেপসান অব দ্য ওয়েস্ট ইন নাইনটিনথ সেঞ্চুরী বেঙ্গল, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮

১০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে নারী

উনবিংশ শতকের বাংলা নাটক ও নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতি ঃ একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

নির্মলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা গল্প দিয়েই শুরু করা যাক। এক রাজা বহু কষ্টে পাশের রাজ্যটিকে জয় করলেন। জয় করেই বিজয়ী রাজা বিজিত দেশের বাদ্যকরদের ধরে এনে তাদের কোতল করবার হুকুম দিলেন। বাদ্যকররা অবাক। জোড়হস্তে তারা বলল—'মহারাজ! আমাদের কি দোষ? আমরা তো আপনাদের সঙ্গে লড়াই করি নি।' রাজা বললেন—'তোমরাই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। যুদ্ধকালে বাদ্য বাজিয়ে তোমরা তোমাদের দেশের সৈন্যদলকে এমন রণোন্মত্ত করে তুলেছিলে যে, দীর্ঘকাল চেষ্টা করেও এদেশ জয় করতে পারি নি আমি।'[১] জাতীয় সংকটে নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীরা এই বাদ্যকরের দল।

বাঙালীর জাতীয় নাট্য 'যাত্রা'-র ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এ ঐতিহ্য সাধারণ মানুষের। যাত্রাতেই প্রথম স্থান পেল সংস্কৃত নাটকের রাজবন্দনা ও দুর্বোধ্য ভাষার পরিবর্তে আবেগ, সহজতা ও সরলতা। সাধারণ মানুষের কাজের বস্তু হয়ে উঠল এই যাত্রা। তারপর এল ইংরেজদের আমল। ইংরেজী শিক্ষার ফলে দেশে নতুন যুগের হাওয়া উঠল। ইংরেজদের থিয়েটার দেখে কলকাতার অভিজাত বাঙালীরা শখের থিয়েটারে মেতে উঠলেন। ক্রমশ কলকাতার মধ্যশ্রেণীর মধ্যে থিয়েটার জড়িয়ে পড়ল। সমাদর লাভ করল, শেষে তাঁদেরই চেষ্টায় কলকাতায় পাবলিক থিয়েটারের ভিৎ পত্তন হল। এদিকে যাত্রার পালায় সমকালীন যুগের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনী স্থান পেল না। সেই কৃষ্ণলীলা—চৈতন্যলীলা—দক্ষযজ্ঞ—ধ্রুবচরিত্র—কমলে-কামিনী প্রভৃতি পুরাণের কাহিনী। শহর কলকাতায় যাত্রা জনপ্রিয়তা হারাল। তারপর থিয়েটারের প্রভাবে আমাদের নিজস্ব নাট্য 'যাত্রা'-তে চেহারাটি হয়ে উঠল 'থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা'।[২]

গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অভিনয় বলতে বাঙালী 'যাত্রা' অর্থাৎ মঞ্চ ও দৃশ্যপটবিহীন খোলা আসরে গীতাভিনয়ই বুঝতো। বদ্ধপ্রেক্ষাগৃহে 'মঞ্চে অভিনয়' রীতি বাঙালীর অজানা ছিল। ইংরেজের থিয়েটারই এদেশে মঞ্চাভিনয়ের উৎসমুখ খুলে দিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবদের হাতে গড়েওঠা 'প্লে-হাউসের' রঙ্গকলাকাণ্ড দেখবার সুযোগই ছিল না কলকাতার মানুষের। ১৭৯৫তে রুশি হেরাসিম লেবেডেফের ডোমতলার থিয়েটারের বাংলা নাটকে মজে নি কলকাতার মানুষ। কলকাতা ডুবেছিল দেশজ খেউড় তরজা যাত্রাগানে। লেবেডেফের থিয়েটার বেশিদিন টেঁকে নি। যাঁদের জন্য তাঁর প্রথম বাংলা নাটক (অনুবাদে বাংলা) মঞ্চায়নের আয়োজন, কলকাতার সেই বাঙালীরা কোন আগ্রহবোধ করেন নি সেদিন। কিন্তু কোন্ 'বাঙালীরা' ? কলকাতার বাঙালীদের স্তরভেদ ছিল। কলকাতায় কোনদিন কোন একক 'কলকাতাই' সংস্কৃতি বা কোন সাংস্কৃতিক মূলধারা তৈরী হতে পারে নি। 'বিলিতি' সংস্কৃতি অনুকরণ করে 'বাবু' সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ; 'বাবু' সংস্কৃতি ভেঙে 'ভদ্রলোক' সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তারপর এই 'ভদ্রলোক' সংস্কৃতি কলকাতার তথা বাঙালীর 'নিম্নবর্গের' সংস্কৃতির উপর দৌরাত্ম করে তাকে অবদমিত করেছে।[৩]

কিন্তু এই 'নিম্নবর্গ' মানে কারা ? উৎপল দত্ত তাঁর 'টিনের তরোয়াল' নাটকে দেখিয়েছেন যে 'নিম্নবর্গ' হল 'মেথর-ডোম' শ্রেণীর লোক, যাদের সঙ্গে উচ্চবর্গের সংস্কৃতির বিরোধ আছে অর্থাৎ 'খেউড়-তরজার' সঙ্গে উচ্চবর্গের 'থিয়েটারের' বিরোধ।[৪] কিন্তু সম্প্রতি এক গবেষণায় সুমিত সরকার বলেছেন যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অতিসরল সামাজিক ভেদরেখা না টানাই ভাল। 'নিম্নবর্গ' বলতে শুধু 'কৃষকচৈতন্য' না বুঝে 'নিম্ন-মধ্যবিত্ত' জগৎকেও বোঝা উচিত।[৫]

লেবেডেফের পর কলকাতায় 'উচ্চবর্গের' নাট্যচর্চা আবার দেখা গেল ১৮৩১ সালে। বেলেঘাটা শুঁড়োর বাগানে প্রতিষ্ঠিত নব্য শিক্ষিত অভিজাত রুচির বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার কার্যত কিন্তু ছিল পুরোদস্তুর সাহেবি। লেবেডেফ তবু বাংলা নাটক অভিনয় করিয়েছিলেন বাঙালী শিল্পীদের দিয়ে, প্রসন্নকুমার এককদম পিছিয়ে বাঙালীদের দিয়ে ইংরেজী নাটক করাতে শুরু করলেন। প্রসন্নকুমারের থিয়েটারও বেশীদিন চলল না। কলকাতার মানুষ তখনও থিয়েটারকে খুব একটা আমল দিচ্ছেন না। প্রথম কলকাতা কাঁপালেন নবীনচন্দ্র বসু ১৮৩৫-এ 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ে মহিলাচরিত্রে মহিলাদের নামিয়ে। কলকাতার অন্ধকারের

নেপথ্যালোকের অধিবাসিনীরা পাদপ্রদীপের আলোয় লোকচক্ষুর সামনে দাঁড়াতে পেরেছিলেন এই থিয়েটারের আশীর্বাদেই। কিন্তু সেটা তো শারীরিক-ভাবে, মানসিকভাবে কতটা ?

আসলে নেপথ্যের প্রাণীকে আলোকিত করার যে কাজ বাংলা থিয়েটারের করা উচিত ছিল, তা বাংলা থিয়েটার করতে পারে নি, বরং বলা উচিত করতে চায় নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় গ্রামীণ অর্থনীতির অবনতি ও কলকাতায় এক নতুন নাগরিক সভ্যতার গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে অগণিত মানুষ চলে আসেন কলকাতায়। গ্রাম থেকে আগত এই নিম্নবর্গের মানুষগুলি কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সমৃদ্ধশালী লোক-সংস্কৃতি, দৈনিক আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী—গান, পাঁচালী, কথকতা, যাত্রা, কীর্তন ইত্যাদি। এই লোকসংস্কৃতির এক অর্থে একটা বিকল্প সংস্কৃতি ছিল অভিজাত-শ্রেণীর শিক্ষিত রুচিপ্রসূত সাহিত্যশিল্পের পাশাপাশি একটা সমান্তরাল, কিন্তু অনেকটা বিপরীত মেজাজের ধারা। হাটবাজারের এই সমান্তরাল সংস্কৃতি পুরোনো সমাজেও ছিল—সংস্কৃতঘেঁষা ধর্মীয়, বা রাজসভার পৃষ্ঠ-পোষকতায় সৃষ্ট সঙ্গীত-নাটকের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত বহুধাবিস্তৃত লোকসংস্কৃতি। অনেক সময়ই এই বিকল্প লোকসংস্কৃতি অভিজাত সংস্কৃতির প্যারডি-রূপে প্রকাশিত হত, এটা ছিল নিম্নবর্গের মানুষের তির্যক প্রতিবাদের কায়দা। সমাজের কর্তাব্যক্তিদের অলঙ্ঘনীয় নিয়মকানুন, ব্রাহ্মণ্যধর্মের রুচিবাগীশ পবিত্রতার প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতা। মেছোহাটা ভাষা দিয়ে সংস্কৃতঘেঁষা দুর্বোধ্য বাঙলার গতিরোধের চেষ্টা। কিন্তু বিলিতি, বাবু ও ভদ্রলোকি—এই তিন সংস্কৃতির টানাপোড়েনে বাংলা থিয়েটার হেলেছে, টলেছে ; নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিকে অবদমিত করেছে।

সুতরাং শারীরিকভাবে এলেও মানসিকভাবে সামনে আসে নি অন্ধকারের মানুষেরা। এইভাবে বিচ্ছিন্ন ও অস্থায়ী নাট্যপ্রয়াসে পেরিয়ে গেল শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশটি বছর। "কখনও বাবুদের সখের থিয়েটার, কখনও খেয়ালের থিয়েটার, কখনও শাসক ইংরেজের অনুকরণে থিয়েটার। কখনও বা তাদের মনোরঞ্জনের থিয়েটার।"[৬]

এরপর ১৮৫৫ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি শুধু যে বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম মৌলিক নাট্যরচনার গৌরবের অধিকারী তা নয়, রামনারায়ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্য আন্দোলনের উৎসমুখ খুলে দিলেন। 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-এ কৌলীন্যপ্রথাকে, 'নব নাটক'-এ বহুবিবাহ

প্রথাকে আক্রমণ করে নাটকে অন্ধ সংস্কার, কু-প্রথা, সামাজিক ব্যাধি ইত্যাদি আক্রমণ করতে শিখিয়ে রামনারায়ণ পরবর্তীকালের বদলা নাটকের প্রতিবাদী চরিত্রকে দাঁড় করিয়ে যান।

১৮৫৪-৭৬, এই ক'বছরের মধ্যে দেখা দিল সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রচিত হতে লাগল বাংলা নাটক। সমাজ-সংস্কারবিষয়ক সচেতনতা ও মনোভাব সেকালের সাহিত্যের সকল বিভাগেই কমবেশী ছড়িয়ে থাকলেও, নাটকেই বোধহয় ব্যাপক ও সরাসরিভাবে ব্যক্ত হয়।[৭] আমরা দীনবন্ধু, মধুসূদনের মত নাট্যকারদের একাধিক ভাল নাটক পেলাম। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করবার মত। উচ্চবর্গীয় মানুষদের এই সংস্কৃতিতে বিশেষ করে নাটকের ক্ষেত্রে আমরা যে সেযুগের মানুষদের, বিশেষ করে সে-যুগের নারীসমাজের সমস্যাগুলি—সতীদাহপ্রথা, কৌলীন্যপ্রথা, বাল্য-বিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতির উল্লেখ পাই; নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিতে এই সমস্যাগুলির প্রতিফলন বড় একটা পাওয়া যায় না।[৮]

১৮৭২-এ প্রতিষ্ঠিত হল সাধারণ নাট্যশালা, 'ন্যাশানাল থিয়েটার'। রাজবাড়ির নাটমঞ্চ থেকে থিয়েটার নেমে এল রাস্তায়। "সত্তরের দশক সত্যিই মুক্তির দশক ছিল ঊনিশ শতকে, সে মুক্তি থিয়েটারের মুক্তি।"[৯] কিন্তু অতঃপর আত্মসমালোচনামূলক সংস্কার আন্দোলনের পরিবর্তে আত্মগর্বমূলক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনেই শিক্ষিত ব্যক্তিদের কৌতূহল এবং মনোযোগ সঞ্চারিত হয়।[১০] তার প্রভাব পড়ে বাংলা নাটকে। 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকে সাম্রাজ্যবাদী শাসককে কলঙ্কিত করার অপরাধে ১৮৭৬ সালে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন রচিত হয়। ফলে বাংলা নাটকের যেটুকু প্রতিবাদী, সংগ্রামী চরিত্র ছিল তাও আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল। ক্রমে বাংলা নাটকে ধর্ম, পুরাণ, ঈশ্বরতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন, কায়েমী স্বার্থ, পেটিবুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষাসংস্কৃতির মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব, রাজতন্ত্র ও প্রভুদের বীরত্ব, প্রেম ও মমতার দ্বন্দ্বের ইতিহাসকে প্রকৃত মর্যাদা দিয়ে প্রচার করা শুরু হয়, যার উদগাতা গিরিশ ঘোষ এবং যে ধারাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষীরোদপ্রসাদ হয়ে দ্বিজেন্দ্রলালে পরিপুষ্ট হচ্ছে; যার কারণ হিসেবে গিরিশ-অনুরাগী সমালোচকবৃন্দ[১১] নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিলের দোহাই দিচ্ছেন আর গিরিশ-বিরোধীরা[১২] তৎকালীন নাট্যপ্রণেতাদের ইতিহাস-বোধের অভাব, ইতিহাসচর্চায় খণ্ডিত, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী, জাতীয়তাবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে হিন্দুয়ানীর বাড়াবাড়ি ও তাকে ঐতিহাসিক ভিত্তি করে প্রচার প্রভৃতি কারণ দেখাচ্ছেন।[১৩]

কিন্তু এর বাইরেও কথা থেকে যায়। "বাবু থিয়েটারের চৌহদ্দির মধ্যেই বাংলা নাটকেরই যথার্থ উন্মেষ।"[১৪] তথাকথিত 'পাবলিক' থিয়েটারের পত্তনে জাতমর্যাদার সুচিবায়ে কণ্টকিত বাবুয়ানির জায়গায় খানিকটা ভদ্রলোকি গণতান্ত্রিকতা এল। কিন্তু থিয়েটারের কেনাবেচায় টাকার ভূমিকা যতই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল, ততই টিকিট থেকে শুরু করে নাটক, নাট্যকার, অভিনেতা সবই কেনাবেচার সামগ্রী হয়ে উঠল। "ভদ্রলোকি সংস্কৃতির মধ্যে থেকেই কলকাতার থিয়েটার উঠে এসেছিল, কিন্তু বাবুবিলাসের হামবড়াই ভিকটোরিও ইংল্যাণ্ড-এর ম্যানেজার-অভিনেতানির্ভর থিয়েটার ব্যবসায়ের ব্যবসায়িক নীতির সঙ্গে মিলে গিয়ে কলকাতার পেশাদার থিয়েটারকে শেষ পর্যন্ত বাবু সংস্কৃতির প্রগতিশীল মাত্রা থেকে তাকে অচিরেই বিচ্ছিন্ন করে দেয়।[১৫]

কিন্তু চেষ্টা যে একেবারেই হয় নি, তা নয়। কলকাতার ভদ্রলোক সংস্কৃতির মধ্যে যারা কিছুটা ভবিষ্যমুখী, তাঁরা বারবার প্রলুব্ধ হয়েছেন নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতির ভাষা ও প্রতিবাদী চেতনাকে আত্মস্থ করতে। বস্তুত বাবুদের ছোটলোকি বড়মানুষীকে আঘাত করতে কালীপ্রসন্ন ও মধুসূদন দু'জনেই নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতির শাণিত অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। 'লোকরহস্য'-র বঙ্কিমচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ত তো বটেই। অতি সন্তর্পণে গিরিশচন্দ্র তাঁর 'পঙ্করঙ'-এ ঐ একই পথের পথিক। কিন্তু বাংলা নাটক ও থিয়েটার ভদ্রলোকি সংস্কারের মধ্যে নিজেকে এমনভাবেই বেঁধে ফেলল যে ভদ্রলোকি জীবনযাত্রার যাবতীয় ক্লীবতা ও অতিসাবধানী আপসমুখীনতাই তার চরিত্রধর্ম হয়ে দাঁড়াল।[১৬]

কলকাতায় বাঙালীরা যখন থিয়েটার খোলে নি তখন বাঙালীর একমাত্র প্রমোদমাধ্যম ছিল যাত্রা। কলকাতার থিয়েটার যাত্রা থেকে আসে নি একথা ঠিক। কিন্তু যাত্রাকে অস্বীকারও করতে পারে নি। গিরিশচন্দ্র এবং তাঁর অনুগামীরা যে অজস্র গীতাভিনয় লিখেছেন, তাতো যাত্রাকেই অনুসরণ করে। এ ছাড়া সং ও সখীর নাচ, গান ও নাচের ব্যাপক প্রয়োগে থিয়েটার যাত্রার কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছিল বলা যায়।[১৭]

কিন্তু এই 'থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা'-য় থিয়েটার যাত্রার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল না যাত্রা ও অন্যান্য নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতি থিয়েটারের ভদ্রলোকি সংস্কৃতি কর্তৃক অবদমিত ও আত্মকৃত হয়েছিল, তা বিচার্য বিষয়।[১৮] কিন্তু এটা ঠিক যে ধীরে ধীরে শিক্ষিত মহলে থিয়েটারপ্রীতি জাগতে লাগল। কিন্তু সাধারণ বাঙালীর মনে যাত্রার প্রতি রইল আলাদা আকর্ষণ। তাই যখনই নাচে গানে ভরপুর কাহিনীর রঙদার পরিবেশন হয়েছে থিয়েটারে তখনই

সেখানে লোকে লোকারণ্য হতে বিলম্ব হয় নি। আর এর সুযোগ নিতে পারেন নি উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতির পুরোধারা।

কিন্তু শুধুমাত্র "মঞ্চ-অভিনেতার শিল্পকলায় উজ্জ্বল হয়ে উঠা"[১৯] কিম্বা "থিয়েটারের একটা ভাল কাজ"[২০] করার জন্য বর্তমান কালের নাট্যপুরোধারা যেমন তাঁদের সময় থেকে পিছিয়ে যাচ্ছেন, যুগকে এড়িয়ে যাচ্ছেন ; ঊনবিংশ শতকের, বিশেষ করে শেষার্ধের নাট্যপুরোধাদের এই মনোভাবও অতি প্রকট। শখের থিয়েটার, খেয়ালের থিয়েটার, ইংরেজ অনুকরণে থিয়েটার, ইংরেজ মনোরঞ্জনে থিয়েটার থেকে গিরিশযুগে শুরু হল "জনতোষণের থিয়েটার।"[২১]

সুতরাং নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে অবদমিত করে, হেয় করে, তার প্রতিবাদী চেতনা সহজতা-সরলতা-স্বাভাবিকতাকে এড়িয়ে গিয়ে ঊনবিংশ শতকের বাংলা থিয়েটারচর্চা বিলিতি থিয়েটারের হাত ধরে, বাবু সংস্কৃতিতেই নিমজ্জিত হয়ে থাকল, মাঝে-মধ্যে ভদ্রলোকি সংস্কৃতির চৌহদ্দির মধ্যে পা বাড়ালেও বাবু সংস্কৃতির গর্ভেই তার 'বড় হয়ে উঠা'। নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতির মধ্যে যে বিক্ষুব্ধ, প্রতিবাদী তিক্ততা, বিশেষত ব্যঙ্গাত্মক মাত্রা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে, তার ভয়েই বুঝি বা একদিকে ভদ্রলোকি সংস্কৃতির মধ্যে দেখা দিল দেশজ শিকড় সন্ধানের কৃত্রিম তাগিদ যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদী মোহ বর্তমান এবং যে জাতীয়তাবাদ অবশ্যই হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং অন্যদিকে নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিকে বিকৃত করে তার স্বপ্নসম্ভবা গীতিময়তা ও হিংস্রতর ব্যঞ্জনাকে 'লুম্পেন সংস্কৃতির' মোড়কে প্রচার করা। আসলে এই লুম্পেন সংস্কৃতি কার্যত বাবু সংস্কৃতিরই উল্টোপিঠ, বাবু সংস্কৃতিকে খাড়া করে রাখার এক চাল মাত্র, যার ধারা ঊনবিংশ শতক অতিক্রম করে বিংশ শতকের বর্তমান দশকেও প্রবহমান এবং একবিংশ শতকের দিকে ধাবমান।

সূত্রনির্দেশ

১ মন্মথ রায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা, ১৯৬৫, গ্রন্থম, পৃ ৩৮

২ শঙ্কর ভট্টাচার্য, কলকাতার থিয়েটার, ডি. এম. লাইব্রেরী, মাঘ ১৩৭৮, পৃ ২১০

৩ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দ্য পারলার অ্যাণ্ড দ্য স্ট্রীটস্ : এলিট অ্যাণ্ড পপুলার কালচার ইন নাইনটিনথ সেঞ্চুরী ক্যালকাটা', সীগ্যাল বুকস, ১৯৮৯

৪ উৎপল দত্ত, টিনের তলোয়ার, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, জুন ১৯৭৩, পৃ ১৩-১৫, ৩৬

৫ সুমিত সরকার, কলিযুগের কল্পনা ও ঔপনিবেশিক সমাজ, পৃ ২ ; ইতিহাস অনুসন্ধান ৪, ১৯৮৯, কে. পি. বাগচী এণ্ড কোং

৬ মনোজ মিত্র, অভিনয়ে পূর্ণ হল কলকাতা ধাম, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ অক্টোবর, ১৯৮৯, ক্রোড়পত্র উনবিংশ শতক, কলকাতা

৭ গোলাম মুরশিদ, সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, বাংলা অ্যাকাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ ৯

৮ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাঙ্গণ-বিহারিণী রসবতী : উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে মহিলা শিল্পী, অনুষ্টুপ, একবিংশতি বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ ১০০-১২৩

৯ সূত্র [৬] দ্রষ্টব্য

১০ সূত্র [৭] দ্রষ্টব্য, পৃ ৭

১১ উৎপল দত্ত, গিরিশ মানস

১২ সুকুমার সেন. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, নটনাট্য নাটক ; অমরেন্দ্রনাথ রায়, গিরিশ নাট্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ; বৈদ্যনাথ শীল, বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা

১৩ প্রভাতকুমার গোস্বামী, দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক, পুস্তক বিপণী, ১ বৈশাখ, ১৩৮৫

১৪ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার সিনেমা-থিয়েটার, আজকাল, কলকাতা সংখ্যা, ১৩৯৬, পৃ ১০৮

১৫ সূত্র [১৪] দ্রষ্টব্য, পৃ ১০৯

১৬ ঐ

১৭ জগন্নাথ ঘোষ, সেকালের থিয়েটার, দেশ বিনোদন, ১৩৯৬, কলকাতা ৩০০ সংখ্যা, পৃ ১৩২

১৮ সূত্র [৩] [৮] [১৪] দ্রষ্টব্য

১৯ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার, রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ অক্টোবর, ১৯৮৯

২০ বিভাস চক্রবর্তী, থিয়েটারের চেতনা, সাক্ষাৎকার, শূদ্রক, সংকলন ৮, পৃ ৮৬

২১ নৃপেন্দ্র সাহা, কলকাতার থিয়েটারে দুই ধারা ও ঝোড়ো হাওয়া, গ্রুপ থিয়েটার, শারদীয়, ১৯৮৯, সংখ্যা ৪৫, পৃ ৫৪

অন্যান্য গ্রন্থপঞ্জী ও প্রবন্ধসমূহ

১ তপন রায়চৌধুরী, ইউরোপ রিকনসিডার্ড: পারসেপসান অব দ্য ওয়েস্ট ইন নাইনটিনথ সেঞ্চুরী বেঙ্গল, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮

২ অশীন দাশগুপ্ত কর্তৃক তপন রায়চৌধুরীর ইউরোপ রিকনসিডার্ডস পুস্তকের সমালোচনা, দেশ, ১৫ এপ্রিল, ১৯৮৯

৩ সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বাংলা নাটকের ঐতিহাসিকতা বিচার, ১৭৫৭-১৮৫৭

৪ রণজিত গুহ, নীলদর্পণ: এক উদারপন্থীর চোখে একটি কৃষক-বিদ্রোহ, পূর্বরঙ্গ, ডিসেম্বর, ১৯৭৩

৫ নরহরি কবিরাজ (সম্পাদিত), বাংলার জাগরণ: তর্ক ও বিতর্ক, কে. পি. বাগচী এণ্ড কোং

৬ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ

৭ গোলাম মুরশিদ, সংকোচের বিহ্বলতা; আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণীর প্রতিক্রিয়া (১৮৪৯-১৯০৫), বাংলা অ্যাকাডেমি, ঢাকা

৮ শম্ভুনাথ বিট্, উনিশ শতকের সমাজ আন্দোলন ও বাংলা নাটকের আদিপর্ব

হাবেলিশহর পরগণার মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী

অলোক মৈত্র

১

'হাবেলিশহর পরগণার'[১] উৎপাদন ব্যবস্থায় দুটো বিভাগ লক্ষ্য করা গেছেঃ (১) কৃষিব্যবস্থা ; (২) কারিগরি শিল্পব্যবস্থা। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরপর ব্যাপক শিল্পায়ণের প্রভাবে কারিগরি শিল্প আবার স্পষ্টতই দু'ভাগে বিভক্ত হয়। বৃহদায়তন শিল্প ও কুটির শিল্প। আবহমানকাল ধরে বংশবৃত্তিতে নিযুক্ত কুটির শিল্পের কারিগরদের সহজেই চেনা যেত। শাঁখারি, চুনারি, কাঁসারি, স্বর্ণকার, কুম্ভকার এঁরা নিজস্ব বৃত্তিতে থেকে স্বকীয় জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি ও শিল্পকর্মের একটা ঐতিহ্য তৈরি করেছিলেন। বিশেষত, কারুশিল্পীদের মধ্যে মৃৎশিল্পীরা একটা বড় অংশ। এঁদের জীবনধারা, সামাজিক আচার-বিচার, রীতি-নীতি ও শিল্পকর্ম ইতিহাসের অন্যতম উপাদান। এখানে দেখার বিষয় হল মৃৎশিল্পীদের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিগত পরিবর্তন কীভাবে ঘটছে এবং মূল সামাজিক অবস্থানটাও কতখানি পাল্টে যাচ্ছে। কীভাবে তাঁদের সমাজে ভাঙন এসেছে, কীভাবেই বা আত্মস্থ করেছে তাঁরা নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে।

কুমারহট্ট (বর্তমান হালিশহর) নামটি চৈতন্যচরিতামৃতে ও কবি কর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে বেশ কয়েকবার উল্লেখ পাওয়া যায়। কুমারহট্টকে অন্তর্ভুক্ত করে বৃহত্তরভাবে 'পরগণা হাবেলিশহর' আজ হালিশহর। হাবেলি-শহর ও কুমারহট্ট দুটো নামই মধ্যযুগের। কোনটি প্রাচীন এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারা যায় নি। তবে ভাষার দিক দিয়ে কুম্ভকার-এর অপভ্রংশ 'কুমার' ও সংস্কৃত 'হট্ট' থেকে হাট, কুমারদের হাট এই অর্থে নামটি প্রচলিত—এরকম জনশ্রুতি আছে। হাবেলিশহর শব্দটি ফারসি। কুমারহট্ট নামটির মধ্যেই কুমোরদের ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। এই পরগণায় কুমোরদের যে পুরোনো বসতিগুলি চিহ্নিত করা গেছে তা কয়েকটি এলাকায় কেন্দ্রীভূত।

গবেষক, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্র, নৈহাটি

ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলেই গড়ে উঠেছে এক একটি কুমোরপাড়া যেমন কুমারহট্ট (বর্তমান হালিশহর), কাঁচড়াপাড়া গৌরীভা, কল্যাণীর ঘোষপাড়া, ভাটপাড়ার মুক্তাপুর, ইছাপুরের নোয়াই খালের তীরবর্তী কুমোরপাড়া ইত্যাদিতে। এছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে রাজেন্দ্রপুর দিভোগ ও শালিদহে কয়েক ঘর পুরোনো পরিবার রয়েছে।

২

মৃৎশিল্পের নিদর্শন অনুসন্ধানে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এখানকার গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় মাত্র কয়েক ফুট নিচে মাটি চাপা পড়া পোড়ামাটির পাত্র বা ফলক কোনভাবেই অক্ষত থাকে না। তবে পুরোনো মন্দিরগুলির কিন্তু চিহ্ন এখনো অবশিষ্ট আছে। হালিশহরের জমিদার সাবর্ণ চৌধুরী লক্ষ্মীকান্তর প্রপৌত্র বিদ্যাধর রায় যে মন্দিরগুলি নির্মাণ করেন তা অধিকাংশ পোড়ামাটির। হালিশহরের বারেন্দ্রগলির রায়-পরিবারের পূর্বপুরুষ কৃপারাম রায়ের পুত্র মদন-গোপাল ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চারটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরগুলির গায়ে যে অপূর্ব টেরাকোটার নির্দশন রয়েছে তা এখানকার মন্দির নির্মাণ শিল্পীদের সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দেয়। মন্দিরগুলির উপরের দিকে রয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যানভাগের খোদাই চিত্র। নিচের দিকের বিভিন্ন প্যানেলে রয়েছে সমসাময়িক সমাজ-জীবনের চিত্র। পোড়ামাটির বা টেরাকোটার লোকায়ত খোদাই ভাস্কর্যের যে নমুনা মেলে তাতে আছে—নগর ভ্রমণে রাজা, শিকারীর সঙ্গে বাঘের যুদ্ধ, বিদেশী বণিকের নৌভ্রমণ, স্তন্যপানে নিযুক্ত শিশু, প্রমোদ ভ্রমণে বিদেশী বণিক ইত্যাদি। টালিগুলি চূর্ণ ও সুড়কির সাহায্যে আটকানো। টালির আকার ৪"×১২", ৪"×৮" এরকম নানা আকারের টালির উপর চিত্রগুলি এখনো উজ্জ্বল। শিল্পীদের মনে ঐ সময়ের সমাজ-জীবনের চিত্র স্বচ্ছন্দভাবেই এসে পড়েছে। হুগলি নদীর পূর্বতীরের সমাজজীবনের যে চিত্র মন্দিরগুলির ভাস্কর্যের মধ্যে ধরা পড়েছে তা কী পশ্চিম তীরের সমাজজীবনের ধারা থেকে আলাদা ছিল!

মূলত হুগলি নদীর পশ্চিম তীরের জনপদের বিস্তৃত সমাজজীবনের ধারা এ পরগণার ধারা থেকে পৃথক ছিল না। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রামেশ্বর দত্ত বাঁশবেড়িয়াতে এক রত্নরীতির গড়ান চালে অষ্টকোণ শিখর সমন্বিত যে বাসুদেব মন্দির গড়ে তোলেন সেটিও পোড়ামাটি ও টেরাকোটার অলঙ্করণে শোভিত। ঐ মন্দিরের উপরের দিকে প্যানেলে রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন আখ্যানভাগের চিত্ররূপ থাকা সত্ত্বেও সবচেয়ে নিচের প্যানেলে যেসব টালি আছে—সেইসব

টালির চিত্র হল : শিকারীর হাতির পিঠে চড়ে বাঘ শিকার, টুপি-পরা বিদেশী বণিক, পালকিতে বিদেশী বণিকের ভ্রমণ, বিভিন্ন নৌকায় বিদেশী বণিকের মূর্তিরূপ। হালিশহরের মন্দিরচিত্রের সঙ্গে আরো যেসব চিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে তা হল : নৃত্যরতা রমণী, ঢোল করতাল সহ কীর্তনরত একদল মানুষ, সম্ভোগ চিত্র, নৃত্যকলার বিভিন্ন ভঙ্গী। এমনকি উভয় মন্দিরের চিত্রেই গৃহপালিত কুকুরের অবস্থান। টেরাকোটা ভাস্কর্যের লোকায়ত এই সমাজজীবনের রূপচিত্রের মধ্যে হুগলি নদীর উভয়তীরের জীবনধারার বিশেষ পার্থক্য চোখে পড়ে না।

হালিশহরের টেরাকোটার মন্দির-শিল্পীদের পরিচয় নির্দিষ্টভাবে জানা যায় নি। তবে এই পরগণার বিভিন্ন অংশে সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা যায় যে বাদুক (হাড়ি) পরিবারের কোন কোন বৃদ্ধ দাবি করেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষরা মন্দির শিল্পী ছিলেন। প্রামাণিক তথ্য হিসেবে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখেছেন, "দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিগ্রহচূর্ণকারী মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দীন, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট সিকন্দর লোদীর সেনাপতি বার্ব্বাক শাহ, ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় এবং সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দুবিদ্বেষী সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক উপর্যুপরি কাশীর বিগ্রহাদি বিচূর্ণিত হয় এবং রাজপুতানা ও বঙ্গদেশ প্রভৃতি নানা স্থান হইতে স্থপতি ও ভাস্করগণ মন্দির ও বিগ্রহাদির পুনর্গঠন করিবার জন্য কাশীতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। নদীয়ার কারিগরগণ পাষাণে মূর্তি গঠন করতে বিশেষ পটু ছিল। এইজন্য কাশীতে তাঁহাদের আদর ও প্রতিপত্তি বড় সামান্য ছিল না। হালিশহর নিবাসী নয়ন ভাস্করের নাম কবি জয়নারায়ণের কাশীখণ্ডে ও ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়।"[২] নয়ন ভাস্কর মন্দির বা মূর্তি কোনটি নির্মাণ করতেন তা জানা যায় নি।

৩

মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থের লেখা ভট্টপল্লীর (ভাটপাড়া) নারায়ন ঠাকুরের বংশ তালিকা থেকে জানা যায় ভাটপাড়া সংস্কৃত সমাজের সূচনা হয়েছিল আনুমানিক ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। মঃ মঃ কমলকৃষ্ণ স্মৃতি-তীর্থের (১৮৭০ খ্রীঃ-১৯৩৪ খ্রীঃ) দশম ঊর্ধ্বতম পুরুষ ছিলেন নারায়ণ ঠাকুর। ঐ সময় থেকে ভাটপাড়ায় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বসবাস শুরু হয় ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল তৈরি হয়। এইসব ব্রাহ্মণ পরিবারের মাটির পাত্রের চাহিদার জন্য হালিশহর থেকে একদল কুমোর ভাটপাড়ার সংলগ্ন মুক্তাপুরে, অপর একদল নৈহাটিতে বসবাস করতে শুরু করেন। ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণদের রন্ধনপ্রণালীর

জন্য মাটির পাত্রের চাহিদা বাড়ে এবং নতুন বাজার তৈরি হয়। বৈদিক শ্রেণীর এই ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে রান্না করার জন্য তিনটি দফায় মাটির পাত্রাদি লাগত আলাদা আলাদা। বিধবাদের জন্য একটি, বাড়ির অন্য সকলের জন্য একটি এবং টোলের ছাত্রদের জন্য একটি। যে ব্রাহ্মণ স্বপাক আহার করতেন তাঁর পরিবারে আরো বেশী পাত্রাদি লাগত। প্রতিটি সংক্রান্তি, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ—এই দিনগুলিতে হাঁড়ি ফেলে দেবার রীতি ছিল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে জাতাশৌচ এবং কারো মৃত্যুতে অশৌচ হলে হাঁড়ি ফেলে দিতে হত। মাটির পাত্রের এত চাহিদা থাকায় এই সময়ে নৈহাটি ও মুক্তাপুরে কুমোরপাড়া গড়ে ওঠে। কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় কুমোরদের যে বসতি রয়েছে সেটিও পুরোনো। এই গ্রামের কেদার পাল, হারু পাল প্রভৃতি কুমোররা সতীমার মেলায় ঘোড়ার মূর্তি তৈরি করতেন। এইসব পরিবারে এখনো ঘোড়ার মূর্তি তৈরি করে। ঐ মূর্তি সতীমার মেলায় বিক্রি করা হয়। এই পরগণার জনজীবনের উপযোগী ব্যবহার্য যে সমস্ত মৃৎপাত্র ও তৈজস তৈরি হত সেটাও দীর্ঘকাল ধরে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল।

৪

'হালি শহরের হাঁড়ি' এক সময়ে সমস্ত বাংলাদেশে বিখ্যাত ছিল। এখানকার হাঁড়ির গঠন ছিল নানা রকমের। তেজালা হাঁড়ি, তেলো হাঁড়ি ও লক্ষ্মী হাঁড়ি এই তিন রকমের হাঁড়ি খুবই বিশিষ্টতা অর্জন করে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সরা, কলসি, কুঁজো, কুয়োর চাক ও অন্যান্য মৃৎপাত্র তৈরি হত। হাঁড়ির আস্তরণ হত পাতলা—কাগজের মত। তাতে থাকত নানা নক্‌শা। হালিশহরের বটু পাল, বিষ্ণুপদ পাল, পরি পাল এরা সবাই ছিলেন নামকরা মৃৎশিল্পী। এঁদের হাতে যে হালিশহরের হাঁড়ি তৈরি হত তা এখনকার আদলের সঙ্গে মেলে না। কলসির কানায় কানায় নানা রকমের কারুকার্য থাকত। এখানকার মৃৎশিল্পীদের স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পৈতৃক বৃত্তি সম্পাদন করতেন। মাটির কাজ করাকে তারা জাতের কাজ বলে মনে করতেন। মৃৎপাত্র তৈরি করার জন্য কুমোররা যে চাকা ঘুরিয়ে পাত্রের আদল তৈরি করেন—সেই চাকার আকার বিভিন্ন রকমের। সূক্ষ্ম কাজের জন্য ছোট চাকার ব্যবহার হয়। চাকার গতিবেগ নির্ভর করে শিল্পীর শারীরিক সামর্থ্যের উপর। বড় বড় জালা, গামলা ইত্যাদি তৈরি করতে তাঁরা চাকের চাইতে হাতের উপরে নির্ভরশীল বেশী। বিভিন্ন রকমের 'হাতিয়ার' (tools) দিয়ে বড় বড় মৃৎপাত্র তৈরি করেন। চাকার পূর্ণ ব্যাস ৪৮" থেকে ১৮" পর্যন্ত দেখা যায়।

চাকাটির চারটি অক্ষ থাকে। অক্ষগুলি চাকার আকার অনুযায়ী ছোট-বড় হয়। তবে অক্ষগুলি এমনভাবে করা হয় যাতে চাকার উপর মাটির তাল বসালে তা ঘুরতে পারে এবং ভারসাম্য না হারাতে পারে। মাটির ওজন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নির্দিষ্ট থাকে না। যদি চাকার মাধ্যমে বড় গামলা তৈরি করে তবে একটা গামলা তৈরি করার মত এক তাল মাটি দেবে। ছোট ছোট গেলাস, ভাঁড়, খুরি এসবের ক্ষেত্রে ছোট চাকার ব্যবহার হয়। চাকাটা বসানো থাকে একটা বড় পাথরের মধ্যে। ঐ পাথরের মধ্যে ছোট একটা গর্ত করে চাকার কেন্দ্রটিকে বসিয়ে দেওয়া হয় যাতে চাকাটি ভারসাম্য অবস্থায় ঘুরতে পারে। চাকার গতি বাড়াতে হয় পাত্রের আস্তরণ পাতলা করার জন্য। কলসি, কুঁজো, গামলা এগুলো শুধু চাকার মাধ্যমে হয় না। হাত দিয়ে নানা হাতিয়ারের সাহায্যে পিটিয়ে পিটিয়ে করা হয়। যে কাঠের জিনিস দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে জালা, গামলা ও কলসির আদল তৈরি হয় তাকে বলে 'পিতনা'। পাথরের নির্দিষ্ট আকারের 'গোল্লা' দিয়ে তলা পিটিয়ে হাঁড়ি তৈরি হয়। ন্যাচলা ও ন্যাদায় নক্শা করার জন্য ছোট-বড় নানা রকমের 'পিতনা' ও 'গোল্লা' থাকে। কলসি, হাঁড়ি বা গামলার নিচের ঠিক বুকটাকে বলে 'ন্যাচলা' বা 'ন্যাদা'। মাটির এইসব নানা ধরনের কাজের জন্য প্রয়োজন হয় এঁটেল মাটির। এই মাটি আসত এই পরগণার উত্তর সীমায় যমুনা নদীর মজে যাওয়া খাল থেকে। পরগণার পূর্বদিকে মজে যাওয়া সুতী নদীর পয়োস্থি জমি থেকেও মাটি আসত। এখনো ঐ অঞ্চল থেকে মাটি আনা হয়। আগে গরুর গাড়ি বা নৌকোয় মাটি আনা হত। এখন ট্রাকে আনা হয়। মাটি কেনাবেচা করার জন্য আর একদল বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছে। এঁটেল মাটিকে হতে হবে চটচটে। প্রথমে অনুপাত মত জল দিয়ে মাটিকে পা দিয়ে ছেনে ছেনে কাদা করা হয়। বড় বড় কাঁকর ঐ সময়ে পায়ে লাগলে ফেলে দেওয়া হয়। এরপর লোহার পাত দিয়ে কেটে কেটে সূক্ষ্ম কাঁকর ফেলে দেওয়া হয়। তৈরি হওয়া মাটিকে বলে 'গোলা' বা 'তাল'। প্রতিমা বা মূর্তি তৈরি করার জন্য ঐ মাটির সঙ্গে পাটের আঁশ মেশানো হয়। ঐ মাটিকে বলে 'ফেঁসো মাটি'।

৫

হালিশহরে উৎপাদিত মাটির সামগ্রিক বাজার ছিল বাংলাদেশের সর্বত্র। দু' ভাগে এই সমস্ত সামগ্রী বাজারজাত হত। সড়কপথে নারায়ণপুরের জয়-চণ্ডীর মেলায়,* হুগলি নদীতে নৌকা করে কলকাতায়। গৃহস্থ বাড়ীতে ঐ

সময়ে মাটির হাঁড়িতে রান্না করার চল ছিল। পাল-পার্বণে, সংক্রান্তিতে ও অশৌচ হলে মাটির পাত্র ফেলে দেবার রীতি থাকার জন্য মাটির পাত্রের নিয়মিত চাহিদা ছিল। এই গ্রামের হরি পাল, পরি পাল এঁরা মাটির কাজের শিল্প-নৈপুণ্যে এত নাম অর্জন করেছিলেন যে কলকাতার বড় বড় আড়ৎদারেরা টাকা অগ্রিম দিয়ে হাঁড়ি-কলসি তৈরি করিয়ে নিয়ে যেতেন। কলকাতায় এঁদের হাঁড়ির খুবই চাহিদা ছিল। কলকাতা থেকে অন্যান্য জায়গায় পাঠানো হত।

হালিশহরের কুমোররা নতুন বাজারের আশায় স্থানচ্যুত হয়ে নৈহাটি-মুক্তাপুর প্রভৃতি জায়গায় থিতু হয়ে বসতি নিলেও এ বাজার বেশীদিন টিকল না। এই পরগণায় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে চটকলগুলি প্রতিষ্ঠা হতে শুরু করলে হুগলি নদীর ধারে ধারে যেসব কুমোরবসতি ছিল, সেখানকার কুমোররা জমি বিক্রি করতে লাগলেন। হালিশহর, মুক্তাপুর নৈহাটির জমির দলিলগুলি এর সাক্ষ্য দেয়। অন্তত ৭০-৮০টি পরিবার তাঁদের জমি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যায়, এঁদের হদিশ পাওয়া যায় না। যাঁরা টিকে থাকলেন তারা আবার প্রতিষ্ঠা হবার পর নতুন যে শ্রমিক উপনিবেশ তৈরি হল, এর জন্য নতুন বাজার পেলেন। বিশেষত চা পানের প্রসারের ফলে মাটির চা পাত্রের চাহিদা এই এলাকায় কম হল না। নতুন বাজারের ফলে কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এল। আর্থিক অবস্থা মানুষের সামাজিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে যারা সে সময়ে বাজার পেলেন, তাঁরা কুমোর পরিবারের সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেন। এতদিন কুমোরদের মাটির কাজের মধ্যে হাঁড়ি-কলসি তৈরির কাজ ছিল, এখন চায়ের পাত্রের দিকে ঝুঁকল। কিন্তু এ অবস্থাও বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। কুমোরবাড়ীতে তখনো চাকা ঘুরত কিন্তু জমির দাম বেড়ে যাবার ফলে কুমোররা তাঁদের উঠোনের জমি বেশী টাকার লোভে বিক্রি করে দিতে লাগলেন। চাকা থাকলে বেশী জমির প্রয়োজন, কাঁচা মাটির পাত্র রোদে শুকানোর জন্য। জমি বিক্রি করে দেওয়ার ফলে কুমোরদের হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তাঁরা মৃৎশিল্পের কাজ থেকে সরে এসে মৃৎশিল্পের ব্যবসা করতে আরম্ভ করলেন। হাঁড়ি-কলসি ইত্যাদি কিনে এনে তা আবার বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে জীবিকানির্বাহ করা। কারণ আঞ্চলিকভাবে উৎপাদন তখন বন্ধ, অথচ বাজারে যে চাহিদা ছিল তা পূরণ করতে হবে। খারাপ মানের মাটির পাত্রের জন্য তাঁরা দিভোগ মৌজার কুমোরদের কাছ থেকে কিনতেন। ভাল মানের পাত্র আসত চন্দননগর থেকে। এ দিকের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চন্দননগরের উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। ফলে চন্দননগরের রথের সড়কের কুমোরদের

আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়ে যাওয়ায় তাঁরা কুমোর সমাজের মধ্যে মর্যাদাবান হয়ে উঠলেন। চন্দননগরের বেশী প্রতিষ্ঠা হল কূপের চাক ও ফুলের টব তৈরির জন্য। মাটির পাত্রের ব্যবসাও এভাবে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ হল হাঁড়ি, কলসি, সরা, গেলাস ইত্যাদি, অপর ভাগ হল কূপের চাক ও ফুলের টব। কুমোরদের কাজের বিভাগ ঘটতে লাগল। মাটির হাঁড়ি, কলসি, কুঁজো ইত্যাদি থেকে একদল পুতুল তৈরি, অপর দল প্রতিমা তৈরির কাজে লাগলেন। যাঁদের বাড়ীতে চাকা ছিল তাঁরা চটকলে কাজ নিলেও আংশিক সময়ের জন্য মৃৎপাত্রও তৈরি করতেন। ফলে এঁদের আর্থিক অবস্থা ততটা বিপর্যস্ত হল না। হালিশহরের কুমোরপাড়ার বিজয়কৃষ্ণ পাল, সাধন পাল এরকম আরো উদাহরণ দেওয়া যায়। মুক্তাপুরের রমেশ পাল শিল্প-শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করে, পরবর্তীকালে বিখ্যাত শিল্পী ও ভাস্কর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। কুম্ভকার-দের বৃত্তির পরিবর্তন ঘটেছে এভাবেই। ঘোষপাড়ার কেদার পালের পিসতুত ভাই সাধন পাল নিজের পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করে চটকলে কাজ নিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, হুগলি নদীর তীর ধরে যেসব কুমোর পরিবার বসতি নিয়ে-ছিলেন তাঁরা কিন্তু তাঁদের বংশবৃত্তিতে সম্পূর্ণ টিকে থাকতে পারলেন না। মৃৎ পাত্রের চাহিদা যতদিন ছিল ততদিন এঁদের বৃত্তি বজায় ছিল, শিল্প প্রতিষ্ঠার পর এঁদেরও বৃত্তিচ্যুতি ঘটেছে।

হাবেলিশহর পরগণার মৃৎশিল্পের পতন ও মৃৎশিল্পীদের বৃত্তির পরিবর্তন ঘটেছে ধাতব তৈজসের ব্যাপক প্রসারের ফলে। এখানকার গ্রামীণ-জীবনের দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীর মধ্যে মৃৎপাত্রের বদলে স্থান পেল এনামেল ও স্টিলের বাসনপত্র। মাটির পাত্র দ্রুত ভেঙে যায়, কিন্তু ধাতব পাত্র অত তাড়াতাড়ি ভাঙে না। ফলে এখানকার কুমোরদের বৃত্তিতে একটা বিরাট সংকটের সৃষ্টি হল। এই সংকট কিছুটা পূরণ করল মাটির চা পাত্র। কিন্তু চা পাত্র তৈরি ও বিক্রি করে পূর্বের মত আর্থিক নিরাপত্তা এল না। ব্যাপক ব্যহারের পরিবর্তে আংশিক বাজার মাত্র। আবার উত্তর-প্রদেশ ও বিহার থেকে আসা চটকল শ্রমিকদের সঙ্গে কিছু অবাঙালি কুমোর এসে এখানে বসতি স্থাপন করলেন হাজিনগর ও জগদ্দল এলাকায়। তাঁরাও চা পাত্র তৈরি করে বাজারে আনতে লাগলেন। প্রতিযোগিতার অনিবার্যতা দেখা দিল।

এই পরগণায় অবাঙালি শ্রমিক উপনিবেশ গড়ে ওঠে সর্দার ও আড়কাঠির মারফৎ মিল মালিকের প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে। এই শ্রমিকদের সঙ্গে যে সমস্ত অবাঙালি কুমোর নিজের গ্রামের (দেহাত) শিকড় ছিড়ে এখানে এলেন তাঁরা জীবিকার জন্য মরীয়া হয়ে উঠলেন। এই প্রতিযোগিতায় তাঁরা টিকে গেলেন

প্রধানত অবাঙালি শ্রমিকদের স্বজনপোষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে। সামাজিক কোন বাধানিষেধ এঁদের নিজেদের মধ্যে না থাকায় এঁরা যে-কোন জায়গায় বসে উৎপাদনের কাজ শুরু করেন। বাজারের কেন্দ্রস্থলেও এঁরা উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করে তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটাতে শুরু করেন। এমনকি অবাঙালি কুমোররা বাঙালি কুমোরদের তৈরি চা-পাত্রের বাজার দাম থেকে কিছু কম লাভ রেখে বিক্রি করা শুরু করায় বাজার পাওয়ার সুবিধা হয়। বাজার দামের এই হেরফের এখনো রয়েছে। বাঙালি মহিলাকর্মীদের তুলনায় অবাঙালি মহিলাকর্মীদের শ্রমক্ষমতা বেশী। পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার ক্ষমতাও এঁদের বেশী। এই সমস্ত নানা কারণের ফলে অবাঙালি কুমোররা মৃৎশিল্পের বাজারে শুধু প্রবেশ করলেন না অনিবার্যভাবে প্রতিযোগিতায় টিকে রইলেন।

অন্যদিকে বাঙালি কুমোররা এই প্রতিযোগিতায় টিকতে পারলেন না। ক্রমশ তাঁরা তাঁদের বৃত্তির পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হতে লাগলেন। যেসব কুমোর কূপের চাক তৈরির কাজ করতেন, পরবর্তীকালে নলকূপ চালু হওয়ায় কূপের চাক তৈরির কাজ কম হয়ে গেল প্রায়। প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত কুমোরদের আর্থিক অবস্থা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বংশগত বৃত্তির পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হলেন পেটের দায়ে। বেশী আয়ের প্রতিশ্রুতিও এ সময়ে কুমোরদের চটকলের কাজে আকৃষ্ট করে। এই প্রবণতার জন্য মাটির কাজের গুরুত্বও কমে যায়। মাটির কাজে পরিশ্রম বেশী, আয় কম। এরচেয়ে কম শ্রমে বেশী আয়ের লোভ ছিল কারখানাতে। এরপরেও যারা নিজ বৃত্তিতে টিকে থাকলেন তাঁরা আংশিক কাজ পেলেন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের এ দেশে আসার ফলে। লক্ষ্মীর পট ও ছাঁচে তৈরি সরস্বতীর একটা বাজার হল বটে তবে তা খুবই সামান্য। ঘরের ছাদের জন্য মাটির টালি তৈরির কাজেও অবাঙালি কুমোরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। সিমেন্টের ব্যাপক ব্যবহার টালির বাজারকে সংকুচিত করেছে। বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি মৃৎশিল্পকে মাটির সঙ্গেই বিলীন করে দিয়েছে, বলা যায়। এমনকি কুম্ভকার সমাজের মূল আদলটিকেও পরিবর্তিত করেছে।

৬

অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভকার সমাজের বিন্যাস পাল্টেছে। এঁদের সমাজে আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর সামাজিক প্রতিষ্ঠা নির্ভর

করছে, তা দেখা গেছে। চটকল স্থাপনের পর এই পরগণার কুমোরদের অবস্থা যখন পড়তে শুরু করল, ঠিক সেই সময়ে চন্দননগরে রথের সড়কের কুমোরপাড়ায় কুমোরদের অবস্থা উন্নত হতে লাগল। পুরুষানুক্রমে রপ্ত মাটির কাজ পরিত্যাগ করে যখন এই এলাকার অধিকাংশ কুমোর মাটির উৎপাদিত সামগ্রীর ব্যবসা শুরু করে, তখন উৎপাদনের ব্যবস্থা এখানে থাকল না এবং যেটুকু ছিল তা খুবই সামান্য। কিন্তু চন্দননগরে উৎপাদন ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকার ফলে হাবেলিশহর পরগণায় মৃৎপাত্রের সামগ্রী সরবরাহ করে তাঁরা আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হলেন। ক্রমে ক্রমে কুম্ভকার সমাজে এঁরা প্রতিষ্ঠা পেলেন। হালিশহরের কুমোর পরিবারে বিয়ে-থার ব্যাপারেও দেখা গেল আর্থিক মানদণ্ডের উপর সম্বন্ধ স্থাপন। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাঘব যখন নদীয়ার মাটিয়ারি থেকে রেউইতে রাজধানী স্থানান্তর করেন, ঐ সময়ের পরে পরেই কৃষ্ণনগরে (ঘুর্ণি) কুম্ভকারসমাজ গড়ে ওঠে। রাজা নবকৃষ্ণের সময়ে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীর একদল কলকাতার কুমারটুলিতে বাস করতে শুরু করেন। বলাবাহুল্য কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের কুমারটুলির মৃৎশিল্পীদের বিয়ে-থার সম্বন্ধ আছে। হাবেলিশহর পরগণার মৃৎশিল্পীদের দু-একটি পরিবারের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের পরিবারের বিবাহ-সম্বন্ধ আছে তবে তা নিঃসন্দেহে আর্থিক মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঘোষপাড়ার কুমোরদের সঙ্গে হালিশহরের কুমোরদের যেমন বিবাহ-সম্বন্ধ আছে তেমনি ইচ্ছাপুরের কুমোরদের সঙ্গেও বিয়ে-থার সম্বন্ধ আছে। নৈহাটি, মুক্তাপুর প্রভৃতি কুমোরপাড়াতেও অনুরূপ সম্বন্ধ আছে। চন্দননগরের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ ছিল তাঁদেরই যাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠা ছিল। কুম্ভকার পরিবারে বিয়ের ব্যাপারে একটা নিয়মের চল ছিল যে যাদের বাড়িতে 'চাকা' আছে তাদের ছেলের বিয়েতে কন্যাপণ দিতে হত। এর কারণ ছিল, বাড়িতে কাঁচা মাটির হাঁড়ি-কলসি ইত্যাদি রোদে শুকানোর জন্য বাড়িতে মহিলাকর্মীর প্রয়োজন। সংসার নির্বাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ঐ কাজ করতেন। স্থায়ীভাবে একজন কর্মী পাওয়া যেত বলে কণের বাবার ওটা প্রাপ্য ছিল। কিন্তু যাঁদের বাড়িতে 'চাকা' থাকত না তাঁদের ছেলের বিয়েতে ছেলের বাবাই যৌতুক পেতেন।

কুমোরদের সামাজিক আচার-বিচারের যে পরিচয় মেলে, সেটি গ্রামীণ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব পরিচয় বহন করত। সারা বৈশাখ মাস কোন কুম্ভকার মাটির কাজ করতে পারতেন না। সামাজিক দিক থেকেই নিষিদ্ধ ছিল। কারণ ছিল বিজ্ঞানসম্মত। বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহে মাটির কাজ করা খুবই পরিশ্রমসাপেক্ষ। পরবর্তীকালে বৈশাখ মাসে মাটির

কাজ না করাটাই বিধান হয়ে দাঁড়ায়। যে চাকাটিকে ঘুরিয়ে মৃৎপাত্রের আদল তৈরি হয়, সেই চাকাটিকে পুজো করা হয়। চাকা পুজোর দিন উপবাস আবশ্যিক ছিল। চাকা পুজোর আগের দিন নিরামিষ ভোজন অবশ্যকৃত্য। চাকা পুজো আগে এরা কীভাবে করতেন তা জানা যায় না, তবে এখন শিব কল্পনা করে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে পুজো হয়। বৈশাখী পূর্ণিমাতে নিজেদের জাতের মধ্যে ব্রহ্মাপূজা করা হয় যার মূল ছিল লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে। বৈশাখ মাসটি কুম্ভকারদের নানারকম বিধি-নিষেধের মাস। এই মাসে যেমন চাকার ব্যবহার হয় না পরিশ্রম-সাপেক্ষ বলে, তেমনি আবহাওয়া শুকনো থাকার জন্য বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ভয় থাকে। কুমোরবাড়িতে যেখানেই মাটির কাজ হয়, সেখানে গর্ত করে রোদে শুকোনো কাঁচা মৃৎপাত্র ঐ গর্তের ভেতরে সাজিয়ে আগুন লাগিয়ে পোড়ানো হয়। একে বলে 'খোলা'। বৈশাখে এই আগুনের খোলাতে বাড়িতে আগুন লাগবার ভয় থাকে। এ জন্য ব্রহ্মাপূজা করা হয়। ভীতি থেকে পূজার উৎপত্তি এটা এখানে প্রমাণ করছে। যাঁরা বৃত্তি পরিবর্তন করেছেন তাঁরা আর এসব লৌকিক পূজা করেন না। যাঁরা বাড়ির উঠোনের জমি বিক্রি করে দিয়ে 'চাকা' বন্ধ করে দিয়েছেন এবং ছাঁচের লক্ষ্মী, সরস্বতী ও পুতুল ইত্যাদি তৈরি করে বিক্রি করেন, তাঁরা ঐতিহ্য রক্ষার জন্য চাকার বদলে ছাঁচটিকে পুজো করেন। দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের পাশাপাশি কুমোরদের নিজেদের সমাজ-জীবনে যে লৌকিক আচার-বিচার ও সংস্কৃতি জায়মান ছিল তা শিল্পায়ণের আঘাতে অবলুপ্তির পথে।

৭

হাবেলিশহর পরগণার শিল্পায়ণের প্রভাবে কুম্ভকাররা নিজেদের পৈতৃক বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় যাওয়ার জন্য পুরোনো দিনের গ্রামীণ সমাজের আদল ভেঙে যায়। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বৃত্তিনির্ভর রীতি-নীতিগুলি, মূল্যবোধ এ সবই ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে। জাতের বৃত্তি থেকে যাঁরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন তাঁরা কেউই এখন কুমোরসমাজের আচার-বিচার মেনে চলেন না। আবার যাঁরা অর্থ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রয়েছেন তাঁরা উঁচু বংশে বা পরিবারে বিয়ে করে উচ্চমন্য হবার চেষ্টা করেছেন। ফলে তাঁরা নিজেদের সামাজিক রীতি-নীতিগুলি গ্রহণ করছেন না। যাঁরা এখনো নিজস্ব বৃত্তিতে টিকে রয়েছেন তাঁরা এখনো চাকাপুজো, ব্রহ্মাপুজো ও অন্যান্য আচার-আচরণ মেনে চলার চেষ্টা করেন দৃঢ়মূল ঐতিহ্যের রেশ হিসেবে। তবে আধুনিক

শিল্প-সমাজের অভিঘাতে সেগুলি শুধুমাত্র অনুষ্ঠানেই পর্যবসিত হয়েছে। কুমোর সমাজের ভাঙন ধরেছে বৃত্তি পরিত্যাগ করার পরেই। লক্ষ্য করে দেখা গেছে, এই সমাজে ভাঙাচোরা চলেছিল খুব ধীরে ধীরে এবং অর্থনৈতিক কারণেই পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন চলেছিল। নিজেদের গোষ্ঠীগত সত্তার সঙ্গে আবহমান বংশগত জীবিকার যে সম্পর্ক দৃঢ়মূল ছিল তা শিল্পায়ণের ফলে ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়েছে। বংশগত জীবিকা যাঁরা ছেড়েছেন, নতুন জীবিকায় গিয়ে তাঁদের যৌথ পরিবারের অন্য অংশের সঙ্গে, এমনকি খুবই সাধারণভাবে গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে সম্পর্কেরও হেরফের ঘটে গেছে।

সূত্রনির্দেশ

১ ইতিহাস অনুসন্ধান (চতুর্থ খণ্ড), গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কে. পি. বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ ১৪৯-১৫৭

২ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (উত্তর ভারত, কাশী), প্রকাশক, অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩২২, পৃ ৩-৪

২ ভূপতিরঞ্জন দাস, পারিবারিক কাহিনীতে চটকলের স্মৃতি, বারোমাস (শারদীয়, ১৯৮৮), কলকাতা, পৃ ৭০-৮৫

আঠারশো আশির দশকে ব্রাহ্মসংস্কার প্রয়াসের অন্তিম পর্ব

অমলশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮২৮ সালে স্থাপিত হবার পর নানা পর্যায়ের বিরোধিতা-সমর্থনের পথ বেয়ে ১৮৭০এর দশক ব্রাহ্মসমাজের কার্যাবলীর সবচেয়ে ব্যস্ততাপূর্ণ পর্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।[১] এরপর অর্থাৎ ১৮৮০র দশকে তাদের ঐ কাজকর্মের জোয়ারে ভাঁটার লক্ষণ দৃষ্ট হতে থাকে। বর্তমান পর্যালোচনা ঐ মন্দার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করার জন্য।

অনেকেই জানেন যে ১৮৭০এর দশকের অনেক উৎসাহী ব্রাহ্ম পরের দশকটিতে ঐ সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পরিহার করেন, বা দূরে সরে যান। কোন পূর্বতন ব্রাহ্মকে ঐ সংস্থার পালের হাওয়া কেড়ে নেবার চেষ্টাও করতে দেখা গেছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৮৮০র দশকটি সমগ্র দেশের ইতিহাসে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের আত্মবিকাশের কাল হিসাবে অধিক পরিচিত। ঐ হিন্দু পুনরুত্থানবাদ পরবর্তী অল্পকালের মধ্যে কংগ্রেসী রাজনীতিতে চরমপন্থী মতাদর্শ সঞ্চার করে যার দ্বারা ঐসব ব্রাহ্মসমাজত্যাগীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

২

এখানে কতকগুলি ব্যাপারে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, বর্তমান আলোচনার মাধ্যমে কোন সংস্থা বা আদর্শের তুল্যমূল্য শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশের কোন চেষ্টাই হচ্ছে না। তবুও বিভিন্ন ধর্মমতকে সমন্বয় করার ও এগুলি থেকে সত্য সন্ধানের মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজ যে গোষ্ঠীনিরপেক্ষ (non-sectarian) দৃষ্টিভঙ্গী প্রদর্শন করেন তা নিঃসন্দেহে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের গোষ্ঠী অনন্য (group exclusiveness) মনোভঙ্গীর থেকে ভিন্নতর সামাজিক পরিস্থিতির ফসল বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। এই আলোচনার মাধ্যমে

ইতিহাস বিভাগ, লালবাবা কলেজ

ব্রাহ্মসমাজের পতন কিম্বা তাদের সংস্কার প্রয়াসের অবক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধানের কোন চেষ্টা করা হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, কোন কোন ব্যক্তির সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে যাওয়া বা ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিকে নির্দেশ করার জন্য এখানে আলোচনার সুবিধার্থে 'ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করা'—এই অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছে।[২] আর এর কারণনির্দেশ করতে গিয়ে কিছু মতাদর্শগত পার্থক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত থাকার জন্য ঐসব ব্যক্তিদের এমন কিছু কিছু আদর্শে আস্থাশীল থাকা প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম সংগঠনের দৃষ্টিতে আবশ্যক ছিল—ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে তাঁরা আর সেগুলি মানতে বাধ্য ছিলেন না।

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন এই যে আধ্যাত্মবিদ্যা (theology) ও ধর্মাদর্শ (liturgy) বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত। তাছাড়া অন্যত্র দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে একটি পঞ্জীকৃত (registeied) সংস্থা হিসাবে ব্রাহ্মধর্ম সংগঠনের কর্তৃপক্ষ (authorities of the established Church) সুনির্দিষ্ট ধর্মাদর্শ কোনকালেই সুস্পষ্টভাবে নিরূপণ করে উঠতে পারে নি।[৩] আর যাওবা হয়েছিল শুধুমাত্র তার প্রতি সব দীক্ষিত ব্রাহ্মের আনুগত্য অখণ্ড ছিল—একথাও বলা চলে না। কারণ দীক্ষিত বা অদীক্ষিত নির্বিশেষে সব অনুগামীদের নিরিখে ব্রাহ্মধর্ম এই বিষয়টি কোন সর্ববাদীসম্মত কিছু ছিল না।[৪] ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নানান উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সুযোগ বুঝে একে নিজের মত ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হতেন। সেই অর্থে ব্রাহ্ম আধ্যাত্মবিদ্যার কতকগুলি মূল বিষয়ে ঐকমত্য[৫] থাকলেও এর বিস্তৃত ব্যাখ্যার তর্কাতীত আদর্শের সন্ধান করতে চাওয়া অর্থহীন।[৬]

অনুরূপভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রায় অর্ধ শতাব্দীর (১৮২৮-১৮৮০) ইতিহাসে কোন ঘটনা বা কাজের সংজ্ঞা নির্ধারণ সীমানা নির্দেশের সমস্যা বরাবরই থেকে গেছে। ১৮৮০র দশকে কিছু লোক ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন—এই বিষয়টিকে আলাদাভাবে নির্দেশ করতে গেলে দেখা যাবে এই ঘটনা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে কোন নতুন ব্যাপার নয়। ইতিপূর্বে অনেকেই এই জাতীয় কাজ করেছেন। ইতিপূর্বে আরো দুবার ব্রাহ্মসমাজে বিভেদ ঘটেছে—পুরোনো সংস্থা ভেঙে নতুন সংস্থা গঠিত হয়েছে।

আবার যদি ১৮৮০র দশকে যাঁরা ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে গিয়ে ভিন্ন ধর্মাচরণ পদ্ধতি অবলম্বন করেন বা পৃথক রাস্তায় আধ্যাত্ম সাধনার চেষ্টা করেছিলেন—তাঁদের কথা ধরা হয়—তবে দেখা যাবে যে দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ আদি সমাজীগণ পৌত্তলিক বলে হিন্দুসমাজের অনেক আদর্শ ও আচরণ পরিত্যাগ করেও

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের চেয়ে বেশী করে হিন্দুসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা যুক্তিযুক্ত মনে করতেন। দেবেন্দ্রনাথ বরাবরই জ্ঞানমার্গী ধ্যাননিরত চিরায়ত ঋষি পদবাচ্য ছিলেন। আবার কেশব সেনই পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিদের আগে বৈরাগ্য ও ভক্তি মার্গানুসারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন। আসলে ভারতের মত বহুর সামাজিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (Pluralistic Society) দেশে কোন সংস্থার সদস্যদের বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও পরিণতির তারতম্য অনুযায়ী ঐ সংস্থার কোন এক সময়ের একীভূত অনন্যতার (Singular Uniformity) মধ্যে অদলবদলের সূত্রপাত হওয়াই স্বাভাবিক।

এখানে তাহলে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করা চলে যে, যদি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করার মধ্যে কোন নতুনত্ব নাই থাকে—তবে ঐসব ব্যক্তিদের এই জাতীয় কাজগুলিকে ব্যাখ্যা করা যাবে কিভাবে?

প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে দীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করে আবার পদত্যাগপত্র প্রদান করে ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে আসা যায়। কিন্তু অল্প সময়েই তা কার্যকর হতে দেখা যেত। আলোচ্য ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউ তাও করেছেন।[৭] সেইসব ক্ষেত্রে তাঁরা কিছু ধর্মাদর্শগত পার্থক্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। এঁদের নিয়ে আলোচনায় তত সমস্যা নেই। কিন্তু আরো কিছু লোক ছিলেন যাঁরা স্পষ্টত (Formally) ব্রাহ্ম-ধর্ম সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন নি আবার বাহ্যিক আচরণের দিক থেকে অনেক কাজ করেন—যা ঐ ধর্ম সংগঠন দ্বারা অনুমোদিত ছিল না। অথচ তাঁদের ঐসব আচরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললে তাঁরা ব্রাহ্ম পত্রপত্রিকা মারফত শতমুখে প্রচার করার চেষ্টা করতেন যে তাঁরা ব্রাহ্মধর্মবিরোধী কিছুই করেন নি।[৮] এইসব করণে আমরা আদর্শগত মতপার্থক্যের সূক্ষ্ম বিচারে নিয়োজিত না হয়ে ঐসব ব্যক্তিবর্গের প্রকৃত কাজকর্ম নিয়ে পর্যালোচনা করতে পারি।

৩

প্রথমেই ধরা যাক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা। তাঁর বহুবর্ণিত জীবনালেখ্য এতই পরিচিত যে সে সম্বন্ধে অধিক বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে তিনি যখনই যে কাজে আত্ম-নিয়োগ করতেন তাতেই তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া হত বেশ চড়া ও কড়া। ১৮৫০এর দশকের শেষের দিকে অথবা ১৮৬০এর দশকের প্রথমদিকে দীক্ষিত হয়ে[৯] —কলকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে ১৮৮৬ সালে[১০] ও পরে ঢাকা

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বাদ থেকে ১৮৮৭ সালে পদত্যাগ করেন।[১১] এই পর্যায়ে তাঁর আচরণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিধাজড়িত সাক্ষ্যে অবস্থা বিকৃত হয়েছে কুলাদানন্দ ব্রহ্মচারীর সাক্ষ্য।[১২] অথচ কলকাতা ও ঢাকায় প্রদত্ত তাঁর ত্যাগপত্রে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, আছেন ও থাকবেন।[১৩] ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে পরবর্তীকালে লেখা জীবনী গ্রন্থে একথাই প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে।[১৩ক] ঐ একই জাতীয় উক্তি করেছেন বিপিনচন্দ্র পাল।[১৪] যুক্তি প্রমাণ সহযোগে তিনি (পাল) দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে প্রয়োজনমুখী সংযোজন ও পরিবর্ধন দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকে বিজয়কৃষ্ণ গোষ্ঠীবদ্ধ ক্ষুদ্রতার থেকে নব্য বৈষ্ণবধর্মের উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্রাহ্মসমাজ থেকে পদত্যাগ করার প্রায় এক দশক পরেও বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনা মন্দিরের অছির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৫]

এবার ধরা যাক আরেকজন ব্রাহ্মের কথা যাঁর জীবনও প্রায় সমপরিমাণে নাটকীয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কেশবচন্দ্রের নববিধানে দীক্ষিত হন ১৮৮৭ সালে।[১৬] অতঃপর ঐ মত ত্যাগ করে প্রথমে প্রটেস্ট্যাণ্ট ও পরে ক্যাথলিক মতে ১৮৯০ সালে ধর্মান্তরিত হয়ে নাম গ্রহণ করেন থিওফিলাস ও তারপর ১৮৯৫ সালে আরেক দফা মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংকটের মধ্য দিয়ে প্রায় চিরন্তন হিন্দু সন্ন্যাসীর আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ধর্মের চেয়ে রাজনীতিতেই নিজের ক্লান্তিহীন কর্মশক্তির সার্থকতা খুজে নেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নামে।[১৭]

পরবর্তী আলোচনাযোগ্য ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ১৮৭১ সালে দীক্ষিত পাঞ্জাবের শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী। আর্যসমাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ১৮৭৭-৭৮ সালে পত্রপত্রিকা, বক্তৃতা ও পর্যটনের দ্বারা তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে আপন মত প্রচার করেন।[১৮] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হবার পর তিনি ১৮৮০ সালে প্রচারক পদে বৃত হন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর প্রভুত্বপরায়ণ ব্যক্তিত্ব ও আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠামূলক আচরণ ব্রাহ্মসমাজের অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে।[১৯] তাঁর ঐ বিশিষ্ট আত্মা স্বাতন্ত্র্যমূলক ধর্মবিশ্বাসের জন্য তাঁকে ক্রমেই এক ধরনের গুরুবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে দেখা যায়। অবশেষে ১৮৮৭ সালে তাঁকে নেতৃত্বে বসিয়ে দেব সমাজ স্থাপিত হয়। আর অগ্নিহোত্রী "ভগবানদেবআত্মা" হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে পূজিত হতে শুরু করেন ১৮৯০ সাল থেকে—যাতে তিনি উন্নীত হন প্রায় দেবতার পর্যায়ে।[২০] তা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত সাধারণের কাছে এঁরা ভিন্ন নামে ব্রাহ্মসমাজ বলেই বিবেচিত হতে থাকেন।[২১]

জীবনের নানা পর্যায়ে নিজের মত ও পথে দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল থেকে জ্বলন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে কর্মতৎপর থাকার আরেকটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে

তারাকিশোর চৌধুরীর জীবন। ইনি যে দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই। তবে ব্রাহ্ম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উপবীত ত্যাগ করায় তখনকার দিনে প্রচলিত নানা গঞ্জনা ও উৎপীড়ন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল।[২২] আবার কুচবিহার বিবাহসংক্রান্ত বিতর্কে কেশব সেনের বিরুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। আনন্দমোহন বসু কর্তৃক সংগঠিত স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েসনের সদস্য হিসাবে একুশ বছর বয়সের আগে বিবাহ না করতে প্রতিজ্ঞবদ্ধ হন।[২৩] আবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন নেতৃবর্গ প্রভাবিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের একজন উৎসাহী সভ্য হিসাবেও তিনি মূলত লেখালেখির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[২৪] এমনকি সম্বলহীন তরুণ বিপিন পালকে শ্রীহট্টে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য আর্থিক সহায়তাও দিতে থাকেন কিছুকালের জন্য।[২৫] বিপিন পালের মতে চরিত্রের তীব্র আবেগ তারাকিশোরকে একজন 'অগ্রগতিসম্পন্ন ব্রাহ্ম' থেকে গোঁড়া হিন্দুতে রূপান্তরিত করে। ১৮৮২ সালে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে আসার পূর্বাহ্নে নিজের অভাব অভিযোগ ব্যক্ত করে তিনি তত্ত্বকৌমুদীতে যে দীর্ঘ চিঠিটি লেখেন তাতে ঐ কালের যুবকদের একাংশে মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[২৬] এরপর শ্রীহট্টে হিন্দুসভা স্থাপন করে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করেন।[২৭] ঐ পর্যায়ে তিনি ওকালতিতে অগ্রগণ্য হয়ে ওঠেন। কিন্তু পরে বৃন্দাবনের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সংঘগুরু হয়ে ব্রজবিদেহী মহান্ত সন্তদাস বাবাজী হিসাবে পরিচিত হন।[২৮]

১৮৬১ সালে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত রামকুমার বিদ্যারত্ন[২৯] ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নিযুক্ত হন।[৩০] ধর্মপ্রচারক হিসাবে ইনিও যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করে আসামের চা বাগিচাগুলিতে ভ্রমণ করে সেখানকার শ্রমিকদের দুর্দশা প্রতিবিধানের জন্য একজন রীতিমত সাংবাদিক হয়ে ওঠেন।[৩১] এই রকমই এক প্রচারকার্যের সূত্রে তিনি যখন স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রকে কোন্নগরে আরেকজন ব্রাহ্মের তত্ত্বাবধানে রেখে কলকাতার বাইরে গিয়েছিলেন···স্বল্পকালের ব্যবধানে প্রথমে তাঁর পুত্র[৩২] ও পরে স্ত্রীবিয়োগ হয়।[৩৩] এর কিছুকাল আগে তিনি বীরভূমের দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকর্মে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[৩৪] স্ত্রী পুত্রের মৃত্যুর ফলে তার মধ্যে বৈরাগ্যের সঞ্চার ঘটে এবং ১৮৮৮ সাল নাগাদ তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ ও কর্মপদ্ধতিতে কিছু কিছু পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। এতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্য উপস্থিত হওয়ায় তিনি সবিনয়ে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন।[৩৫] এরপর তিনি তন্ত্রসাধনায় নিযুক্ত হয়ে রামানন্দ ভারতী নামে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেন।[৩৬]

নরেন্দ্রনাথ দত্ত হিসাবে পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ নববিধান পর্যায়ে কেশব সেন নির্দেশিত "নববৃন্দাবন" নাটকে যোগীর ভূমিকায় অভিনয় করেন ১৮৮২ সালে।[৩৭] তীব্র আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি কিছুকাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও ঘোরাফেরা করেন।[৩৮] অতঃপর রামকৃষ্ণপ্রদর্শিত যে পথে তিনি খুঁজে পান আত্মতৃপ্তির উপায় তা বহুল পরিচিত।

বরিশালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। ১৮৭৩ সালে ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় বসবাস কালে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন।[৩৯] তাঁর সেই আকর্ষণ বরিশালে ফিরে এসে কর্মজীবন পর্যায়েও অক্ষুণ্ণ থাকে। উৎসাহের সঙ্গে তিনি ব্রাহ্ম আদর্শ প্রচার করতে থাকেন।[৪০] কিন্তু ১৮৮৬ সালের পর থেকে তাঁর মনোভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে থাকে। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষার্থীদের উৎসাহদানে তিনি বিরত হন।[৪১]

বরিশালের আরেকজন উৎসাহী ব্রাহ্মপ্রচারক ছিলেন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। ১৮৮০ সাল নাগাদ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে বেশ উদ্যমের সঙ্গে স্থানীয় হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণের থেকে ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের মধ্যেও ব্রাহ্ম আদর্শ প্রচার করেন।[৪২] ১৮৮৭-৮৮ সালে সস্ত্রীক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করার পরেও কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও বরিশালের স্থানীয় ব্রাহ্মধর্ম সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল।[৪৩] কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালেও ঐ ধর্মমণ্ডলের বহু আদর্শের সঙ্গে তাঁর ঐকমত্য হয় নি।[৪৪] আবার পরবর্তীকালে এর বহু আদর্শের প্রতি তার নিষ্ঠারও অভাব ঘটে নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।[৪৫]

চরমপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিপিনচন্দ্র পালের চরিত্র এতই পরিচিত যে তা আর পুনরুক্তির অপেক্ষা রাখে না। ইনিও ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় থাকাকালে ব্রাহ্ম আদর্শে দীক্ষিত হন।[৪৬] কুচবিহার বিবাহসংক্রান্ত বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।[৪৭] এছাড়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম পর্যায়ে একজন উৎসাহী সদস্য হিসাবে রচনা কর্মে আত্মনিয়োগ করেন।[৪৮] অতঃপর ১৮৯৫ সালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে দীক্ষাগ্রহণকরে তিনি যে জীবনযাপন করেন তাতে ব্রাহ্মধর্মবিরোধী কিছু না করার কৈফিয়ত বরাবরই সোচ্চার থেকেছে।[৪৯]

সমাজ সংস্কারের তাড়নায় বা প্রেরণায় তরুণী বিধবা বিমাতার বিবাহ দেবার জন্য খ্যাত বা কুখ্যাত বরিশালের অন্তর্গত লাখুটিয়ার জমিদার রাখাল

চন্দ্র রায়চৌধুরী ছিলেন ১৮৬০এর দশকে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের একজন অতি উৎসাহী সভ্য।[৫০] পরে বিজয়কৃষ্ণের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে পরিত্যক্ত উপবীত পুনঃগ্রহণ করেন ও পৌত্তলিকতায় নতুন করে আস্থাশীল হয়ে পড়েন।[৫১]

8

আজকে দেশের মধ্যে যখন ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বারম্বার সাম্প্রদায়িক সমস্যায় দীর্ণ ও বিদেশে প্রগতিশীল আদর্শ বিতর্কসঙ্কুল—বর্তমান পর্যালোচনাটির কিছু প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে বলা যায়।

প্রথমেই নির্দেশ করা যেতে পারে যে শিক্ষাগত যোগ্যতার বিচারে আলোচ্য ব্যক্তিবর্গ পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিতই ছিলেন।[৫২] আর এই বৌদ্ধিক চর্চাই উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূত্রপাত করে।[৫৩] সেই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিদের বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রভাবিত ব্রাহ্ম আদর্শ পরিত্যাগ করে চিরায়ত ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার অনুবর্তন করার চেষ্টা বেশ কৌতূহল উদ্রেক করে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে এঁদের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে আসার পরেও ব্রাহ্ম আদর্শ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন যে তাঁরা ব্রাহ্ম আদর্শবিরোধী কিছু করেন নি বা ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে তাঁরা উপকৃতই হয়েছেন।[৫৪] অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের কাছে এঁদের বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি অনুমোদনযোগ্য ছিল না ব্যতিক্রম বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবান্ধব। যতদূর সাক্ষ্যপ্রমাণ মেলে তাতে এই ব্যতিক্রমকেও ব্যাখ্যা করা কঠিন নয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এঁদের মতভেদের কোন ক্ষেত্র বা মতবিশ্বাস নিয়ে বিতর্কের কোন সূত্রই রচিত হয় নি।

অথচ ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে আসার পরবর্তীকালে এঁরা সকলেই আপন আপন কর্মের দ্বারা লোকসমাজে বেশ পরিচিতি লাভ করেন, অগ্রগণ্য নেতৃস্থানীয় মানুষ হিসাবে স্বীকৃত হন। এমন বহু মানুষের উপর এঁদের প্রভাব বিস্তৃত হয়—যাঁরা এঁদের কাছে জীবনের নানা প্রয়োজনে নির্দেশ গ্রহণ করতেন। তাঁদের কেন্দ্র করে কোন কোন ক্ষেত্রে জনসেবার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়। তবে বলাই বাহুল্য যে ঐ সংগঠনগুলি কালক্রমে "আপনাতে আপনি আবদ্ধ" সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকাতেই অস্তিত্বের চরম সার্থকতা বলে মনে করতে শুরু করে। বৃহত্তর কোন প্রেক্ষাপটে উত্তীর্ণ হবার সমস্ত লক্ষণ হারিয়ে ফেলে।

আলোচ্য ব্যক্তিবর্গের কারো কারো ব্যক্তিগত সাক্ষ্য এবং অন্যদের

পরবর্তী পর্যায়ের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে অপর যে সাধারণ লক্ষণটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে—এক ধরনের গভীর মানসিক হতাশা—এঁদের ব্রাহ্ম-সমাজ ত্যাগ করতে প্রেরণা যোগায়। এই মানসিক হতাশার কারণ আমাদের সন্ধান করতে হবে ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন পরিস্থিতির মধ্যে। কেশব-উত্তর নববিধান গোষ্ঠীর মধ্যেকার তীব্র মতভেদ[৫৫] আর সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ঐ পর্যায়ে নিয়মকানুনের কড়াকড়ি, মত ও বিশ্বাস নিয়ে অস্বাভাবিক স্পর্শকাতরতা, সংস্কার কর্মে যে আগ্রহ আগে দেখা যেত—তার অভাব ও পলায়নী মনোবৃত্তি বেশ উগ্র হয়ে উঠেছিল।[৫৬] আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলি চর্চার জন্য নির্দিষ্ট সংস্থায় তীব্র ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ, সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত, ভোট, তর্কবিতর্ক, কমিটি গঠন করার প্রাবল্য ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিকতার প্রতি এক ধরনের অমনোযোগ সূচিত হয় যা জন্ম দেয় ঐ মানসিক হতাশার। গভীরতর মানসিক বৃত্তির চর্চার পথ ব্যাহত হয়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রাহ্ম নেতাদের কাছে এই ব্যাপারটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে ব্রাহ্ম আদর্শ তখনকার যুবমানসকে আর আগের মত আকর্ষণ করতে পারছে না।[৫৭] বয়স্ক ব্রাহ্মগণও এই সমস্যামুক্ত ছিলেন এমন নয়। আধ্যাত্মিক তৃপ্তির সন্ধানে দু-চারজন সাধারণী ব্রাহ্মকর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনভজনের চর্চা করেন। তখন কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাছে এটা খানিকটা ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ বলে বিবেচিত হতে শুরু করে।[৫৮] সুতরাং পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের মত যাঁরা ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে আসেন নি তাঁদের এই সমস্যাটি নিয়ে চিন্তিত হতে দেখা যেত। আর ঐ অভাববোধকে নির্দেশ করার জন্য "শুষ্কতা"—এই শব্দটি অত্যন্ত ঘনঘন ব্যবহৃত হতে দেখা যেত ঐ সমাজের মুখপত্রস্বরূপ ব্রাহ্ম পত্র-পত্রিকাগুলির প্রায় প্রতিটি সংখ্যায়।[৫৯]

অন্যদিকে পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ গুরুকরণের দ্বারা ঐ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। গুরুর নির্দেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্তিত সমবেত উপাসনার বদলে ব্যক্তিগতভাবে ধ্যান, প্রাণায়াম, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, হিন্দুশাস্ত্রনির্দিষ্ট ব্রত পালন, আচার আচরণ অনুসরণ, তীর্থভ্রমণ, নানা অঙ্গের তন্ত্রসাধনা এক কথায় চিরায়ত ভারতীয় ধর্মসাধনের বিভিন্ন মার্গ অনুসরণ করা ঐ চেষ্টার অন্তর্গত ছিল। তবে গুরুকরণের ব্যাপারে তাঁদের সকলের প্রত্যয় (Perception) যে এক রকমের ছিল এমন নয়। গুরুকরণ তো দূরের কথা শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী নিজেই গুরু হয়ে বসে শিষ্যবর্গের কাছ থেকে ভগবানের প্রতি ভক্তের আনুগত্য দাবি করতে থাকেন। এই অর্থে ব্রাহ্মসমাজত্যাগী ব্যক্তিদের কাছে গুরুই হয়ে উঠেছিলেন আধ্যাত্ম সাধনার চরম উপাস্য। অপরদিকে তখনকার প্রতিটি

আদর্শে অতৃপ্ত অথচ অফুরন্ত উদ্যমী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সবকটি আদর্শকে যাচাই করে ফিরেছেন—কিন্তু নিজে গুরু সেজে বসেন নি বা কারো শিষ্যত্বও গ্রহণ করেন নি। গুরু হিসাবে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অবস্থা খুব একটা পৃথক ছিল না। তবে মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ তাঁর নেতৃস্থানীয় বাঙালী শিষ্যদের দৃষ্টিতে গুরু ও ঈশ্বর একাকার হয়ে যায় নি।

ঐসব ব্রাহ্মসমাজত্যাগীদের কর্মোদ্যম শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানেই আবদ্ধ থাকে নি। সমাজসেবা ও সাংসারিক বৃত্তিগুলির চর্চার পরেও তাঁরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অফুরন্ত উদ্যমকে পরিচালিত করেন।

এখানে লক্ষণীয় যে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু কি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগণ্য নেতৃবর্গ যেখানে কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী মতাদর্শ পোষণ ও প্রচার করা পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন—সেখানে এরা সকলেই চরমপন্থী মত ও বিশ্বাসে আস্থাশীল ছিলেন। আমাদের এই বিশ্লেষণের সমর্থনে হাইমসাথের একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তাঁর মতে রামমোহনের সময় থেকে অনুসৃত সমাজসংস্কার প্রয়াসের আকাঙ্ক্ষিত পর্যাপ্ত অগ্রগতি লক্ষ্য না করে সংস্কারকদের একদল এর জন্য ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতাকেই দায়ী করতে শুরু করেন। ক্রমে ভারতের পশ্চাৎপদ অবস্থার ঐ ব্যাখ্যা অন্যসব বিবেচনাকে এমনভাবে ছাপিয়ে ওঠে যে সমাজসংস্কার থেকে রাজনৈতিক কর্মোদ্যমের (সাধারণত চরমপন্থী আদর্শের) পিছনেই জনসমর্থন বাড়তে থাকে।[৬০] তবে অগ্নিহোত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত দেবসমাজের সদস্যগণ তাঁদের গুরুর প্রতি অখণ্ড আনুগত্য স্থাপন করে এবং সাংসারিক জীবনে উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করেও গোষ্ঠীগতভাবে জীবনের বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধে উৎসাহহীন হয়ে পড়েন।

সূত্রনির্দেশ

১ প্রদীপ সিংহ, নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী বেঙ্গল, (কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৫), পৃ ৮৬; তৎসহ দেখুন ডি. চক্রবর্তী, "শশিপদ ব্যানার্জী: স্টাডি ইন দি নেচার অফ দি ফার্স্ট কন্‌টাক্ট অফ দি বেঙ্গলী উইথ দি ওয়ার্কিং ক্লাস অফ্ বেঙ্গল (কলকাতা: সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোসাল সায়েন্সেস্, ১৯৭৫), পৃ ৬

২ চার্লস, এইচ. হাইমসাথ, ইণ্ডিয়ান ন্যাসানালিজম অ্যাণ্ড হিন্দু সোসাল রিফর্ম, (নিউ জার্সি : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪), ভূমিকা, পৃ ৭

৩ ডেভিড কফ, দি ব্রাহ্মসমাজ অ্যাণ্ড দি সেপিং অফ মডার্ণ ইণ্ডিয়ান মাইণ্ড, (নিউ জার্সি : প্রিন্সটন ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৭৯), পৃ ৭৮-৮০

৪ অমলশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হিস্ট্রি অফ এক্সপ্যানসান অফ ব্রাহ্মইজম আউটসাইড ক্যালকাটা বিটুইন ১৮২৮-১৯০০ : এ কেস স্টাডি অফ ঢাকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৫ সালে প্রদত্ত এম. ফিল গবেষণা-পত্র, পৃ ১

৫ সুতপা ভট্টাচার্য, দি ব্রাহ্মসমাজ মুভমেন্ট ইন বিহার : ইটস্ সোসাল রিলিজিয়াস ডায়মেনসনস, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৩ সালে প্রদত্ত পি. এইচ. ডি. গবেষণা-পত্র, পৃ ৪৩ এ-৫১

৬ অমলশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত

৭ বঙ্কুবিহারী কর, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত, (কলকাতা : বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩২৮), ২য় সংস্করণ, পৃ ২২১-২৫৬ ; তৎসহ দেখুন ধনঞ্জয় দাস, ব্রজবিদ্রোহী মহন্ত ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত্র, কলকাতা : চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৯৪০), পৃ ৫৮ এবং দুর্গানাথ ঘোষ, পরিব্রাজকাচার্য স্বামী রামানন্দ (কলকাতা : সৌরীন্দ্রনাথ রায়, ১৩৩৪), পৃ ৯৪-১১৪ এবং তারাকিশোর চৌধুরীর পত্র, তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৪ শক, ১ আশ্বিন, পৃ ১২৯-১৩২

৮ বঙ্কুবিহারী কর, পূর্বোল্লিখিত, ভূমিকা ; তৎসহ দেখুন মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পত্র, তত্ত্বকৌমুদী, ১ বৈশাখ, ১৮১৬ শতাব্দ, পৃ ৬-৮ ; এবং বিপিনচন্দ্র পাল, মেমারিস অফ মাই লাইফ এণ্ড টাইমস্, (কলকাতা : বিপিনচন্দ্র পাল ইন্সটিটিউট, ১৯৭৩), ২য় সংস্করণ, পৃ ৫৪২

৯ ডেভিড কফ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২২০ ; তৎসহ দেখুন শিবনাথ শাস্ত্রী, হিস্ট্রি অফ দি ব্রাহ্মসমাজ, ১৯৭৪), ২য় সংস্করণ, পৃ ৮৭

১০ শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩১১

১১ বঙ্কুবিহারী কর, পূর্ব বাঙলা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, (ঢাকা (?) : পূর্ববাঙলা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে হেমন্তকুমার ঘোষ, ১৯৫১), পৃ ১৩৩-১৩৮ ; প্রবীণ সাধারণী ব্রাহ্ম গুরুচরণ মহলানবিশ তাঁর আত্মজীবনীতে বিজয়কৃষ্ণ

গোস্বামীর ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের এক কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মহলানবিশের মতে অতিরিক্ত মরফিয়া সেবন ও আত্মীয়স্বজনের অর্থলিপ্সার দরুন বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন। বিস্তৃত বিবরণের জন্য গুরুচরণ মহলানবিশ, আত্মকথা, (কলকাতা : নির্মল-কুমারী মহলানবিশ, ১৯৭৪) দেখুন

১২ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রী সদ্‌গুরু সঙ্গ : শ্রীমদাচার্য শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীউর দেহাশ্রিত অবস্থার কতক সময়ের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত, পুরী : ঠাকুরবাড়ী আশ্রমের সেবাইত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬৯ (?), ১ম খণ্ড, পৃ ১-১৫৭

১৩ বঙ্কুবিহারী কর, পূর্ববাঙলা, পৃ ১৩৭। তৎসহ দেখুন, তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৮ শকাব্দ, ১ আষাঢ়, পৃ ৫ ; তদেব, ১ শ্রাবণ, পৃ ৮৪

১৩ক বঙ্কুবিহারী কর, "বিজয়কৃষ্ণ", ভূমিকা

১৪ বিপিনচন্দ্র পাল, মেমরিস, পৃ ৫০০

১৫ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ১৮৯৬, পৃ ৫

১৬ যোগেশচন্দ্র বাগল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা ; (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭১), ১০০তম খণ্ড, পৃ ১৪ ; তৎসহ দেখুন এস. পি. সেন (সম্পাঃ), ডিকসেনারি অফ ন্যাসানাল বায়োগ্রাফী, (কলকাতা : ইনস্টিটিউট অফ হিস্টোরিকাল ষ্টাডিস্. ১৯৭৪), ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৩৭১-৩৭৪ ; মদনমোহন কুমার (সম্পাঃ), ভারতকোষ, (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৩), ৫ম খণ্ড, পৃ ১৯২-১৯৩

১৭ ডেভিড কফ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২০১-২১৪

১৮ জে. এন. ফার্কুহার, মডার্ণ রিলিজিয়াস মুভমেন্টস্ ইন ইণ্ডিয়া, (নিউ ইয়র্ক : ম্যাকমিলান কোম্পানি, ১৯১৫), পৃ ১৭৩-১৮০

১৯ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, অ্যানুয়াল রিপোর্ট ১৮৮৭, পৃ ৫ ; তৎসহ দেখুন, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, ১০ অক্টোবর, ১৮৮৬, পৃ ৪৫

২০ কে. ডবলু. জোন্স, আর্য ধর্ম : হিন্দু কনসাসনেস ইন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি পাঞ্জাব, (দিল্লী : মনোহর বুক সার্ভিস, ১৯৭৬), পৃ ১১৫-১১৯

২১ তদেব, পৃ ১১৬

২২ ধনঞ্জয় দাস, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১২

২৩ বিপিনচন্দ্র পাল, মেমরিস, পৃ ২৬১

২৪ ধনঞ্জয় দাস, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৫

২৫ তদেব, পৃ ৩১

২৬ তত্ত্বকৌমুদী, ১৮৪৪ শকাব্দ, ১ আশ্বিন, পৃ ১২৯-১৩২

২৭ ডেভিড কফ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৪৭

২৮ শঙ্করনাথ রায়, ভারতের সাধক, (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৯৮২), ১০ম সংস্করণ, ২ খণ্ড, পৃ ২৬০-৩১২

২৯ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), কুলী কাহিনী, (কলকাতা : যোগমায়া প্রকাশনী, ১৯৮২), মুখবন্ধ

৩০ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ১৮৭৮

৩১ অমর দত্ত, আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও দ্বারকানাথ, (কলকাতা : সান্ত্বনা দত্ত, ১৯৭৮), পৃ ৩৫, ৩৬

৩২ তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৮ শকাব্দ, ১৬ অগ্রহায়ণ, পৃ ১৮৮

৩৩ তদেব, ১৮১০ শকাব্দ, ১ কার্তিক, পৃ ১৫৬

৩৪ তদেব, ১৮০৭ শকাব্দ, ১ আষাঢ়, ১ শ্রাবণ, ১৬ ভাদ্র ও ১৬ পৌষ

৩৫ দুর্গানাথ ঘোষ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১১৩

৩৬ তদেব, পৃ ১৫১-১৯৫

৩৭ ডেভিড কফ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২০৪

৩৮ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, (কলকাতা : প্রভাসচন্দ্র গুপ্ত, ১৩১৪) ৪র্থ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ ১৯ ; তৎসহ দেখুন, তত্ত্বকৌমুদী, ১৮১৭ শকাব্দ, ১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৩৫

৩৯ সুরেশচন্দ্র গুপ্ত, স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবনচরিত, (বরিশাল : আনন্দময়ী আশ্রম, কাশীপুর, ১৩৩৫), পৃ ৮৬

৪০ তদেব, পৃ ১৫৫, ৫৩২-৫৩৬

৪১ মন্মথমোহন দাস (সম্পাঃ), ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, (বরিশাল, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ, ১৩৩৪), পৃ ১৯

৪২ মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, মনোরমার জীবন-চিত্র, (কলকাতা : দেবরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ১৯২১), পৃ ৫৭, ৬৩-৬৫, ৬৯

৪৩ তদেব, পৃ ২৭৭, ২৯০, ৩১৯ ; তৎসহ দেখুন, তত্ত্বকৌমুদী, ১৮১৪ শকাব্দ, ১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৩৫

৪৪ তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ বৈশাখ, পৃ ৬-৮ ; এটি তাঁর লিখিত তৃতীয় পত্র

৪৫ সুমিত সরকার, দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (১৯০৩-০৮), (কলকাতা : পিপল্‌স্ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৭), পৃ ২৮ ; তৎসহ দেখুন উমা ও হরিদাস

মুখার্জি অ্যাটেম্পটস্ অ্যাট ন্যাসানাল এডুকেশন; অতুলচন্দ্র গুপ্ত (সম্পাঃ). স্টাডিস্ ইন বেঙ্গল রেনেসাঁ, (কলকাতা : ন্যাসানাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, ১৯৫৮), পৃ ৪১৫-৪১৬

৪৬ বিপিনচন্দ্র পাল, মেমরিস, পৃ ২৩১-২৬১, ২৬২-২৬৩

৪৭ তদেব, পৃ ২৭৬-২৭৮

৪৮ তদেব, পৃ ৫৪০

৪৯ তদেব, পৃ ৫১৬-৫৩৪

৫০ শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪২০-৪২৬

৫১ বিপিনচন্দ্র পাল, মেমরিস, পৃ ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৫

৫২ তারাকিশোর, এম. এ. এল. বি অশ্বিনীকুমার ও ভাই; শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী রুরকী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ডিগ্রিপ্রাপ্ত, বিজয়কৃষ্ণ কলকাতা মেডিকেল কলেজে বছর দুই পড়েছিলেন; ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এন্ট্রান্স পাস করে এফ. এ. পড়তে পড়তে কলেজ ছাড়েন; বিবেকানন্দ দর্শনে বি. এ. অনার্স; বিপিন পাল এফ. এ পর্যন্ত পড়েছিলেন; কেবল রামকুমার বিদ্যারত্ন টোলে চিরায়ত পদ্ধতিতে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন বটে, কিন্তু কর্মজীবনে ওয়েসলিয়ান মিশন স্কুলে কাজ করার সময় পাশ্চাত্য চিন্তার সংস্পর্শে আসেন।

৫৩ নিমাইসাধন বোস, ইণ্ডিয়ান অ্যায়েকেনিং অ্যাণ্ড বেঙ্গল, (কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৬), ৩য় সংস্করণ, পৃ ৯২

৫৪ বঙ্কুবিহারী কর, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৪৭; তৎসহ দেখুন দুর্গানাথ ঘোষ, পূর্বোলিখিত, পৃ ১১১-১১২

৫৫ শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৭১-২৭৬

৫৬ ডেভিড কফ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৪২-১৪৩; তৎসহ দেখুন প্রশান্তকুমার সেন, বায়োগ্রফি অফ এ নিউ ফেথ, (কলকাতা: থ্যাকার এ্যাণ্ড স্পিঙ্ক, ১৯৫৪), ২য় খণ্ড, পৃ ২১৩-২৩০

৫৭ ইণ্ডিয়ান মেশেঞ্জার, ১৮৮৬, ১৭ অক্টোবর, সংখ্যা ৭, পৃ ৫০-৫১: তৎসহ দেখুন, তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৭ শকাব্দ, ১৬ কার্তিক, পৃ ১৬৪-১৬৫

৫৮ তত্ত্বকৌমুদী, ১৮১৩ শকাব্দ, সাম্যবাদী শীর্ষকপত্রগুলি দ্রষ্টব্য

৫৯ তদেব, ১৮০৭ শকাব্দ, ১ পৌষ, পৃ ১৯৩; তদেব. ১৮০৮ শকাব্দ ১৬ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৪০-৪৫; তদেব, ১৮০৯ শকাব্দ ১৬ বৈশাখ, পৃ ১৫-১৬, ২২

৬০ চার্লস এইচ. হাইনসাথ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৭-১৮

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কলকাতার নগরায়ণে বেসরকারী উদ্যোগ

সৌমিত্র শ্রীমানী

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কলকাতার নগরায়ণে বেসরকারী উদ্যোগের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বুঝে নেওয়া দরকার সরকারী উদ্যোগ বলতে আমরা কি বোঝাতে চাইছি। ১৭৫৭-এর পলাশীর যুদ্ধের বহু আগে থেকেই ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরে জমিদারী করে আসছিল। জমিদার হিসাবে কোম্পানী যেমন এই অঞ্চলগুলি থেকে রাজস্ব আদায় করত, তেমনি এই অঞ্চলগুলিকে উন্নত করার এবং সেখানে লোকবসতির বৃদ্ধি ঘটানোর দায়িত্ব তার ছিল। সেইদিক থেকে বলতে গেলে কলকাতায় সরকারী উদ্যোগ হল, সেইসব উদ্যোগ যেগুলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার সূচনা করেছিল। অতএব কোম্পানীর প্রশাসনের বাইরে ব্যক্তিগত উদ্যমের ফসল হিসাবে যা যা ঘটেছিল—সে-সবই ছিল বেসরকারী উদ্যোগ। আমাদের আলোচ্য সময়ে কলকাতায় সরকারী এবং বেসরকারী—এই দুই ব্যবস্থার পার্থক্যটা আরও গভীর এবং আরও ব্যাপক। কারণ ১৭৫৭-তে পলাশীর যুদ্ধ ইংরেজ কোম্পানীকে কার্যত সুবা বাংলার শাসকে রূপান্তরিত করে এবং এই রূপান্তরের উপর বাদশাহী শিলমোহর পড়ে ১৭৬৫-তে, যখন কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করল। অর্থাৎ ১৭৫৭ উত্তর কলকাতায় সরকার বলতে কোম্পানী ছাড়া আর কিছুই বোঝাল না।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কলকাতার নগরায়ণে বেসরকারী উদ্যোগ এক বিরাট প্রাধান্য লাভ করেছিল। এক হিসাবে বলতে গেলে কলকাতার ক্ষেত্রে এটা আদৌ নতুন কিছু নয়। মধ্যযুগের বাংলার অন্যতম প্রধান বন্দর সপ্তগ্রামের অবক্ষয়ের যুগে বণিককুল হুগলী নদীর মোহনার দিকে নেমে আসতে শুরু করেছিল। তাদের মধ্যে যারা আরও অধিক সাহসী তথা উদ্যমী—তারা

ইতিহাস বিভাগ, পি. এন. দাস. কলেজ, পলতা

আরও নীচের দিকে নেমে হাওড়ার বেতড়ে বসতি স্থাপন করে। এদেরই মধ্যে চারটি বশাখ ও একটি শেঠ পরিবার নদী অতিক্রম করে পূর্বতীরে এসে গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তন করেছিল। তারা জঙ্গল কেটে, পথ-ঘাট নির্মাণ করে, পুকুর কেটে অতি দ্রুত তাদের স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। এইভাবে ঐ তন্তুবায় পরিবারগুলির উদ্যোগেই গড়ে উঠল সুতানুটি হাট—যা সুতানুটি গ্রামের উৎসভূমি।[১] অর্থাৎ আমাদের পরিচিত সময়ের ইতিহাসচর্চা করতে গেলেই দেখা যাচ্ছে যে, কলকাতার আদিম সময় হতে বেসরকারী তথা ব্যক্তিগত উদ্যোগই তাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। এই ব্যক্তিগত উদ্যোগের পশ্চাতে কিয়দংশে কোম্পানীরও মদত ছিল। শেঠ পরিবারগুলির উদ্যম ও শ্রমের প্রতিদানে জমিদার হিসাবে কোম্পানী তাদের অধিকৃত জমির খাজনা হ্রাস করে দেয়। এটা ঘটে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে।[২] এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কলকাতার নগরায়ণের এক নতুন দিক উন্মোচিত হল। কারণ শেঠ পরিবারগুলির উদ্যমের পুরস্কার হল এই আর্থিক সুবিধা দান, এই সুবিধা প্রদানের মাধ্যমেই কোম্পানী জানিয়ে দিল যে, ব্যক্তিগত উদ্যমকে সে উৎসাহ যোগাবে। বলা যেতে পারে যে, এইভাবেই কলকাতার নগরায়ণে ব্যক্তিগত উদ্যমের সূত্রপাত।

শুধুমাত্র যে স্থানটির প্রয়োজনের কথা মনে রেখে কোম্পানী ব্যক্তিগত উদ্যমকে উৎসাহ দিতে শুরু করেছিল, তা নয়। কোম্পানীর ব্যবসায়িক প্রয়োজনের জন্যও এটা জরুরী ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে কোম্পানী বাংলার বস্ত্র নিয়ে ভালরকমের ব্যবসা করত। এজন্য কোম্পানী তার নিজের অধিকারে তন্তুবায়দের বসতিতে বিশেষ আগ্রহী ছিল। সেই উদ্দেশ্য মাথায় নিয়েই কোম্পানী কলকাতায় তন্তুবায়দের বসতিতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়।[৩] নগরায়ণের পশ্চাতে এদের ভূমিকাও নেহাৎ কম ছিল না।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ কলকাতার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। কলকাতা হয়ে উঠল একাধারে বাণিজ্য, রাজনীতি তথা প্রশাসনের কেন্দ্র। স্বাভাবিকভাবে কলকাতায় জনবৃদ্ধি ঘটল এবং সেইসঙ্গে তার নগরায়ণের গতিও কিছুটা ত্বরান্বিত হল। ধনী ব্যক্তিরা কলকাতায় জায়গাজমি কিনতে শুরু করে এবং তাদের এ-কাজে যথেষ্ট লাভেরও ইঙ্গিত ছিল। স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস এ তথ্য স্বীকার করেছেন।[৪] ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণ ও গোকুল ঘোষাল যৌথভাবে বার্ষিক ১৩ লক্ষ টাকা জমার বিনিময়ে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী পঞ্চান্ন গ্রামের খাজনা আদায়ের ইজারা তিন বছরের মেয়াদে নেওয়ার প্রস্তাব দেন।[৫] তাঁদের এই প্রস্তাবই কলকাতার গুরুত্ব প্রমাণ করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কলকাতার এই গুরুত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যম কিভাবে ও কতখানি বৃদ্ধি পেল ?

আমরা প্রথমে কলকাতার বন্দর ও তার যোগাযোগের কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। বন্দর ও জলপথের গুরুত্ব আমাদের কাছে অধিক এইজন্য যে, ইংরেজরা কলকাতাকে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেই প্রথমে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ কলকাতায় একটি আধুনিক বন্দর নির্মাণে গুরুত্ব দেন। কোম্পানী কিন্তু সেইমত বিশেষ কিছু করে উঠতে পারে নি। তারা পুরাতন কেল্লার কাছে ব্যাঙ্কসালটিকে পুনর্নির্মাণ করেই কাজ সমাধা করে। আধুনিক বন্দরের চাহিদা পূরণের জন্য মেজর ওয়াটসন এগিয়ে এলেন। গোবিন্দপুরের দক্ষিণে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে তিনি একটি আধুনিক বন্দর গড়ার পরিকল্পনা হাতে নেন। কোম্পানী অবশ্য তাঁকে সাহায্য করেছিল। মোট ১০৩ বিঘা ৮ কাটা জমি তিনি লাভ করেন যদিও তাঁর চাহিদা আরও বেশী ছিল।[৬] এখানেই একাহিনীর শেষ নয়। তাঁকে বহু বাধার সামনে পড়তে হয়। সমস্ত ছিন্নমূলকে অন্যত্র বসতি দেওয়া নিয়ে দীর্ঘকাল কোর্ট-কাছারিতে সময় নষ্ট হয়। এসবের থেকেও বড় বাধা ছিল গোকুল ঘোষালের আপত্তি। কারণ আধুনিক খিদিরপুরে, অর্থাৎ যেখানে বন্দরে গড়ে উঠল, গোকুল ঘোষালের বিপুল সম্পত্তি ছিল। কোম্পানীর ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁকেও কিছু জমি ছাড়তে হয়—যদিও সে-সবের জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন। হেস্টিংসের অন্যতম কাউন্সিলার বারওয়েল গোকুলকে মদত দেন। ফলত দীর্ঘকাল কলকাতায় সুপ্রীম কোর্টে ওয়াটসনের সঙ্গে গোকুলের মামলা চলে এবং ওয়াটসন কিছুটা জমি ফেরৎ দিতেও বাধ্য হন। এভাবেই ওয়াটসনের উদ্যোগ পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়।[৭] কিন্তু বন্দর গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজটি ওয়াটসন ভালভাবেই সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন।

খিদিরপুরে বন্দরের পাশাপাশি কলকাতায় যোগাযোগের এক দীর্ঘ জলপথও এই সময়ে খুলে যায় বেসরকারী উদ্যোগে। আমরা টলির নাল্লার কথা বলছি। খিদিরপুর হতে সুন্দরবনের তরদহ বা মতান্তরে ফরদহ পর্যন্ত সুর-মানের কাটা খালটিকে প্রশস্ত করেছিলেন মেজর টলি। এভাবে হুগলী নদীর সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্বের বিদ্যাধরী নদীকে যুক্ত করা হল—যে দূরত্ব ছিল ১৭ মাইল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে টলি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই এই বিরাট কাজটি সমাধা করেন।[৮] কলকাতায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহে এই জলপথটির বিরাট ভূমিকা ছিল। এই জলপথেই পূর্ববাংলা থেকে খাদ্যসামগ্রী সহজে কলকাতায় আনা যেত। যশোহর ও খুলনাকে চন্দননগরের সঙ্গে এভাবেই যুক্ত করা গেল।[৯]

এমনকি ঢাকাও এই পথেই যুক্ত হল।[১০] টলি ৪ আগস্ট ১৭৭৯ তারিখে একটি চিঠি লিখে কলকাতা কমিটিকে জানান যে তাঁরই উদ্যোগের ফলে পূর্ব-বাংলা তথা কলকাতায় পূর্বদিকে লবণহ্রদগুলি থেকে অতি সহজেই মাছ প্রতিনিয়ত কলকাতায় সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়েছে। এর ফলে মাছের দামও কমতে শুরু করেছে।[১১] প্রথম প্রথম টলি নৌকা পিছু যে শুল্ক ধার্য করেছিলেন পরবর্তীকালে তার পরিমাণ হ্রাস করেন। এর থেকেই বোঝা যায় জলপথটিকে কিভাবে বহুল ব্যবহৃত হত। শুধুমাত্র খালটিকে সংস্কার করাই নয়, টলি খিদিরপুর হতে লবণহ্রদ পর্যন্ত খালের পার্শ্ববর্তী ২000 বিঘা পতিত জমি ইজারা নিয়ে তা বাসযোগ্য করার ব্যবস্থা করেন।[১২] ফলত, খালের ধারে ধারে গড়িয়াহাট, চেতলা, বেলতলা প্রভৃতি ঘাটগুলিও কর্মচঞ্চল হয়।[১৩]

কলকাতার পূর্তকাজে টলির ভূমিকায় এখানেই শেষ নয়। তিনি কলকাতা হতে পাটনা পর্যন্ত একটি রাস্তা -নির্মাণেরও প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তা গ্রাহ্য হয় নি। তবে বেলেঘাটা থেকে শহরের উত্তরাংশ হয়ে হুগলী নদী পর্যন্ত একটি খাল খননের অনুমতি তিনি লাভ করেছিলেন।[১৪]

শুধুমাত্র কলকাতাকে বহির্জগতের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য বেসরকারী উদ্যোগ ছিল, তা নয়। শহরের মধ্যেও রাস্তাঘাট নির্মাণে তার কোন ঘাটতি ছিল না। মহারাজ নবকৃষ্ণ চিৎপুরের সঙ্গে পরবর্তীকালের অন্যতম প্রধান রাজপথ সার্কুলার রোডকে যুক্ত করার জন্য নিজ অর্থে একটি রাস্তা নির্মাণ করান।[১৫] আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে, নিজের তালুকটি আরও সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই নবকৃষ্ণ এই কাজ করেছিলেন। ঠিক তেমনিভাবে রাইটার্স বিল্ডিং-এর সম্মুখে ১৯ কাঠা জমি সরকারের কাছ থেকে কিনে নিয়ে টমাস লায়ন একটি পাকা রাস্তা তৈরি করান।[১৬] আমাদের এটাও ভুললে চলবে না যে, এই লায়নই কলকাতায় কোম্পানীর 'রাইটারদে'র থাকার জন্য একাধিক বাড়ী তৈরি করেছিলেন। কোম্পানী তার নিজের কর্মচারীদেরই থাকার মত কোন ব্যবস্থা করে উঠতে পারে নি।

এই রকম কিছু রাস্তাই যে বেসরকারী উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিল, তা নয়। তৎকালীন কলকাতায় ইউরোপীয়দের অধ্যুষিত এলাকা, যা কসাইটোলা নামে পরিচিত ছিল, সেখানে 'পাকা' নর্দমা তৈরির জন্য পথের ধারে বহু জমি বিলি করা হয় অধিবাসীদের মধ্যে।[১৭] মনে রাখা দরকার যে, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কলকাতার পাকা নর্দমা প্রায় ছিল না বললেই হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বেসরকারী উদ্যোগের পশ্চাতে প্রধান কারণ কি ছিল।

আমরা জানি যে, আমাদের আলোচ্য সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতায় সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার কারণটিকে বিশেষভাবে মর্যাদা দিতে শুরু করেছিল। বলা যেতে পারে যে, সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা দৃঢ়মূল হওয়ার ফলেই কলকাতায় একশ্রেণীর কর্মীর সমাবেশ হতে থাকল। তারাই নিজ নিজ সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি করার জন্যও বটে আবার সেইসব সম্পত্তিতে ভাড়াটে ইত্যাদি বসাবার জন্যও বটে—অর্থ বিনিয়োগ করার পন্থা শুরু করে। একজন ব্যক্তি যথেচ্ছ পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হতে পারত। সে তার অধীনস্থ ভাড়াটেকে পাট্টাও প্রদান করতে পারত।[১৮] অতএব নতুন ভাড়াটে বসাতে এবং বেশী পরিমাণে ভাড়া লাভ করতে এইসব সম্পত্তির মালিকরা নিজ নিজ এলাকাগুলিকে সংস্কার করারও চেষ্টা করত। মনেহয় কোম্পানীর প্রশাসন ও এই জাতীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কিয়দ্‌পরিমাণে কাজ করেছিল। ১৭৭৮এ যখন নবকৃষ্ণকে সুতানুটির তালুকদারী প্রকাশ করা হয়, তখন তাঁকে বিশেষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে তিনি যেন নিরন্তর প্রজাবৃদ্ধিতে মনোযোগ দেন। এটা করতে গিয়ে তাঁকে সদাচারী হতেও সরকার পরামর্শ দিয়েছিল। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নবকৃষ্ণের বার্ষিক 'জমার' পরিমাণ ছিল ১২৩৭ টাকা ১ আনা ১৩ গণ্ডা ১০ কড়া।[১৯] সেক্ষেত্রে নিরন্তর প্রজাবৃদ্ধির ফলে তাঁর যে আয় বৃদ্ধি হত তাতে কিন্তু কোম্পানীর সরকার আদৌ কোন অংশ দাবী করে নি। এটা যে শুধু নবকৃষ্ণের ক্ষেত্রে ঘটেছিল তা নয়। এটাই ছিল তৎকালীন সরকারী ব্যবস্থা।

অতএব নবকৃষ্ণ নিজ অর্থ ব্যয় করে নিজের জমিতে সিমলায় ১৫ বিঘায় একটি পুকুর খনন করতে দ্বিধা করেন না।[২০] তাঁরই মত রাজা রামলোচন আরকুলিতে ৬ বিঘা ৭ কাঠা জমিতে অনুরূপ পুকুর খনন করান।[২১] এণ্ড্রু উইলিয়ামস্ নামে এক ইংরাজও চৌরঙ্গীতে ১৯ বিঘা ৫ কাঠা জমিতে একটি পুকুর কাটিয়েছিলেন।[২২] এর আশপাশের এলাকাগুলিও তিনি সংস্কার করেন।[২৩] অবশ্য এটা মনে করলে ভুল হবে যে, সরকারের তরফে এইসব কাজে আদৌ কোন যোগদান দিল না। পুকুর কাটলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই জমির দেয় খাজনা মকুব করার প্রথা ছিল। তবে আগে থেকে অনুমতি সংগ্রহ করতে হত। সেকালের কলকাতায় জলসরবরাহ ব্যবস্থা বলতে এই পুকুরগুলিকেই বোঝাত। নদীর জল পানের যোগ্য ছিল না। সরকারী ব্যবস্থায় পুকুর খননের বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে লালদিঘীটি সরকারী রক্ষণাবেক্ষণে ছিল। কিন্তু সেখানকার জল সম্ভবত ইউরোপীয় অধিবাসীরাই ব্যবহার করতে পারত। জলসরবরাহের কথা বলতে গেলে

মনোহর দাসের নাম উল্লেখ করতেই হয়। তিনি ছিলেন কাশীর এক ধনী বণিক। কলকাতায় এসে তিনি চৌরঙ্গীর বিখ্যাত জলাশয়টিকে নিজ অর্থে সংস্কার করান।[২৪] আজও তা 'মনোহরদাস তড়াগ' নামে খ্যাত। মনে রাখতে হবে, পুকুরটির ধারে কাছে তাঁর কোন সম্পত্তি ছিল না। তিনি যা করেছিলেন তা সম্পূর্ণই জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে।

একইভাবে প্রায় সম্পূর্ণত ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেকালের কলকাতায় নদীর তীর বাঁধাই সম্ভব হয়েছিল। নদীর তীরে অনবরত ভাঙ্গন দেখা যেত। মনে রাখতে হবে যে, নদীই ছিল তখনকার কলকাতার প্রাণ। এরই ধারে ধারে বাণিজ্য কুঠীগুলি এবং এরই ঘাটে ঘাটে ভিড়ত হাজারো জাহাজ ও নৌকা। অতএব এই নদীর তীরকে সুরক্ষিত রাখা ছিল বিশেষ জরুরী। সরকারের তরফ থেকে শুধুমাত্র ব্যাঙ্কসালের ঘাট ও তার পার্শ্ববর্তী তীরের সংস্কার ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করা হয় নি। কিন্তু নদীর তীরে বহু ব্যক্তির জমি ছিল—তা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্যও বটে আবার বাসের জন্যও বটে। যেহেতু জমির পাট্টায় বর্ণিত পরিমাণের জন্য জমির মালিক খাজনা দিতে বাধ্য ছিল এবং যেহেতু পাট্টায় বর্ণিত পরিমাণের অতিরিক্ত এক ফোঁটা জমির উপরও তার অধিকার ছিল ছিল না।[২৫] সেইহেতু জমির মালিক সর্বদাই নিজ নিজ সম্পত্তির যথেষ্ট সংরক্ষণে উদ্যোগী হতে বাধ্য থাকত। এইরকম তাগিদ থেকেই কলকাতায় নদীর তীরে কিছু ঘাটের জন্ম তথা সংরক্ষণ হয়। এভাবেই জনৈক উইলিয়াম জনসন তাঁর নিজের বাড়ী ও পুরাতন কেল্লার মধ্যবর্তী অংশে ৫০ ফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ঘাটটি ৮০ ফুটে রূপান্তরিত করেন।[২৬] এছাড়া তীরবর্তী গুদামগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য ১২০ গজ পরিমিত স্থানে রেলিং দেন,[২৭] ও সেখানকার আরও বহুল সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন।

চাঁদপাল ঘাটের কাছে জনৈক লুই দ্য কোস্টা একটি স্থায়ী প্রাচীর তুলে সেখানকার গুদামগুলিকে নদীর জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন।[২৮] এর পাশেই পুরাতন কাস্টম হাউসের কাছে জনৈক উইলিয়াম বারবার জমি কিনে তীর বাঁধাই করে দেন।[২৯] চাঁদপাল ঘাটের কাছেই টমাস লায়ন, যাঁর পরিচয় ইতিপূর্বেই আমরা পেয়েছি, নিজ অর্থে অন্যূনপক্ষে ৫০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট একটি রাস্তা নির্মাণ করান।[৩০] সেকালের দৃষ্টিতে বিচার করলে এ রাস্তাকে নেহাৎই রাজপথ বলা যেতে পারে।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কলকাতায় এক শ্রেণীর ধনী ভারতীয়র বসতি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। লক্ষণীয় বিষয় যে, নদীর ঘাট বা তীর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এইসব ভারতীয়র যোগদান সম্বন্ধে আমাদের তথ্য নেই। যদিও নদীর তীর

সংরক্ষণে কাজ হয়েছিল খুবই কম তথাপি সেটুকু কাজই করেছিল ইউ-রোপীয়রা। সম্ভবত নদীবাণিজ্যে ইউরোপীয়দের দ্রুত অগ্রগতি তাদের নদীর তীরে সম্পত্তি ইত্যাদি কিনে নিতে সাহায্য করেছিল। ফলত সেই সম্পত্তির রক্ষার্থে বটে আবার নিজেদের বাণিজ্যের প্রয়োজনে যোগাযোগের স্বার্থেও বটে—এইসব ইউরোপীয়রা উদ্যম দেখিয়েছিল।

তবে আমাদের আলোচ্য সময়ে কলকাতায় বেসরকারী উদ্যোগ সর্বাধিক নিয়োজিত হয়েছিল বাজার নির্মাণে। আবার এই বাজার নির্মাণেই ভারতীয়-দের যোগদান ছিল সর্বাধিক। আমাদের মনে রাখতে হবে যে কলকাতা শহরের বা তার পূর্বতন অবস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধির পশ্চাতে বাজারের ভূমিকাই ছিল প্রধান। তা সুতানুটি হাটের দ্বারা হোক বা বড়বাজারের দ্বারা হোক। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে কলকাতার দিকে জনস্রোত ছিল অবিরাম ধারায়। এই জনবৃদ্ধির ফলস্বরূপ বাজারগুলির চাহিদাও বৃদ্ধি পেল একইভাবে। বাজার নির্মাণে এবং ইজারা নেওয়ায় ভারতীয়দের ব্যাপক যোগদানের পশ্চাতেও কিছু কারণ ছিল। বাণিজ্যিক পটভূমি হতে ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমানহারে পশ্চাদপসরণ অনিবার্যভাবেই তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দিকে আকৃষ্ট করে তোলে।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজ-উদ্-দৌলার আক্রমণের সময়ে তৎকালীন কলকাতার উত্তরভাগের ক্ষতি হয়েছিল সর্বাধিক। লক্ষণীয় বিষয় এই উত্তর-ভাগেই ভারতীয়দের বসতি ছিল অধিক পরিমাণে। পলাশীর যুদ্ধের পরই এই অংশে উন্নয়ন শুরু হয়। ১৭৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাজবল্লভের পিতা মহারাজা মহেন্দ্রদুর্লভ রামবাহাদুর গোবিন্দরাম মিত্রের পুত্র রঘু মিত্রের কাছ থেকে হুগলী নদীর ধারে বাগবাজারে একখণ্ড জমি কেনেন। এখানে তিনি নিজ অর্থে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। কোম্পানীর সরকারও এর গুরুত্ব অনুভব করতে পেরেছিল। তারা দুর্লভরামকে এই বাজারের জন্য দেয় খাজনা মকুব করেছিল।[৩১]

কালে কালে দেখা গেল যে, বাজারের মালিকানার মাধ্যমে ধনী ভারতীয়দের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি সূচিত হচ্ছে। যদি কোন ব্যক্তি সরকারের কাছে তার প্রস্তাবিত বাজার সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করতে সমর্থ হত বা যদি সেই বাজার অন্য একটি স্থায়ী বাজারের হানি করার অবস্থায় না থাকত তাহলে নতুন বাজার গড়ে তোলায় সরকারের কোন আপত্তি থাকত না।[৩২] অতএব ধনী ব্যক্তিরা নিজ নিজ জমিতে সুবিধা পেলেই বাজার বসিয়ে দিত। ব্যাপারটা লোভনীয় ছিল এই কারণে যে, বাজারে সম্মিলিত বিক্রেতা বা ফড়িয়াদের কাছ

থেকে ভাড়া বাবদ প্রতিদিনই অর্থ সংগ্রহ করা যেত। ফলত একটি বাজার চালাতে পারলে তা লাভজনকই হত।

মহারাজ নবকৃষ্ণকে তাই আমরা দেখি ২০ জুলাই ১৭৭৪ তারিখে শোভাবাজারের সনদ সংগ্রহ করতে।[৩৩] একইভাবে তাঁর প্রতিবেশী অঞ্চলে দেওয়ান কাশীনাথ বার্ষিক ৭৫০ টাকা 'জমা'য় রামবাজারের সনদ লাভ করেন ঐ একই সময়ে। রেভিনিউ কমিটির সভাপতির বেনিয়ান রাজা রামলোচনও আরকুলিতে বার্ষিক ৪০০ টাকার 'জমা'র বিনিময়ে একটি বাজারের অধিকার লাভ করেন।[৩৪] এসবের পাশাপাশি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ব্রহ্মোত্তর বাজারটিও উল্লেখযোগ্য। এই বাজারটি জানবাজারের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। অন্যান্য বাজারের সঙ্গে এটির একটি চরিত্রগত পার্থক্য ছিল, কারণ এরজন্য কোন খাজনা লাগত না এবং তা দর্পনারায়ণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হত।[৩৫] বোঝাই যাচ্ছে যে তৎকালীন কলকাতায় দর্পনারায়ণ একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর মর্যাদা ও প্রতিপত্তির সম্পূর্ণ ব্যবহার তিনি করেছিলেন।

বাজার নির্মাণে ভারতীয়দের সঙ্গে ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গীর এক মূলগত পার্থক্য ছিল। অন্যান্য পূর্ত কাজের মতই ইউরোপীয়রাও বাজার নির্মাণে পিছিয়ে ছিল না। তৎকালীন কলকাতায় কোম্পানীর সার্ভেয়ার এডওয়ার্ড টিরেটার মাধ্যমে ইউরোপীয়দের বাজার-নির্মাণে এক নতুন ভূমিকার সূত্রপাত হয়।

লালবাজারের কাছে বলডেন গার্ডেন বা জোড়াবাগ নামে একটি স্থানকে এক 'গঞ্জ' নির্মাণের জন্য চয়ন করা হয়।[৩৬] কিন্তু স্থানটির দখল নিয়ে একদিকে কলকাতায় কালেক্টর ও অন্যদিকে পুলিশ কমিশনারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ব্যাপারটা গুরুতর আকার ধারণ করলে সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে উদ্যোগী হয়ে তার নিষ্পত্তি করতে হয় এবং বাজার গড়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কালেক্টর লাভ করে। কিন্তু কালেক্টর তা নির্মাণ করতে পারে নি। অর্থাভাবই ছিল এর মূল কারণ।

কিন্তু শূন্যাবস্থা আদৌ বজায় থাকল না। টিরেটা মঞ্চে অবতরণ করলেন। তিনি বলডেন গার্ডেনে নিজ অর্থে একটি পরিকল্পিত 'প্যাকা' বাজার নির্মাণের প্রস্তাব দেন। তিনি তিনটি পৃথক বাজারের পরিকল্পনা করেন যাদের একটিতে মাংস, একটিতে মাছ এবং সর্বশেষটিতে আনাজ বিক্রি করা হবে। সেকালের দৃষ্টিতে বিচার করলে এ পরিকল্পনা যে আধুনিক তথা বিজ্ঞানসম্মত ছিল তা মানতেই হয়। টিরেটা অবশ্য বার্ষিক মোট ৫০০ টাকা 'জমা'য় ৯৯ বছর মেয়াদী এক ইজারা প্রার্থনা করেন। যেহেতু প্রস্তাবিত বাজার নির্মাণে যথেষ্ট

অর্থ ব্যয় হবে সেইহেতু তিনি প্রারম্ভিক তিন বছরের জন্য খাজনা মকুবেরও প্রার্থনা করেন।[৩৭] টিরেটার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছিল।

ঠিক টিরেটারই মত ধর্মতলা অঞ্চলে জমি কিনে জন বা মতভেদে জোসেফ পেরবোর্ণ এমনই এক বাজার নির্মাণের প্রস্তাব করেন। তিনিও ৯৯ বছরের এক মেয়াদী ইজারার প্রস্তাব দেন।[৩৮] টিরেটার বাজারে সঙ্গে অবশ্য তাঁর প্রস্তাবিত বাজারের এক চরিত্রগত পার্থক্য ছিল। টিরেটা সরকারী জমি ইজারা নিয়েছিলেন যা পেরবোর্ণ পারেন নি। সরকার পেরবোর্ণকেও অনুমতি দিয়েছিল।[৩৯] তাঁর বাজারটি ছিল সম্পূর্ণ ইউরোপীয়-অধ্যুষিত এলাকায়। তাঁর বাজার এতই পরিচ্ছন্ন তথা আধুনিক ছিল যে তার জুড়ি সেকালের কলকাতায় ছিল না বললেই হয়। এমনকি 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর সম্পাদক পর্যন্ত তার প্রশংসা করেছিলেন উন্মুক্তভাবে।[৪০]

এঁদেরই মত চার্লস শর্ট, ক্যামাক ও ফেনউইক কলকাতায় উন্নতমানের বাজার নির্মাণে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শর্ট নাকি ৭০ হাজার টাকারও বেশী ব্যয় করে এই কাজ করেন।[৪১] যদিও ইউরোপীয়দের বাজারগুলি ইউরোপীয়-অধ্যুষিত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল তথাপি কলকাতায় নগরায়ণে তাদের ভূমিকা বড় একটা কম ছিল না।

আমাদের সম্ভবত বলতে অসুবিধা নেই যে, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কলকাতার নগরায়ণে বেসরকারী উদ্যোগ সরকারী উদ্যোগকে বহু ক্ষেত্রেই ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিল। এখানেই ছিল কোম্পানীর প্রশাসনের সার্থকতা ও সাফল্য। কোম্পানী জনমনে এমনই এক আস্থার পরিবেশ জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল যার দ্বারা উদ্যোগী ব্যক্তিরা এই স্থানটির নগরায়ণে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। একটি উপনিবেশের ক্ষেত্রে এটা বড় কম লাভ নয়।

সূত্রনির্দেশ

১ সি. আর. উইলসন, দ্য আর্লি অ্যানাল্‌স্‌ অফ দ্য ইংলিশ ইন বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, (নতুন দিল্লী, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৩), পৃ ১৩৪ ৩৫

২ উইলসন, পূর্বোল্লেখিত, সংখ্যা ২১৫

৩ উইলসন, দ্য ওল্ড ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, (লণ্ডন, ১৯০৬), সংখ্যা ২৫৩

৪ ওয়ারেন হেস্টিংস্, দ্য প্রেজেন্ট স্টেট অফ দ্য ইস্ট ইণ্ডিজ, (লণ্ডন, ১৭৮৬), পৃ ১২

৫ রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানা, নতুন দিল্লী ; হোম ডিপার্টমেন্ট (পাবলিক ব্রাঞ্চ) কার্যবিবরণী, ২০ আগস্ট, ১৭৬৭ ; অবশ্য এই প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করে নি

৬ পঃ বঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, ক্যালকাটা কমিটি অফ রেভিনিউ কার্যবিবরণী, ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৯-এর সংযোজনী

৭ এলফ্রেড স্পেন্সার সম্পাদিত মেমোয়ার্স অফ উইলিয়ম হিকি, (তারিখ নেই, লণ্ডন) ৩য় খণ্ড, পৃ ১৪৯

৮ এ. কে. রায়, এ শর্ট হিস্ট্রি অফ ক্যালকাটা, এন. আর. রায় সম্পাদিত, (কলকাতা, ১৯৮২), পৃ ২০৫ এবং নীলমণি মুখার্জী, দ্য পোর্ট অফ ক্যালকাটা : এ পার্ট হিস্ট্রি. (কলকাতা, ১৯৬৮), পৃ ৩২

৯ পঃ বঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, ক্যালকাটা কমিটি অফ রেভিনিউ কার্যবিবরণী, ১৬ জুলাই, ১৭৭৯

১০ ঐ, বোর্ড অফ রেভিনিউ (বিবিধ) কার্যবিবরণী, ২৬ ডিসেম্বর, ১৭৮৬

১১ ঐ, ক্যালকাটা কমিটি অফ রেভিনিউ কার্যবিবরণী, ৪ আগস্ট, ১৭৭৯

১২ ঐ, ১৫ মে, ১৭৭৭

১৩ ঐ

১৪ ফোর্ট উইলিয়ম ইণ্ডিয়া হাউস করসপনডেন্স, যা রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানা হতে প্রকাশিত, ৭ম খণ্ড, লেটার টু দ্য কোর্ট, ৫ আগস্ট, ১৭৭৫, অনুচ্ছেদ ২৩ ও ২৪

১৫ হেনরী কটন, ক্যালকাটা : ওল্ড এণ্ড নিউ, এন. আর. রায় সম্পাদিত, (কলকাতা, ১৯৮০), পৃ ২৮৯

১৬ পঃ বঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, ক্যালকাটা কমিটি অফ রেভিনিউ কার্যবিবরণী, ২০ আগস্ট, ১৭৭৯ এবং ৬ সেপ্টেম্বর, ১৭৭৯

১৭ ঐ, বোর্ড অফ রেভিনিউ (বিবিধ) কার্যবিবরণী, ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৭৯০, সংযোজনী ২৩

১৮ ঐ, ক্যালকাটা কমিটি অফ রেভিনিউ কার্যবিবরণী, ২৭ নভেম্বর, ১৭৭৮

১৯ ঐ, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, জি. জি. ইন কাউন্সিল কার্যবিবরণী, ১৬ জানুয়ারী, ১৭৭৮

২০ জেমস লঙ, সিলেকসন্ ইত্যাদি, (কলকাতা, ১৯৭৩), সংখ্যা ৫৮০

২১ পঃ বঙ্গ মহাফেজখানা, কমিটি অফ রেভিনিউ কার্যবিবরণী, ১৩ ডিসেম্বর, ১৭৮১

২২ পঃ বঙ্গ মহাফেজখানা, কমিটি অফ রেভিনিউ কার্যবিবরণী, ১৬ জুলাই, ১৭৮১

২৩ ঐ, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, ইত্যাদি কার্যবিবরণী, ১৬ নভেম্বর, ১৭৮১

২৪ রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানা, হোম ডিপার্টমেন্ট, (পাবলিক ব্রাঞ্চ) কার্যবিবরণী, ২২ মার্চ, ১৭৯৩

২৫ পঃ বঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, বোর্ড অফ রেভিনিউ (বিবিধ) কার্যবিবরণী, ৭ এপ্রিল, ১৮২০

২৬ ঐ, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, ইত্যাদি কার্যবিবরণী, ৩০ ডিসেম্বর, ১৭৭৭

২৭ ঐ, ১১ মার্চ, ১৭৭৭

২৮ ঐ, ক্যালকাটা কমিটি অফ রেভিনিউ কার্যবিবরণী, ২৩ আগস্ট, ১৭৭৯

২৯ ঐ, বোর্ড অফ রেভিনিউ (বিবিধ) কার্যবিবরণী, ২৫ জুন, ১৭৯৩

৩০ ঐ, ক্যালকাটা কমিটি অফ রেভিনিউ কার্যবিবরণী, ৬ আগস্ট, ১৭৭৯

৩১ ঐ, বোর্ড অফ রেভিনিউ (সেয়ার) কার্যবিবরণী, ১৪ নভেম্বর, ১৭৯৪

৩২ ঐ, কমিটি অফ রেভিনিউ কার্যবিবরণী, ২০ এপ্রিল, ১৭৮১

৩৩ ঐ, রেভিনিউ বোর্ড কনসিস্টিং অফ হোল কাউন্সিল কার্যবিবরণী, ১ নভেম্বর, ১৭৭৪

৩৪ ঐ, কমিটি অফ রেভিনিউ কার্যবিবরণী, ২৪ জুলাই, ১৭৮২

৩৫ ঐ, বোর্ড অফ রেভিনিউ কার্যবিবরণী, ৩০ মে, ১৭৮৭

৩৬ ঐ, কমিটি অফ রেভিনিউ কার্যবিবরণী, ৩০ মে, ১৭৮১

৩৭ ঐ, ২২ জুলাই, ১৭৮২

৩৮ ঐ, ৪ নভেম্বর, ১৭৮২

৩৯ ঐ, ১৬ জানুয়ারী, ১৭৮৩

৪০ ডবলু. এস. সিটন-কার সম্পাদিত, সিলেকসন্স ফ্রম ক্যালকাটা গেজেট ইত্যাদি, (কলকাতা, ১৮৬৪) ২য় খণ্ড, দ্রষ্টব্য সম্পাদকীয়, ১১ সেপ্টেম্বর ১৭৯৪

৪১ পঃ বঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, কমিটি অফ রেভিনিউ কার্যবিবরণী, ২৪ মার্চ, ১৭৮৫

একজন বাঙালী তীর্থযাত্রীর চোখে 'সিপাহী বিদ্রোহ'

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। ভারতের নানা শ্রেণীর মানুষ এই বিদ্রোহে সামিল হল। বিদ্রোহীদের ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্ন তুলে তাদের ছোট করার প্রবণতা কোন কোন লেখকের মধ্যে দেখা গেছে, কিন্তু সমসাময়িক ঘটনাপঞ্জী এবং ইংরেজদের লেখা থেকেই অন্যরকম সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয়দের নিষ্ঠুরতার ছবি যেমন তাঁরা এঁকেছেন, তেমনি তাঁদের ঔদার্য, সহনশীলতা, দয়া-মায়া ও মানবিকতার কথা একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। এ কথা তো মানতেই হয় যে, ১৮৫৭ সালে কোম্পানির অপশাসনের বিরুদ্ধে ভারতের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। সিপাহী ও অন্যান্যদের অংশগ্রহণ এতই বাস্তব ঘটনা যে, সেটিকে অস্বীকার করা অসম্ভব। আবার কেউ কেউ বিষয়টিকে সামন্তশ্রেণীর প্রতিক্রিয়া বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক সময় লিখেছিলেন, "কেউ বলবে না যে, 'সিপাহী বিদ্রোহে' জাতীয় সংগ্রামের সুপরিণত মূর্তি দেখা যায়—তা অসম্ভব। কিন্তু তাই বলে দেশের একটা বিরাট এলাকাজুড়ে, আর সারা দেশের মন মাতিয়ে একটা বিপুল ঘটনা ঘটল, ইংরেজশাসন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠল, সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুরতা মরিয়া হয়ে একেবারে নারকীয় রূপে দেখা দিল—আর সেই অভূতপূর্ব ঘটনার কদর্থ করব. জাতির মনে যে স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে—তাকে মলিন করার চেষ্টায় নামব, 'সামন্ত প্রতিক্রিয়া' প্রভৃতি বুলি আউড়ে তথ্যান্বেষীকে বিভ্রান্ত করে দেব, এ হল কি ধরনের ইতিহাসবোধ, কি ধরনের দেশপ্রেম?" (প্রমোদ সেনগুপ্ত, "ভূমিকা", 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭', কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ঠ-ড)। দেশপ্রেমের কত রকমের চিত্র যে পাওয়া যায় তার সাক্ষ্য বহন করছে সেকালে বইপত্র ও সরকারি-বেসরকারি নথিপত্র।

যুগ্ম সম্পাদক, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্র, নৈহাটি

সমসাময়িককালের অনেক বাঙালী বুদ্ধিজীবী সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন। এঁরা অধিকাংশই বড় বা ছোট জমিদার, তালুকদার এবং জমির স্বত্বভোগী। ১৮৫৭ সালের ১৫ মে তারিখে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ভারত সরকারের সচিবকে একটি চিঠি সহ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তাবলীর একটি কপি পাঠান। উক্ত সভায় সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভার কার্যবিবরণীর যে কপি পাঠানো হয় তার এক জায়গায় লেখা হয়ঃ "That this meeting contemplates, with the highest and most sincere satisfaction, that the sepoy disaffection has met with no sympathy or encouragement from the civil population of any part of this vast empire, nor has it been shared in by the major portion of the native soldiery ; but that the same feelings of loyalty and attachment to the British rule, which they have hitherts been inspired with, still continue to animate them with unabated fidelity." (A Hindu, 'The Mutinies and the People or Statements of Native Fidelity Exhibited During the Outbreak of 1857-58', Calcutta, 1859, p 128, এরপর থেকে 'Mutinies' উল্লেখিত হবে।) ভারত সচিব সিসিল বিডন ২৬ মে, ১৮৫৭ তারিখে রাধাকান্ত দেবকে তাঁর এই চিঠির উত্তর দেন। তাতে ব্রিটিশ সরকারের খুশির বার্তা ছিল। (Mutinies, p 129) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকও ভারত সচিবকে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনে চিঠি লিখেছিলেন। কার্যবিবরণীর ছত্রে ছত্রে দেখা যায় সরকারের প্রতি গভীর আনুগত্য। এ তো গেল সংস্থার সমর্থন। অনেক জমিদারের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিদ্রোহের বিরোধিতা লক্ষণীয়। সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য তারা তৎপর ছিলেন। ১৮ জুলাই ১৮৫৮ সালের Hurkaru থেকে জানা যায় যে, শ্রীরামপুরের গোঁসাইরা সরকারকে কয়েকটি বাড়ি বিনা ভাড়ায় সৈন্যদের বসবাসের জন্য ছেড়ে দেয়। হিন্দু স্কুল সৈন্যশিবিরে পরিণত হলে কলকাতার এক ধনী শ্যামাচরণ মল্লিক তাঁর একটি সুন্দর বাড়ি অস্থায়ীভাবে হিন্দু স্কুলের জন্য সরকারকে ব্যবহার করতে দেন। সরকারের কাছের লোক ছিলেন আরেক জমিদার—উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক নীলমণি মুখোপাধ্যায় 'A Bengal Zamindar : Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and His Times 1801-1888' বইতে তাঁর চরিত্র-কৃতিত্ব সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর জীবন ও আর্থিক উন্নতির মূলে

ছিল ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য। হয়ত সে কারণেই তিনি ব্রিটিশপন্থী ও বিদ্রোহবিরোধী ছিলেন। তিনি হুগলীর তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট এফ. আর. ককেরেলকে ১৭ জুন ১৮৫৭ সালে সিপাহীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করার জন্য একটি দরখাস্ত দেন। তাতে জয়কৃষ্ণ ছাড়া আরও ৪৭ জনের স্বাক্ষর ছিল। আবেদনকারীদের মধ্যে জয়কৃষ্ণ যে অন্যতম প্রধান তাতে সন্দেহ নেই। এই পত্রে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকারকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি যেমন আছে, তেমনি আছে নানান পরামর্শ। ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিলেন এঁরা সেই ছায়ায় আশ্রিত ছিলেন; ফলত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, ল্যাণ্ড হোলডার্স অ্যাসোসিয়েশন, সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষে গঠিত পাবলিক মিটিং অব দ্য নেটিভ কমিউনিটি এবং অন্যান্য সংগঠনের সদস্য তথা কর্তাব্যক্তিগণ কোম্পানী সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদ ছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ফলে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় কোম্পানী সরকারের খুব কাছাকাছি আসার সুযোগ পায়। ফলে সুযোগ-সুবিধাও তারা অনেক পেয়েছে। এই সমস্ত কারণেই বোধহয় তাদের রাজভক্তি ছিল চরম। এমনকি ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারা, শোষণ, অত্যাচার সম্পর্কেও তাঁরা নেহাৎই ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নিয়ে তৎকালীন বাংলার কিছু তথাকথিত অর্থে বড় মাপের মানুষ ব্রিটিশ সরকারকে যেভাবে তোষণ করেছেন তাতে উত্তরকালের বাঙালী যে লজ্জায় অবনত হবে তাতে আর সন্দেহ কি!

সমসাময়িক লেখকের রচনা ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গ্রাহ্য। পরিকল্পিত বইতে যে সমস্ত তথ্য সাজানো হয় তার পিছনে নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। দিনলিপি বা কড়চা সাধারণত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লেখা হয় না। লেখক তাঁর তুল্যকালীন তথ্যগুলিকে বিশ্বাস অনুযায়ী সাজিয়ে একটা মতকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। অনেক লেখক নিজের খেয়ালেই সাধারণতও দিনলিপি লেখেন। মুদ্রিত গ্রন্থাকারে পাঠকদের হাতে তুলে দেবার বাসনা বা পরিকল্পনা লেখকের নাও থাকতে পারে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে একাধিক দিনলিপি পাওয়া যায়। সেগুলি থেকে বিদ্রোহ সম্পর্কিত অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তা ছাড়া ঐগুলিতে সামাজিক চিন্তাধারাও প্রতিফলিত। প্রতিফলিত হয় ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত চিন্তনপ্রক্রিয়া।

যদুনাথ সর্বাধিকারী হুগলী জেলার খানাকুলের জমিদার ছিলেন। তিনি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তীর্থভ্রমণে বের হন। ফিরে আসেন বিদ্রোহের পর।

উত্তর ভারতে তিনি যখন ভ্রমণ করছিলেন সেই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহী হয়। যদুনাথ তাঁর ভ্রমণের দিনলিপি রাখতেন। ফলে তাঁর দিনলিপিতে সিপাহী বিদ্রোহের চিত্র অনুপস্থিত নয়। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব আছে, কারণ তাঁর দিনলিপি পরিকল্পিত গ্রন্থের খসড়া নয়। তিনি যেমন দেখেছেন, ভেবেছেন এবং তাঁর মানসিক গঠন অনুযায়ী যা সমর্থনযোগ্য মনে হয়েছে তাই বিবৃত হয়েছে। কোন তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তথ্যের সমাবেশ ঘটান নি। তাই এটি সমসাময়িক কালের দলিল হিসেবে গণ্য হতে পারে। তিনি মারা যাওয়ার অনেকদিন পর নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে যদুনাথের দিনলিপিটি 'তীর্থভ্রমণ' নামে প্রকাশিত হয়। মুখবন্ধে নগেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "২৯ বৈশাখ (১৮৫৭ খৃঃ অঃ, ১০ মে) হইতে ৩০ জ্যৈষ্ঠ (১০ জুন) পর্যন্ত দিল্লী, মীরাট, আগরা, মথুরা, আলিগড়, জৌনপুর, কাশী প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহীরা যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, যেরূপে বিদ্রোহ দমন করা হয়, গ্রন্থকার সংক্ষেপে সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সমসাময়িক বহু ইংরাজ যদিও সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সে সময়ের একজন প্রসিদ্ধ বাঙালীর রচনা বলিয়া বিশেষত আমাদের দেশীয় রাজন্যবর্গের, প্রধানত বাঙালীর কৃতকর্মের কথা যাহা ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ অনাবশ্যকবোধে ছাড়িয়া গিয়াছেন, আমাদের বাঙালীর গ্রন্থাকার তাহার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি কারণে তীর্থভ্রমণের 'সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণ' অংশ বাঙালীর নিকট বিশেষ মূল্যবান।"

আগেই উল্লেখ করেছি ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভূমিকেন্দ্রিক অভিজাত অনেক বাঙালীর মধ্যে ইংরেজপ্রীতি জাগিয়ে তুলেছিল। এঁরাই ছিলেন সাধারণত সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে এবং ইংরেজপক্ষ অবলম্বন করতে গিয়ে অনেক সময় অহেতুক নির্লজ্জ ইংরেজ বন্দনায় মেতেছেন তাঁরা। শুধু বন্দনা করেই ক্ষান্ত হন নি। সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন অযাচিত-ভাবেই। যদুনাথ সর্বাধিকারীর রচনায় ইংরেজপ্রীতি প্রকট। তিনি দেশীয় সিপাহীদের বিদ্রোহকে সমর্থন তো করেন নি, বরং তির্যক মন্তব্য করেছেন। তাঁর এই মনোভাবের উৎস সম্পর্কে প্রথমে বিশ্লেষণ করে নেওয়া দরকার। যদুনাথ তৎকালীন যুগের একজন শিক্ষিত ভূম্যাধিকারী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, "ইহাদের উপাধি বসু।··· উড়িষ্যার রাজ সরকারে চাকরি করিয়া সর্বাধিকরী উপাধি পাইয়াছিলেন, অনেক তালুক-মুলুক পাইয়াছিলেন এবং সকল সময়ে রাজসম্মানে জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছিলেন।

সে উপাধি তাঁহাদের এখনো আছে—সে তালুক এখনো আছে এবং পুরীর মন্দিরে সে সম্মান তাহাদের এখনো আছে।" (সত্যজিৎ চৌধুরী ও নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ', ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৯. পৃ ৭২৯) ওড়িশা রাজের পক্ষে এই ভূমিকেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণীর সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পর বাংলার রাজনৈতিক পটপরিবর্তন অনুসারে পাঠান, মোগল ও ইংরেজদের পক্ষে যুগোপোযোগী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে বরাবরই তাঁদের সম্মান অটুট থাকে। আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদ তো তাঁরা পেয়েছিলেন। তাছাড়া যদুনাথের লেখা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কোম্পানি-সরকারের প্রতি তাঁরা কৃতজ্ঞ ও মুগ্ধ ছিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে 'তীর্থভ্রমণ' প্রকাশিত হয় ১৩২২ বঙ্গাব্দে। নামপত্রে লেখা আছে "যদুনাথ সর্বাধিকারী রচিত / তাঁহার ভ্রমণের রোজনামচা / টীকা-টিপ্পনী ও সবিস্তার মুখবন্ধ সহ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত-বারিধি-সম্পাদিত।" এই বইয়ের একমাত্র "সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণ" অংশই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে যদুনাথ প্রথম দিনলিপি লিখতে শুরু করেন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মে তারিখে। রচনার সূত্রপাত এইভাবে—"দিল্লীর ছাউনিতে যে সৈন্যগণ ছিল, ইহারা মতান্তর হইয়া ষ্টেশনের রাজপুরুষগণকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের ব্যূহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দিল্লীশ্বরকে সাহায্য জন্য কহে।" ('তীর্থভ্রমণ', পৃ ৪৬০) দিল্লীতে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ যেন মনে মনে তৈরিই ছিলেন। তিনি সানন্দে নেতৃত্বের পদ গ্রহণ করলেন। ফলে সিপাহীদের সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ হয় নি। ইংরেজরা এদেশে ক্ষমতাসীন হওয়ায় বাহাদুর শাহের মনে ইংরেজদের প্রতি বিরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। তিনি হয়ত সিপাহীদের সাহায্যে স্বাধীন শাসনক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আশা করেছিলেন। সেদিক থেকে সিপাহীদের আহ্বানে তাঁর সাড়া দেওয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। যদুনাথ ১০ মে ১৮৫৭-র কড়চায় লিখছেন, "এক্ষণে দিল্লীতে যে তিন দল দেশীয় পদাতিক ছিল, তাহারা দিল্লীনগরে যে সমস্ত সেনাপতিগণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে হত করিয়া, দিল্লীশ্বরের ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, দিল্লীশ্বরের পুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া দিল্লীশ্বর করিয়াছেন। (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬১) এখানে তথ্যগত ত্রুটি লক্ষণীয়। "দিল্লীশ্বরের পুত্র" নয়, স্বয়ং দিল্লীশ্বরকে সিপাহীরা নেতা নির্বাচন করে তাঁর অস্তমিত ক্ষমতা ও গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। হয়ত সমসাময়িককালে এমন প্রচার হয়েছিল যে অশীতিপর বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্ শারীরিক দিক থেকে অক্ষম ; সুতরাং তাঁর

উত্তরাধিকারীর প্রতিই সিপাহীদের ঝোঁক ছিল প্রবল। বাহাদুর শাহের ছেলে মহম্মদ খোরাসের দাবি ছিল প্রবল। মীরাট সেনা-ছাউনি থেকে বিদ্রোহী সিপাহীরা যখন চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তখন "কর্ণেল ফিনিস্ প্রভৃতি অন্যান্য সেনাপতিগণ পদাতিকদিগকে স্তুতিবাক্যে সম্বরণার্থ বহুতর মিনতি করিতেছিলেন।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬০) কিন্তু কর্ণেল সিপাহীদের হাতে মারা যান। "পদাতিকগণ সাহেব লোকের বাঙ্গালোতে অগ্নি দিল, ভীষণ ঘোরনাদে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল, সকল দগ্ধ হইয়া হত হইল।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬১) এর মধ্য দিয়েই দিল্লী সাময়িকভাবে সিপাহীদের দখলে চলে যায় এবং বাহাদুর শাহ্ নেতা হন। শুধু দিল্লী নয়, "দিল্লীর আশপাশ সিপাহীগণ অধিকার করিয়া লইয়াছে।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬১)

বারাকপুরে যে বিদ্রোহের সূচনা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। "আলিগড়, কোয়েল, মইনপুরী, বুলন্দ সহর, ইটাওয়া প্রভৃতি লুঠ হইয়াছে। কানপুর আগরা ইত্যাদি সশঙ্কিত।... মথুরা শহরের বাজার ইত্যাদি দুই দিবস বন্ধ ছিল। সহরের সকল ফটক বন্ধ, কেবল লাল-দরজা আর আগরা-দরজার খিড়কি খোলা ছিল।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬১) এই অবস্থায় ব্রিটিশশক্তি তৎপর হয়ে ওঠে। সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য তারা তৈরি হয়। ইংরেজদের সাহায্যের জন্য দেশীয় ধনাঢ্যদের একাংশ এগিয়ে আসেন। যদুনাথের রচনা থেকে জানা যায়, "লছমি চাঁদ শেঠ পাঁচ-শত মেওয়াতি পদাতিক সাহায্য জন্য দিয়াছে।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬১) শুধু কি তাই! এমনকি "The Rajah of Rewah has placed two guns and two hundred sowars at the disposal of the Government for employment against the mutineers between Mirjapore and Rewah." (Phoenix, 17 June, 1857) কাশী থেকে কয়েকজন ইংরেজ ফিনিক্সের সাংবাদিককে জানিয়েছিলেন যে, কিছু বন্ধুভাবাপন্ন ভারতীয় জমিদার বিদ্রোহের সময় তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। (পূর্বোক্ত সূত্র) বিশেষ করে কাশীর রাজা "ঈশ্বরীনারায়ণ রায়বাহাদুর পাঁচশত বন্দুকধারী লোক লইয়া স্বয়ং শিকরোলে আছেন।" ('তীর্থভ্রমণ', পৃ ৪৬২)

সিপাহীদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে এনফিল্ড-রাইফেলের টোটার কথা বলা হয়ে থাকে। যদুনাথের রচনায়ও এ প্রসঙ্গ এসেছে। তাঁর মতে "সিপাহীগণ মতান্তর দেখিয়া সিবিল ও মিলিটারী বহুতর স্তুতিবাক্য" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৫২) ব্যবহার করে বোঝাতে চেয়েছেন, কারো ধর্ম নষ্ট করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয় এবং টোটা সম্পর্কে কোন সন্দেহ

থাকলে উক্ত টোটা ব্যবহার না করার অনুমতি দেন। কিন্তু কার্যত কোন ফল হয় নি। কিন্তু "শিখ সৈন্যগণ অবাধ্য হয় নাই।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬২) শিখ-সৈন্য ব্যতীত দেশীয় অন্যান্য সৈন্য, বিশেষ করে পদাতিকগণ সকলে একত্রিত হয়ে এদেশ থেকে ইংরেজদের উৎখাত করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। সিপাহীদের গোলমাল শুরু হয় "মীরাট, দিল্লী, অম্বালা, কোয়েল, আজমগড়, ইটাওয়া" প্রভৃতি স্থানে। যদুনাথ লিখেছেন, "কোন দেশের রাজা কি বাদশাহ কেহ সহযোগী হয় নাই। ইদানীন্তন জনশ্রুতিতে শ্রুত হইতেছে, নেপালাধিপতির প্রধান সেনাপতি জঙ্গবাহাদুর ৪০০০ হাজার সৈন্য লইয়া পাহাড় হইতে নীচে আসিয়াছেন।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬৩) জঙ্গবাহাদুর ইংরেজদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এই তথ্যের সমর্থন পাই হেনরি অ্যামব্রস ওল্ডফিল্ডের 'স্কেচেস ফ্রম নিপাল' (দ্বিতীয় খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৮০) বইতে।

গোয়ালিয়রের হোলকারের স্ত্রী "রাজাবাই দুই হাজার পদাতিক, এক হাজার অশ্বরূঢ় শস্ত্রপাণি এবং বার কামান আগ্রার কেল্লাতে পাঠাইয়া কোম্পানি বাহাদুরের তরফ মদতগিরি করিয়া আগরা রক্ষা করিতেছেন।··· ভরতপুরের রাজা আগরার ন্যায় মথুরা রক্ষা করিতেছেন।" ('তীর্থভ্রমণ', পৃ ৪৬৩-৬৪)

৪ জুন তারিখে যদুনাথ তাঁর কড়চায় লিখেছেন, ইংরেজ সেনাপতিগণ পদাতিকদের সরকারি হুকুম জানানোর উদ্দেশে প্যারেড লাইনে দাঁড়াতে আদেশ দেন। "কিন্তু ইহারা আপন আপন দুর্ভাগ্যক্রমে টোটার বিষয়ে বিপরীত বোধ করিয়া, যত ন্যূনতা স্বীকার করিয়া সেনাপতিগণ স্তুতিবাক্য কহিয়াছিলেন, সে বাক্য কপট বোধ করিয়া দুরাচার পদাতিকগণের আদেশে সেনাপতিগণ এবং রাজপুরুষগণকে হত করিয়া খাজনা লুঠিয়া গমন চেষ্টায় ছিল।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬৪) শেষ পর্যন্ত কাশীর রাজা ঈশ্বরী-নারায়ণ ইংরেজদের অনুরোধে পদাতিকদের কিছুটা শান্ত করতে সমর্থ হন। কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ ও রণোন্মত্ত ইংরেজরা পদাতিকদের নির্বিচারে হত্যা করতে শুরু করে। এমনকি "···তোপের গোলাদ্বারা প্রায় দেড়শত শিখ পদাতিক হত হইল।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬৬) ফলে ইংরেজদের একদা বিশ্বাসভাজন শিখ সৈন্যরাও গোরাদের বিরুদ্ধে যায় এবং "রণস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া রথী, পদাতিক এবং প্রধান সেনাপতি মেজর গাইসকে গুলি দ্বারা হত করিয়া বাহির হইয়া গেল।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬৬) বিদ্রোহের আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। ইংরেজরা কোনরকমে কাশীরাজের সাহায্যে নিজেদের দুর্গ রক্ষা করলেন। চতুর্দিকে দেশীয় কোন কোন জমিদার এবং সাধারণ প্রজারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইংরেজবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুললে

"৬ জুলাই বেনারস হইতে তিনশত গোরা, দুই তোপ, একজন সেনাপতি এবং কাশীর রাজার পাঁচ শত পদাতিক চলিল। এই গ্রামে সকল ভগই পরগণায় কাশীর রাজার রাজ্য।··· প্রজাগণ প্রায় সকল সৈন্য নিপাত করিয়াছিল, যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহারা প্রাণ লইয়া রাজার রামনগরের কেল্লাতে আসিয়াছিল। প্রজাগণ রাজসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া মহানিষ্টকারী হওয়ায় দৌরাত্ম্যের পথ প্রবল হইয়াছিল।··· প্রধান অনিষ্টকারী জমিদারকে ফাঁসী দেওয়াতে পূর্বোক্ত উপদ্রব হয়। তজ্জন্য রাজসৈন্যগণ সরকার বাহাদুরের সাহায্য জন্য···দুরাত্মাদিগকে প্রাণদণ্ড নিষ্কণ্টক করিয়াছেন।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৯১) এখন প্রশ্ন, হাজার হাজার এ দেশীয় মানুষ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল বলে সকলেই কি বদমায়েস, ডাকাত, দুরাত্মা বা অসৎ ? ব্রিটিশ-ভক্ত যদুনাথের তাই মনে হয়েছে। কিন্তু তা কি বিশ্বাসযোগ্য ? তিনি নানাসাহেব এবং তাঁর সঙ্গীদের কীর্তিকলাপকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। নানাসাহেবের ইংরেজবিরোধিতা তাঁর কাছে নিন্দনীয়। ইংরেজবিরোধী দেশীয় সৈন্য ও প্রজাদের কৃতিত্বকে তিনি উপেক্ষা করেছেন।

যদুনাথের কড়চা থেকে জানা যায় দেশীয় রাজা বা জমিদারদের অনেকেই ইংরেজদের সাহায্যও করেছেন। তাঁর মতে এ'রা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন। যুদ্ধাকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত জমিদারগণকে তিনি দস্যু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বাংলার বাইরে বিশেষ করে কাশীর প্রবাসী বাঙালীদের করুণ অবস্থার কথা যদুনাথ বর্ণনা করেছেন নিপুণভাবে। দেশীয় সৈন্যদের সঙ্গে গোরাদের যুদ্ধ দেখে তারা বিহ্বল। পালানো ছাড়া আর কোন উপায় তারা খুঁজে পেল না। বাঙালীদের দুর্গতির একটি বর্ণনা যদুনাথ দিয়েছেন, "যে সমস্ত বাঙালী পরিবার লইয়া শিকরোলে বাস করিয়াছিলেন, তাহাদের পরিবার লইয়া কি পর্যন্ত ক্লেশ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। একে স্ত্রীলোক, তাহাতে বাঙ্গালী, তাহাদিগের নিকটে অর্ধক্রোশ মধ্যে রণস্থল তৎকালে যেমত ভয়ানক হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। ত্রাসযুক্ত হইয়া কে কোথায় কিভাবে লুক্কাইত হইল, তাহা বলা যায় না। স্থান বিবেচনা নাই, কেহ সবস্ত্র, কেহ বিবস্ত্রে, কেহ অচৈতন্য, কেহ মূর্চ্ছাগত হইয়া ঐ রাত্রি ঐ স্থানে ছিল।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬৭-৬৮) জৌনপুরে ইংরেজ এবং বাঙালীদের অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। যদুনাথ বর্ণনা দিয়েছেন, "···উপদ্রব উপস্থিত হইলে পরম্পরায় জৌনপুরস্থ সকল সাহেব সপরিবার ধরাতলে মহানিদ্রায় শয়ন করিলেন। কেবল জেলের সার্জ্জন আর কমিশনর চারি পাঁচ বিবি (ও) কয়েকজন বালককে লইয়া পলাইয়া কোন জমিদারের

বাটীতে থাকিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। যে সমস্ত বাঙালী তথায় পরিবার সমেত ছিলেন, তাঁহারা অতিশয় প্রাণভয়ে ত্রাসিত হইয়া স্ত্রীপুত্রপরিবার লইয়া, কেহ মালার ঘরে, কেহবা চাষীর ঘরে, কেহ কাহারের ঘরে, কেহ ডোমের ঘরে, এই মত ছোট ছোট জাতির ঘরে যাইয়া জাতিকুলের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণরক্ষা করিয়া রহিলেন।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৭২) পাশাপাশি দেশীয় সিপাহীদের আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে, "দস্যুগণ প্রবল প্রতাপ হইয়া সহর গ্রাম এবং নগরের পথে ভয়ানক ব্যাপার করিয়া রহিল। কাহারও কোথাও গমনাগমনের ক্ষমতা রহিল না। পথিকব্যক্তি দেখিলেই তাহার সকল দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া লইয়া, এক কৌপীন পরাইয়া বিদায় করিয়া দেয়। স্ত্রীলোক হইলে কৌপীন দেয় না, বিবস্ত্রা করিয়া পাঠায়। তাহাতে জোরজবরদস্তি করিলে প্রাণদণ্ড করে।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৭৩) দেশীয় সিপাহীরা দস্যু! তাদের এই আচরণ কতদূর সত্য? এরা যদুনাথের মতে "দুরাচার, বদমায়েশ এবং কোম্পানি বাহাদুরের অনিষ্টকারী, সরকারের মন্দকারী"। সুতরাং ইংরেজরা এদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারলে বা করলে তিনি খুশিই হন।

রঘুবংশীয়গণ ইংরেজ সৈন্যদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে ইংরেজরা নিজেদের পরিবারবর্গকে নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করেন "এবং সকল বাঙালীদিগকে হুকুম দিলেন, 'অদ্যকার কাছারি দপ্তর সকল বন্ধ করিয়া সকলে বাঙালীটোলায় যাও।'... গোরা ও শিখদিগকে যুদ্ধসজ্জা করিতে আদেশ হইল।... রণস্থলের নিকটবর্তী হইয়া এক তোপ দাগিল। ঐ শব্দে বিপক্ষগণ সতর্ক হইয়া আপন আপন যুদ্ধ সজ্জা লইয়া" (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৪) যুদ্ধ করতে লাগল। এবং "বিপক্ষগণের বিপুল আশা নিরাশা করিয়া সকলে" নিজেদের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসে। দেশীয় সিপাহী বা সাধারণ মানুষ যারাই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তাদের বলা হয়েছে "বিপক্ষগণ"। যদুনাথের মতে সরকারপক্ষ হচ্ছে স্বপক্ষ!

"কানপুরে সিপাহীগণের আর নানাসাহেবের দোহাই ফিরিতেছে। যদি কেহ কোম্পানি বাহাদুরের দোহাই দেয়, তৎক্ষণাৎ তাহার শিরোচ্ছেদ। এই মত প্রবল প্রতাপ করিয়া কেবল মার মার কাট্ কাট্ এই শব্দ সর্বত্র, সাহেব ও বাঙালীদিগকে দেখিতে পাইলেই অধিক আক্রমণ।... বিপক্ষগণ চতুর্দিকে সাহেবদিগের অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে।... যেখানে ইংরাজ সম্পর্কীয় স্ত্রীপুরুষ পাইতেছে; তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বধ করিতেছে।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৫০১-০৪) শুধু এই কাজ করেই তারা ক্ষান্ত হয় নি।

ইংরেজদের প্রাণ নষ্ট করে সিপাহীরা নাকি বাঙালীদের হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হয়। "বাঙালীদের ধরিবার জন্য সর্বত্র দূত প্রেরণ করিল।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৫০৭) বাঙালিদের প্রতি ক্ষোভের কারণ যদুনথের রচনায় স্পষ্ট নয়। তবে এই রচনার শুরুতে সিপাহী বিদ্রোহে বাঙালীদের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা যে সন্দেহ প্রকাশ করেছি তা মিথ্যা প্রমাণিত করার কি কোন সুযোগ নেই ! না কি তাঁর বিশ্বাসই স্থান পেয়েছে বেশী ?

যদুনাথ সর্বাধিকারীর রচনায় ইংরেজপ্রীতি লক্ষ্যণীয়। তিনি কোম্পানি সরকারের কোন দোষ দেখেন নি। পক্ষান্তরে দেশীয় সিপাহী ও এ দেশের বিদ্রোহী দেশবাসীকে হেয় করেছেন। সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্য ইতিহাসে স্বীকৃত। কারণ, বিচার ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রকৃত তথ্য-সত্য উদ্ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদুনাথের এই রচনা থেকে আমরা ইতিবাচক তথ্যও আহরণ করতে পারি। একজন তীর্থযাত্রী ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে কাছ থেকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূল্যবান। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা তৎকালীন সমাজমানসের পরিচয়ও পেতে পারি।

হাওড়া-রামকৃষ্ণপুর ঃ উনিশ শতকের কলকাতার চালের বাজার

স্মৃতিকুমার সরকার

একালের মত সেকালেও ধানচালের ব্যবসা ছিল বাংলা মুলুকের সবচাইতে বড় ব্যবসা। শহর কলকাতার কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেক কিছুর মত এই ব্যবসার প্রতিষ্ঠিত রূপরেখাটিও পরিবর্তিত হতে শুরু করে।[১] উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে, এই শহর সমগ্র পূর্ব ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ ধান-চালের বাজারে পরিণত হয়। সমকালীন বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের এক হিসাবে (১৮৭৬-৭৭) দেখা যায় যে, বিভিন্ন সঙ্গে কলকাতা শহরের এই ব্যবসার পরিমাণ ছিল বাংলার বাকী মোট ধান-চালের ব্যবসার থেকেও বড়।[২]

সমগ্র বাংলাদেশের মোট বাজারজাত ধান-চালের এক বিরাট অংশের এই কলকাতামুখী অভিকেন্দ্রিক গতিপ্রবাহের মূল লক্ষ্য ছিল একদিকে নগরায়ণসৃষ্ট দানাশস্যের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা পূরণ এবং অন্যদিকে রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যোগান সৃষ্টি।

অধ্যাপক বিনয় চৌধুরীর হিসাব অনুসারে ১৮৮১-৯১ খ্রীঃ অন্তবর্তীকালীন সময়ে শহর কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিঞ্চিদূর্দ্ধ শতকরা ১১ ভাগ এবং তার পরবর্তী দশকে শতকরা ২৪ ভাগ। ঐ সময়ের সামান্য কিছু হেরফেরে (১৮৭২-১৯০১) হাওড়া শিল্পাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা ৮৮ ভাগ।[৩] ক্রমবর্দ্ধমান এই জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা থেকেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে কলকাতা বন্দরনির্ভর ধান-চালের রপ্তানী বাণিজ্যের চাহিদা ছিল অনেক অনেক বড়।

যেমন, ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শহর কলকাতায় ভুক্ত মোট চালের (৪১ লক্ষ মণ) প্রায় পাঁচগুণ পরিমাণ চাল (১৮৮ লক্ষ মণ) কলকাতা বন্দর থেকে রপ্তানী করা হয়।[৪] অথবা, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে মোট আমদানীকৃত চালের শতকরা পঁয়ষট্টী ভাগই বাহির্বিশ্বে রপ্তানী করা

ইতিহাস বিভাগ, বি. কে. সি. কলেজ

হয়।[৫] একইভাবে, ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা শহরে মোট যে পরিমাণ চাল বেচাকেনা হয়েছিল তার শতকরা নব্বই ভাগই ছিল রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য।[৬]

প্রাক-ব্রিটিশ যুগেও বাংলাদেশের ধান-চালের একটা উল্লেখযোগ্য রপ্তানী বাজার ছিল। বার্ণিয়ারের রচনায় পাওয়া যায় বাংলাদেশ থেকে কিভাবে চাল গঙ্গাপথে পাটনা ও উপকূল ধরে মাসলিপট্টম, করমণ্ডলের বিভিন্ন বন্দর এমনকি সিংহল, মালদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও যেত।[৭] কিন্তু, সেকালের থেকে ঊনিশ শতকের চালের রপ্তানী বাণিজ্য ছিল অনেক বেশী কেন্দ্রীভূত এবং মূলত কলকাতা নির্ভর, তার গতিপ্রকৃতিও ছিল স্বতন্ত্র। ঊনিশ শতকের শেষভাগে কলকাতা থেকে চাল রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন, ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই রপ্তানী বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা ১৯৬ ভাগ।[৮] পরবর্তী বেশ কিছুকাল ধরেই চাল রপ্তানীর এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকে।[৯]

ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে শহর কলকাতার চাল-বাজারগুলির মধ্যে চেতলাহাটই ছিল প্রধান। শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই এই বাজারের একটা সুন্দর বর্ণনা রেখে গেছেন:

> "বর্ষে বর্ষে ইংলণ্ডে যে সকল চাউলের রপ্তানী হইত চেতলা সে সকল চাউলের সর্বপ্রধান হাট ছিল। এতদর্থে সুদূর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে শত শত চাউলের নৌকা ও শালতী আসিয়া কালিঘাটের সন্নিকটবর্তী টলির নালা নামক খালকে পূর্ণ করিয়া রাখিত। সুতরাং পূর্ববঙ্গনিবাসী চাউলের গোলাদার, আড়তদার ও বাঙ্গাল মাঝি প্রভৃতিতে চেতলা পরিপূর্ণ ছিল।"[১০]

শোভাবাজার-কুমারটুলি অঞ্চল ধান-চালের বেচাকেনার জন্য বিখ্যাত ছিল। শোভাবাজার সম্পর্কে সমকালীন এক বর্ণনায় পাওয়া যায়:

> "এখানে পূর্ববঙ্গের তিলি ও সাহা জাতীয়েরা চালের ব্যবসা করিয়া থাকেন। এখানে 'দেশোয়াল' চালের আমদানীই প্রধান। মহাজনেরা বড় বড় গুদামে প্রচুর পরিমাণ চাল 'বাঁধি' রাখে। এখানে খুচরা দশ-কুড়ি বোরার চালানি কাজ হয় না।"[১১]

কুমোরটুলির চাল-বাজার ছিল নদীয়ার তিলি মহাজনদের নিয়ন্ত্রণে। এ সম্পর্কে চন্দননগরের এক চালের মহাজন লিখেছেন:

> "নদীয়া জেলার মধ্যে তিলি জাতিদিগের ধান-চালের প্রধান কারবার। ইহার মধ্যে তিন বড় বড় ধনী মহাজনদিগের এই

জেলার প্রসিদ্ধ বাজারে নিজেদের গোলা আছে। তথা হইতে চাল খরিদ হইয়া কলিকাতায় হাটখোলা ও কুমারটুলিতে প্রচুর পরিমাণে চাল বাঁধা থাকে। কুমারটুলিতে তিলি মহাশয়দিগের নিজেদের বড় বড় গদী ও গোলা আছে, তথায় তাহারা ১২ মাস বিক্রয় করিয়া থাকে।"[১২]

পাশাপাশি, বেলেঘাটা-উল্টাডিঙ্গি অঞ্চলও চালের বাজারের জন্য বিখ্যাত ছিল। বড় বড় দেশী নৌকায় এখানে প্রধানত পূর্ব ও নিম্নবঙ্গের চাল এসে জড়ো হত।[১৩] সে কারণে চেতলাহাটের মত বেলেঘাটা-উল্টাডিঙ্গি অঞ্চলকেও চলতি কথায় 'পূর্‌বি চালের বাজার' বলা হত।[১৪] অন্যান্য ছোটবড় বাজারগুলির মধ্যে খিদিরপুর-মুন্সীগঞ্জ এবং জানবাজার ছিল উল্লেখযোগ্য। হাওড়ায় ছিল রাঢ়ী চালের মোকাম, যদিও তা কলকাতার বাজারগুলির মত অত বড় ছিল না।

পরবর্তীকালে যে রামকৃষ্ণপুর বাংলাদেশ তো বটেই, সমগ্র পূর্ব ভারতের সবচাইতে বড় ধান-চালের বাজারে পরিণত হয়েছিল, ঊনিশ শতকের গোড়াতে সে বাজারের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত বৃহত্তর কলকাতার নগর পরিকল্পনার মানচিত্র অনুসারে রামকৃষ্ণপুর ছিল পরিত্যক্ত চড়া অঞ্চল, একসময় যা বেঙ্গল আর্টিলেরীর গোলাগুলি পরীক্ষার জায়গা ছিল।[১৫] এখানে চালের ব্যবসা জমে ওঠে আরও অনেক পরে, সম্ভবত ১৮৭০এর দশকে।[১৬]

ঊনিশ শতকের কলকাতার প্রতিষ্ঠিত চাল-বাজারগুলির মধ্যে এক ধরনের আঞ্চলিকতা চোখে পড়ে। এক এক বাজারে বাংলাদেশের এক এক অঞ্চলের চাল এবং এক এক জায়গার মহাজনদের প্রাধান্য ছিল এর বৈশিষ্ট্য। যেমন, চেতলাহাটে পূর্ববঙ্গীয় সাহা ব্যবসায়ীদের, কুমোরটুলীতে নদীয়ার তিলি মহাজনদের এবং কুলপীঘাটে রাঢ়ের চাল ও রাঢ়ী ঘোষ, পাল ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্ব লক্ষ্যণীয়। কুমোরটুলীর তিলি মহাজনরা যেমন নদীয়ার ধান-চালের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতো, তেমনি চেতলার ব্যবসায়ীরা নিম্নবঙ্গের চালের একচেটিয়া যোগানদার ছিল।

রামকৃষ্ণপুরের চালের বাজার ছিল এই সমস্ত বাজারের যেন এক সামগ্রিক রূপ। সমগ্র বাজারটি চারটি পট্টীতে বিভক্ত ছিল ঃ (১) পূর্বী পট্টী, (২) রাঢ়ী পট্টী, (৩) নাকোদা পট্টী এবং (৪) কোরা ও বিলি পট্টী।[১৭] প্রথম পট্টী দুটি যথাক্রমে পূর্ববঙ্গ এবং রাঢ় দেশের চালগুদামের এবং তৃতীয় পট্টীটি মূলত চাল-রপ্তানীকারী নাকোদা প্রমুখ অবাঙালী মহাজনদের কেন্দ্রীকরণ থেকে

উদ্বৃত্ত। চালের মত পূর্বী পট্টীতে পূর্ববঙ্গীয় মহাজনদের নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রধানত। আয়তন এবং ব্যবসার পরিমাণের দিক থেকেও এই পট্টীটি ছিল সবচাইতে বড়। চেতলাহাট, উল্টাডিঙ্গি, শোভাবাজার প্রভৃতি বাজারের সবচাইতে বড় বড় পূর্ববঙ্গীয় মহাজনেরা এই পট্টীতে এসে তাদের নতুন ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। যেমন এসেছিলেন অন্য ক্ষেত্রে সফল রাঢ়ী ব্যবসায়ীগোষ্ঠীরাও।

কিন্তু কেন এই কেন্দ্রীকরণ? ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত **মহাজনবন্ধু** পত্রিকার এক খবরে পাওয়া যায়ঃ

> "পনেরো বছর পূর্বে রামকৃষ্ণপুরের চড়ের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি ছিল না। কেবল চাউলের মহাজনদিগের কৃপায় এই স্থানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। বিদেশী জাহাজী রপ্তানী কার্য্যের সুবিধার জন্যই এই স্থানে মহাজনদিগের আগমন হইয়াছে এবং ক্রমশ আরও হইবার সম্ভাবনা আছে।"[১৮]

ঊনিশ শতকের শেষকালে ক্রমবর্দ্ধমান ধান-চালের রপ্তানী বাণিজ্যের চাহিদা পূরণ করার জন্য একাধিক বাজার ও একাধিক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবসায়িক সমন্বয় প্রতিষ্ঠা ও বৃহত্তর পরিকাঠামোর প্রয়োজন ছিল। কারণ, এই চাল রপ্তানীর চাহিদা ছিল অনিয়মিত এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে সেই চাহিদার যোগান দিতে হত। সুতরাং, প্রয়োজন ছিল বৃহত্তর মজুত ব্যবস্থার এবং ক্রম সম্প্রসারণশীল পশ্চাৎভূমির উপর কার্যকরী ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

নবনির্মিত রেলপথে এবং ১৮৮০র দশকে "রামকৃষ্ণপুর সাইডিং" তৈরী হলে এই চড়া উদ্যোগী চালের মহাজনদের কাছে এক অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। এই 'চড়ার হাটের' সাফল্যের মূল কারণ ছিল রেলের "বিশেষ মাশুল" (Special Rate) ব্যবস্থা। অন্যান্য অনেক জিনিষের মত এই সময়ে চাল রপ্তানীকে উৎসাহিত করবার জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় উল্লেখযোগ্য চালের মোকাম থেকে কলকাতাভিমুখী চাল পরিবহণের জন্য রেলকর্তৃপক্ষ অত্যন্ত কম হারে "বিশেষ মাশুল" ধার্য করে।

যেমন, ১৮৯৯ সালে বর্দ্ধমান থেকে রামকৃষ্ণপুর সাইডিং পর্যন্ত চাল পরিবহণের রেলভাড়া ছিল মণপ্রতি মাত্র দু-আনা, সেখানে বর্দ্ধমান শহরের কোন এক আড়ত থেকে স্টেশনে চাল আনবার মণকরা খরচা পড়ত তিন আনা।[১৯] কিছুকাল পরের এক রিপোর্টে দেখা যায় বাঁকুড়াতে মহাজনের আড়ত থেকে স্টেশনে চাল পৌঁছাবার গরুরগাড়ীর ভাড়াই পড়ত মণপ্রতি চার থেকে আট আনা।[২০] ঐ একই সময়ে হুগলীতে ঐ ভাড়ার হার ছিল

মণকরা ছয় আনা।[২১] সুতরাং, বিশেষ মাশুল ব্যবস্থাধীন রেল পরিবহণ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন চালের মোকাম থেকে এমনকি বিহার ও উড়িষ্যার অনেক অঞ্চল থেকেও রামকৃষ্ণপুর বাজারে চাল পরিবহণকে উৎসাহিত করে।

রেল যোগাযোগের সুবিধার সূত্র ধরে রামকৃষ্ণপুরে প্রথম ভীড় জমায় চাল রপ্তানীকারী বড় বড় নাকোদা এবং মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা। ঠিক যেমনটা ঘটেছিল সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ জুড়ে অন্যান্য রেলওয়ে শহরের পাইকারী বাজারগুলিতে। পরে এই নাকোদা ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের দেখাদেখি পূর্ববঙ্গীয় ও রাঢ়ী চালের মহাজনরা এখানে তাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পট্টী গড়ে তোলে। রেলপথ গড়ে ওঠার পর মিরজাপুর বা বেনারসের মত এককালের রমরমা ব্যবসাকেন্দ্রগুলি যেমন নতুন রেলওয়ে শহর কানপুর, হাথরাস বা হাপুরের মত এতাবৎকালের অখ্যাত স্থানের কাছে তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলে,[২২] ঠিক তেমনি রামকৃষ্ণপুরের ব্যবসায়িক গুরুত্ব হারিয়ে যায়।

রামকৃষ্ণপুর বাজারের দৈনিক বেচাকেনার নমুনা সম্পর্কে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার এক বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

> "যুদ্ধের পূর্বে যখন রেল, স্টীমারে মাল আসিত, তখন প্রায় প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ বস্তা আমদানী রপ্তানি হইত। এখন মাল আমদানি রপ্তানি ও বিক্রয়ের ঠিক নাই। কেননা Food Comptrollerএর উপর আমদানি রপ্তানির ভার দেওয়া আছে।"

তবুও এই সময়কার এক হিসাব অনুসারে এখানকার খুচরো বাজারে প্রাত্যহিক বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৮/১০ হাজার বস্তা চাল।[২৩] ১৯০২ সালের এক খবরে পাওয়া যায় যে একদিনে এই বাজার থেকে ৭৬ হাজার বস্তা 'বাংলা চাউল' ও ২৩ হাজার বস্তা 'কট্‌কী চাউল' জাহাজে বোঝাই করা হয়।[২৪]

রামকৃষ্ণপুরের চাল-বাজারের আর একটি স্বাতন্ত্র্য ছিল তার "কোরা ও বিলি পট্টী।" কলকাতার প্রতিষ্ঠিত চালের বাজারগুলিতে এ ধরনের কোন পট্টী ছিল না। 'কোরা' অর্থে ধান কুঁড়ে চাল তৈরী করা ও 'বিলি' অর্থে ভানুনীদের মধ্যে ধান বিলির মাধ্যমে এই কাজ করিয়ে নেওয়াকে বোঝাত। এদেশে চালকলের আগের যুগে গ্রামের ব্যবসায়ীরা সাধারণত সংগৃহীত ধানকে চাল করে বিক্রী করাটাকেই পছন্দ করত বেশী। সে-ক্ষেত্রে তাদের মুনাফার হারও যেত বেড়ে। সাধারণভাবে, কৃষক বা ধান-উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই এই রীতিকে অনুসরণ করার চেষ্টা করত, যদিও সকল সময় তা সম্ভব হয়ে উঠত না। বহুসংখ্যক পেশাদারী ধান ভানুনী একাজে নিযুক্ত থাকলেও এর

সংগঠনটি ছিল অত্যন্ত ঢিলেঢালা। ফলে, অল্পসময়ে বেশী পরিমাণে চাল সংগ্রহ করা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অনিশ্চিত।

'জাহাজী কাজে' এই অনিশ্চয়তাকে দূর করবার জন্যই রামকৃষ্ণপুরে 'কোরা ও বিলি পট্টী' নামে একটি স্বতন্ত্র পট্টী গড়ে ওঠে। রামকৃষ্ণপুরে এই কাজ ছিল প্রধানত পূর্ববঙ্গের মহাজনদের হাতে। গ্রামাঞ্চল থেকে ধান সংগ্রহ করে চাল কুটে তাদের আড়তে যোগান দেবার জন্য এইসব মহাজন আড়তদাররা প্রধানত দু' শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের দাদন দিত : 'বাণীওয়ালা' এবং 'কিস্তিওয়ালা'। বাণীওয়ালাদের কাজ ছিল সরাসরি চাষী বা গ্রামের হাট থেকে নগদে/ধারে ধান কিনে বিভিন্ন গ্রামের ভানুনী বা কুটনীদের মধ্যে প্রথমে বিলি করা এবং পরে নির্দিষ্ট বাণীর বিনিময়ে কুটনীদের কাছ থেকে এইসব চাল সংগ্রহ করা। এইভাবে সংগৃহীত চাল, বাণীওয়ালারা তখন 'কিস্তিওয়ালা" অথবা বড় বড় কিস্তিদার ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিত। শেষোক্ত দল তখন সেই মাল নিয়ে এসে রামকৃষ্ণপুরের দাদনদার মহাজনদের গুদামে ভরে দিত।

অনেক সময়ে কিস্তিওয়ালারা রামকৃষ্ণপুরের মহাজন এবং বাণীওয়ালাদের মধ্যে দাদন ও অন্যান্য ব্যবসার যোগসূত্রের কাজ করত। বড় বড় বাণীওয়ালা ব্যবসায়ীরা অবশ্য রামকৃষ্ণপুরের মহাজনদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগই পছন্দ করত বেশী। ব্যবসায়িক যোগাযোগ থাকলেও এই দুই শ্রেণীর ব্যবসায়ীর মধ্যে প্রভেদ ছিল বিস্তর।

কিস্তিওয়ালারা ছিল প্রধানত পূর্ববঙ্গের লোক। নিজেদের কিস্তিগুলি ছাড়া ব্যবসায়িক মূলধন তাদের খুব একটা বেশী ছিল না। বছরের শুরুতে তারা কোন এক মহাজনের কাছে কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে প্রধানত তার অর্থেই বেচাকেনার কাজ করত। তার উপর এরা ছিল ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী। বছরে বছরে তারা ভিন্ন ভিন্ন বাজার বা ভিন্ন ভিন্ন মহাজনের হয়ে কাজ করত।

অন্যদিকে, বাণীওয়ালারা ছিল হাওড়া ও হুগলী জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কার্যকরী মূলধনের একটা বড় অংশ ছিল এদের নিজস্ব। ছোট-বড় গাঁ-গঞ্জ বা ক্ষেত-খামার থেকে সরাসরি ধান সংগ্রহ করে কুটনীদের দিয়ে চাল কুটিয়ে রামকৃষ্ণপুরে যোগান দেবার পুরো ব্যবস্থাটি ছিল মূলত তাদের সাংগঠনিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। বাণীওয়ালা ব্যবসায়ীদের মধ্যে "মঙ্গলঘাটী" বা মঙ্গলঘাট পরগণার লোকই ছিল বেশী।[২৫]

রামকৃষ্ণপুরের মহাজনেরা সমগ্র বাংলাদেশ তথা বিহার ও উড়িষ্যার বহু অঞ্চলে তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ-ব্যবস্থা গড়ে

তুলেছিল। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের মোট বাজারজাত ধান-চালের একটা বিরাট অংশ কলকাতায় এবং প্রধানত এই বাজারে এসে জড়ো হত। 'নওয়ালির' সময়ে রামকৃষ্ণপুরের অনেক মহাজন তাদের গোমস্তাদের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাত সরাসরি ধান সংগ্রহের জন্যে। "বঙ্গে চালতত্ত্ব"-এ এই বাজারের বেচা-কেনার বিভিন্ন রীতি-নীতি, ছল-চাতুরী সম্পর্কে অনেক খবর আছে।[২৬]

উনিশ শতকের একেবারে শেষভাগে এই বাজারে আর একটি নতুন আঙ্গিক যুক্ত হয়। ১৮৯৫ সালে এখানে প্রথম ধান ভানবার জন্য "হলার" মেশিন আসে।[২৭] অল্প কয়েক বছরের মধ্যে এর সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ও' ম্যালী এই বাজার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> 'Rows of godowns lie along the river bank, stored with the rice of Western Bengal, while a number of rice-cleaning machines are at work in the season, producing clean white rice for export or for consumption in Calcutta. ...In this way an industry has been developed"[২৮]

এখান থেকে এই মেশিন ছড়িয়ে পড়ে চেতলা, কুমোরটুলি ও আরও পরে অন্যত্র।[২৯] শুরু হয় আর এক ধরনের পরিবর্তন।[৩০]

রামকৃষ্ণপুরে চালের বাজারের এই কেন্দ্রীকরণ এক অর্থে যেমন ছিল ভৌগোলিক, তেমনি অর্থনৈতিক অর্থেও সত্য। বৃহত্তর পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন এই বাজারের সংগঠনটি ছিল শহর কলকাতার প্রতিষ্ঠিত বাজারগুলির থেকে স্বতন্ত্র। ছোট পাইকার, ফোড়ে, ব্যাপারী, গোলাদার বা শালতি। কিস্তিদার ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীলতার পরিবর্তে এখানকার মহাজনেরা সংগ্রহ করাটাকেই পছন্দ করত বেশী। রামকৃষ্ণপুরকে কেন্দ্র করেই, কলকাতা শহরের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাটিতে অবাঙালী ব্যবসায়ীদের অনুপ্রবেশ ঘটে। আগেই বলা হয়েছে, এ বাজারের উদ্ভব ছিল চাল-রপ্তানীনির্ভর। ফলে, বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে এই রপ্তানী বাণিজ্যের নিম্নমুখী প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণপুরের চাল বাজারেরও অবনতি শুরু হয়।

সূত্রনির্দেশ

১ S. K. Sarkar, The Rice Milling Industry of Bengal etc. in Calcutta Historical Journal, Vol. XIII, Nos. 1-2, July 1988, June 1989

২ Report on the Internal Trade of Bengal for the year : 1876-77, p 24 ; এর পর থেকে RIT

৩ B. B. Chaudhuri, Agrarian Relations in Bengal 1859-1885 in N. K. Sinha (ed), The Histroy of Bengal (1757-1905), (Calcutta, 1967), p 249

৪ RIT, 1876-77, p 25

৫ Bengal Irrigation Proceedings, Jan. 1875. App. Note on Rice Statistics by J. W. Ottley, Bengal 1874. Cited by B. B. Chaudhari, op. cit

৬ RIT, 1882-83, p 71

৭ F. Bernier, Travels in the Mogul Empire A. D. 1656-1668, (London, 1916) Reprint, Delhi, 1968 ; p 437

৮ RIT, 1876-77, p 24 ; 1877-78, p 9

৯ক) ঐ, প্রাসঙ্গিক বর্ষসমূহ, খ) S. Mukherjee, Trade in Rice and Jute in Bengal ete. (Unpublished Thesis, Deptt. of Economics, Jadavpur University Mss.) Calcutta, 1971, p 115

১০ শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, (কলকাতা, ১৯০৩) পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৩, পৃ ৩২

১১ সন্তোষনাথ শেঠ, বঙ্গে চালতত্ত্ব, (কলকাতা, ১৩৩২), পৃ ৪৯

১২ ঐ, পৃ ৩৫২

১৩ ঐ, পৃ ৫০

১৪ অজ্ঞাত, রামকৃষ্ণপুরে চাউলের কাজ, মহাজনবন্ধু, চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩১১ বঙ্গাব্দ

১৫ M. M. Woolaston, Plan of Calcutta, (London, 1825) in N. K. Sinha (ed) op. cit. Back Cover Map

১৬ মহাজনবন্ধু, ৪র্থ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১১, পৃ ৬০

১৭ স. না. শেঠ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮০-৮৩

১৮ ৪র্থ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১১, পৃ ৬০

১৯ বর্ধমানে চাউলের কাজ, ঐ, পৃ ১০৬

২০ Marketing of Agricultural Products in Bengal, 1926. p 22

২১ Ibid, p 22

২২ C. A. Bayly, Rulers, Townsmen and Bazaars. : North Indian Society in the Age of British Expansion 1770-1870, (Cambridge, 1983)

২৩ পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৭-৩৮

২৪ মহাজনবন্ধু, ৪র্থ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃ ৫৮

২৫ ঐ, পৃ ৫৬-৫৯

২৬ স. না. শেঠ, পূর্বোল্লিখিত

২৭ ধান ভানা কল, মহাজনবন্ধু, তৃতীয় খণ্ড, সংখ্যা ২, ১৩১০, পৃ ৩২

২৮ O' Malley, Bengal District Gazetteers : Howrah ; (Calcutta, 1909), p 114

২৯ ক) শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোলিখিত। খ) H. H. Ghosh, Rice Manufacture in Report of the Indian Industrial Conference, 1906, (Calcutta, 1906) pp 97-98. গ) স. না. শেঠ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৫২

৩০ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমার 'The Rice Milling Industry of Bengal' দেখুন, পূর্বোল্লিখিত

স্বাধীন ভারতের ডাক-মণিহারির ইতিহাস

(১৯৪৭-১৯৮৯)

প্রবীরকুমার লাহা

আজও ডাকপত্র, খাম, অন্তর্দেশীয় পত্র মানুষজনের বাড়ীতে প্রিয়জনের যে চিঠিপত্র আসে তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ তাৎক্ষণিক, কখনও বা দলিল হয়ে ওঠে। কিন্তু এসবের নীরস ইতিহাসের প্রতি সাধারণের মানুষের কোন অনুরাগ না থাকলেও, এ-সব ডাক-মণিহারির (Postal stationery) একটা পৃথক মহিমা আছে, স্থূল ব্যাপারে সংবাদ আদান-প্রদানের বাইরে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'এ একটা নতুন জাতের সুখ'। চিঠিপত্র ঘিরে আছে বিয়োগ-বেদনা, দুঃখ-সুখের নানা কাহিনী। কবির সুরছন্দে ধ্বনিত হয়েছে ঃ

> "চিঠি-বিলি করা ডাকহরকরা চলে যায় সরাসর ঐ—
> উদ্বেগ-মাখা পথ-চেয়ে-থাকা-বুকে-করে-রাখা চিঠি কৈ ?
> মরণের পর নেই ডাকঘর, নইলে খবর নিত সে ;
> এটি-উঠি-সিটি-লিখে চারি পিঠই একখানি চিঠি দিত সে
>
> —কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (ব্যাথার স্মৃতি)

আজকের মত, আজ থেকে একশো বছর আগে যোগাযোগব্যবস্থা এত উন্নত না হওয়ার ফলে ডাকের চিঠি ছিল মানুষের সংবাদ পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলধন। কিন্তু বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ফলে নতুন যোগাযোগব্যবস্থা আজ চিঠিপত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে।

এ প্রবন্ধে ভারতের ডাক-মণিহারির ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৮৯) সম্পর্কে একটি চুম্বক আলোকপাত করা হবে। ডাক-মণিহারির মধ্যে পড়েছে ডাকপত্র, অন্তর্দেশীয় পত্র, লেফাফা, রেজিস্টারীপত্র, বিমান ডাকপত্র, মনিঅর্ডার ফরম প্রভৃতি।

গবেষক

ডাক-মণিহারির শ্রেণীবিন্যাসটি এরূপ ঃ

(১) ডাকপত্র—১. স্থানীয় ডাকপত্র (জবাবীপত্রসহ)
২. সারা ভারত ডাকপত্র (জবাবীপত্রসহ)
৩. বিজ্ঞাপন ধ্বনি সহ সীমিত অঞ্চলের প্রকাশিত ডাকপত্র
৪. বিমান ডাকপত্র—বিদেশ ডাকের জন্য।

(২) অন্তর্দেশীয় পত্র—১. দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশের ডাকের জন্য,
২. বিজ্ঞাপন ধ্বনি লেখিত

(৩) লেফাফা—১. সাধারণ
২. রেজিষ্টারী
৩. বিমান ডাক
৪. এক্সপ্রেস ডেলিভারী।

ডাকপত্র

ইংরাজী নাম পোস্টকার্ড পরিচিতি বেশী। পৃথিবীতে প্রথম ডাকপত্র প্রচলিত হয় ১৮৬৯ সালে অস্ট্রিয়া প্রদেশে। আবিষ্কারক ছিলেন সি. ই. হারমান।

এদেশে প্রথম ডাকপত্র চালু হয় ১৮৭৯ সালে। প্রথমে জনমন এটি ভাল মনে নেন নি, কারণটা হল ব্যক্তিগত সংবাদ জানাজানি হওয়ার আশঙ্কায়, এখন এটি সর্বাধিক জনপ্রিয়। ডাকপত্রের প্রথম যুগটি অর্থাৎ পরাধীন ভারতে এটিতে চিত্রের স্থান ছিল ইংলণ্ডের রাজা বা রানীর। কারণটা হল এদেশ ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন। স্বাধীনতার পর ৭. ৯. ১৯৪৯ সালে ডাক-পত্রের চিত্র বদল হয়ে এল এলিফেন্টা গুহার বিখ্যাত ত্রিমূর্তির ছবি। দাম ৯ পাই। ১৫. ৫. ১৯৫০ সালে চালু হল স্থানীয় ডাকপত্র, দাম ২ পয়সা। ডাকপত্রের ছবিতে স্থান পেল কোনারকের ঘোড়া। পাশাপাশি জবাবী ডাকপত্র চলতে থাকে। (দামটা দ্বিগুণ), সরকারি কার্যে ব্যবহৃত ডাকপত্র

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিতে নিবেদিত হল ডাকপত্রে। গান্ধীজী চিত্রিত হলেন ২. ১০. ১৯৫১ এবং ২. ১০. ১৯৫৯ (গান্ধী জন্মশতবর্ষ) প্রকাশিত যথাক্রমে ৪ এবং ৩টি ডাকপত্রে। চিত্রগুলি হল—গান্ধীজীর দুটি ভাবচিত্র, চরকাকাটারত গান্ধীজীর দুটি চিত্র, শিশু ও গান্ধীজী, সস্ত্রীক কুস্তুর্বা সহ গান্ধীজী এবং ওয়ারারত গান্ধীজী।

১. ১০. ১৯৫৪তে ভারতের ডাকটিকিট শতবর্ষ স্মরণে প্রকাশ পেল 'ত্রিমূর্তির

চিত্র সম্বলিত' ডাকপত্রের উপর লাল কালিতে ইংরাজী ও হিন্দীতে লেখা লিপি "ভারতের ডাকটিকিট শতবর্ষ, ১৮৫৪-১৯৫৪"।

১. ৪. ১৯৫৭তে সারা দেশে দশমিক পদ্ধতি চালু হলে তার প্রভাব পড়ল ডাকপত্রের উপর। পরিবর্তিত হল ডাকমাশূল, ডাকপত্রের চিত্র। স্থানীয় ও সাধারণ ডাকপত্রের মাসুল হল যথাক্রমে ৩ এবং ৫ পয়সা। চিত্র এল অশোকস্তম্ভ। ১. ৭. ১৯৬৬ সালে স্থানীয় ডাকপত্রের বিলুপ্তি ঘটিয়ে ডাকপত্রের নতুন মাশূল ধার্য হল ৬ পয়সা। ১. ৫. ১৯৭৮ এবং ১. ১. ১৯৭৪ সালে ডাকপত্রের মাশূল পুনর্বিন্যাস করে হল যথাক্রমে ১০ এবং ১৫ পয়সা। ১. ৪. ১৯৫৭—২২. ৩. ১৯৭৬ পর্যন্ত ডাকপত্রের চিত্রে শোভিত হত অশোকস্তম্ভ। ২১. ৩. ১৯৭৬ থেকে ডাকপত্রের চিত্র বদল হয়ে স্থান পেল জাতীয় পশু বাঘের মাথা। ১৯৮২তে নবম এশিয়ান গেমস উপলক্ষে, ১৯৮০ বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২. ৭. '১৯৭৯ বিশ্ব ডাকটিকিট প্রদর্শনী (ইণ্ডিয়া '৮০), ১৯৮০ ডাকপত্রে শতবর্ষ উপলক্ষে স্মারক ডাকপত্র প্রকাশ পায়। ১৯৮২, ১৯৭৯ ও ১৯৮০ প্রকাশিত চিত্রে স্থান পেল জাতীয় পক্ষী ময়ূর। ডাক-মণিহারি জনমনে ও জনব্যাহারে জনপ্রিয় বলে, বিজ্ঞাপনের নিশ্চিত সাফল্যের জন্য ১৯৭৫এর ২১ জুলাই থেকে ডাকপত্রে লিখিত হতে থাকে বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণকর ধ্বনি ও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, যেমন—উৎপাদন বাড়াও, সবুজ পরিবেশ রক্ষা, শিশুর যত্ন, পরিবার কল্যাণ, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ধারায় জীবনবীমা, ব্যাঙ্ক, সাটিং সুটিং, ব্যাটারী, ফুড প্রডাক্ট, চা প্রভৃতি।

১৯৭৫—১৯৮৯ বিজ্ঞাপনের সংখ্যা প্রায় ৮৩টি।

ডাকপত্রের বৈশিষ্ট্য

১ বিভিন্ন সময় চিত্র বদল ও মূল্য পরিবর্তন
২ রঙের পরিবর্তন—সবুজ বাদামী, গাঢ় বাদামী
৩ ১৯৭৫তে বিজ্ঞাপনের প্রচলন
৪ স্মারক ডাকপত্র প্রকাশ
৫ ভাষায় ব্যবহার—প্রথমে শুধু লিপি, বিষয়, মূল্যমান ইংরাজীতে লেখা থাকত, পরে তা হিন্দী ও ইংরাজীতে লেখা শুরু হয়।
৬ ১৫. ৮. ১৯৭২ থেকে দেশে পিনকোর্ড ব্যবস্থা চালু হলে ডাকপত্রে তা লেখার ব্যবস্থা মুদ্রিত হয়।

এয়ারমেল ডাকপত্র

১৯২৯ থেকে এদেশে ডাকবিমান সেবা প্রচলিত হয়। ১. ৫. ১৯৫০ এবং ২৯. ৮. ১৯৫৮ প্রকাশিত দুটি বিমান ডাকপত্রে চিত্রিত হয় আকাশপথে বিমান উড়ার দৃশ্য, মূল্য যথাক্রমে ৪ আনা এবং ৪০ পয়সা। ষাটের সত্তরের দশকে ১. ১১. ১৯৬৩, ১. ১২. ১৯৬৬ এবং ১. ৭. ১৯৭০ তারিখে প্রকাশিত বিমান ডাকপত্রে বোয়িং বিমানচিত্র চিত্রিত হয়। ডাকমাশূল হল ৪৫, ৬০ এবং ৭৫ পয়সা। আশির দশকের শেষে ১. ১২. ১৯৮৮তে প্রকাশিত হল ইণ্ডিয়া '৮৯ নামে ডাকটিকিট প্রদর্শনী উপলক্ষে ৭টি স্মারক বিমান ডাকপত্র। চিত্রিত হল এ-দেশের ঐতিহাসিক স্থানের চিত্রাবলী—দিল্লীর লালকেল্লা, কুতুব মিনার, শের শা সমাধি, জয়পুরের হাওয়ামহল, আগ্রার তাজমহল, তামিলনাড়ুর মীনাক্ষিদেবী মন্দির এবং মহাবলীপুরম। ডাকমাশূল হল প্রতিটি ৪ টাকা। পঞ্চাশের দশকে ভাষা ছিল ইংরাজী, ষাটের দশকে ইংরাজী ও হিন্দী ভাষার ব্যবহার সম্প্রসারিত হল লিপি, মূল্যমান, মূল্য নির্দেশকে।

অন্তর্দেশীয় পত্র

এদেশে ১৮৫৭ সালটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একদিকে যেমন মহা-বিদ্রোহের জন্য স্মরণীয়, তেমনি অন্যদিকে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য অল্প দামে হাল্কা ওজনের অন্তর্দেশীয়পত্র প্রচলিত করা হল। দাম ছিল আধ আনা বা দু পয়সা। কম ব্যয়ে ব্যক্তিগত চিঠি লেখায় এর দান অসামান্য বললে ভুল হবে, অসাধারণও বটে। কিন্তু বিধির বিধানে জনপ্রিয়তা না থাকার জন্য ঢিমেতেতালায় প্রবর্তনের বার বছর পরেই অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে এর অবলুপ্তি ঘটে। আশি বছর পরে আবার যবনিকা উঠল স্বাধীন ভারতে।

২. ১০. ১৯৫০ তারিখে নবরূপ আর্বিভাব হল জলপাই সবুজ রঙের দেড় আনা মূল্যের নব অন্তর্দেশীয় পত্র, চিত্রিত হল অশোকস্তম্ভ। ১. ৪. ১৯৫৭তে অন্তর্দেশীয় পত্রের মাশুল হার হল ১০ পয়সা। পরবর্তী সময়ে মাশূলের হার পরিবর্তিত হল—

১৫. ৫. ১৯৬৮—১৫ পয়সা, ১৫. ৫. ১৯৭৪—২০ পয়সা, ১. ৬. ১৯৭৯—২৫ পয়সা, ১. ৬. ১৯৮২—৩৫ পয়সা, ১. ৪. ১৯৮৮তে ডাকমাশূল বৃদ্ধি পেল ১৫ পয়সা ডাক কাগজ দাম হিসাবে। দাম হল ৩৫ + ১৫ = ৫০ পয়সা।

স্মারক অন্তর্দেশীয় পত্র প্রকাশের তালিকায় রয়েছে—জাতীয়, আন্তর্জাতিক, বিশ্ব ডাকটিকিট প্রদর্শনী (১৯৭৩—এনডিপেক্স, ইনপেক্স, ইণ্ডিয়া '৮০, ৮৯), নবম এশিয়ান গেমস্ উপলক্ষে। ১৯৭৫ থেকে অন্তর্দেশীয় পত্রে শুরু হল বিজ্ঞাপনের ব্যবহার। ১৯৭৫-১৯৮৯ পর্যন্ত প্রকাশিত বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সংখ্যা প্রায় ২০৩, এর মধ্যে রয়েছে জীবনবীমা, HMT, সুটিং সাটিং, পেণ্টস, সাবান, ব্যাটারী, TV সেট, ব্যাঙ্ক, শিশুর যত্ন প্রভৃতি।

বৈশিষ্ট্য

১ সময় সময়ে রঙ, নক্সা, চিত্রবদল। ১. ৬. ১৯৮২তে অশোকস্তম্ভের বদলে ময়ূর চিত্রে স্থান পায়

২ বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হতে থাকে ২৮. ৭. ১৯৭৫। এর ভাষায় ধারা মূলত হিন্দী ও ইংরাজীতে

৩ ১৫. ৮. ১৯৭২ থেকে পিন কোড লেখার ব্যবস্থা

৪ ১৯৭১ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ থেকে অসংখ্যক শরণার্থী এলে এদের সাহায্যের জন্য ১. ১২. ১৯৭১ অন্তর্দেশীয় পত্রের মূল্য বৃদ্ধি পায় ৫ পয়সা, সংযোজিত হল শরণার্থী সাহায্য সম্পর্কে ৫ পয়সার ডাকটিকিট

৫ ১৯৫১, ১. ১০. ১৯৫৪, ৮. ২. ১৯৫৬, ২০. ৭ .১৯৫৯ এবং ১৯৬৮ সালগুলিতে Novalue চিহ্নিত অন্তর্দেশীয় পত্র প্রকাশিত হয়েছিল

এরোগ্রামস

স্বাধীন ভারতে প্রথম ১৯৪৯তে প্রকাশিত Aerogrammes চিত্রিত হল এয়ারক্রাফ্ট চালু থাকে ১. ১১. ১৯৮৩ পর্যন্ত।

২১. ১২. ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত এরোগ্রামসে্ চিত্রিত হল বোয়িং এয়ারক্রাফ্ট।

১৯৭১ সালে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত অসংখ্যক শরণার্থীদের জন্য ১. ১২. ১৯৭১ বিমান ডাকপত্রের মাশুলের বৃদ্ধি হল ৫ পয়সা (৮৫ + ৫ = ৯০ পয়সা)।

৯. ৬. ১৯৭৫ থেকে বিমানের বদলে উড়ন্ত হাঁস চিত্রিত হল। নব নক্শায় উড়ন্ত হাঁসের চিত্র প্রকাশ পায় ১০. ৯. ১৯৮০।

১৯. ২. ১৯৭৬ থেকে লেখা শুরু হয় বিভিন্ন স্তরের Fold শব্দটি।

স্মারক বিমানডাকপত্র তালিকায় রয়েছে গান্ধী শতবর্ষে ৪টি গান্ধীজীবন-

চিত্রসম্বলিত, ভারত উৎসব, স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে লালকেল্লা চিত্রসম্বলিত, নবম এশিয়ান গেমস (১৯৮২), Indipex'73 উপলক্ষে।

রঙের সীমাবদ্ধতায় লাল এবং নীল রঙ। বিজ্ঞাপনের ব্যবহার শুরু ১৯৭৬ থেকে। বিজ্ঞাপন মূল কফি বোর্ড, ব্যাঙ্ক, জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা। ১৯৮৯ পর্যন্ত প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সংখ্যা ১৭টি।

মূল্য পরিবর্তনের চিত্র

১৫. ৯. ১৯৪৯—২ আনা, ১. ৪. ১৯৫০—৬ আনা, ১১. ১. ১৯৫১—৪, ১০, ১২ আনা, ১. ৫. ১৯৫৩—৩ আনা, ১৯. ১. ১৯৫৪—৮, ১০ আনা, ২৭. ১. ১৯৫৪—১২ আনা, ৪. ২. ১৯৫৪—৩ আনা, ১. ১. ১৯৫৪—১০ আনা, ১৯৫৬—৪, ১০, ১২ আনা, ১. ৪. ১৯৫৭—২০, ৫০, ৭০ পয়সা, ১. ১১. ১৯৬৩ এবং ২১. ১২. ১৯৬৪—৫৫ পয়সা, ২০. ১. ১৯৬৭—৬৫ পয়সা, ১. ৬. ১৯৬৮—৮৫ পয়সা, ৩১. ১২. ১৯৭১—৮৫ + ৫ = ৯০ পয়সা, ১৫. ৮. ১৯৭২—৮৫ পয়সা, ৯. ৬. ১৯৭৫—১২৫ পয়সা, ১৯. ২. ১৯৭৬—১৬০ পয়সা, ১০. ৯. ১৯৮০—১৬০ পয়সা, ২৫. ৭. ১৯৮১—২৭০ পয়সা, ১৯৮০—৩০০ পয়সা।

এয়ার মেল লেফাফা

স্বাধীন ভারতে ১৫. ৯. ১৯৪৯ প্রকাশিত ২½ আনার এয়ারমেল লেফাফায় চিত্রিত হল উড়ন্ত বিমানযান, ১. ৫. ১৯৫০ প্রকাশিত হল চিত্রবদল না হলেও মাশূল হল ১২ আনা। ২৫. ১. ১৯৬৪ পর্যন্ত এই চিত্রটি প্রচলিত ছিল। ২৬.১.১৯৬৮তে প্রজাতন্ত্রদিবসে প্রকাশিত হল নব নক্সা মহাদেশীয় মানচিত্রের প্রেক্ষাপটে বোয়িং বিমানচিত্রটি। ১. ১০. ১৯৫৪তে ভারতের ডাকটিকিট শতবর্ষ (১৮৫৪-১৯৫৪) নিবেদিত হল স্মারক ডাকবিমান খাম, হিন্দী ও ইংরাজীতে ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। দাম,—১২ আনা।

মাশূল পরিবর্তনের চিত্রটি—১. ৯. ১৯৪৯—২½ আনা, ১. ৩. ১৯৫০—১২ আনা, ২৯. ৮. ১৯৬৮—৯০ পয়সা, ২৬. ১. ১৯৬৮—১৩০ পয়সা, ৩. ১০. ১৯৮৮—১.৫৫ পয়সা।

EXPRESS DELIVERY

১১. ৫. ১৯৬৪ Exprsss Delivery চালু হয়, ডাক মাশূল ২৮ পয়সা।

(ডাকমাশূল—১৫ + বিতরণ মাশূল—১৩ পয়সা) চিত্রিত হল অশোস্তম্ভ, লেখা হল ইংরাজীতে Express Delivery শব্দটি। লিপি, মূল্য লেখার ভাষা ছিল ইংরাজী। ২৩. ৩. ১৯৭০ এর মূল্য বৃদ্ধি হল ৪০ পয়সা (ডাকমাশূল ও বিতরণমূল্য হল ২০ + ২০ পয়সা) খামের সাইজ হল পর্যায়ক্রমে ১২.২ × ৯.৮, ১৪.১ × ৯.৩ সেমি। পরে এই ডাকব্যবস্থা উঠে যায়।

কিন্তু পরে বেসরকারী অস্বীকৃত কুরিয়ার মেল সেবা ব্যবস্থার দাপট রুখতে ডাকবিভাগ ১৯৮৬ সালে চালু করে Speed Post. মাশূল নির্ধারিত হল রেজিষ্টারী মাশূল সহ ২০ টাকা অতিরিক্ত। ২৪ ঘণ্টায় ডেলিভারী, নয়ত মাশূল ফেরত।

রেজিষ্টারী লেফাফা

স্বাধীন ভারতে অশোকস্তম্ভ চিত্রসম্বলিত রেজিষ্টারী লেফাফা প্রকাশিত হয়েছিল। বৈশিষ্ট্যে দেখা যাবে যে সময় থেকে সময়ান্ত পর্যন্ত অশোকস্তম্ভের চিত্রের পরিবর্তন না ঘটলেও, এর নকসা রূপের পরিবর্তন ঘটেছে—কখনও সাদা, কারুকার্যযুক্ত, গোল, ষষ্ঠকোণবিশিষ্ট। রঙের বৈচিত্র্যময়—নীল, বাদামী। প্রথমে মূল্যমান ও নির্দেশক, লিপি ইংরাজীতে লেখা হত। ২৫. ১১. ১৯৬৩ থেকে এটি হিন্দী ও ইংরাজীতে লেখা শুরু হয়।

১. ১০. ১৯৫৪ সালে ভারতের ডাকটিকিট শতবর্ষ উপলক্ষে স্মারক রেজিষ্টারী খাম প্রকাশ পায়। ১২.৯. ১৯৮০তে চালু হয় এতে ডাকপত্র মাশূল। প্রথমে ছিল ১০ পয়সা, পরে তা হয় ৫০ পয়সা। এর ডাকমাশূল বৃদ্ধি ঘটে ঃ

২৬. ১. ১৯৫০—৬১/২ আনা
২. ১২. ১৯৫২—৮ আনা
১. ১২. ১৯৫৩—৯৩/৪ আনা
১৯৫৭—৭৩ পয়সা
১৫. ১১ ১৯৫৭—৭৫ পয়সা
২৫. ১১. ১৯৬৩—৮০ পয়সা
১০. ১০. ১৯৬৭—৮৫ পয়সা
২০. ৬, ১৯৬৮—১০০ পয়সা
১৪. ৮. ১৯৬৮—১০৫ পয়সা
১৫. ৩. ১৯৭১—১২৫ পয়সা
১৫. ১২. ১৯৭১—১৩০ পয়সা
২৪. ১১, ১৯৭৫—১৬০ পয়সা
১০. ৫. ১৯৭৬—২৩৫ পয়সা
১৫. ৬. ১৯৭৮—২৬০ পয়সা
১. ৬, ১৯৭৯—২৬৫ পয়সা
১২. ৯. ১৯৮০—২৭০ পয়সা
১. ৩. ১৯৮২—৩২০ পয়সা
১. ৬. ১৯৮২—৩৭৫ পয়সা
১৯৮৮—৬৬০ পয়সা

লেফাফা (ENVELOP)

এদেশে লেফাফার জন্ম ১৮৫৬ সালে, ব্রিটিশ-ভারতে এর চিত্রে ছিল ইংলণ্ডের রাজা বা রানী। চিত্র বদল হত ইংলণ্ডের রাজা বদলের সঙ্গে সঙ্গে। এ অবস্থা চলে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। ১৯৪৯ সালে স্বাধীন ভারতে লেফাফার চিত্র এল রাষ্ট্রীয় প্রতীক অশোকস্তম্ভ, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মহামতি অশোক ও সারনাথের ইতিহাস কাহিনী। লেফাফার ক্রমবিকাশ, পরিবর্তন ও বৈশিষ্ট্যও বৈচিত্র্যময়তায় ভরা :

১ লেফাফা প্রচলিত ছিল স্থানীয় (১৯৫০—১ আনা) এবং সাধারণ

২ অশোকস্তম্ভের চিত্রের সঙ্গে 'সত্যমেব জয়তে' বা নীতি লেখা

৩ লিপিতে = ৬. ৬. ১৯৪৯—১৪. ৫. ১৯৬৮ ইংরাজীতে লেখা থাকত India Postage. ১৯৬৮-র ১৫ মে থেকে দ্বিতীয় লেখা হল হিন্দীতে ভারত এবং ইংরাজীতে India.

৪ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান থেকে আগত শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য লেফাফার ডাকমাশূল ২০ থেকে বাড়িয়ে ২৫ পয়সা হল। শরণার্থী সাহায্যের ৫ পয়সার মুদ্রিত ডাকটিকিট সংযোজিত হল

৫ ১৯৮৮ থেকে পিন কোড লেখার ঘর চালু হয়

৬ ১. ১০. ১৯৫৪ সালে ভারতের ডাকটিকিট শতবর্ষ উপলক্ষে একটি স্মারক লেফাফা প্রকাশিত হয়

৭ লেফাফার রঙের পরিবর্তন দেখা যাবে—৫. ৯. ১৯৮০—লাল, ১. ৬. ১৯৮২—সবুজ, ১. ৬. ১৯৭৬ এবং ১৫. ৭. ১৯৮০—বাদামী

৮ ১৯৬৯ এবং ২৫. ৭. ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত লেফাফার চিত্র মুদ্রিত হয় সাদা রঙে, পিঙ্ক কাগজের উপর হলুদ রঙে

৯ এখন স্থানীয় লেফাফা নেই, আছে সাধারণ লেফাফা

১০ ৫. ৯. ১৯৮০ থেকে মূল্যনির্দেশ শব্দ উঠে যায়

১১ সাইজ ৩৪ × ২৯.৫ মি. মি, ৩৩ × ২৮-৫ মি. মি.

১২ পুরাতন Express Delivery লেফাফাকে ছাপ মেরে সাধারণ লেফাফায় পরিণত হয়। এর সাইজগুলি হল = মি মি—৩৫ × ৩৫৫, ৩৫.৫ × ২৯.৫, ৩৪.৫ × ৩০, ৩৩.৫ × ২৯.৫, ৩৭ × ৩.২৫, ৩৬.৫ × ৩১.৫, ৩৫.৫ × ৩০, ৩৪.৫ × ২৯.৫, ৩৭ × ৩২, ৩৫ × ৩০—সংখ্যা ১০টি, এগুলি মাদ্রাজ ও কলকাতায় Overprint হয়।

১৩ ৯, ১০. ১৯৭০ প্রকাশিত ২৫ পয়সা লেফাফার সাইজ ছিল ৩৪.৫ × ৩০.৫ মি. মি.

১৪ জুলাই, ১৯৭৫ সালটি লেফাফার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বছর। এসময়েই এদেশের বিভিন্ন শহরে লেফাফায় Overprint হয়েছিল :—
২৫ পয়সা (২০+২০ পয়সা উপর) আমেদাবাদ, মহারাষ্ট্র, হায়দ্রাবাদ। সাইজ = ১২.২ × ৯.৭ এবং ১৪.২ × ৭ সেমি এবং ২৫ পয়সায় (১৫ + ১৩ পয়সার উপর) দিল্লী, ভূপাল, আমেদাবাদ এবং লাক্ষ্ণৌ।

১৫ বিভিন্ন সময়ে লেফাফার মূল্য পরিবর্তন ঘটে—৬. ৬. ১৯৪৯—২ আনা. ২. ১০. ১৯৫০—১ আনা (স্থানীয়), ২. ১১. ১৯৫৭—১৩ পয়সা, ১৭. ১১. ১৯৫৭—১৫ পয়সা, ১৫. ৫. ১৯৬৮—২০ পয়সা, ৯. ১০. ১৯৭০—২৫ পয়সা, ১. ১২. ১৯৭১—৩০ পয়সা, ১৫. ৫. ১৯৭৪ —২৫ পয়সা, ১. ৬. ১৯৭৬—৩০ পয়সা, ১৫. ৭. ১৯৮০—৩৫ পয়সা, ১. ৬. ১৯৮৬—৫০ পয়সা, ১. ১. ১৯৮৭—৭০ পয়সা, ১৯৮৮—৭৫ পয়সা।

১৮ বার লেফাফার ডাকমাশূলের পরিবর্তন ঘটেছে।

১. ৬. ১৯৮৭ থেকে চালু হয় ডাকপত্র মাশূল ১০ পয়সা, ১৯৮৮ তা বেড়ে দাড়াল ১৫ পয়সা।

এছাড়াও ডাক-মণিহারির তালিকায় রয়েছে—মনিওর্ডার ফরম্, রেজিষ্টারী পত্রের প্রাপ্তিপত্র, আণ্ডার সার্টিফিকেট অফ পোস্টিং ফরম (UCP), এর মধ্যে শেষ দুটি বিনামূল্যে দেওয়া হয়ে থাকে। UCP form বন্ধ হয়ে গেছে অনেক দিন A/D card সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। A/D card অভাবে কখনও কখনও ডাকপত্র বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভাষার ব্যবহারে দেখা যাবে যে—M. O. কার্ডে পূর্বে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষা লেখা থাকত। এখন এই দুটি ভাষা ছাড়াও আঞ্চলিক ভাষা লেখা হচ্ছে। A/D card এবং UCP form হিন্দী ও ইংরাজী ভাষাই প্রাধান্য।

ডাক-মণিহারির বৈচিত্র্যময় ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এতে দেশের ঐতিহাসিক স্থান, জাতীয় প্রতীক যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির তালে তালে ডাকমাশূল সময় সময়ে পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষত, বার্ষিক বাজেটের আগে ও পরে। এসব পরিবর্তনও ডাক-মণিহারিতে কি থাকবে, না থাকবে সে সম্পর্কে বোধহয় কোন সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতি নেই ও জনমানসের দাবী অবহেলিত। এসবের ইচ্ছায় কর্তা হলেন কেন্দ্রীয় সরকার বাহাদুর, যার অধীনে রয়েছে ডাক বিভাগ। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি, লক্ষ্য, ইচ্ছাই ডাক-মণিহারিতেও প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

শতবর্ষের আলোয় রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সমাজচিন্তা

অশ্রুরঞ্জন পাণ্ডা

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৬৮) সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে বিশাল অবদান রেখে গেছেন তার বিক্ষিপ্ত আলোচনা হলেও ব্যাপকভাবে তাঁর অবদানের মূল্যায়ণ হয় নি। আমরা অনেক সময়েই সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে বিদেশী লোকদের অনুসরণ করি, কিন্তু দেশের মধ্যে যে অফুরন্ত সম্পদের উৎস রয়েছে তার সন্ধান করি না। জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে শুধু নয়, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদানের যথার্থ মূল্যায়ণের প্রয়োজনে রাধাকমলের উপর আলোচনার গুরুত্ব যথেষ্ট। অল্পপরিসরে ব্যাপক আলোচনার অবকাশ নেই। অনুসন্ধিৎসুগণ যাতে রাধাকমল সম্পর্কে আরও আগ্রহী হন তাই এই বিনম্র প্রয়াস।

রাধাকমল মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে ৭ ডিসেম্বর, ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বাবু গোপালচন্দ্র ছিলেন স্থানীয় আদালতের একজন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী এবং মাতার নাম মনোমোহিনী দেবী। রাধাকমলরা আট ভাই এবং চার বোন। ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ হলেন তাঁর অন্যান্য কৃতবিদ্য ভাইদের অন্যতম।

রাধাকমলের জীবনের প্রথম ষোল বছর বহরমপুরেই কাটে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করার পর ১৯০৫ সালে কে. এন. কলেজ থেকে স্কলারশিপ নিয়ে এফ. এ. পাশ করেন। এরপর ১৯০৬ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরাজী ও ইতিহাসে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন। এইসময় বস্তিবাসীদের সমস্যা ও সমাজের অবহেলিত মানুষের অবস্থা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইসব সমস্যায় জড়িত হয়ে রাধাকমল অর্থনীতি ও রাষ্ট্রদর্শনের দিকে ঝোঁকেন এবং এর ফলশ্রুতিস্বরূপ অর্থনীতি নিয়ে এম. এ. তে ভর্তি হন এবং প্রথমশ্রেণীতে প্রথম হন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ

এই সময় সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি ছাড়াও পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যার বইগুলিও রাধাকমল যত্নের সঙ্গে অনুধ্যান করেন। প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, জনসংযোগ, জনশিক্ষা ও সেবামূলক কাজে এই অনুধ্যান সহায়ক হয়।

এই সময় ডন সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার ও বিপিনচন্দ্র পালের সান্নিধ্যে রাধাকমল আসেন। দেশজ শিল্পের ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্র রাধাকমলকে অনুপ্রাণিত করেন। রাধাকমল ও বিনয় সরকার দুই সমবয়স্ক তরুণ শিক্ষার প্রসার ও শহরতলীর পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতার প্রভাব রাধাকমলের উপর পড়ে। তবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, ধ্বংস ও হিংসার পরিবর্তে গঠনমূলক কাজে ও শিক্ষাপ্রসারে রাধাকমলের আগ্রহ বেশী ছিল।

১৯১০ সালে অর্থনীতির লেকচারার হিসাবে বহরমপুরের কে. এন. কলেজে রাধাকমল যোগ দেন। এই সময় অর্থনীতির বিষয়গুলিকে বাস্তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্যোগী হন। কৃষকদের ও অন্যান্য গ্রামীণ পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার ধরন, সমবায় সংগঠন ও আন্দোলনের গতিপ্রগতি রাধাকমল গবেষণায় ব্রতী হন। এই গবেষণার ফসল হল বৃহদায়তন 'ফাউণ্ডেশন অব ইণ্ডিয়ান ইকোনমিক্‌স (১৯১৫)'। এই বইয়ের কয়েকটি অধ্যায়ের জন্য রাধাকমল পি. আর. এস ডিগ্রী পান।

কে. এন. কলেজে পাঁচ বছর কাজ করার পর রাধাকমল লাহোরের সনাতন ধর্ম কলেজে অধ্যক্ষের পদে যোগ দেন। এর কিছু আগে ব্রিটিশ সরকারের কোপদৃষ্টি রাধাকমলের উপর পড়ে। রাধাকমল আত্মজীবনীতে বলেছেন যে, অধ্যক্ষের চাকরী নিয়ে চলে না গেলে হয়ত তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তেন।

এই সময় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মিঃ মেনার্ড রাধাকমলের উপর পাঞ্জাবের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মূল্যায়ণ করার দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং ভিনোগ্রাদফ যিনি ঐসময় পাঞ্জাবে গবেষণার জন্য এসেছিলেন তাঁর পথ ও পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাধাকমল গ্রামীণ সম্প্রদায় ও প্রথাগুলির পর্যালোচনা করেন। ১৯১৭র মার্চে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের আহ্বানে ভারতীয় অর্থবিদ্যার উপর রাধাকমল কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ঐ বছর ২৭ নভেম্বর দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজে 'কৃষি ও শিল্পবাদ' এই শিরোনামে বক্তৃতামালা প্রদান করেন। গান্ধীজী এই বক্তৃতামালায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন।

লাহোর থেকে আশুতোষ মুখার্জীর আহ্বানে রাধাকমল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে যোগ দেন এবং এখানে পাঁচ বছর অর্থাৎ ১৯১৭-২১ অর্থবিদ্যা, সমাজতত্ত্ববিদ্যা ও রাজনৈতিক দর্শন পড়ান।

পঠনপাঠনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কাজকর্মেও রাধাকমল নিজেকে যুক্ত করেন। তিনি ক্যালকাটা ওয়ার্কিংমেন্স ইনষ্টিটিউটের ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগের একজন সম্পাদকের পদেও রাধাকমল আসীন হন।

১৯১৮র এপ্রিলে কলকাতার বস্তিজীবনের উপর প্রদর্শনীতে রাধাকমল সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। গান্ধীজী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং সরোজিনী নাইডু এই সভায় সমাজসেবার গুরুত্ব সম্পর্কে ভাষণ দেন। ঐ বছরই ডিসেম্বরে রাধাকমল দক্ষিণ ভারতের নগর ও গ্রামগুলি পরিদর্শনে যান।

১৯২১এ রাধাকমল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজবিদ্যার অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগ দেন এবং এখানেই কর্মজীবনের বাকী সময় অতিবাহিত করেন।

লক্ষ্ণৌতে কর্মরত থাকাকালীন ১৯৩৬এ রাধাকমল ৬ মাসের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় বিভিন্ন জায়গায় 'স্টাডি ট্যুর'এ যান। ব্রিটেনের নতুন কৃষিনীতি, হিটলারের জার্মানীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, মুসোলিনীর ইটালীতে পাবলিক ওয়ার্কস পদ্ধতি, ভূমিক্ষয়রোধ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, আমেরিকায় নিউ ডীল ব্যবস্থায় গ্রামীণ পুনর্বাসন, সোভিয়েত রাশিয়াতে যৌথ সমবায় ব্যবস্থার পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করেন। সোভিয়েত রাশিয়াতে রাধাকমল এই সময় এক মাস ছিলেন।

১৯৩৯এর গ্রীষ্মে আমেরিকার কলম্বিয়া, শিকাগো, মিচিগান, উইনসকনসিন, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে রাধাকমল আমেরিকায় যান। সমাজতত্ত্বে পরিবেশের উপর এবং মূল্যবোধের আলোচনায় রাধাকমল অংশগ্রহণ করেন।

চারের দশকের মাঝামাঝি লেবার কমিশনের সদস্য হিসেবে রাধাকমল বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে ঘোরেন এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিত হন। এই অভিজ্ঞতার ফসল হিসাবে 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কিং ক্লাস' (১৯৪৫) বইটি আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৪৫এর মে-তে সিন্ধিয়ার মহারাজা রাধাকমলকে গোয়ালিয়র রাজ্যের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত করেন।

স্বাধীনোত্তর ভারতে যে জাতপাতের দ্বন্দ্ব ভারতের উত্তরাংশে ও বিভিন্ন

প্রান্তে দেখা গিয়েছিল রাধাকমল সে বিষয়ে উদ্বেগজনকভাবে সজাগ ছিলেন। গার্ডনার মারফি এই সময় ইউ. এন. ওর প্রোগ্রাম অব সোস্যাল টেনশন রিসার্চের কাজে লক্ষ্ণৌ-এ আসেন। মারফির সঙ্গে রাধাকমল উত্তরপ্রদেশের জাতিগত পার্থক্য ও উত্তেজনার দিকটি গবেষণা করেন।

রাধাকমল ১৯২১ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেন। এরই সঙ্গে ১৯৪৫এ প্রতিষ্ঠিত জে. কে. ইনস্টিটিউট অব সোসিওলজির ডিরেক্টর পদেও দায়িত্ব পালন করেন। উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিভিন্ন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ওয়াশিংটনে অবস্থিত 'ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোপোসালস'এর সদস্য ছিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত পত্রিকা 'সোসিওলজি' ও 'সোস্যাল রিসার্চ' বোর্ডে ১৯২৮ থেকে ১৯৬৮, এই দীর্ঘ ৪০ বছর, মৃত্যু পর্যন্ত সদস্য ছিলেন।

অধ্যাপনা, গবেষণা ছাড়াও নিষ্ঠাবান ও নিয়মানুবর্তী রাধাকমল অবসর সময়ে খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদে সময় কাটাতেন। দুঃস্থ আত্মীয়দের নিয়মিত অর্থাদি সাহায্য করেছেন। আবার রাধাকমল ভগবৎ চিন্তা, ধ্যান ও পূজার্চনায় গভীর মনোযোগী ছিলেন। স্বামী ওংকারনাথ, আনন্দময়ী মা, প্রণবানন্দজী প্রমুখ সাধক-সাধিকার সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

এই আকর্ষণীয়, বিজ্ঞ, নিবেদিতপ্রাণ মনীষী রাধাকমলের জীবনাসান ঘটে ২৪ আগস্ট, ১৯৬৮ বেলা ৪টা ১৫ মি-এ ; তাঁর মৃত্যুও কাজের মধ্যে ঘটে। লক্ষ্ণৌতে 'ললিতকলা একাডেমী'র সভায় সভাপতিত্ব করার সময়েই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান।

রাধাকমলের এই বিদগ্ধজীবনের পটভূমিতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর বিভিন্ন চিন্তাধারার একটা ধারণার চেষ্টা করা যেতে পারে।

২

রাধাকমলের অর্থনৈতিক চিন্তা

রাধাকমলের অর্থনৈতিক চিন্তাকে দুটি ভাগে আলোচনা করা যায় :— অর্থনীতির তত্ত্ব এবং অন্যটি তার ব্যবহারিক প্রয়োগ।

অর্থনীতির তত্ত্বগত দিক

(ক) এই শতাব্দীর প্রথম দুদশকের অভিজ্ঞতায় রাধাকমল অনুধাবন করেছিলেন যে অর্থনীতির পুনর্গঠন একান্ত প্রয়োজন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যা যুগের প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ

হয়। কেয়ারনস্ এবং বেজহট মন্তব্য করেছেন যে ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যা বুদ্ধিজীবীদের এবং মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হয় নি।

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি ছিল অসম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। ভোগবাদী তত্ত্ব, নূন্যতম কষ্টের বিনিময়ে ভারসাম্য বজায় বর্তমান অর্থনীতির পরিমণ্ডলে অপাংক্তেয়। অধ্যাপক ক্লার্ক ও মার্শাল যোগ্যতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তা প্রথম যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলির উত্তরণের যথোপযুক্ত ছিল না।

এ ছাড়া নব্য ক্লাসিক্যাল স্কুল অংক ও গ্রাফের সাহায্যে অর্থনীতির ব্যাখ্যার সূত্রপাত ঘটালেও অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তা মোকাবিলা করার উপযুক্ত ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, অবাধ প্রতিযোগিতার আগের রমরমা আর ছিল না। এর পরিবর্তে কল্যাণকর রাষ্ট্রের কাজের প্রসার ও নিয়ন্ত্রণ এবং কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার নীতি ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির ধারণাগুলিকে নস্যাৎ করে।

রাধাকমল অর্থনীতির মানবিকীকরণের উপর জোর দিয়েছিলেন যা ছিল ক্লাসিক্যাল ধারণার পরিপন্থী।

(খ) রাধাকমল বলেছেন পশ্চিমী অর্থবিদ্যা প্রাচ্যের অর্থনীতির পুনর্গঠনে অনুপযুক্ত এবং পশ্চিমী অর্থবিদ্যার দুটি সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করেছেনঃ— (i) নৈর্বসিক বৌদ্ধিকতাবাদ (এবস্ট্রাক্ট ইনটেলেকচুয়ালিজম) যা অহংবোধকে সামাজিক মমতার চেয়ে প্রাধান্য দেয়। (ii) পশ্চিমী অর্থবিদ্যা জীবনকে একই রকম ছাঁচে ফেলতে চেয়েছিল। এর ফলে জীবনের বৈচিত্র্য এবং প্রতিষ্ঠানগত মূল্যবোধগুলি হারিয়ে যায়। প্রাচ্যের ক্ষেত্রে এই কৃত্রিম সমতা অনুপযুক্ত। পাশ্চাত্তের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী দৃষ্টির পরিবর্তে গোষ্ঠীর মূল্যবোধ প্রাচ্যের জীবনাদর্শকে পরিচালিত করে।

প্রাচ্যের বিশেষ করে ভারতের গ্রামীণ সংগঠনগুলি গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির মাধ্যমে প্রকাশিত যা পশ্চিমী অর্থনীতিবিদরা অনুধাবন করতে পরেন নি। রাধাকমল 'কমিউনালিজম' শব্দটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন যা কমিউনিটি বা সম্প্রদায়গুলির সমবায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে প্রকাশিত।

পাশ্চাত্তের যান্ত্রিক দক্ষতার বৃদ্ধি মানুষের নিজস্ব ক্ষমতা ও কল্যাণময়তাকে খাটো করে দেয়। সম্পদের ব্যাপক বৈষম্য এবং শ্রেণীদের মধ্যে ক্ষমতার পার্থক্য সংঘর্ষ ঘটায় এবং পাশ্চাত্তের জাতিগত সংঘর্ষ বিশ্বশান্তিকে ব্যাহত করেছে। পশ্চিমের এই অবক্ষয়ের দিকটি প্রাচ্যের ক্ষেত্রে রাধাকমল অস্বীকার করে বাতিল করে দিয়েছেন।

(গ) গোড়ার দিকে পশ্চিমী অর্থনীতিবিদদের উপর ডারউইনের গভীর প্রভাব দেখা যায়। ডারউইনের অস্তিত্বের লড়াই এবং যোগ্যতমের বাঁচার অধিকার ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত; বস্তুতপক্ষে স্পেনসার এবং হাক্সলে থেকে নীৎসে এবং বেণহার্ডি পর্যন্ত পশ্চিমী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকরা ডারউইনবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

রাধাকমলের মতে শ্রেণীদীর্ণ, রক্ষণশীল এবং শোষণযুক্ত পশ্চিমী অর্থনৈতিকতত্ত্ব সাধারণের কল্যাণের জন্য কখনই সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না। খাজনা, লাভ ও মজুরীর গোঁড়া তত্ত্ব আধুনিক অর্থনীতির ইতিহাসে অচল।

পশ্চিমী শ্রেণীসংগ্রামের পরিবর্তে ভারতে শ্রেণীসহযোগিতার উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াস দরকার।

(ঘ) অর্থবিদ্যাকে অন্যান্য সমাজবিদ্যার শাখার দ্বারা সঞ্জীবিত করতে হবে। জীববিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃতত্ত্ববিদ্যা, মনস্তত্ত্ববিদ্যা, আইন, জনসংখ্যাবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা প্রভৃতির দ্বারা অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে তাকে সমাজজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে।

অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগ

অধ্যাপক বালজিৎ সিং বলেছেন যে রাধাকমল শুধু আয়েসী আরাম-কেদারায় বসা তাত্ত্বিক ছিলেন না। বস্তুতপক্ষে রাধাকমলের 'ফাউণ্ডেশন অব ইণ্ডিয়ান ইকোনমিক্স' বইটির ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে অভিবক্ত বাংলার গ্রামের মানুষের বিভিন্ন পেশার জীবনধারা তিনি গভীরভাবে অনুশীলন করেছেন। চাষী, কুমোর, তাঁতী, কামার, ছুতোর, মুচি, তেলী প্রভৃতি বিভিন্ন কারিগরী সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তাঁদের সমস্যা তুলে ধরেছেন এবং ভারতের অর্থনীতির মূল অনুসন্ধানে ও তার সমাধানে নিজ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন।

প্রথমত, গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে ভূমিসমস্যার বিষয়টি সঙ্গত কারণেই রাধাকমল তুলে ধরেছেন। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধের জমি-সমস্যার পর্যালোচনায় সামগ্রিকভাবে তিনি দেখেছেন যে—(ক) জমির মালিকরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে বিভক্ত হওয়ার ফলে জমির খণ্ডীকরণজনিত সমস্যা দেখা দেয়; (খ) কৃষক তার পেশাকে লাভজনক করতে পারে নি কারণ তারা ছিল মহাজনদের কাছে ঋণ-জর্জরিত; (গ) সমাজের ঐতিহ্য ও কৃষির ক্ষেত্রে পারিবারিক সহযোগিতার যে ব্যবস্থা আগে ছিল তার অবনয়ন ঘটে; (ঘ) চাষীদের মধ্যে কে জমির চাষের ব্যাপারে অংশীদার হবে এ ব্যাপারে পরিষ্কার

ধারণার অভাব ছিল ; (ঙ) বাংলার জোতদার, বোম্বের লিঙ্গায়েত এবং মাদ্রাজের ব্রাহ্মণেরা জমিতে প্রত্যক্ষভাবে শ্রমদান করা থেকে ক্রমশ সরে আসে এবং চাষী যার অর্থনৈতিক শক্তি হ্রাস পেয়েছে তার উপরই চাষব্যবস্থা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ; (চ) গ্রামের ভূমিহীনদের শহরাঞ্চলে ভীড় এবং শহরাঞ্চলের দুর্গতি এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ সমাজকাঠামোতেও ভারসাম্যের হ্রাস ; (ছ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অর্থনৈতিক দিক থেকে ছিল অবৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে অসফল এবং এর সামগ্রিক কুপ্রভাব জমির উর্বরতাশক্তি হ্রাস এবং জলের অভাব প্রভৃতিতে দেখা দেয় ; (জ) ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় যে নিয়মনীতি ছিল তাতে মালিকানা ও জমির উন্নতি ব্যাহত হয়।

ভূমি মালিকানা ও জমি সমস্যার সমাধানে রাধাকমল বেশ কয়েকটি সুপারিশও করেছেন—(ক) জমির ব্যবহার, সেচ এবং চাষের ক্ষেত্রে যৌথ নিয়ন্ত্রণ, সমবায় সংগঠন গড়ে তোলা এবং তার প্রসার, সমবায় ঋণদানের ব্যাপ্তি ; (খ) বিক্ষিপ্ত হোল্ডিংগুলিকে একত্রে করা, ন্যায্য কর ধার্য করা, গ্রামীণ-আদালতের মাধ্যমে বিচার নিষ্পত্তি করা, মহাজনী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ; (গ) উৎপাদনের ভাগ বণ্টন এবং বর্গার অংশ নির্ধারণ ; (ঘ) পতিত জমিগুলিকে চাষযোগ্য করে তোলা।

দ্বিতীয়ত, কৃষির উল্লেখ করে রাধাকমল উল্লেখ করেছেন যে, প্রাক-ব্রিটিশ যুগে এবং পরেও কৃষিজীবীরাই গ্রামকে খাওয়াতো এবং গ্রামের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাদ্যের উৎপাদন যোগান দিত।

ব্রিটিশদের আসার পর কৃষি ও কৃষকের জীবনে বেশ কিছু পরিবর্তন ও সমস্যা দেখা দেয়—(ক) কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক উৎপাদন শুরু হয় এবং কৃষিব্যবস্থার আঞ্চলিকভাবে উৎপাদন বিশেষ হ্রাস পায় ; (খ) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং এই শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে কৃষি-শ্রমিকের চাষের ক্ষেত্রে লাভজনক সুবিধা না থাকায় একটি অংশ চাষব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে শিল্পে ভীড় করতে থাকে ; (গ) কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার ফলে বিদেশী উৎপাদনের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায় ; বিদেশী বণিকরা শোষণ চালু করে ; (ঘ) এছাড়া মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি, সমবায়ের অভাব, ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক নীতি, কৃষকদের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, হুকওয়ার্ম প্রভৃতিতে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হওয়া জমিদারদের গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার প্রবণতা ও অনুপস্থিতি, যথার্থ হিসেবনিকেশের অভাব, অরণ্য ও অরণ্যসম্পদের ক্রমবর্ধমান বিলোপ এবং সর্বোপরি কৃষিপণ্য বিক্রীর জন্য যথোপযুক্ত বাজারের অভাব কৃষির ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়।

রাধাকমল কৃষির সমস্যাগুলির সম্ভাব্য সমাধানেরও উল্লেখ করেছেন— (ক) চাষের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার প্রয়োগ এবং কৃষিক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থা গ্রহণ ; (খ) জমির মালিকানা ব্যবস্থার যথাযথ পরিবর্তন যাতে চাষীর স্বার্থ সুরক্ষিত হয় ; (গ) কৃষিতে অংশীদারী ব্যবস্থা চালু করা—বীজসারের উন্নতি, পোকামাকড় মারা ; আগাছা তোলা, পশুবীমা, জঙ্গল পরিস্কার, গ্রামীণ শিক্ষার উন্নতি, অসুস্থদের সেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই অংশীদারী প্রথার ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হবে ; (ঘ) খণ্ড খণ্ড জমিগুলিকে যতদূর সম্ভব বড় প্লটে পরিণত করে চাষাবাদ করতে হবে।

তৃতীয়ত, খাদ্যসমস্যা ও তার নিরসনের ক্ষেত্রেও রাধাকমল বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। জলবায়ু, মাটির প্রকৃতি, পরিবেশ, ফসলের বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র দেশকে কয়েকটি খাদ্য এলাকায় ভাগ করেছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যসমস্যার তীব্রতা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আলোচনায় এসেছে।

'ফুড প্ল্যানিং ফর ফোর হান্ড্রেড মিলিয়নস' (১৯৩৮) বইটিতে রাধাকমল তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। ভবতোষ দত্ত মন্তব্য করেছেন যে রাধাকমল যখন এইসব লিখছেন তখন তাঁকে অযাচিত ভয়সঞ্চারকারী বলে কেউ কেউ গণ্য করেছেন। কিন্তু জনসংখ্যার সঙ্গে খাদ্যের সম্পর্ক যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা প্রমাণিত হয়েছে।

খাদ্যসমস্যা সমাধানে জমির মালিকানা নীতি, চাষের ঋণ, উন্নতি বীজ ও সার প্রয়োগ, সমবায় গড়ে তোলার উপর তাঁর যুক্তি আজ প্রমাণিত। এই সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাভাস পাল্টানোর ক্ষেত্রে তিনি বহু আগেই সুপারিশ করেছেন। ভারতীয়দের খাদ্য তালিকা কী হবে, কত ক্যালরী বা খাদ্যশক্তি ভারতীয়দের প্রয়োজন, জলবায়ুভেদে তার তারতম্য সবই তিনি যুক্তিসহকারে বৈজ্ঞানিকভাবে তুলে ধরেছেন, নিরামিষ খাদ্যের মধ্যেও যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটীন জাতীয় খাদ্য আহরণ করা যায় এ-সম্পর্কেও তিনি বহু আগেই বলেছেন। এছাড়া বন্য ও অবহেলিত প্রাকৃতিক সম্পদকে বৈজ্ঞানিকভাবে খাদ্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে। সুষম পরিকল্পিত খাদ্যের উৎপাদনও সেই সঙ্গে করতে হবে। খাদ্যসমস্যার সমাধানে যানবাহনের উন্নতি অপরিহার্য। মাছের চাষও বৈজ্ঞানিকভাবে করতে হবে। উপরন্তু সমবায়ের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু বিক্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তার উপর রাধাকমল জোর দিয়েছিলেন।

চতুর্থত, শিল্পের উন্নতির দিকেও রাধাকমল তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। তাঁর বিভিন্ন বইয়ে গ্রামীণ কুটীরশিল্পের প্রসারের উপর ব্যাপক জোর দেওয়া

হয়েছে। গ্রামে কারিগররা যে সমস্ত জিনিষ উৎপাদন করত তা গ্রামের চাহিদা মেটাতো। শহরাঞ্চলের কুটীরশিল্পগুলি বিভিন্ন জিনিষ উৎপাদন করত। বড়লোকদের বিলাসিতা দ্রব্য ছাড়াও, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজন মেটানো এবং কিছু আঞ্চলিক বৈচিত্র্যযুক্ত শিল্প গড়ে উঠেছিল। এই সঙ্গে পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী কুটীরশিল্পও শহরে পরিলক্ষিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে দ্রুত শিল্পায়ণের দিকে ঝোঁক দেখা দেয় এবং ঐ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই রেলওয়ে, বস্ত্রশিল্প, পাট ও কয়লাশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে।

এই পটভূমিতে রাধাকমলের শিল্পসম্পর্কে কিছু নতুন ভাবনাচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়—(ক) এতদিন পর্যন্ত অর্থনীতি শিল্পের দক্ষতার দিকটি বিবেচনা করত; এখন সম্পদের ও অর্থের সুষম বণ্টনের ও সমাজের কল্যাণের দিকটিও শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব দিতে হবে; (খ) সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি থেকে শিল্পের বিশ্লেষণ দরকার। শিল্পের রূপ, উৎপাদনের পদ্ধতি, শ্রমের নীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি কোন্ সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি বসবাস করছে তা লক্ষ্য করতে হবে; (গ) শিল্পের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দৃষ্টিও রাধাকমল উল্লেখ করেছেন যেখানে ধর্ম ও জাতিগত ব্যবসা প্রাধান্য বিস্তার করেছে; (ঘ) রাধাকমল কুটীরশিল্পের সঙ্গে বৃহৎশিল্পকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুতঃপক্ষে যেখানে একই ধরনের অনেক উৎপাদনের প্রয়োজন সেখানে বৃহৎশিল্পের প্রয়োজন বেশী; (ঙ) ক্ষুদ্র কুটীরশিল্প আমাদের অর্থনৈতিক পরিবেশ, সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কৃষির সঙ্গে এই সমস্ত শিল্প ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বছরের কয়েক মাস যখন কৃষির কাজ থাকে না তখন তারা এই কুটীরশিল্পে যুক্ত হয়—বিশেষ করে বাঁশ, বেত, তাঁতের কাজে তারা নিজেদের যুক্ত করত।

তবে রাধাকমল এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে ক্ষুদ্রশিল্পকে আরও কার্যকরী হতে হলে আধুনিক কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য নিতেই হবে। বিদ্যুতের ব্যবহার এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্পের ক্ষেত্রে কতকগুলি সমস্যাও রাধাকমল উল্লেখ করেছেন—যেমন, (i) বিচ্ছিন্ন কারিগর ও শ্রমিকশ্রেণীরা প্রায়ই পাইকারী ব্যবসায়ীদের দয়া ও জুলুমের অধীনে ছিল। এছাড়া দালাল, ফড়িয়া, আড়কাঠিয়া ভোগকারী, কারিগর ও শ্রমিকদের মধ্যে থেকে শ্রমিকদের শোষণের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিত, (ii) কারিগরদের শিল্পগত শিক্ষাও ছিল অযথার্থ, পারিবারিক শিক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেও যুগোপযোগী হওয়ার জন্য আরও কারিগরি শিক্ষার

দরকার, পুরানো যন্ত্রপাতিও যথোপযুক্ত লাভের অন্তরায় ছিল; (iii) ব্যবসায়িক দিকটিও শিল্পে উপেক্ষিত ছিল; (iv) ফ্যাক্টরী ব্যবস্থার উন্নতি না হওয়ায় বস্তিজীবন আরও দুর্বিসহ হয়ে পড়ে. গঙ্গার দুদিকে কলকাতা ও হাওড়ার কলকারখানার সঙ্গে যুক্ত বস্তিগুলি ছিল এককথায় নরকতুল্য; (v) শ্রমিকদের মজুরীজনিত সমস্যা, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি. শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, অসুস্থতা, দীর্ঘ অনুপস্থিতিও শিল্পের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শিল্প-সমস্যার কয়েকটি সমাধানও রাধাকমল দিয়েছেন—যেমন, সমবায় ব্যবস্থার প্রসার, সহজ ঋণদান প্রকল্প. কারিগরী শিক্ষার প্রসার. কর্মসংস্থান-দপ্তরের প্রবর্তন, গ্রাম ও শহরের যথার্থ সমন্বয়, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে ন্যায্য বোঝাপড়া, বস্তি-উচ্ছেদ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহসমস্যার সমাধান ইত্যাদি।

পঞ্চমত. সমাজবিজ্ঞানী রাধাকমলের চিন্তাভাবনা পরিকল্পনা কীরূপ হওয়া উচিত সেদিকেও লক্ষ্য করা গিয়েছে।

পরিকল্পনার অর্থ হল সচেতনভাবে নতুন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি। নতুন মূল্যবোধ ও লক্ষ্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে। সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা, সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দ্বারা পরিকল্পনার রূপরেখা গঠিত হওয়া উচিত। সামাজিক সাম্য, ন্যায় ও মঙ্গলের দিকটি পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হওয়া একান্ত উচিত।

যে পরিকল্পনায় শুধু আয়, সম্পদ এবং সুযোগের উপর জোর দেওয়া হয় এবং বেকারত্ব, আধা-বেকারত্ব দিকটি উপেক্ষিত হয়, সেই পরিকল্পনা হল আমলাতান্ত্রিক পরিকল্পনা।

আঞ্চলিকত্ব ও জনসংখ্যার স্বরূপও পরিকল্পনার মধ্যে বিধৃত হতে হবে, পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিষয়ের প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিবেচনা করে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সাধারণ মানুষের দারিদ্র, অনিরাপত্তা ও অজ্ঞতাকে আগে দূর করতে হবে।

পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে সমাজের বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ের মাধ্যমে তাকে ঐক্যবদ্ধ করে জীবনযাত্রার মানকে আরও উন্নত ও জটিল ঐক্যে উত্তরণ করা। সমস্ত পরিকল্পনাই হবে মূল্যভিত্তিক।

৩

রাধাকমলের রাজনৈতিক চিন্তা

রাধাকমল যে পরিবেশে বড় হয়েছিলেন তা ছিল রাজনৈতিক উত্তেজনা ও আন্দোলনের পরিবেশ। বাড়ীতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আনাগোনা ও

সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে যুক্ত রাধাকমলের রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল তাই স্বাভাবিক। তবে রাধাকমল প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়ান নি।

সমাজবিজ্ঞানী রাধাকমল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাতে পৌর ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে যথার্থ ধ্যানধারণা ও দায়িত্বশীলতা জন্মায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে গোষ্ঠীগত ও আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জোর দেওয়া দরকার। রাজনৈতিক পরীক্ষানিরীক্ষা আরও সফল হবে যদি সেগুলি প্রধানত মূল গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংগঠনগুলির কার্যকলাপের সঙ্গে জনগণের প্রয়োজনীয় অভ্যাস, রাজনৈতিক প্রথা ও ধ্যানধারণার সমন্বয় ঘটে।

আঞ্চলিকগত ও সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা রাধাকমল করেছেন। আঞ্চলিকগত আলোচনার মধ্যে গঠনগত, বংশগত, মনস্তত্ত্বগত ধ্যানধারণাগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং সাধারণ দৃষ্টি-কোণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার দিকটি বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

বহুত্ববাদী, আঞ্চলিকত্ব, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীগত ভিত্তির উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচ্য বিষয়—যথা ঃ অধিকার, রাষ্ট্রীয়ক্ষমতা, সার্বভৌমিকতা, আইন, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র প্রভৃতির আলোচনা রাধাকমল করেছেন।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে রাধাকমল স্বাগত জানিয়েছেন। বর্তমানের নিয়ত পরিবর্তন ঘটছে, সমাজে বৈপরীত্যের অবস্থানের ফলে তাদের সংগ্রাম, সংঘর্ষের মাধ্যমে নতুন চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটছে। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির আলোচনায় সঙ্গত-কারণেই রাধাকমল মার্ক্সের বক্তব্য আলোচনা করেছেন। মার্ক্সের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সামাজিক সাম্য ও ঐক্যের বিষয়টিকে তিনি স্বাভাবিকভাবেই সমর্থন করেছেন। তবে শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টি পরিহার করার কথা বলেছেন এবং শ্রমিকদের দাসোচিত ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে সমাজের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সৃজনশীল সামাজিক মানুষ হিসাবে দেখার কথা বলেছেন।

রাজনৈতিক আদর্শের আলোচনায় আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য তাহল রাধাকমল বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে একটি সার্বজনীন সামাজিক সমন্বয়ের উপর আস্থা রাখতে চান—যেখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই হবে মূলমন্ত্র।

৪

রাধাকমলের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক চিন্তা

সমাজ ও মানবজগতের সামগ্রিক ঐক্য ও সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে রাধাকমল তাঁর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ধ্যানধারণাগুলি প্রকাশ করেছেন।

(ক) সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংহতি স্থাপনই হল সাংস্কৃতিক ভাবনা-চিন্তার প্রধান সুর। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে তিনটি পথের সন্ধান রাধাকমল উল্লেখ করেছেন—(i) মানুষের প্রতীক, মূল্যবোধ, আচরণবোধ ও ব্যবহারগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা ; (ii) প্রতীক, মূল্যবোধগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও ঐক্যের দিকটি তুলে ধরা, উচ্চ ও নীচ মূল্যবোধ-গুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা, সামাজিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংহতি স্থাপন করা ; (iii) মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের মেলবন্ধন ঘটানো।

রাধাকমল বলেছেন ব্যক্তি, মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতি এই তিনের পারস্পরিক সম্পর্কের একান্ত প্রয়োজন এবং এর ফলেই নৈতিক ও বৌদ্ধিক মান নির্ণীত হবে।

(খ) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সমান্তরাল অবস্থানের কথা রাধাকমল বলেছেন।

পাশ্চাত্যের চিরায়ত, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ধারাগুলি ঐ দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনটি অন্যের ক্ষেত্রে হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ ডারউইনের ও হেগেলের তত্ত্ব একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই যুক্তিযুক্ত, অন্য সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে তা অনেক সময় উপযুক্ত নয় সুতরাং যে ইতিহাস ও দর্শনচিন্তায় পশ্চিমী সংস্কৃতিকে সার্বজনীনভাবে দেখানো হয় তা ভুল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমান্তরাল সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে রাধাকমল সমস্ত সংস্কৃতির মধ্যে সার্বজনীন মানবীয়তার কথা বলেছেন। বিভিন্ন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটুক, কিন্তু একই সঙ্গে তাদের মধ্যে সহমর্মিতা ও সাম্মানিক যোগসূত্রও কাম্য।

ব্রাহ্মণীয় বেদান্তবাদ, মহাফল বৌদ্ধবাদ, চৌয়িক দর্শন খ্রীষ্টীয় ধর্ম, এনলাইটেনমেন্ট, বৈজ্ঞানিক মানবিকতাবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন যুগে ও ইতিহাসে নিজ নিজ প্রভাব যেমন বিস্তার করেছে তেমনি শাশ্বত মূল্যবোধ ও মানবিকতার মাধ্যমে একটি সার্বজনীনতার আদর্শও পরিলক্ষিত হয়।

এই মানবীয় সংস্কৃতির বিকাশ যে মূল্যবোধের উপর ভিত্তিশীল সেই মূল্যবোধ মানুষের জৈবিক প্রয়োজন ও উপযোগিতার দ্বারা যেমন নিশ্চয়ই প্রভাবিত তেমনি সামাজিক প্রথা, আচরণ ও প্রতিষ্ঠানের প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের প্রথম সভ্যতার বিকাশের সময় তার জৈবিক ও স্বার্থগুলি পূরণের সময় সংস্কৃতি ছিল প্রধানত বস্তুগত বা উপাদানগত। পরে বস্তুগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির ধারণা যখন আরও এগিয়ে যায়, জ্ঞান, শিল্পকলা, ধর্ম আরও বিকশিত হয় তখন সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ আরও পরিস্ফুট হয়।

৫

রাধাকমলের আঞ্চলিক ও পরিবেশগত চিন্তা

আঞ্চলিকত্ব ও পরিবেশের গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে রাধাকমলকে একজন বিশ্বের অগ্রণী সমাজতত্ত্ববিদ হিসাবে গণ্য করা হয়। বিশ ও ত্রিশের দশকের লেখা রাধাকমলের বইগুলি সে-সময় ভারতীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিস্ময়ের বিষয় ছিল।

আঞ্চলিকত্ব ও পরিবেশবিদ্যা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। একটি অঞ্চলের ধ্যানধারণায় সেখানকার মানুষের জীবনের গতিপ্রকৃতি, রাস্তাঘাট, নদীনালা, ঝরণা, হ্রদ এবং এককথায় ভৌগোলিক পরিমণ্ডল অন্তর্ভুক্ত। গাছ-পালা, অরণ্যসম্পদ, জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের তথা সমাজের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ।

আবার শুধু ব্যক্তি নয় গোষ্ঠীজীবনের উপরও আঞ্চলিকতার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য মানুষের শারীরিক ও মানসিক দিকই শুধু গড়ে না তার পেশা কী হবে তাও নির্ধারণ করে। শিকারীজীবন, পশুচারণ, কৃষি, শিল্প প্রত্যেকের সৃষ্টি ও উন্নতির ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। নদীমাতৃক অর্থনীতির ক্ষেত্রে ত্রিশের দশকে রাধাকমলের গবেষণা একটি প্রথম সারির রচনা। গঙ্গা নদীর অববাহিকা, তার গতিপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবন-যাত্রার এক মনোজ্ঞ গবেষণাধর্মী লেখা আমরা লক্ষ্য করি।

নিঃসন্দেহে আঞ্চলিকতাবাদ সংস্কৃতি, সভ্যতাকেও প্রাণবন্ত করে তোলে। রাজনীতির ধরনধারণ, গতিপ্রকৃতিও আঞ্চলিকতার গুরুত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়। সামরিক দিক থেকে ভৌগোলিক অবস্থান রাষ্ট্রের সামরিক ও পররাষ্ট্র-নীতিকে প্রভাবিত করে।

৬

রাধাকমলের জনসংখ্যা সংক্রান্ত ধ্যানধারণা

জনসংখ্যা সমস্যার আলোচনায় রাধাকমল বলেছেন ম্যালথাসের তত্ত্বের সমালোচনা হলেও জনসংখ্যা সমস্যাটি সম্পর্কে তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

জনসংখ্যা সম্পর্কে রাধাকমলের উদ্বেগ ত্রিশের দশকে তখন অনেকে গুরুত্ব না দিলেও পরবর্তীকালে তা একটি জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। দূরদর্শী সমাজবিজ্ঞানী রাধাকমল পঞ্চাশ বছর আগেই তা অনুধাবন করেছিলেন।

জনসংখ্যার বিষয়টি প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, উর্বরাশক্তি, সাধারণ জীবনযাত্রার মান, জীবনের পরিধির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এই পটভূমিতেই কাম্য জনসংখ্যার বিষয়টিও বিবেচ্য, উপরন্তু মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীও জনসংখ্যা সমস্যার মূল্যায়ণে গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় বাধার নজিরও আমরা লক্ষ্য করেছি।

বিশ্ব জনসংখ্যার পটভূমিতে রাধাকমল সীমিতহারে এবং বাস্তবদিকটি বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জনসংখ্যার আদান-প্রদানের কথাও বলেছেন। জলবায়ুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অনুকূল ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থায় এই ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়া সম্ভব যদি আমরা যথার্থ বিশ্বজনীনতা ও সৌভ্রাত্রকে মানি।

উপসংহারে উপরোক্ত জীবন ও বিভিন্ন মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে রাধাকমল তাঁর যুগের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের সমন্বয় তাঁর চিন্তাধারায় বিধৃত। রাধাকমলের বিশেষ অবদান আর্ট, চিত্রকলার মধ্যেও রয়েছে; এ ছাড়া অতীন্দ্রিয়বাদ ও ভক্তিবাদ সম্পর্কেও রাধাকমলের ভাবনাচিন্তা রয়েছে। তাঁর সময়ে বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও একজন উল্লেখযোগ্য সমালোচক ও পত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকাও আমরা লক্ষ্য করি। এককথায় রাধাকমল ছিলেন বহুধাব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং যথার্থ অর্থে মানবদরদী বিশ্বপ্রেমিক দার্শনিক।

সূত্রনির্দেশ

(ক) জীবনী অংশের জন্য

১ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, Dynamics of Moralsএর ভূমিকাতে গার্ডনার মারফির মন্তব্য

২ American Sociological Review, (জুন, ১৯৬৫), এ রবার্ট নিসবেটের প্রবন্ধ

৩ ইশরাৎ জেড. হোসেনের, Radhakamal Commemeration volumeএ ম্যানুয়েল গট্‌লিয়েবের মন্তব্য

৪ জি. আর. মদনের, Economic Thinking in India বইয়ের রাধা-কমলের উপর লেখা

৫ ভবতোষ দত্ত, অর্থনীতির পথে, রাধাকমলের উপর লেখা

৬ পি. সি. জোশীর প্রবন্ধ, Foundation of the Lucknow School and thier Legacy—Economic & Political weeklyতে প্রকাশিত ১৬ আগস্ট, ১৯৮৬

৭ Frontiers of Social Science, বালজিৎ সিং কর্তৃক সম্পাদিত বইয়ে রাধাকমলের লেখা An Intellectual Autobiography

৮ রাধাকমলের ভাগিনেয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর রাধাকমলের উপর লেখা In Memoriam

৯ রাধাকমলের বড়মেয়ে শ্রীমতী মন্দিরা চট্টোপাধ্যায়, বড়জামাই শ্রী জে. এন. চ্যাটার্জী, ছোটমেয়ে শ্রীমতী মধুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, বড়ভাই রাধাচরণের পুত্র শ্রীঅতুল্যচরণ মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১০ অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডঃ অধীর চক্রবর্তী, ডঃ অলোক রায় এবং সর্বোপরি ডঃ বেলা দত্তগুপ্তর সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত

(খ) তত্ত্ব অংশে, অর্থনৈতিক চিন্তার জন্য, রাধাকমলের লেখা

১ Principles of Comparative Economics, Vol I

২ Borderlands of Economics, সূচনা ও প্রথম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৩ Institutional Theory of Economics, সূচনা

৪ Groundwork of Economics, ভূমিকা

বাস্তব অংশে ভূমি ও কৃষি, 'রাধাকমলের লেখা

১ Land Problems of India

২ Foundation of Indian Economics

৩ Economic Problems of Modern India (ed,), Vol. 1, (সূচনা ও বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর নিবন্ধ—The Agricultural Regions of India)

খাদ্য, রাধাকমলের লেখা

১ Population Problems in India, পৃ ৮৩-৭
২ Groundwork of Economics, পৃ ৬২-৬৫
৩ Regional Sociology, পৃ ৬৭

শিল্প

১ Vera Anstey, The Economic Development of India, পৃ ৫
২ বিপানচন্দ্র, The Rise & Grouth of India, পৃ ৫৫
৩ রাধাকমলের লেখা
 (i) The Foundations of Indian Economics
 (ii) Indian Working Class
 (iii) Principles of Comparative Economics, Vol. II

পরিকল্পনা

১ Frontiers of Social Scienceএ বালজিৎ সিংএর প্রবন্ধ Mukherjee As a Pioneer in Indian Economics
২ রাধাকমলের লেখা
 (i) Planning the Country Side, ভূমিকা ও প্রথম পরিচ্ছেদ
 (ii) Regional Balance of Man
 (iii) Social Science & Planing in India, পৃ ১, ৯-১১
 (iv) Labour & Planning (edited)

(গ) রাজনৈতিক চিন্তা, রাধাকমলের লেখা

১ Civies, মুখবন্ধ
২ Democracies in the Esat, মুখবন্ধ, Part I & Part II
৩ Regional Sociology
৪ Philosophy of Social Science, পৃ ৬, ৭, ১২৭-৮, ১৩৪-৫, ১৫১
৫ Social Structure of Values

(ঘ) সাংস্কৃতিক ও নৈতিক চিন্তা, রাধাকমলের লেখা

১ Philosophy of Social Science, ভূমিকা, সূচনা, প্রথম পরিচ্ছেদ
২ Social Structure of Values, পৃ ৯৩
৩ Dynamics of Morals

(ঙ) আঞ্চলিক, পরিবেশ ও জনসংখ্যা, রাধাকমলের লেখা

১ Regional Sociology
১ Social Ecology
৩ Man & His Habitation (মুখবন্ধ ও ভূমিকা)
৪ Regional Balance of Man (সূচনা)
৫ Changing Face of Bengal--A Study in the Rivrion Economy
৬ বাঙলা ও বাঙালী, পৃ ২৩
৭ Population Problems of India
৮ Article by ভবতোষ দত্ত 'Increasing Population—Impediment to Development—Yojana, 26th Jan, 1990

ব্রহ্মবান্ধব—অগ্নিঋষি ?

ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়

॥ অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু ॥

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে গোটা বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যেও এক গৈরিক বসনধারী বৈদান্তিক ক্যাথলিক সন্যাসী আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কারণ জীবনের প্রত্যুষ থেকেই এই যুবক দেশের মুক্তির জন্য পথ হাঁটা শুরু করেছিলেন। কিন্তু পথ তিনি নিজে তৈরী করে নিয়েছিলেন। সুদীর্ঘ এই যাত্রাপথ আবর্তিত হয়েছে বহু ঘটনাবলীতে, তিনি নিজেও আবর্তিত হয়েছেন সেইসব ঘটনায়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের গতি পরিবর্তন, ধর্মমতের পরিবর্তন, বিশ্বাসের ভেঙেচুরে যাওয়া, আবার নতুন বিশ্বাসের জগৎ গড়ে ওঠা—কোন কিছুই কিন্তু রাজনীতির ছোঁয়া বহির্ভূত ছিল না। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় হয়ে ওঠার পিছনে ছিল একদিকে ফিরিঙ্গি তাড়িয়ে ভারত মুক্তির স্বপ্ন অপরদিকে তাঁর লড়াই-ই ব্রহ্মবান্ধবের জীবন-ইতিহাস—তাই এক হিসাবে এক পরাধীন জাতির স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্ক্ষামথিত আন্দোলনের ইতিহাস। ব্রহ্মবান্ধব তাঁর সারা জীবনে যা কিছু করেছেন, যা করেন নি—সে-সবই তাঁর দেশপ্রেমের তাগিদে। সার্বিকভাবে যা কখনোই করতে পারে নি তা হল ছকেবাঁধা পথে হাঁটা। সেটাই মানুষটিকে তাব জীবন ইতিহাসকে চিন্তাকর্ষক ও চিত্তাকর্ষক করেছে।

ব্রহ্মবান্ধবের জন্ম হয় ১৮৬১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী, কলকাতা থেকে ৩৫-৩৬ মাইল উত্তরে খন্নান গ্রামে। আশৈশব মাতৃহীন ও পুলিশ ইন্সপেকটার পিতার সান্নিধ্য বঞ্চিত ব্রহ্মবান্ধবের জীবন গঠনে তাঁর ঠাকুরমা ও কাকা কালী-চরণের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। কালীচরণ ছিলেন খ্রীষ্টান আইন ব্যবসায়ী অথচ জাতীয়তাবাদী। কৈশোরের দুটি ঘটনা ব্রহ্মবান্ধবের পরবর্তী জীবন গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। চুঁচুড়ায় কতকগুলি আর্মেনিয়ান যুবক পাড়ার হিন্দু ভদ্রমহিলাদের দীর্ঘ দিন ধরেই জ্বালাতন করছিল। ব্রহ্মবান্ধব তখন চুঁচুড়াবাসী। বিষয়টি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে পর্যন্ত তোলা হয়; তিনি ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু ফল কিছু পাওয়া যায়

অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, কৃষ্ণনগরকলেজ

নি। তখন ব্রহ্মবান্ধবের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একদিন আর্মেনিয়ান যুবকগুলিকে উত্তম-মধ্যম দিলে বিষয়টির মীমাংসা হয়ে যায়। এই ঘটনা কিশোর ব্রহ্মবান্ধবের এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করে যে, আবেদন নিবেদন নয় বলপ্রয়োগই ইংরেজদের এদেশে থেকে তাড়াবার একমাত্র পন্থা। এই বিশ্বাস প্রসঙ্গে তিনি পরবর্তীকালে 'আমার ভারত উদ্ধার' গ্রন্থে বলেছেন যে, সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি দেশের ভাবনা ভাবতে শেখেন, দেশোদ্ধারে অগ্রসর হন কিন্তু কিশোর বয়সেই তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল যে সুরেন বাঁড়ুজ্যের পথে চলা যাবে না। তিনি তখন "ছেলেমানুষ—সুরেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে মনে মেলে না—বলিলেই তো লোকে জ্যাটা বলিয়া উড়াইয়া দিত।" তাই একদিন তিনি আনন্দমোহন বসুর কাছে গিয়ে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন —"কলমবাজিতে হইবে না, তলোয়ারবাজিতেই ভারত উদ্ধার হইবে।' কিন্তু আনন্দমোহনও যখন তাঁকে বোঝান যে 'পাশবশক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই'—তিনি বিশেষভাবে বিচলিত হন। তাঁর ভাষাতেই—"আমি তো এই কথা শুনিয়াই অস্থির হইয়া উঠিলাম। যত শীঘ্র পারিলাম বিদায় লইয়া বাটি আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কি করি, কোথায় যাই? শেষে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া—জল্পনা-কল্পনা করিয়া স্থির করিলাম,—গোয়ালিয়ারে গিয়া সৈনিক হইব, যুদ্ধবিদ্যা শিখিব, ফিরিঙ্গী তাড়াইব।" যেমন ভাবা অমনি কাজ। দু' দুবার তিনি বাড়ী থেকে পালিয়ে গোবালিয়ারের পথে পা বাড়ান। দ্বিতীয়বার পথের ক্লান্তি ভুলে গোয়ালিয়ার পৌঁছে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা হল এই যে রাজ সরকারেও কূটচক্রীদের প্রভাব। সেখানে যুদ্ধবিদ্যা শেখার কোন সুযোগ নেই। ফলে দেশীয় রাজার সামরিক শক্তি সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস ও কল্পনা একেবারেই শূন্যে মিলিয়ে যায়। সৈন্যবিভাগে যোগ দেবার সংকল্প ছেড়ে তিনি ব্যর্থ মনোরথ হয়ে নানা দেশ ঘুরে বিভিন্ন তীর্থস্থান দেখে শেষ পর্যন্ত বাড়ী ফিরে আসেন।

১৪-১৫ বছর বয়স থেকেই ব্রহ্মবান্ধব যে 'কি করি, কোথায় যাই'—এই প্রশ্নে ভাবিত হয়েছেন সারাজীবন এই প্রশ্নেই তিনি তাড়িত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর গোয়ালিয়ার পরিকল্পনা কার্যকর না হওয়ায় তিনি তীব্র হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তিনি ধর্মের প্রতি ঝোঁকেন। এই সময়ে তাঁর অভিজ্ঞান সংকট তাঁর স্বাদেশিকতার পরিমণ্ডলে ধর্মের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটায়। অবশ্য বারো / তেরো বছর বয়স থেকেই তাঁর হিন্দুধর্মের আচারনিষ্ঠতা প্রকাশিত হয়েছিল। দেশমুক্তির সংকল্পে বাধা পেয়ে তাঁর মন ভাগবৎ দর্শনের দিকে ঘোরে। শুরু হয় তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়—ধর্মীয় পর্যায়।

২

॥ তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা ॥

লক্ষণীয়, দ্বিতীয় পর্যায়ের আধ্যাত্মিক আকর্ষণের সঙ্গেও মিশে থাকে ব্রহ্মবান্ধবের স্বাদেশিকতার ধারণা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই-তিন দশক থেকে ব্রহ্মবান্ধবের যে অভিজ্ঞান সংকট তা বিগত শতাব্দীর ব্যক্তিদের তুলনায় অধিক ঘনীভূত। কারণ ব্যক্তিগত কর্তব্য নিরূপণে নয়, স্বাদেশিকতাকে সর্বস্তরে পরিচালিত করার পন্থা অনুসন্ধানেই নিহিত ছিল তাঁর অভিজ্ঞান সংকট। স্বভাবতই ব্রহ্মবান্ধবের অভিজ্ঞান সন্ধান শিক্ষাগত বা চাকুরীগতভাবে মিলবে না। তাঁর অভিজ্ঞান সংকটের সমাধান ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ছিল, ক্ষেত্র ছিল সার্বজনীন। আর এইখানেই তাঁর সংকটের তীব্রতা। তিনি ভারতীয় জনারণ্যে মিলিত হতে চেয়েছিলেন তাঁর সব তত্ত্ব নিয়েই। এমনকি খ্রীষ্টান ধর্মকেও ভারতীয় করে তোলাই হয়ে উঠেছিল তার লক্ষ্য। কেশবচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্ত্বে হিন্দুর প্রাচীনত্ব, খ্রীষ্টিয় তত্ত্ব ও আন্তর্জাতিকতাবাদকে মেলাতে চেয়েছিলেন। সেইজন্যই ১৮৮০-৮১ সাল না'গাদ সময়ে ব্রহ্মবান্ধব কেশবের প্রতি আকৃষ্ট হন। হিন্দুর আচারনিষ্ঠ এই ব্রাহ্মণ যুবক নিয়মিত কেশব-প্রবর্তিত 'বাইবেল ক্লাশে' গভীর উৎসাহে ও সাগ্রহে যোগ দিতেন। কেশবচন্দ্রের ধর্ম ব্যাখ্যায় ও কাকা কালীচরণের প্রভাবে তাঁর মন ক্রমশই খ্রীষ্টধর্মের দিকে ঘোরে এবং ১৮৮৭ সালের ৬ জানুয়ারী তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

১৮৮১ সালে কলকাতা ফিরে ব্রহ্মবান্ধব পেশা হিসাবে 'ফ্রি চার্চ ইন্সটিটিউশনে' শিক্ষকতা এবং পত্রিকা সম্পাদনার অভিজ্ঞতা অর্জন শুরু করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে তাঁর সিন্ধু দেশীয় বন্ধু হীরানন্দের আমন্ত্রণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য ব্রাহ্ম মিশনারী হিসাবে হায়দ্রাবাদে যান এবং হীরানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'ইউনিয়ন' অ্যাকাডেমি'তে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৮১ সালে 'ফ্রি চার্চ ইন্সটিটিউশনে' মোটামুটি নিশ্চিত নিরাপত্তার শিক্ষকতা পাবার পর এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের তত্ত্বকে গ্রহণ করে ব্রহ্মবান্ধব তাঁর বয়ঃসন্ধিকালীন অভিজ্ঞান সংকট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। ডেভিড কফ তাঁর 'The Brahmo Samaj And The Shaping of The Modern Indian Mind" বইতে বলেছেন, "A nationalist in tempa-rament and identity, he was nevertheless much attracted to Keshub Sen's experiments with comparative religion' Thus a year or so after the schism, Bhawani Charan offered him-

sef as a recruit to Keshub's 'Nava Vidhan', proclaiming his devotion to the task of constructing a universal religion. Couriously enongh, the young nationalist seemed most attracted to the new rituals designed to integrate comparable sets of religions function and behaviour from discrete cultures under a single harmonious umbrella of symbols."

১৮৮৮ সালে ব্রহ্মবান্ধবের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। তিনি তাঁর অসুস্থ পিতার সেবার জন্য মূলতান যান। সেখানে বাবার বইয়ের তাকে ব্রুনোর 'ক্যাথলিক ফেথ' বইটি পান। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষটির চিন্তার জগতে বইখানি নতুন আলোকসম্পাত করে। ১৮৮৯ সালে হায়দ্রাবাদে একজন অ্যাংলিকান মিশনারীর বক্তৃতা শুনে তিনি পাপের সমস্যা বিষয়েও চিন্তিত হয়ে পড়েন। মিঃ জোসেফ রেডম্যান প্রবর্তিত বাইবেল ক্লাশে তিনি নিয়মিত যোগ দেন এবং নিজেও খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করে বেড়ান। তাঁর এই খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ স্বভাবতই তাঁর ব্রাহ্মবন্ধুরা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। ফলে হায়দ্রাবাদে পৌঁছানোর পর নতুন করে যে অভিজ্ঞান সংকটে ব্রহ্মবান্ধব পড়েছিলেন তা ক্রমশই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। 'ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি'র কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও এ নিয়ে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। ফলে ১৮৯০ সালের মে মাসে ব্রহ্মবান্ধব ঐ বিদ্যালয়ের কাজে ইস্তফা দেন।

হীরানন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় ব্রহ্মবান্ধব তাঁর খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের সংকল্প ছ'মাস পেছিয়ে দেন। কিন্তু এই সময়ে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের গভীর অনুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮৯০ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্রহ্মবান্ধব 'দি হার্মনী' পত্রিকায় 'আওয়ারসেল্‌ভস্‌' শীর্ষক রচনায় এই মত ব্যক্ত করেন যে, 'ধর্ম' সমন্বয়ের প্রচেষ্টায় তিনি কেশবচন্দ্র প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হতে কৃত-সংকল্প। কেশবচন্দ্রের 'নববিধানের সঙ্গে 'পতিত' মনুষ্যজাতির পরিত্রাণ কর্তা রূপে যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপনের কোন সত্যিকার বিরোধ নেই, যেমন বিরোধ-নেই খ্রীষ্টপ্রীতির সঙ্গে ভারতীয় ধর্মাদর্শের প্রতি অনুরাগের।' [উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ / হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়।]

৩

॥ মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া ॥

ব্রহ্মবান্ধব তাঁর অভিজ্ঞান সংকটের সমাধানের জন্য হায়দ্রাবাদের অ্যাংলিকান চার্চের রেভারেণ্ড হীটনের দ্বারা ১৮৯১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী খ্রীষ্টধর্মে

দীক্ষিত হন। কিন্তু অ্যাংলিকান চার্চে দীক্ষিত ব্রহ্মবান্ধব এই চার্চের বাহ্য রীতিনীতি ও আদবকায়দা গ্রহণ না করে, তাঁর কাকা কালীচরণের মত স্বদেশের মঙ্গলার্থে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতীয় চার্চ গড়ে তোলার কথা ভাবেন। ব্রহ্মবান্ধবের জীবনীকার প্রবোধ সিংহের মতে এদেশে প্রচলিত প্রোটেসটাণ্ট ধর্মের মধ্যে উচ্চাঙ্গের ভক্তি বা তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই এই শাখার প্রতি তাঁকে নিরাশ করে। তাছাড়া অ্যাংলিকান চার্চ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ব্রহ্মবান্ধব ঘোর বিরোধী। সর্বোপরি, ব্রহ্মবান্ধবের সাম্রাজ্যবাদী চার্চের খ্রীষ্টধর্মে ও কেশবীয় বিশ্বজনীনতাবাদে সমন্বয় তাঁর প্রোটেসটাণ্ট বন্ধুদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। ফলে তাঁর অভিজ্ঞান সংকট তীব্রতর হয়ে উঠে। এই সংকট মোচনের আশায় তিনি ১৮৯১ সালেরই ১ সেপ্টেম্বর করাচী শহরে ফাদার থিওফিলাস পেরিগের দ্বারা ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নিয়ে 'থিওফিলাস' নাম নেন। এই গ্রীক শব্দটির অর্থ ব্রহ্মবন্ধু (Lover or Friend of God)। ব্রহ্মবান্ধব চান খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসে হিন্দু ঋষিদের ত্রি-নীতি তত্ত্ব—সচ্চিদানন্দের মন্ত্র উচ্চারণ করতে।

এতক্ষণ ধরে আমরা দেখলাম যে কৈশোর চেতনার উন্মেষ থেকেই ব্রহ্মবান্ধব পীড়িতবোধ করেছেন চারিদিকের বাধায়। সে বাধা ভিতরে, সে বাধা বাইরে অথচ মুক্তির পথ তাঁকে খুঁজে নিতেই হবে। হিন্দু থেকে ব্রাহ্ম, ব্রাহ্ম থেকে প্রোটেসটাণ্ট এবং তা থেকে আবার ক্যাথলিক—আসল লোকটা যে গোয়ালিয়রে গিয়েছিল তলোয়ার খুঁজে নিতে, কিন্তু পায় নি। তলোয়ার তিনি যে কারণে খুঁজেছিলেন খ্রীষ্টীয় ক্রশও তিনি সেইজন্যই খুঁজেছিলেন—নিজেকে মুক্ত করতে হবে—ভাবলে অবাক লাগে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে একজন যুবক ইংরেজের উপনিবেশে ব্রিটিশ প্রজা রূপে নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করছিল না।

৪

॥ জাতি প্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায় ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায় ॥

ব্রহ্মবান্ধব বিশ্বাস করতেন, হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্মের মূল নীতিগত সাদৃশ্য বিদ্যমান এবং ভারতের পুনর্জন্ম খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে দিয়েই হবে। সেইজন্যই খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ। কিন্তু তাঁর দৃঢ়প্রত্যয় ছিল ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কার ও সাধনার মধ্যে দিয়েই খ্রীষ্টধর্মকে ভারতীয়দের কাছে পৌঁছাতে হবে। অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্মের ভারতীয়করণ অবশ্যপ্রয়োজনীয়। ব্রহ্মবান্ধব '৯০-এর দশকেও তত্ত্বগতভাবে বিশ্বজনীনতাবাদে বিশ্বাসী এবং যৌক্তিক

ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভারতীয় রোমান ক্যাথলিক। ১৮৯৪ সাল থেকে পাঁচ বছর তিনি ক্যাথলিক চার্চের 'সোফিয়া' পত্রিকা সম্পাদনাকালে তাঁর ধর্মীয় মতবাদকে সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলেন। ১৮৯৮ সালের জুন মাসে তিনি 'আমরা কি হিন্দু' ? প্রবন্ধে বলেন, 'জন্মকালেও আমরা হিন্দু এবং মৃত্যু পর্যন্তও হিন্দু। কিন্তু দ্বিজ হিসাবে আমরা ক্যাথলিক। আচার-ব্যবহারে, আহারে-বিহারে ও বর্ণাশ্রম ধর্মপালনে আমরা খাঁটি হিন্দু ; কিন্তু আমাদের ধর্ম বিশ্বজনীন। আমাদের চিন্তাপ্রণালী নিঃসন্দেহে হিন্দু। আমরা যত বেশী আমাদের সার্বজনীন ধর্ম (অর্থাৎ ক্যাথলিক ধর্ম) পালন করব, তত বেশীই হিন্দু হিসাবে আমাদের উন্নতি ঘটবে। যতবেশী আমরা নরহরিকে অর্থাৎ যীশখ্রীষ্টকে ভালবাসবো ততবেশী আমাদের স্বদেশের প্রতি মমত্ব বাড়বে। আমরা হিন্দু ক্যাথলিক।' কিন্তু তাঁর এই চিন্তাধারা হিন্দু বা খ্রীষ্টান কেউই গ্রহণ করেন নি। ফলে ১৮৯৫ সাল নাগাদ সময় থেকে ব্রহ্মবান্ধবকে আবার এক অভিজ্ঞান সংকটের সম্মুখীন হতে আমরা দেখি। তাঁর ভারতীয়ত্বের দিকে, বেদান্তের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা বাড়তে থাকে। নাম ভারতীয়ত্বে রূপান্তরিত করে থিওফিলাস হয়ে যান ব্রহ্মবান্ধব। তাঁর আচার, আচরণ, পোষাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেবলমাত্র গলায় ঝোলানো ক্রশ চিহ্নটি হিন্দু সন্যাসীদের থেকে তাঁকে পৃথক করে। এই বিশ্বাসেও তিনি অনড়—ভারতের পুনর্গঠন সম্ভব খ্রীষ্টের পথে। তিনি এক অদ্ভুত আনুগত্য বিভাজন নীতির কথা বলে তাঁর অভিজ্ঞান সংকট থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, তিনি শারীরিক ও মানসিক গঠনে হিন্দু অভিজ্ঞান বহন করেন এবং বিশ্বাস, নৈতিকতা ও মরণশীল সত্তায় তিনি খ্রীষ্টান। এই হিন্দু খ্রীষ্টান বা খ্রীষ্টানী হিন্দুত্বের বাস্তব রূপায়ণের জন্য জব্বলপুরের নর্মদা তীরে ১৮৯৯ সালে তিনি 'কাস্থলিক মঠ' নির্মাণ করেন। অনিমানন্দের মতে, এখানেই বেদান্তের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের মনের মিল পাকা হয়। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের এই হিন্দুয়ানীর গন্ধযুক্ত তত্ত্ব ভারতীয় ক্যাথলিকরা বরদাস্ত করে নি। তাঁরা মনে করেন ব্রহ্মবান্ধব ক্যাথলিক বেশে হিন্দুত্বের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন। ভারতীয় ক্যাথলিক ধর্মের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিরোধিতায় পীড়িত ব্রহ্মবান্ধবের 'কাস্থলিক মঠ'ও দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়।

ব্রহ্মবান্ধব আবারও বুঝলেন যে কোনপ্রকার মুক্তি প্রয়াসই তাঁর চারপাশের অবজেকটিভ কণ্ডিশান মঞ্জুর করবে না। তিনি যা হতে চাইছিলেন সাম্রাজ্যবাদের সহচর মিশনারীদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া মুশকিল ছিল। তারা যখন দেখল যে ব্রহ্মবান্ধবকে শেকল পরানো যাবে না, কোন মঠ গীর্জার খাঁচায় পোরাও যাবে না তখন তারা তাঁর ডানা ছেঁটে দেবার চেষ্টা করল।

তা আমরা এখনি দেখেছি আরও দেখবো। মনে হচ্ছে ব্রহ্মবান্ধবও যেন একজন 'ইনএফেকচুয়াল এঞ্জেল'—তাঁর অগ্নিময় ডানা বারবার ব্যাহত হল পাথুরে দেওয়ালে। ভারতের ক্যাথলিকদের সঙ্গে বিরোধের সূত্র ধরেই ব্রহ্মবান্ধব সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধের সম্মুখীন হন। ব্রহ্মবান্ধব তাঁর ধর্মীয় তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা নিয়ে রোমের পথে পা বাড়িয়েছিলেন পোপ ত্রয়োদশ লিও-কে যাবতীয় বিষয় জানাতে। কিন্তু হঠাৎ কোন এক অজ্ঞাত কারণে পোপ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সম্মত নন বলে জানান। এতে ক্যাথলিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিক্ততর হলেও তিনি ক্যাথলিকই থেকে যান। কিন্তু তিনি তীব্রভাবে 'ইওরোসেনট্রিক খ্রীষ্টানীটি'র জাতিগত সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন।

ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃপক্ষের বিরোধিতায় ১৮৯৯ সালের মার্চ মাসের পর মাসিক 'সোফিয়া' বন্ধ হয়ে যায়। ব্রহ্মবান্ধবও করাচী থেকে কলকাতায় চলে এসে ১৯০০ সালের জুন মাস থেকে সাপ্তাহিক রূপে 'সোফিয়া'র পুনরুজ্জীবন ঘটান। কিন্তু ক্যাথলিক কর্তাব্যক্তিদের বিরোধিতায় ক্যাথলিকদের পক্ষে 'সাপ্তাহিক সোফিয়া' পাঠ নিষিদ্ধ হয়। 'সোফিয়া'র বিরুদ্ধে অভিযোগ—এর স্বত্বাধিকারী অ-ক্যাথলিক, এখানে ব্রহ্মবান্ধব কর্তৃক ক্যাথলিক ধর্মের অপব্যাখ্যা হচ্ছে, ব্রহ্মবান্ধব দর্শন ও থিওলজির এমনসব কঠিন প্রশ্নের আলোচনা করছেন যাতে তাঁর অধিকার বা যোগ্যতা নেই, 'সোফিয়া'তে খ্রীষ্টধর্মকে হিন্দু-সাজ পরাবার উদ্যোগ চলছে, ইত্যাদি। অ-ক্যাথলিক কর্তৃত্বের অভিযোগ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে পরের সংখ্যাতেই সম্পাদক হিসাবে ব্রহ্মবান্ধবের নাম ঘোষিত হয়। ব্রহ্মবান্ধব ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষকে বলেন—তাঁর কোন লেখা ক্যাথলিক বিশ্বাসের বিরোধী হয়েছে, তাঁরা বলুন। তাঁর লেখার উপর 'সেন্সর' ব্যবস্থা মেনে নিতেও তিনি রাজি হন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নি। ক্যাথলিক হয়ে ক্যাথলিক নিয়মানুবর্তিতা ভাঙতে কুণ্ঠিত ব্রহ্মবান্ধব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে যান নি। বৈধ উপায়ে ন্যায়বিচার পাওয়ার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলে ৮ ডিসেম্বরের পর 'সাপ্তাহিক সোফিয়া' তিনি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষের 'সোফিয়া' বিরোধিতার প্রসঙ্গে মনোরঞ্জন গুহ তাঁর 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' বইতে দেখিয়েছেন, "সাপ্তাহিক সোফিয়ার বিরুদ্ধে ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে যেসব অভিযোগ আনেন সেগুলির চেয়ে আরও গুরুতর একটা অভিযোগ ছিল, যা তাঁরা প্রকাশ্যে বলতে পারেন নি। ব্রহ্মবান্ধব রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার 'বুয়র

যুদ্ধ' এবং চীনে 'বক্সার বিদ্রোহ' সম্পর্কে সোফিয়াতে যেসব মন্তব্য প্রকাশিত সেগুলি ইউরোপীয়দের নিকট আদৌ রুচিকর ছিল না। বিশেষ করে চীনে মিশনারীদের অখ্রীষ্টানোচিত মনোভাব ও ব্যবহারের যে সমালোচনা করা হয় তাতে খ্রীস্টান কর্তৃপক্ষের গাত্রজ্বালা ধরে। খ্রীস্টান-সম্পাদিত কাগজে এরূপ সমালোচনা বার হলে বড়ই মুশকিল।"

চার্চ 'সোফিয়া' বন্ধ করে দিলে ব্রহ্মবান্ধব অধিকতর হিন্দু ভাবাপন্ন 'টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী চরিত্র গঠনে অগ্রসর হন। এখন তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদ তত্ত্ব ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বৌদ্ধিক সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে কাজ করে। এই যুগে ব্রহ্মবান্ধব খ্রীস্টের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে আর তেমন প্রস্তুত নন বরং তিনি এই পর্বে নিজেকে জাতীয়তাবাদী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষও ১৯০১ সালের ২০ জুন এই মর্মে ফতোয়া জারি করেন যে, পূর্ব-নিষিদ্ধ 'সাপ্তাহিক সোফিয়া'ই 'মাসিক টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী' নাম নিয়ে বেরিয়েছে। ক্যাথলিকদের পক্ষে এ পত্রিকাও অস্পৃশ্য, অপাঠ্য। ক্যাথলিক নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে এবারও ব্রহ্মবান্ধব সবিনয়ে যথেষ্ট লড়েছিলেন কিন্তু বিদ্রোহ করেন নি।

যাইহোক, ব্রহ্মবান্ধবের চিন্তার অর্গলগুলো এক এক করে খুলে যাচ্ছিল। তিনি এই সহজ সিদ্ধান্ত নিজে উপার্জন করলেন যে, ব্রহ্মোপলব্ধিই হোক, অথবা খ্রীস্টীয় বিশুদ্ধতা চর্চাই হোক—সব কিছুই শেষ পর্যন্ত ব্যাহত হবে ভারতীয় পরাধীনতার প্রাচীরে মাথা ঠুকে। সুতরাং জাতীয় ইতিহাসের অগ্নিগর্ভ যুগটিতে তিনি এবার নিজের ভূমিকা খুঁজতে লাগলেন। অপরদিকে বেদান্তের উপর ভিত্তি করে খ্রীস্টধর্মকে ভারতে প্রতিষ্ঠা করার নিজস্ব তত্ত্বের জন্য এবং বেদান্তের প্রতি, হিন্দু আচারব্যবহারের প্রতি তাঁর ক্রমবর্ধমান ঝোঁকের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে ক্যাথলিকরা ব্রহ্মবান্ধবকে ধর্মচ্যুত করে।

৫

॥ তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে অর্পণ করেছ নিজে ॥

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক বেলায় কঠোর জাতীয়তাবাদী ব্রহ্মবান্ধব তাঁর চিন্তাধারা ও মানসিকতায় এমন এক স্তরে উপনীত যখন তিনি যা কিছু দেশীয় ও হিন্দুধর্মভুক্ত তাকেই গ্রহণে তৎপর। আজীবন মুক্তিসন্ধানী এই মানুষটি অনেক ঘুরপাক খেয়ে এবার মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন হিন্দুধর্মে—

বেদান্তে। তাঁর মনে হয়েছিল এই ক্ষেত্রটিতে তাঁকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তার আমলাতান্ত্রিক বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। এতাবৎকাল পর্যন্ত ব্যর্থ এই মুক্তিসন্ধানী এও মনে করেছিলেন যে ভারতের মুক্তি মিলবে ভারতীয়ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীলত্বের ও আস্থাশীলত্বের বোধের উন্মেষে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, ইংরেজী বিদ্যা শিখে, ইংরেজী চালচলন অনুকরণ করে, ইংরেজের দাসত্ব করে ভারতবাসী একেবারে জাতিভ্রষ্ট ও ধর্মভ্রষ্ট হয়েছে। সুতরাং বালক বয়স থেকেই মনে শিক্ষাগুণে আত্মমর্যাদা ও আত্মনির্ভরের ভাব উন্মেষিত করতে প্রাচীন বৈদিক আদর্শে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতার সিমলা স্ট্রীটে ক্ষুদ্র আবাসিক আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের কাজ শুরুর অব্যবহিত পরেই তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে যোগ দিতে সদলবলে বোলপুর চলে যান। ব্রহ্মবান্ধবের শান্তিনিকেতন জীবন দীর্ঘস্থায়ী না হবার কারণ যাইহোক না কেন শিক্ষাদানের নীতি তিনি ত্যাগ করেন নি। ১৯০২ সালের আগস্ট মাসে বোলপুর থেকে চলে এসেই ঐ মাসেই তিনি সিমলা স্ট্রীটে 'সারস্বত আয়তন' নামে পুনরায় নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর বিদ্যায়াতনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলতেন—"প্রাচীন আদর্শে শিক্ষাদান এইটিই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিবে। তবে ইংরেজের বাহ্য চাকচিক্যময়ী, গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী বিদ্যাও ইহার মধ্যে স্থান পাইবে। কারণ সময় অনুযায়ী সকল দিক বজায় রাখিয়া বালক গঠন করিতে হইবে। কেবলমাত্র প্রাচীন ভাব অবলম্বন করিয়া যদি শিক্ষাদান করা যায়, তাহা হইলে তাহারা বিদেশীর সমকক্ষ হইয়া তাহাদের সহিত যুঝাপড়া করিতে পারিবে না। ইংরেজী বিদ্যা যে আর্যজ্ঞানের পরিচারিকা, এই সংস্কার বালকদিগের মনে—হাতেকলমে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইবে। বাল্যকাল হইতে হিন্দুত্ব প্রধান ও ইংরেজী গৌণ, এইভাব বালকদিগের মনে প্রবেশ করাইয়া দিলে আত্মবিস্মৃতি ঘুচিয়া যাইবে ও আত্মমর্যাদা ফিরিয়া আসিবে। গোলামী দূর করিবার ইহাই এক প্রশস্ত উপায়।" [উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব / প্রবোধচন্দ্র সিংহ]

৬

॥ এ নিঃশব্দ দাহ / নিঃসহ নৈরাশ্য তাপ ॥

১৯০২-০৩ সালে এক বছর বিলাত ভ্রমণের পর ব্রহ্মবান্ধবের স্বদেশাভিমান ও ফিরিঙ্গি বিরোধিতা তীব্রতর হয়। বাংলার রাজনীতিতেও এই সময়ই স্বদেশী আন্দোলনের মূল স্লোগান যা-কিছু স্বদেশী তা গ্রহণ ও

বিদেশী বয়কট। ব্রহ্মবান্ধবও এতটাই গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ যে হিন্দুধর্মের যাবতীয় কিছুকেই শ্রেয়জ্ঞানে পালনীয় বলে প্রচার করেছেন, জীবনে গ্রহণ করেছেন, স্বদেশে পরিব্যাপ্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর 'সারস্বত আয়তনে' হিন্দু ধর্মানুযায়ী অনুষ্ঠানাদি পালনের গোঁড়ামীর ফলে তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী রেবাচাঁদ, জ্ঞানচাঁদ প্রভৃতি তাঁরই হাতে গড়া শিষ্যরাও তাঁর সঙ্গ পরিহার করেন। এই পর্বে ব্রহ্মবান্ধব হিন্দুধর্মের কোন প্রকার সংস্কার আন্দোলনেরও বিরোধী মানসিকতা থেকেই ব্রাহ্মবিরোধীও। কারণ তখন তাঁর প্রতীতি জন্মেছে যে ফিরিঙ্গিদের প্রতিপক্ষে ভারতীয়দের প্রধানত প্রয়োজন একতা ও আত্মগৌরববোধ। অতএব সনাতন হিন্দুধর্মের যাবতীয় ঐতিহ্যই অবশ্যপালনীয়। ব্রহ্মবান্ধবের হিন্দুত্বের গোঁড়ামি কতদূর পৌঁছেছিল তা একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। বলাই দেবশর্মা লিখিত 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' বইয়ের ভূমিকায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "একদিন সকালে আমি কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি—শিবনারায়ণ দাস স্ট্রীটের মোড়ের দোতলা থেকে উপাধ্যায় ডাকলেন। উপরে গেলে তিনি বললেন, 'সন্ধ্যা' কাগজের এজেন্সী নেবার জন্য কতকগুলি কুলীন কায়স্থ ছেলে দিতে পারেন? পচা মৌলিক দিলে হবে না।" সুতরাং হিন্দুধর্মের প্রতি নিষ্ঠায় তিনি প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করবেন এটা নিশ্চয় স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু শুধু এইটুকুই কারণ হলে বিষয়টির গুরুত্ব এত বেশী হত না। তাঁর সারা জীবনের মুক্তি অন্বেষায় জড়িত ছিল যেমন জাতীয়তা ও দেশপ্রেম, তাঁর প্রায়শ্চিত্তের পিছনেও উপস্থিত ছিল রাজনৈতিক প্রয়োজন। তিনি বুঝেছিলেন সম্পূর্ণভাবে হিন্দু না হলে দেশের মানুষ তাঁর কথাকে গ্রহণ করবে না। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন—তিনি 'jesuit' এই অভিযোগ ভিত্তিহীন—তিনি জাতীয়তাবাদী। তাঁর বিষয়ে সন্দেহ তৎকালীন কোন কোন বৈপ্লবিক নেতার মধ্যেও ছিল। ব্রহ্মবান্ধব সে সন্দেহ মোচন করতে আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন—দেশের জন্য প্রায়শ্চিত্তে তিনি প্রস্তুত। দেশপ্রেমে তিনি পাগল। হিন্দুধর্মের মধ্যে যে মুক্তির আলো তখন তিনি দেখেছিলেন সেই আলোতেই তিনি স্বদেশীর পথও খুঁজে পেয়েছিলেন।

৭

॥ রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি এসেছে দুয়ার ভেদিয়া ॥

ব্রহ্মবান্ধব বুঝেছিলেন—স্বদেশী আন্দোলনকে জনারণ্যে নিয়ে যেতে হবে। তারজন্য এবার তিনি গোয়ালিয়ারে না পাওয়া তলোয়ার হাতে তুলে

নিলেন—'সন্ধ্যা' পত্রিকা। তিনি দেখেছিলেন অরবিন্দ, বিপিন পাল যা বলছেন তা আবদ্ধ থাকছে শিক্ষিত, উচ্চশ্রেণীর মানুষের মধ্যে। ব্রহ্মবান্ধব মুক্তি-পিয়াসী। এই স্বদেশী আন্দোলনের ধারাকে মুক্ত করে দিতে হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে। জনারণ্যে মিশে যেতে হবে এই হিন্দু বৈদান্তিক সন্ন্যাসীকে—তবেই মুক্তি সম্ভব। সুতরাং এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি প্রকাশ করলেন 'সন্ধ্যা' পত্রিকা। ইংরেজ সম্বন্ধে মানুষের মনে যে ভীতি আছে তা দূর করতে হবে। মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ জাগাতে হবে, মনোবল বাড়াতে হবে। 'সন্ধ্যা'র স্তম্ভে স্তম্ভে একদিকে হিন্দুর জ্ঞানধর্ম ও গুণগরিমা প্রকাশ করতে লাগলেন অপরদিকে ইংরেজ ভারতবাসীকে নির্জীব বিবেচনায় কিভাবে যাদুমন্ত্রে ভুলিয়ে রেখে ক্রমশ পদদলিত করছে তা স্পষ্টরূপে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। সর্বোপরি সাধারণ মানুষকে উদ্বেলিত করে তুলতে লাগলেন ইংরেজবিরোধী বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে। আরও একটু অগ্রসর হয়ে ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা'য় পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন—"আমরা ভারতের মুক্তি চাই"। (১৩-০৮-০৭) মুক্তির পথ-নির্দেশও তিনি দিলেন—"প্রত্যেক গ্রাম, অঞ্চল, হাট, বাট, আবাস দুর্গে পরিণত করতে হবে। লাঠি, সড়কি, গুপ্তি, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্র প্রতি হাতের শোভাবর্ধন করবে। তীর ধনুক এবং কালী মায়ির বোমা' প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করতে হবে।" (১৪-০৫-০৭, ০৪-০৫-০৮ তারিখে সন্ধ্যায় 'কালি মায়ির বোমা' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি এই বোমার উপর প্রচুর আস্থা স্থাপন করেন।) [কালীচরণ ঘোষ] আর এই সমস্ত কিছুকেই তিনি উপস্থিত করলেন একেবারে সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষায়, গ্রাম্য ভাষায়—কখনো বা রূপকথা ও হেঁয়ালীর ভাষাতেও। কখনো কখনো 'সন্ধ্যা'র ভাষা সাধারণ শিষ্টাচার সীমাও লঙ্ঘন করত। এ বিষয়ে কেউ আপত্তি করলে ব্রহ্মবান্ধব উত্তর দেন, "তাহাতে দোষ কি ? লোকে না হয় বলিবে, 'উপাধ্যায়টা ইতর'। কিন্তু লোকের যে ভয় ভাঙ্গিবে—ফিরিঙ্গিকে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারিবে—ইহা যে পরম লাভ।" [কংগ্রেস/হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ] ব্রহ্মবান্ধবের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। 'সন্ধ্যা'র ব্যাপক প্রচার হয় এবং সত্যই আপামর জনগণ 'সন্ধ্যা'র জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯০৪ থেকে ১৯০৫এ 'সন্ধ্যা'র প্রচার ৫০০ থেকে ৭০০০এ পৌঁছেছিল। সংবাদপত্র যে গণমাধ্যম রূপে কার্যকর ভূমিকা পালন করে তার ভিত্তি নির্মাণ করেছিল 'সন্ধ্যা'।

বস্তুতপক্ষে ব্রহ্মবান্ধবের পূর্ববর্তী যাবতীয় পন্থানুসন্ধান যেমন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এক্ষেত্রে তিনি সর্বাংশে না হলেও অনেকাংশেই সফল

হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অবজেকটিভ কণ্ডিশন থেকে যে বাধা তিনি আজীবন পেয়েছেন সেই বাধা এক্ষেত্রে আরও তীব্র ও প্রত্যক্ষ আকারে আসে। 'সন্ধ্যা'র এই জনমনে স্বদেশী সম্প্রসারণ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার স্বভাবতই সহ্য করে নি। 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত ১৯০৭ সালের ১৩ আগস্ট 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে', ২০ আগস্ট 'সিডিশানের হুড়ুম দুড়ুম, ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম' ও ২৩ আগস্ট 'বাছাসকল নিয়ে যাচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবন'—এই প্রবন্ধ তিনটিতে রাজদ্রোহের অভিযোগে পুলিশ 'সন্ধ্যা' অফিস খানাতল্লাসী করে এবং ম্যানেজার সারদাচরণ সেন, প্রিণ্টার হরিনাথ দাস ও ব্রহ্মবান্ধবের নামে মামলা দায়ের করে। ২৩ সেপ্টেম্বর এই মামলা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের আদালতে শুরু হয়। প্রথম দিনই ব্রহ্মবান্ধব যাবতীয় দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে এক বিখ্যাত বিবৃতি দেন। ঐ বিবৃতিতে তিনি জানিয়ে দেন যে ভাগবৎ প্রেরণায় তিনি স্বরাজ স্থাপনের কাজে লিপ্ত হয়েছেন সেজন্য তিনি বিদেশীর কাছে কোন কৈফিয়ৎ দেবেন না। মামলা চলতে থাকে। ব্রহ্মবান্ধব কোর্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার ফলে কয়েকদিন পরে তাঁর পুরানো হার্নিয়া রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হন। তাঁকে ক্যাম্বেলে ভর্তি করে অস্ত্রোপচার করতে হয় (২২ অক্টোবর ১৯০৭)। ব্রহ্মবান্ধব হাসপাতালে থাকাকালীন ২৪ অক্টোবর পুলিশ 'সন্ধ্যা' অফিস দ্বিতীয়বাব খানাতল্লাসী করে এবং প্রচারমূলক যাবতীয় পত্রাদি পুড়িয়ে দেয়। এইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধবের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল তার একটি গুরুত্বপুর্ণ সংগ্রহও পুলিশ পুড়িয়ে দেয়। ১১ ও ১৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে রাজদ্রোহে অভিযোগে সারদাচরণ সেন ও হরিচরণ দাসকে গ্রেপ্তার করে। এবার জামিনে তাঁদের মুক্তি দেওয়াও হল না। বাংলাদেশে সিডিশান মামলার ইতিহাসে এই প্রথম জামিনেও অভিযুক্তরা খালাস পেলেন না। এই খবরে ব্রহ্মবান্ধব বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু এবিষয়ে তিনি কিছু করতে পারেন নি। কারণ ২৭ অক্টোবর (১৯০৭) সকাল ৯টায় হঠাৎ ধনুষ্টংকারে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়।

৮

॥ নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান··· ॥

স্বদেশী আন্দোলনে ব্রহ্মবান্ধবের ভূমিকা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একথা অবশ্য স্মরণীয় যে তিনিও ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে সমার্থক করে নিয়েছিলেন। এটা অবশ্যই সেই যুগেরই, গোটা আন্দোলনেরই সমস্যা। কিন্তু যে ব্যক্তি একাধিকবার ধর্মান্তরিত হয়েছেন, যিনি আজীবন নিজের মুক্তির

পথ নিজেই অন্বেষণ করে নির্ণীত করেছেন তিনি তাঁর জীবনের কোন পর্বেই ভারতীয় জনগণের এক বৃহত্তর অংশ মুসলমানদের বিষয়ে আগ্রহী বা ভাবিত হন নি। মুসলমানদের বিষয়ে কোন বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করলেও এই ধর্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে তাঁর ঔদাসীন্য আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। আমরা লক্ষ্য না করে পারি না যে, যে-ব্যক্তি সারাজীবন প্রচলিত ছক থেকে মুক্তি খুঁজেছেন এই বিষয়ে কিন্তু তিনিও 'ভারতীয় মানেই হিন্দু'—এই প্রচলিতছককে স্বীকার করেছিলেন। এই ছকটি ভাঙার চেষ্টা কোন সময়ই কোনভাবেই তিনিও করেন নি।

ব্রহ্মবান্ধবের গোটা কাহিনী পর্যালোচনা করলে তাঁর জীবনের মূল সমস্যা যা বেরিয়ে আসে তাহল—কৈশোর থেকেই তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থা তাঁর চারদিকে বিরাজমান সেটাকে মেনে নেওয়া যাবে না। ফলে বহুমুখী ছকে বদ্ধ মানুষটি সারাজীবন মুক্তির পথ খুঁজেছেন। সে মুক্তি জীবনযাত্রার ঔপনিবেশিক ছক থেকে মুক্তি। তাঁর নিজের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই জড়িয়ে গিয়েছিল দেশেরও মুক্তির প্রশ্ন—মিশে গিয়েছিল দেশীয় বিরাট জনারণ্যে তাঁর মিশে যাবার প্রচেষ্টাও। এই মুক্তির আগ্রহ তাঁর অন্তরে দেশীয় যে আগুন প্রজ্বলিত করেছিল তার তাপ কোন সময়েই কোন অংশেই কম ছিল না। এই আগুনে তিনি আগাগোড়া দগ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর অন্তরের এই আগুনকে তাঁর জীবনযাত্রার বেড়াগুলো অতিক্রম করে তিনি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন নি। বেড়াগুলো তিনি যতবারই ভাঙতে গেছেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রায় তিনি পারিপার্শ্বিকের বাধায় নতুন বেড়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। ফলে গোয়ালিয়ার যাত্রা থেকে যে ব্যর্থতার শুরু সেই বাধা ও ব্যর্থতার ছায়া ব্রহ্মবান্ধবকে প্রায় শেষ পর্যন্তই বয়ে বড়াতে হয়েছিল। তবু বরং অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও একেবারে শেষে এসে জনসাধারণের কাছে পৌঁছাবার একটা সীমিত সফল পন্থা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। সেখানেও বাধা ছিল, বাধা পেয়েওছিলেন কিন্তু সে বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারতেন কিনা তার প্রমাণ পাওয়া গেল না। তিনি আরও কিছুটা অন্তত দীর্ঘজীবী হলে আমরা সেটা বুঝতে পারতাম। কিন্তু মহাকাল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে এবং আমাদেরও সে সুযোগ দেয় নি।

সূত্রনির্দেশ

১ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-র ভূমিকা সম্বলিত, হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, জুন, ১৯৬১

২ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, প্রবোধচন্দ্র সিংহ, উত্তরপাড়া, প্রকাশকাল, মুদ্রিত নেই

৩ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-র ভূমিকা সম্বলিত, বলাই দেবশর্মা, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮

৪ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য-র ভূমিকা সম্বলিত, মনোরঞ্জন গুহ, বর্ধমান, ১৩৮৩

৫ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, যোগেশচন্দ্র বাগল, কলকাতা

৬ চরিতচিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, কলকাতা, ১৯৫৮

৭ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৬১

৮ জাগরণ ও বিস্ফোরণ, ১ম খণ্ড, কালীচরণ ঘোষ, কালকাতা, ১৩৭৯

৯ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের রচনা সংগ্রহ, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮৭

১০ কংগ্রেস, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কলকাতা, ১৩২৭

১১ The Brahmo Samaj And The Shaping of The Modern Indian Mind, David Kopf. Princeton, 1979

১২ The Swadeshi Movement In Bengal, 1903—1908, Sumit Sarkar. Calcutta, 1973

১৩ The Blade, Swami Animananda, Calcutta, 1947

১৪ The Extremist Challenge, India Between 1890 and 1910, Amales Tripathi, Orient Longmans, 1967

১৫ ব্রহ্মবান্ধবের প্রায়শ্চিত্ত, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, 'পরিচয়' পত্রিকা, শারদীয়, ১৩৯৫

১৬ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ফাদার পিয়ের ফালোঁ, 'বিশ্বভারতী' পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৮

বঙ্গভঙ্গ ও সঞ্জীবনী

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় সন্ধিক্ষণে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮৩ সালে সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে এর আত্মপ্রকাশ। এই পত্রিকার ব্রান্তিকাল ছিল ১৮৮৩ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত। ইলবার্ট বিল, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনের বিকাশে এই পত্রিকার অবদান অসামান্য। ভারতসভা প্রতিষ্ঠা, প্রাদেশিক সম্মেলন, শিক্ষিত জনগণের রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন ইত্যাদিতে যখন বাংলার আকাশ-বাতাস উত্তপ্ত, তখনই প্রয়োজন দেখা দেয় একটি পত্রিকার যার মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে এই মতবাদগুলি। এই পত্রিকার প্রাণপুরুষ ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। এই পত্রিকার বহুবিধ কার্যকলাপের আলোচনা করার এখানে অবসর নেই, শুধু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে এই পত্রিকার কি যোগ ছিল তা দেখাবার চেষ্টা এখানে করা হয়েছে।

স্বাদেশিকতার স্রোত যখন জাতির জীবনে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হচ্ছিল তখন লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে, জনমতের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও, দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করলেন। কার্জন দেখলেন সমগ্র ভারতে বাংলার প্রতিপত্তি অত্যধিক। তাই বাংলাদেশ থেকে চট্টগ্রাম বিভাগ ছিন্ন করে আসামের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইলেন। এতে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠল। বঙ্গদেশের অন্য কতক অংশ এবং উত্তরবঙ্গের কিয়দংশ আসামের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব ভারত সচিবের সমর্থন লাভ করে একদিন সেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন। সারা বাংলাদেশে তীব্র প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠল।

এই সময়ে সঞ্জীবনী যেন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। এই পত্রিকাতেই প্রথম কৃষ্ণকুমার মিত্রের বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হল। তিনি সঞ্জীবনী মারফত প্রস্তাব করলেন, "বাংলা যতদিন মিলিত না হয়, ততদিন বাঙালী বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করিবে না ও বিলাতী দ্রব্য বয়কট করিবে।" এই বয়কট দ্বারা তিনি ইংরাজ জাতির দৃষ্টি বাঙালীর প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন "ল্যাঙ্কাশায়ারের সহস্র সহস্র মজুরের ভাত-কাপড় বাংলায় বস্ত্র বিক্রয় করিয়া জোগাড় হইয়া থাকে,

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, উলুবেড়িয়া কলেজ

তাহাদের বস্ত্র বিক্রয় না হইলে পার্লামেন্ট তাহাদিগের প্রতিনিধি দ্বারা নিজেদের ব্যবসায় অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, বঙ্গদেশে বয়কট কেন হইল তাহার কারণ জানিতে চাহিবে এবং সেই কারণের প্রতিকার করিয়া পার্লামেন্ট বাঙালীর এই আন্দোলন বন্ধ করাইয়া দিবে। তাহাদের নিজেদের ব্যবসা রক্ষার জন্য উহা করিতে বাধ্য হইবে।" স্থানীয় শাসনকর্তারা যখন বাঙালীর প্রতিবাদে কর্ণপাত করলেন না, তখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যারা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের দ্বারাই বাঙালীর প্রতি এই অবিচারের প্রতিকারের জন্য কৃষ্ণকুমার বয়কট আন্দোলন উপস্থিত করেন।

যখন সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত হল, "আমরা চিনি খাইব না, গুড় খাইব, লিভারপুলের লবণ খাইব না, করকচ খাইব", তখন একদিকে সাধারণ বাঙালী অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিল; অন্যদিকে কল্পনাপ্রবণ বাঙালী যুবকগণ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। দলে দলে যুবকগণ এই আন্দোলনে যোগ দিতে লাগল।

কৃষ্ণকুমার মিত্রই প্রথম তাঁর পত্রিকা সঞ্জীবনীতে একটি সুপরিকল্পিত কার্যক্রম দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করেন। বিদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ এই কার্যকমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলের মহতী জনসভায় সঞ্জীবনীর প্রস্তাবিত কার্যক্রম গৃহীত হয়। সঞ্জীবনী যখন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিদেশী পণ্যবর্জনের প্রস্তাব উত্থাপন করে, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো কোনো পত্রিকায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছিল। সঞ্জীবনী পত্রিকায় 'কর্তব্য নির্ধারণ' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কৃষ্ণকুমার দেশবাসীকে এই কার্যক্রম গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান করেন—"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালীর চিরাশৌচ হইবে। যতদিন বঙ্গদেশের ছিন্ন-অঙ্গ পুনরায় একত্র না হয়, ততদিন বাঙালী শোকচিহ্ন ধারণ করিবে। বাঙালী আমোদপ্রমোদ পায়ে ঠেলিয়া সমস্ত বঙ্গ এক করিবার মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। যতদিন সাধনায় সিদ্ধ না হইবে ততদিন তপশ্চর্যা করিবে। জাতীয় অশৌচের সময় বাঙালী আর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার জেলা বোর্ড বা লোকাল বোর্ডের সভ্য, সরকারী ম্যাজিস্ট্রেট থাকিতে পারিবে না। জাতীয় অশৌচের সময় বড়লাট, ছোটলাট, কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধে কোনো কার্যের জন্য আর অর্থদান করা হইবে না। যতদিন জাতীয় শোকের অবসান না হয়, ততদিন রাজপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাবে আমাদের কেহ যোগ দিতে পারিবে না। লর্ড কার্জন বাঙালীর সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন যদি তিনি উদ্যত খড়্গ সম্বরণ না করেন, বাঙালী আর রাজপুরুষদিগের সংশ্রবে যাইতে পারিবে না।"

বাঙালী আবেদন নিবেদনের রাজনীতিতে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

আত্মমর্যাদাহীন, মেরুদণ্ডহীন জাতির প্রাণে আত্মশক্তির মন্ত্র নবচেতনার সৃষ্টি করল। নিষ্ঠুর আঘাতে জাতি আত্মশক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হল। কৃষ্ণকুমার মিত্র সঞ্জীবনীতে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করলেন ; বাংলার নেতৃবৃন্দ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সঞ্জীবনী লিখল, "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে আমাদের স্বদেশভক্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁহারা আর বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীতে জীবনবীমা করিবেন না। আমাদের নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে ; ঠেকনা দিয়া কোনোদিন কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে কেহ কখনও দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারে না।"

এসময় দেশবাসীকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করবার জন্য নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা পত্রটিও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাতদ্রব্য পাইলে কোনো বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই দ্রব্য ক্রয় করিতে যদি আর্থিক বা অন্য কোনো প্রকার ক্ষতিস্বীকার করিতে হয় তাহাও করিতে আমরা প্রস্তুত হইব। আমরা এরূপ কার্য কেবল নিজেরাই করিয়া ক্ষান্ত হইব না। বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকে এরূপ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের শুভ সংকল্পের সহায় হউন।"

১৯০৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসে বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হল না। কিন্তু স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার সমর্থন করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সময় সরকারের দমননীতির ফলে আন্দোলনে বাহ্যিক শিথিলতা দেখা দেয়। ১৯০৬-এ ইংলণ্ড থেকে ঘোষণা করা হয় যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন মন্দীভূত হয়ে এসেছে। সেজন্য বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করবার আর কোনো সঙ্গত হেতু নেই। মন্ত্রীসভার এই ঘোষণায় ক্ষুব্ধ হয়ে দেশনায়কগণ দেশে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করবার ব্যবস্থায় পুনরায় মনোনিবেশ করলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারী গোলদীঘিতে প্রকাশ্যভাবে বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব আড়াই ঘণ্টা ধরে চলেছিল।

দেশে যখন এইভাবে নতুন করে আন্দোলন শুরু হল, সেই সময়ে সমগ্র দেশের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। বিদেশী জিনিষ বর্জন ও বয়কট এবং বিদেশী দ্রব্যের বহ্ন্যুৎসব হতে লাগল। ছাত্রসমাজও এই আন্দোলনের বাইরে থাকল না। ছাত্রদের প্রচারের ফলে বয়কট আন্দোলনের সাফল্যে চমকিত হয়ে সরকারপক্ষ ছাত্রদমন যজ্ঞ আরম্ভ করে দেয়। বড়বাজারের মারামারির যবনিকাপাত করতে পুলিশ স্বীকৃত হলেও এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছাত্রদের প্রতি সরকারপক্ষের সন্দেহ ছিল। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর আলেকজাণ্ডার

পেডলার সেই সমস্ত ছাত্রদের বিতাড়িত করবার জন্য শিক্ষায়তন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি 'সার্কুলার' পাঠালেন।

২২ অক্টোবর বাংলা সরকারের পক্ষে মিঃ কার্লাইল যে ইস্তাহার স্কুলে স্কুলে জারি করলেন, তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে ; এই পরোয়ানায় ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগ দিতে নিষেধ করা হয় এবং স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, যদি তাঁরা ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা না করেন, তবে উক্ত স্কুল ও কলেজসমূহ গভর্ণমেন্টের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে। ছাত্রগণ বৃত্তিলাভার্থ প্রতিযোগিতা করতে পারবে না। যদি ছাত্রগণ কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে, তবে সেই সমস্ত নামের তালিকা জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে পাঠাতে হবে।

২৭ অক্টোবর পটলডাঙার মল্লিকদের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এক সভায় ছাত্রগণের পক্ষ থেকে শচীন্দ্রনাথ বসু, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সিংহ ও মহম্মদ সিদ্দীক বক্তৃতা করেন। ছাত্রগণ সেই সভায় ঘোষণা করেন যে, যদি বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করতে হয় তাহলেও স্বদেশী ব্রত তারা ত্যাগ করবে না। রংপুরের ছাত্রদের সভায় যোগ দেওয়ার অভিযোগে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং এই অর্থদণ্ড না দেওয়ায় ছাত্রদের স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়া মাত্র কলকাতায় ছাত্রদল নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে এক বিরাট ছাত্রসভায় গোলদীঘিতে মিলিত হয়ে 'সার্কুলার বিরোধী সমিতি' স্থাপনের সংকল্প করলেন। স্থির হল যে কৃষ্ণকুমার এর সভাপতি ও শচীন্দ্রনাথ বসু এর সম্পাদক হবেন। শিবনাথ শাস্ত্রী ছাত্রদের স্বদেশের জন্য প্রয়োজন হলে এক বৎসরের জন্য পড়াশুনা স্থগিত রাখতে আহ্বান করেন।

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের পান্তির মাঠের সভায় সুবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য এক লক্ষ মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। নানা আলোচনায় বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয় ও অরবিন্দ ঘোষ এই কার্যে যোগদান করেন। এই সমস্ত কাহিনীর মূল ঘটনাবলীর সাক্ষী সঞ্জীবনী পত্রিকা।

সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে "সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র—সঞ্জীবনী" গ্রন্থ থেকে

মুর্শিদাবাদ জেলায় বিপ্লববাদ ঃ ১৯০৩-৩৮

বিষাণকুমার গুপ্ত

বিপ্লববাদ বলতে আলোচ্য প্রবন্ধে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শুরু হওয়া বাংলাদেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকেই বোঝান হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা একটি যুগ এবং এই যুগকে অগ্নিযুগ বলে অভিহিত করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে তা হল সন্ত্রাসবাদ।

দেশের তৎকালীন নিম্নগামী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি; বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্রীঃ)-বিরোধী তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন; ইংরাজ ও আমলাতন্ত্রবিরোধী জাত্যাভিমান ও তার প্রচার; দেশাত্মবোধক ও উদ্দীপনাময় কাব্য, কবিতা ও নাটক; জাপানের হাতে রুশদের এবং তুর্কীদের হাতে গ্রীকদের পরাজয় এবং সর্বোপরি রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্রমবিকাশ যা আমাদের দেশের বিপ্লবীদের বিভিন্ন "Actions" বা বৈপ্লবিক কাজকর্মের সমর্থনে একটি বিশেষ পটভূমি রচনা করে এই বিপ্লববাদের জন্ম দিয়েছিল।[১]

যুগান্তর ও অনুশীলন দলই ছিল এ রাজ্যের প্রাচীনতম বিপ্লবী দল। পরবর্তীকালে ১৯২৪ সালে শ্রীসংঘ এবং সেই দল ভেঙে ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে গঠিত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স এবং সর্বোপরি বিভিন্ন দলের বিদ্রোহী কর্মীদের নিয়ে গঠিত Revolt Group বা বিদ্রোহী গোষ্ঠী এই রাজ্যের বিশিষ্ট বিপ্লবী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।[২] এই সকল বিপ্লবী দলগুলির দ্বারা পরিচালিত বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে মোটামুটি-ভাবে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটি ১৯০৩-১৯১৭; দ্বিতীয়টি ১৯২৩-২৭ এবং তৃতীয়টি ১৯৩০-১৯৩৭।[৩]

বাংলার অন্যতম জেলা মুর্শিদাবাদেও এই বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্নিশিখার ছোঁয়াচ লেগেছিল। যদিও তার গতিপ্রকৃতি ও তীব্রতা ছিল ভিন্ন ধরনের। তার মূল্যায়ণ করাই হল আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

১৯০৩-৪ সাল নাগাদ সর্বপ্রথম বহরমপুর সংলগ্ন সৈদাবাদ এবং

ইতিহাস বিভাগ, শ্রীপৎ সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ

লালবাগ মহকুমার জিয়াগঞ্জে দুটি বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপনের মধ্য দিয়েই মুর্শিদাবাদ জেলায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন যাত্রা শুরু করে। যদিও বাইরে থেকে তা সংস্কৃত শিক্ষা বা দেহচর্চা কেন্দ্র হিসাবেই পরিচিত ছিল এবং সেগুলি মূলত প্রখ্যাত বিপ্লবী পুলিন দাসের সহায়তায় গড়ে উঠেছিল। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে জিয়াগঞ্জ শহরের যে বাড়ীটিতে ঐ গোপন বিপ্লবী কেন্দ্রটি গড়ে ওঠে তার মালিক হলেন রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ নেহালিয়া, যিনি আবার ইংরাজ সরকার গঠিত Anti-terrorist Committee-র সদস্য ছিলেন। তার অনুরোধেই পুলিন দাস ঢাকা থেকে জনৈক শচীন ব্যানার্জীকে জিয়াগঞ্জে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যুবকদের বিপ্লববাদে দীক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে ছোরা খেলা, লাঠি খেলা, ঘোড়ায় চাপা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত Training দিতেন।[৪]

ভৌগোলিক দিক থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই জেলা একদিকে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের যোগসূত্র এবং অপরদিকে পার্শ্ববর্তী রাজশাহীর মধ্য দিয়ে সমগ্র পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আবার বিহারের ছোটনাগপুর ও সাঁওতালপরগণার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ফলত মুর্শিদাবাদ জেলা বিভিন্ন এলাকার বিপ্লবীদের মিলন ও যোগাযোগের স্থল হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছিল। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রবাদপ্রতীম অধ্যক্ষ রেভাঃ ওইলার, কয়েকজন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক, কাশিমবাজার ও লালগোলা রাজপরিবার এবং বৈকুণ্ঠ সেন পরিবারের অকুণ্ঠদান যা বহু ছাত্রকে বিনা পয়সায় অথবা অল্প পয়সায় বহরমপুরে থাকাখাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে ঐ কলেজের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল, তা মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছে।[৫] এই আকর্ষণেই বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু বিপ্লবী তরুণ এখানে লেখাপড়া করতে অথবা বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজে আসতেন।[৬] এদের মধ্যে সূর্য সেন, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, নলিনী বাগচী, অমূল্য গাঙ্গুলী, যোগেন দে সরকার, নরেন সরকার প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া স্থানীয় বিশিষ্ট বিপ্লবী নলিনাক্ষ সান্যাল, অনাদিকান্ত সান্যাল, ভূপেশচন্দ্র নাগ প্রভৃতির নাম অবশ্যই স্মরণীয়।[৭] তৎসহ বহরমপুর সংলগ্ন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান সন্যাসী স্বামী অখণ্ডানন্দের আকর্ষণ বহু যুবককে জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লববাদে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাগুরু গোলওয়ালকার একদা এখানে স্বামী অখণ্ডানন্দের শিষ্য হিসাবে কিছুকাল অতিবাহিত করেছিলেন।[৮] যে কারণে বহু বিপ্লবী

মুর্শিদাবাদ জেলাকে তাঁদের অবাধ বিচরণের কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেন। তারা এখানে কোনরকম রাজনৈতিক "এ্যাকশান" করতেন না, পাছে ইংরাজ-পুলিশ বা গোয়েন্দা দলের এখানে যাতায়াত বৃদ্ধি পায়।[৯]

মুর্শিদাবাদ জেলা অনুশীলন দলের বিশিষ্ট ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। অন্যকোন বিপ্লবী দলের অস্তিত্ব এই জেলায় প্রায় ছিল না বললেই চলে। ফলত ত্রৈলক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, শচীন সান্যাল, প্রভাস লাহিড়ী প্রভৃতি অনুশীলন দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সাংগঠনিক কাজে এই জেলায় প্রায় আসতেন। ত্রিদিব চৌধুরী, তারাপদ গুপ্ত, প্রফুল্ল গুপ্ত, রাম সেন, কালীদাস বসু, মিহির মুখার্জী, ননী ভট্টাচার্য প্রমুখ এই জেলার বিশিষ্ট বিপ্লবীরা তাদেরই সৃষ্টি। অবশ্য নিরঞ্জন সেনগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। কারণ কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্য অনুশীলন নেতৃত্ব তাকে এই জেলায় সাংগঠনিক কাজে প্রেরণ করেছিলেন ১৯২৩ সালে। ১৯২৫ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে তার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১০] প্রকৃত বিপ্লবী পরিচয় গোপন করার তৎকালীন প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে তিনি জেলা কংগ্রেসের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং এক সময় তিনি ব্রজভূষণ গুপ্তের সভাপতিত্বে জেলা কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক ছিলেন। তার অনুগামী স্থানীয় বিপ্লবীগণও সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন যদিও গান্ধীবাদের প্রতি তাদের কোন ভক্তি ছিল না। তারা রুশ বিপ্লবী Leon Trotsky-র লেখা In Defence of Terrorism বইটি পড়ে প্রভাবিত হয়ে মনে করতেন "violence should be met with violence", বৈপ্লবিক কাজকর্ম ছাড়াও তারা নানা জনসেবামূলক কাজকর্মের মধ্যেও নিজেদের যুক্ত করেছিলেন।[১১]

মুর্শিদাবাদ জেলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে কাশিমবাজারের সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র "আন্নাকালী টোল", অথবা কাদাই এলাকার "দেশবন্ধু লাইব্রেরী" ও গোরাবাজারের "বিহারীলাল স্মৃতি সংঘ" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে যদিও এগুলি ছিল শিক্ষাকেন্দ্র বা গ্রন্থাগার বা ব্যায়ামচর্চা কেন্দ্র। কিন্তু তারই অন্তরালে চলত বিপ্লবী প্রস্তুতি।[১২] ফলত এই কেন্দ্রগুলি রাজরোষ বা পুলিশী হয়রানীর শিকার হয়েছিল। জেলার বিপ্লবীরা গোপনে নানা প্রস্তুতি নিতেন। "গোপীনাথ দিবস", "নলিনী বাগচী দিবস" প্রভৃতি পালন করতেন স্বাধীনতা (সাপ্তাহিক), বেনু (মাসিক) এবং দেশবন্ধু লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত একটি দেওয়াল পত্রিকা জেলার বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করত।[১৩]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই জেলার কোন কোন এলাকায় কিছু বিপ্লবী কর্মকাণ্ড হতে শুরু করে। সেগুলি বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ প্রভৃতি এলাকাতেই মূলত সীমাবদ্ধ ছিল। কালক্রমে ক্রমশ তা কান্দী ও বেলডাঙ্গার মত কোন কোন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক সচেতনতা আদৌ উল্লেখযোগ্য ছিল না। তবে ১৯২৫-৩৫ পর্যন্ত এই জেলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তার কারণ সম্ভবত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ও তাদের প্রবীণ নেতৃত্বের দুর্বলতা, Actionএর প্রতি অনীহা বা অকর্মণ্যতা প্রতিটি নবীন বিপ্লবীদের অধৈর্য করে তুলেছিল। ক্রমশ তারা তাদের প্রবীণ নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে নতুন কিছু ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। এই ভাবনা আরও চূড়ান্ত রূপ লাভ করে তখন, যখন ১৯২৮ সালে কলকাতার পার্কসার্কাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশন গান্ধীজীর নির্দেশে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে।[১৪] বিপ্লবীরা চূড়ান্ত Actionএর জন্য মরীয়া হয়ে উঠলেন। এই সময় রাজ্যের বিভিন্ন বিপ্লবী দলে, বিশেষ করে অনুশীলন দলে ব্যাপক ভাঙ্গন শুরু হয়। প্রবীণ নেতৃত্বের সঙ্গে নবীন কর্মীদের রণকৌশলগত কারণে তীব্র মতবিরোধ শুরু হল। মুর্শিদাবাদ জেলা সহ ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিং ও দক্ষিণ কলকাতায় অনুশীলন দলে এই ভাঙ্গন ব্যাপকভাবে ঘটেছিল এবং তারাই Revolt Group (A. R. G) গঠন করেন।[১৫] নিরঞ্জন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ জেলায় A. R. G. গঠিত হল। সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, শচীন করগুপ্ত ও প্রতুল ভট্টাচার্য ছিলেন Revolt Group-এর প্রধান। পরে যুগান্তরের নলিনী দাসও ঐ দলে যোগ দেন। তারাপদ গুপ্ত প্রমুখ জেলার অনেক বিপ্লবী এই দলে যোগ দেন। অপরদিকে ত্রিদিব চৌধুরী প্রমুখ বিপ্লবীগণ পুরাতন দলেই থেকে গেলেন। দল ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই দুই দলের বিরোধ তীব্ররূপ লাভ করে।[১৬] নবীন বিপ্লবীরা তাদের "দাদাদের" তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে থাকেন। জনৈক নবীন বিপ্লবীর ভাষায়, "work, work and die brother. I tell all my friends, it is better to die doing work. Party feeling and "Dadaism" are being followed every where in Bengal. Should we also follow it at the cost of ours? Shame, leave it.[১৭] প্রকৃতপক্ষে প্রবীণ নেতৃত্বের গরম মৌখিক আশ্বাস শহরের বেশকিছু শিক্ষিত যুবককে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের দিকে পুনরায় ধাবিত করেছিল। বাংলাদেশের প্রবীণ

অনুশীলন ও যুগান্তর "দাদাগণ" নবীন বিপ্লবীদের তখনই কোন ঘটনা বা Action না ঘটিয়ে শুধুই ধৈর্য ধরে প্রস্তুতির কথা বলে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে ফেলতেন। যুগান্তর দল সুভাষচন্দ্র বসুকে এবং অনুশীলন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে সমর্থন করতেন।[১৮] স্বাভাবিক কারণেই তা মুর্শিদাবাদ জেলা সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ বিপ্লবীদের মোহভঙ্গ ঘটিয়ে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। সম্ভবত বাংলার বিপ্লববাদের এটা একটা মস্তবড় ট্রাজেডি। এর প্রতিক্রিয়া পরবর্তীকালের রাজনীতিতে তীব্রভাবেই অনুভূত হয়।

এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীই ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বমুহূর্তে ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৯ কলকাতা পুলিশ তা বানচাল করে দেয়। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ঐ অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার দুজন বিশিষ্ট বিপ্লবী তারাপদ গুপ্ত ও নৃপেন মৈত্র সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের ২৭ জন বিপ্লবী ধরা পড়লেন এবং পুলিশ জেলার বহু এলাকায় তল্লাশী চালায়। কমিশনার চার্লস টেগার্ট সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে এক মামলা দায়ের করলেন যা মেছুয়াবাজার বা কলাবাগান বোমা ষড়যন্ত্র মামলা নামে সবিশেষ পরিচিত। আলিপুরের এক বিশেষ আদালতে বিপ্লবীদের বিচার করা হয়েছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পূর্বে এটাই ছিল বিপ্লবী বাংলার সশস্ত্র জাগরণের প্রথম প্রয়াস—যদিও তা শুরুতেই ব্যর্থ হয়েছিল। "বাংলার তরুণদের প্রতি" নামক অগ্নিময়ী প্রচারপত্র তরুণ বিপ্লবীদের এই প্রস্তাবিত অভ্যুত্থানে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[১৯] জনৈক বিপ্লবীর ভাষায়, "যদি প্রয়োজনে স্বৈরাচারী ও রক্তপিপাসু ইংরাজদের বিরুদ্ধে এককভাবে লড়াই করিয়া মৃত্যুবরণ করিতে হয়, তবুও তাহা গর্বের।"[২০]

কিন্তু তাদের এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় ত্যাগ, দেশপ্রেম ও আত্মবলিদানের অনন্য নিদর্শন থাকলেও তাদের কর্মসূচীর পিছনে কোন ব্যাপক গণভিত্তি ছিল না, অথবা তাদের কোন আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীও ছিল না এবং ১৯২৮ সালে দিল্লীর ফিরোজ শাহ্ কোটলার এক নিভৃত কোণে ভগৎ সিং, যতীন্দ্রনাথ সান্যাল, ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ও অজয় ঘোষের নেতৃত্বে, গঠিত হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির (H. S. R. A) চিন্তাধারার সঙ্গে তৎকালীন বাংলার বিপ্লবীদের এটিই ছিল পার্থক্য। অবশ্য ফিরোজ শাহ্ কোটলার ঐ চিন্তাধারা বাংলার মাটিকে স্পর্শ করেছিল আরও কয়েক বছর পর, যখন ১৯৩৫-৩৬ সালে আন্দামান ও অন্যান্য জেল থেকে বিশিষ্ট বিপ্লবীরা নিজ রাজ্যে ছাড়া পেয়ে ফিরে এলেন।[২১] মহান অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় তাদের

চিন্তাধারাকে জেলখানাতেই আলোকিত করে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। জাতীয় বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ এই-ভাবেই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদে এবং ক্রমশ তা সাম্যবাদী গণআন্দোলনের পথে পা বাড়াতে শুরু করে।[২২] এর ফলেই ১৯৩৬ পরবর্তী যুগে সশস্ত্র বিপ্লবীরা কারামুক্তির অব্যবহিত পরেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষিত হয়ে এই রাজ্যে তিনটি সাম্যবাদী দল গড়লেন। একটি দল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পতাকাতলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হলেন ; অপর একটি দল ত্রিদিব চৌধুরীর নেতৃত্বে মার্কসবাদী অনুশীলন দলে (R. S. P.) পরিণত হলেন ; এবং তৃতীয় দলটি সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট লীগ (R. C. P. I.) গঠন করল। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হল। প্রাক্তন অনুশীলন নেতা অনন্ত ভট্টাচার্য আন্দামান থেকে ফিরে ১৯৩৮ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় C. P. I. দল গঠন করলেন। ত্রিদিব চৌধুরী, ননী ভট্টাচার্য প্রমুখ মার্কসবাদী অনুশীলন দলে যোগ দিলেন এবং তারাপদ গুপ্ত প্রমুখ কমিউনিস্ট লীগ গঠন করলেন এই জেলায়।[২৩]

মুর্শিদাবাদ জেলায় বৈপ্লবিক কাজকর্ম ১৯২৮ পরবর্তী যুগে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৮ সালে তৎকালীন D. P. I. মিঃ স্টেপলটনকে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রবৃন্দ বয়কট করেন এবং তার হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। "Stapelton Go Back" আওয়াজ সারা শহরের বাতাসেই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।[২৪] কারণ ইংরাজ সরকারের নির্মম অত্যাচার। বহরমপুর গ্রান্ট হলে প্রখ্যাত বিপ্লবী নেত্রী লতিকা বসুর নেতৃত্বে এক জনসভা বা প্রতিবাদ সভা সংঘটিত হয়। কিছুদিনের মধ্যে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বহরমপুরেই অপর এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[২৫] প্রধান অতিথির ভাষণে বিপ্লবী প্রতুল গাঙ্গুলী বলেন, "স্বাধীনতার এই লড়াই কেবলমাত্র বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য।" তিনি যুবকদের সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।"[২৬] ১৯৩১ সালে বহরমপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল "ইউথ লীগ", ইংরাজ পুলিশের ভাষায় যা নাকি "মারাত্মক"। এইরূপ পটভূমিতেই হিজলী জেলে পুলিশ রাজবন্দীদের উপর গুলি চালালে শহীদ হলেন সন্তোষ মিত্র এবং গুরুতর আহত হলেন জেলার দুই বিশিষ্ট বিপ্লবী তারাপদ গুপ্ত ও সনৎশেখর রায়চৌধুরী।[২৭] এই সমস্ত ঘটনা জেলার সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করেছিল এবং পুলিশী

অত্যাচার, তৎপরতা ও গ্রেপ্তার বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি জড়িয়ে পড়তে থাকে এই বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে। Bengal Criminal Law amendment Act-1930 এবং Regulation III ধারা বলে গ্রেপ্তার হন এই জেলার কিছু ছাত্র বিপ্লবী। Presidency Division Commissionerএর গোপন Report-এ জানা যায় যে ১৯৩০-৩২ সালের মধ্যে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলের ২ জন, কৃষ্ণনাথ কলেজের ৯ জন, বহরমপুর গভঃ উইভিং কলেজের ৪ জন এবং জিয়াগঞ্জ এডোয়ার্ড করোনেশন হাইস্কুলের ৩ জন ছাত্র এই আইনবলে গ্রেপ্তার হন। সরকার ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কালো তালিকাভুক্ত করতে উদ্যত হন। কিন্তু মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক জেলার অন্যান্য পদস্থকর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করে রাজ্য সরকারকে ঐরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ তা সমগ্র পরিস্থিতিকে জটিল বা ঘোরালো করে তুলতে পারত।[২৮] এইরূপ এক পটভূমিতে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে বহরমপুর শহরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। কিন্তু তা জেলা তথা রাজ্যের মানুষকে হতাশ করেছিল। সমকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার রিপোর্ট পাওয়া যায়।[২৯]
১৯৩০ সালে কান্দী শহরে S. D. O-র বাংলোতে বোমা পড়ল, কেও হতাহত হন নি। গ্রেপ্তার হলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী নিখিল গুহরায়, মধুসূদন সেনগুপ্ত এবং শিবু দাঁ। বিচারে তাঁদের সাজা হল। নিখিল গুহরায়কে সে সময় অন্য একটি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সূত্রে এই জেলার ভরতপুরে অন্তরীণ রাখা হয়। কান্দীর বোমার ঘটনার "মস্তিষ্ক" হিসাবে চিহ্নিত করে তাকে পুনরায় আন্দামানে পাঠান হয়।[৩০] স্বাধীনতাপূর্ব যুগে মুর্শিদাবাদ জেলার বিপ্লবী আন্দোলনের সেই দিনগুলিতে বোমা নিক্ষেপের ঘটনা এই প্রথম। সেই যুগের অপর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বহরমপুরের কুখ্যাত গোয়েন্দা অফিসার আশুতোষ ব্যানার্জীকে জেলা শাসকের বাংলোর পিছন দিকে হত্যা। মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনে এটাই হল একমাত্র হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। কে অথবা কোন বিপ্লবী গোষ্ঠী এই কাজটি করেছিল তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব না হলেও অনেকে অনুমান করেন যে ঐ হত্যাকাণ্ডের নায়ক হলেন বিপ্লবী যতীন দাস।[৩১] সংক্ষিপ্তভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এগুলিই হল উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সামগ্রিকভাবে এই জেলার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই জেলা তুলনামূলকভাবে ছিল অনেক শান্ত। গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রিপোর্টেও তার সমর্থন মেলে। ১৯৩৫

সালে প্রেরিত মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের এক গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছে "এই জেলায় খুব কমই রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার অত্যন্ত তৎপর এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমন করার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সর্বদা সতর্ক থাকার জন্য প্রাদেশিক সরকার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ত্রুটি এবং ক্ষতিকারক দিকগুলি জনসাধারণের মধ্যে তুলে ধরছেন। সরকারী কর্মচারীগণকে এব্যাপারে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নিয়োগ করা হয়েছে। তারা জনসভায় বক্তৃতা ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনসাধারণকে বোঝাচ্ছেন। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরও একাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্থানীয় ভাষায় তাদের বক্তৃতা ও সিনেমা প্রদর্শনী খুবই ফলপ্রসু হচ্ছে এ ব্যাপারে।[৩২]

কিন্তু জেলার সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনে কেন এই দুর্বলতা? কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে:

প্রথমত, যুগান্তর অনুশীলন প্রভৃতি বিপ্লবী দলগুলি মুর্শিদাবাদ জেলাকে তাদের নিরাপদ আশ্রয় (Shelter) হিসাবে বেছে নিয়ে এই জেলায় কোনরকম Action করার ঝুঁকি নিতে চান নি। নতুবা পুলিশ বা গোয়েন্দা তৎপরতা তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে বিঘ্ন ঘটাতো। অপরদিকে ইংরাজ গোয়েন্দারা রাজা-মহারাজা ও নবাবঅধ্যুষিত এই জেলাকে রাজনৈতিক দিক থেকে কোন গুরুত্বই দেন নি। তার প্রমাণ ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সংঘটিত মেছুয়াবাজার ষড়যন্ত্রের পূর্বপর্যন্ত এই জেলার গোয়েন্দাদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন একজন মাত্র I. B. Inspector.[৩৩]

দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত যদিও কয়েক বছর (১৯২৩-২৮) এই জেলার বিপ্লবী আন্দোলনের সফল নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন বহিরাগত। মুর্শিদাবাদ জেলায় নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, ত্রৈলক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, সতীশ পাকড়াশী বা সূর্য সেনের মত বিপ্লবী সংগঠকের জন্ম হয় নি কোনদিন।

তৃতীয়ত, না সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, না গান্ধীবাদী বিপ্লবী আন্দোলন, না সাম্যবাদী আন্দোলন, কোন আন্দোলনই এ জেলায় ব্যাপকতা লাভ করে নি বা তীব্র হয়ে ওঠে নি। শিক্ষার নিম্নহার ও রাজনৈতিক সচেতনার অভাবহেতু এই জেলার রাজনৈতিক ভীৎ খুবই দুর্বল। জেলার রাজনীতির নেতৃত্ব মুখ্যত দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের হাতেই কুক্ষিগত ছিল। সে-কারণে ১৯০৫, ১৯২০, ১৯৩০, ১৯৩২ বা ১৯৪২ সালের আন্দোলনও এখানে কখনই তীব্র রূপ পরিগ্রহ করে নি। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত, বিপিন গাঙ্গুলী, সতীশ সামন্ত, হেমন্ত সরকারের মত কংগ্রেসী নেতাও এ জেলায় জন্মান নি—

জন্মান নি হাজী দানেশের মত কমিউনিস্ট ও কৃষকনেতা। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী আন্দোলন সেকারণে এই জেলায় কখনই ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হতে পারে নি। ফলত ৪০এর বা ৫০এর দশক পর্যন্ত সাম্যবাদী আন্দোলনও মুর্শিদাবাদ জেলায় দানা বাঁধতে পারে নি। কৃষক সংগঠনগুলি মূলত মধ্যচাষী-অধ্যুষিত। সেকারণে ঐতিহাসিক তেভাগার লড়াই এখানে হয় নি বললেই চলে—যদিও উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। এমনকি এই জেলার মানুষের সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মানসিকতা বা ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন বা বৈপ্লবিক আন্দোলনকে শক্তিশালী ভীতের উপর দাঁড় করানো এখানে অনেক সহজ ছিল—সে সুযোগ অন্য অনেক জেলার ছিল না। এটাই মুর্শিদাবাদ জেলার বিপ্লবী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।

সূত্রনির্দেশ

১ Misra B. B, ; The Indian Politicai Parties, New Delhi, 1976, p 473

২ ঐ এবং প্রফুল্ল গুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, ১৯৭৫ এবং সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, অগ্নিযুগের কথা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৭৬

৩ Misra B. B, পূর্বোক্ত গ্রন্থ

৪ ত্রিদিব চৌধুরী, মুর্শিদাবাদে সশস্ত্র আন্দোলনের রূপরেখা, প্রবন্ধ, বালার্ক (শারদ সংকলন), বেলডাঙ্গা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ এবং তারানাথ রায়, বিপ্লবী আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ, প্রবন্ধ, মুর্শিদাবাদ সমাচার (শারদীয়া সংখ্যা), বহরমপুর, ১৯৫১

৫ ত্রিদিব চৌধুরী, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ এবং প্রফুল্ল গুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ

৬ ঐ

৭ ঐ এবং কৃষ্ণনাথ কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৯৫৪

৮ প্রফুল্ল গুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ এবং সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন প্রদত্ত তথ্যাবলী

৯ ত্রিদিব চৌধুরী, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

১০ ঐ এবং কৃষ্ণনাথ কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ

১১ জেলার বিশিষ্ট বিপ্লবী তারাপদ গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি গবেষণা গ্রন্থ, ডঃ বিষাণকুমার গুপ্ত

১২ ঐ

১৩ প্রফুল্ল গুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৫

১৪ ঐ, অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি, গবেষণা গ্রন্থ এবং সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, অগ্নিযুগের কথা

১৫ ঐ এবং পূর্ণেন্দু দে সরকার, বাংলার বিপ্লব সাধনা' কলকাতা, ১৯৭৭
১৬ ঐ
১৭ Home Political File No. 79/1930, Govt. of Bengal, West Bengal State Archives, Calcutta
১৮ সুমিত সরকার, Modern India, 1885-1947, New Delhi, 1984, p 267
১৯ Home Political File No. 79/1930, Govt. of Bengal, West Bengal State Archives, Vide, Prosecution and Trial by special Tribunal of Niranjan Sen Gupta and 26 others, Kalabagan Bomb case
২০ সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৬৭-৬৮
২১ ঐ
২২ Adhikary Gangadhar, Development of Ideology of the National Revolutionaries, article published in Challenge edited by Kalpana Joshi, New Delhi, 1984, p 8
২৩ কমিউনিস্ট আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ, প্রথম খণ্ড, সনৎ রাহা, বহরমপুর, ১৯৮০ এবং Bhattacharyya Buddadev, Origin of R. S. P, Calcutta, 1982 এবং বিপ্লবী তারাপদ গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার
২৪ প্রফুল্ল গুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ
২৫ ঐ
২৬ Report of the Native News papers and Periodicals, 1930-31, West Bengal State Archives, Calcutta
২৭ প্রফুল্ল গুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ
২৮ Home Political File No. 562/1932, Serial No. 10, Govt. of Bengal, West Bengal State Archives, Calcutta
২৯ রাজ্য মহাফেজখানায় রক্ষিত R. N. P. Volumes এবং গণকণ্ঠ (মুর্শিদাবাদ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৯) পত্রিকায় প্রকাশিত ও ডঃ বিষাণ-কুমার গুপ্ত লিখিত প্রবন্ধ, পৃ ঈ ৫-১১
৩০ প্রফুল্ল গুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ এবং বিজয়কুমার গুপ্ত, প্রবন্ধ, একটি বিস্মৃত অধ্যায়, শারদীয়া কান্দী বান্ধব, ১৯৭৭
৩১ অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি. গবেষণা গ্রন্থ, ড: বিষাণকুমার গুপ্ত এবং শশাঙ্কশেখর সান্যাল, প্রবন্ধ সংকলন, কলকাতা, ১৯৭৮ ও প্রফুল্ল গুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ
৩২ Home Political File No. 147|35, Govt. of Bengal, West Bengal State Archives, Calcutta
৩৩ ত্রিদিব চৌধুরী, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু

কুন্তল মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কোন একটি বিশেষ আন্দোলন ও বিশেষ কতিপয় ধরনের আন্দোলনের ফসল নয়। ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বেশ কয়েকটি ধারা-উপধারা রয়েছে। এর প্রত্যেকটিই কোন-না-কোনভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূলস্রোতকে পুষ্টি জুগিয়েছে এবং শেষ অবধি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছে।

চিন্মোহন সেহানবীশ ১৯৮৬ সালে সূর্য সেন স্মারক বক্তৃতায় ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনকে নয়টি ধারায় চিহ্নিত করেছেন।[১] এগুলি হল ঃ

১ আদিবাসী অভ্যুত্থান

২ ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে অনেক সময়ে রাজ্য, জমিদারী বা বিষয়সম্পত্তিচ্যুত রাজা-মহারাজা-নবাব-জায়গীরদার-জমিদার অথবা "স্বর্গরাজ্য" প্রতিষ্ঠার অবশ্যম্ভাবিতায় বিশ্বাসী ধর্মগুরুর নেতৃত্বে বেকার সৈন্য, লাঠিয়াল, পাইক এবং গ্রামের কৃষক ও দরিদ্র জনসাধারণের বিদ্রোহ

৩ ওয়াহাবি, ফারাজি আন্দোলন

৪ ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর নবজাগরণ

৫ সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ বা বিদ্রোহের চেষ্টা

৬ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন

৭ সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন

৮ দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলন

৯ সংগঠিত শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব ও নারী আন্দোলন।

আমাদের আলোচনার বিষয় এই সপ্তম ধারা অর্থাৎ সমস্ত জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে জাতীয় বিপ্লবীদের এক সময়ে এদেশে terrorist বা সন্ত্রাসবাদী এবং anarchist বা নৈরাজ্যবাদী বলা হত ; অসম সাহসিকতা বা চূড়ান্ত আত্মদানের মাপকাঠিতে কিন্তু ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তাদের স্থান কারো চাইতে নীচে নয়। কিছু সামন্ততান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা নিয়েও তাঁরা "জাতীয় বিপ্লবী" কারণ পরাধীন ভারতে আমাদের সর্বপ্রধান প্রতিপক্ষ যেহেতু ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই বাস্তবক্ষেত্রে সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে তাঁদের মরণপন সংগ্রাম নিশ্চয়ই ভারতের জাতীয় বিপ্লব প্রক্রিয়াকেই ত্বরান্বিত করেছিল। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু এই সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম কয়েকজন শহীদদের অন্যতম।

সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবীরা ছিলেন প্রায় সকলেই কমবেশী ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাঁরা নিজেদের মধ্যে গুপ্ত সমিতি গঠন করে, রিভলবার, পিস্তল, বোমা নিয়ে লড়াই শুরু করেছিলেন ইংরেজ রাজপুরুষ ও তাদের তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন বলেই এঁদের কিছুটা সর্বভারতীয় চেতনা ছিল, এমনকি কাম্য স্বাধীনতার রূপও কিছুটা পরিষ্কার ছিল তাঁদের মনে। অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করায় শ্রেয়। ক্ষুদিরাম বসুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পেছনেও ছিল এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীচেতনা ও কিছুটা আবেগময়তা। সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের যে ধারা বাংলাদেশে বহমান ছিল—নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সেই ধারাই সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনাকে উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে সচেষ্ট ছিল এবং সাধারণ মানুষকে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করানোর ব্যাপারে বিশেষ অবদান রেখেছিল। তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর সশস্ত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং তাঁর কর্মকাণ্ড পরবর্তীদের কাছে এই আন্দোলনে যোগদানের ইচ্ছাকে আরও বেশী ত্বরান্বিত করেছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাল্যকালে পিতামাতার মৃত্যু এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কাছে আশানুরূপ ভালো ব্যবহার না পাওয়ার কারণে ক্ষুদিরামের আচরণে গৃহমুখীণতা একেবারে ছিল না বললেই চলে। গৃহ আসক্তির বোধ না থাকার ফলে বাল্যকাল থেকেই ক্ষুদিরাম ছিলেন তাঁর সমবয়সী বালক-বালিকার তুলনায় একটু বেশী ডানপিটে ও এ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়। অন্যরা যে কাজে ভীত, বা যা আপাতদৃষ্টিতে নিষিদ্ধ, গোপন এবং সাহসিকতাপূর্ণ সেই কাজের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাল্যকাল থেকেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ক্ষুদিরামের প্রত্যক্ষ-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের শুরু ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে।

১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুরে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল, এই সময় ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ ও গালাগালিপূর্ণ "সোনার বাংলা" নামে একটি "প্যাম্পলেট" প্রকাশিত হয়েছিল। তার ইংরেজী অনুবাদ "পাইওনিয়ার" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত প্রদর্শনীর প্রবেশ দ্বারের কাছে ক্ষুদিরাম নির্বিচারে সকলকে ঐ প্যাম্পলেটগুলি বিলি করছিলেন। এই সময় তিনি একজন হেড কনেস্টবল কর্তৃক ধৃত হন এবং কর্তব্যরত পুলিশকে মুষ্ট্যাঘাত করে পালিয়ে যান। ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা রুজু করা হল। বাংলাদেশে বিপ্লববাদীদের বিরুদ্ধে বোধহয়, এই প্রথম রাজদ্রোহের অভিযোগ।[২] ফেরারী অবস্থায় কিছুকাল থাকবার পর ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরে এসে ধরা দিলেন। মোকদ্দমা দায়রায় গেল। তবে কোন এক অজ্ঞাত কারণে সরকার ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলে নিয়েছিল। এখানে জেনে রাখা ভালো যে পুলিশের হাতে ধরা দেবার আগে ক্ষুদিরামকে দণ্ডবিধির ১২১, ১২৪ প্রভৃতি ধারা পড়ে শোনানো হয়েছিল। তবে পুলিশী দণ্ডের অতিরঞ্জিত বর্ণনাতেও তিনি ভয় পান নি এবং পুলিশী অত্যাচারের মুখে কিছু স্বীকার করেন নি। সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবীদের অসীম সাহসিকতা ও ধৈর্যশীলতার পরিচায়ক ছিল ক্ষুদিরামের এই কাজ।

হেমচন্দ্র কানুনগোর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারছি একদিন মেদিনীপুর শহরে হেমচন্দ্র কানুনগোর সাইকেল থামিয়ে ক্ষুদিরাম তাঁর কাছ থেকে বন্দুক প্রার্থনা করেছিলেন সাহেব মারার জন্য। সাহেব মারার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উত্তেজিত হয়ে ক্ষুদিরাম হেমচন্দ্র কানুনগোকে বলেছিলেন যে ভারতের উপর ইংরেজ যে অন্যায় অত্যাচার করেছে তার প্রতিশোধ নিতে তিনি বদ্ধপরিকর। কোন সন্দেহ নেই ক্ষুদিরামের অন্তরে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের বীজ বপন করেছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু সত্যেন। কিন্তু যে কারণে ক্ষুদিরাম অনন্য তা হল—নিজের বা অন্যের প্রতি আচরিত কারো অন্যায় তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের শরিকেরা মনে করতেন যে ব্যক্তি সমাজ, ঘরের বা বাইরের কোনপ্রকার অন্যায় অত্যাচারে বিচলিত না হয়, সে সমাজে, মৃত; যে সমাজনীতির প্রবর্তক বা নেতা এরূপ অবস্থার বিপরীত বিধান দেয়, সে অবতার হলেও হতে পারে, কিন্তু সে জনসাধারণের শত্রু। অন্যের উপর আচরিত অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকারকল্পে অন্যায়কারীকে দণ্ড দেবার চেষ্টা যে মানুষ করে না, সে মানুষ নয়—তার মানে সে মনুষ্যত্বহীন।[৮] ক্ষুদিরামের কাজকর্মে এই আদর্শের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই কারণে শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে আত্মীয়ের সংসারে আশ্রয় পাবার পর, আশ্রয়-

দাতাদের অন্যায় অত্যাচার, যা বেশীর ভাগ ভারতীয় মুখবুজে কৃতজ্ঞচিত্তে সহ্য করে, তিনি সহ্য করেন নি, ফলে তাঁর স্বাভাবিক বিদ্রোহী চরিত্রকে দুরন্তপনা, অশিষ্টতা, অবাধ্যতা, ধৃষ্টতা বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হলেও পরবর্তী ইতিহাস তাঁর বিপ্লবীসত্তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে।

অন্যায়কারীকে যত অধিক ঘৃণা করা যায় স্বাভাবিকভাবেই উৎপীড়িতের প্রতিও তেমনি অধিক সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠতে হয়। ক্ষুদিরামেরও তাই হয়েছিল। যে ভগ্নিপতির বাড়িতে তিনি আশ্রিত ছিলেন, তার পাশের বাড়ীতে একজন রমণী, যিনি প্রথম বয়সে নেহাৎ উৎপীড়নের জন্য খারাপ হতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ার জন্য ক্ষুদিরামকে লোকনিন্দার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমাজের এবং তাঁর পারিপার্শ্বিকের নৃশংস ব্যবহার আশৈশব তার মনকে এমন বিদ্রোহী করে তুলেছিল যে সমাজের লোকাচার বা লোকমতের বিরুদ্ধাচারণ করাটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হত। ফলে সেই উৎপীড়িতার প্রতি ক্ষুদিরাম হয়ে উঠেছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন। পারিপার্শ্বিক লোকনিন্দা বা স্তুতির দ্বারা চালিত হয়ে মন্দ কাজে বিরতি ও ভাল কাজে প্রবৃত্তির ভাবটা, ক্ষুদিরামের মধ্যে যতটা ছিল, তার চেয়ে ঢের বেশী ছিল মন্দ কাজকরণজনিত আত্মগ্লানির ভয় ও ভাল কাজ করে আত্মপ্রসাদ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। তাই যে অবস্থায় পড়ে বেশীর ভাগ ভারতীয় বালক বা কিশোর হীন চরিত্র পায়, তিনি তা না পেয়ে এক অননুকরণীয় ও বরণীয় প্রকৃতি পেয়েছিলেন।

তবে tenacity or purpose'র সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে একটা অতি বিপ্লবীয়ানার ঝোঁকও লক্ষ্য করা গেছে। সমস্ত বিপ্লবী দলের "ক্যাসাবিয়াঙ্কা" ক্ষুদিরাম কাজের সময় অনেক নির্দেশই পালন করেন নি। কথা ছিল, বোমা ফেলতে যাবার সময় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল অন্য প্রদেশবাসীর অনুকরণে বদল করে পরে বোমা ফেলা হয়ে গেলে সাধারণ বাঙালীর পোশাক পরবেন। কিন্তু তারা উপদেশ মতন কাজ করেন নি। বোমা ফাটলে রিভলবার ফেলে দেবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা তাও দেন নি। দুটো রিভলবার পাতলা জামার দু পকেটে ঝুলছে, আর দু হাতে খাবার খাচ্ছেন, এরকম অবস্থায় বোমা ফাটার পরদিন রেলষ্টেশনে তিনি ধরা পড়েন। ক্ষুদিরামের সমসাময়িক অথচ তাঁর থেকে বয়স্ক সশস্ত্র বিপ্লবীরা মনে করতেন যে উপদেশ মত চলা গুপ্ত সমিতির প্রধান কর্তব্য জেনেও তার আবশ্যকতা ক্ষুদিরাম উপলব্ধি করতে পারেন নি। অনেকের মতে যে "Suggestion Phobia" বাঙালী চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব সেই দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি ক্ষুদিরামকেও আক্রমণ

করেছিল। ফলে গুপ্ত সমিতির উপদেশের আবশ্যকতা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি।

এমনকি ধরা পড়ার পরেও ক্ষুদিরাম প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একরকম স্বীকারোক্তি দিয়ে সেসন কোর্টে না-কি তা সংশোধন করে অন্যরকম বিবৃতি দিয়েছিলেন। উকিলবাবুদের অনুরোধে নাকি জনগণের কাছে নিজেদের বীরত্ব প্রকাশের লোভে ক্ষুদিরাম এই দু-ধরনের বিবৃতি দিয়েছিলেন—তা নিয়েও বিপ্লবীদের মধ্যে বিতর্ক ছিল। ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল কুখ্যাত মিঃ কিংসফোর্ডের পরিবর্তে মিসেস ও মিস কেনেডিকে হত্যা করে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের যে অসতর্কতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার দিকটি উন্মোচিত করেছিলেন তারই ফল অনুযায়ী অরবিন্দ ঘোষ সমেত পূর্ব কলকাতায় ব্যস্তসমস্ত বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার হতে হয়। তবে এই ব্যাপারে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লর স্বতঃস্ফূর্ততা ও অতি উৎসাহ যেমন দায়ী, তেমনি বারীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি নেতাদের "Carelessness" সমপরিমাণে দায়ী।[৩]

ক্ষুদিরামের কাজকর্মের ধারা অনুধাবন করতে গেলে সেই সময়ের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণদের মানসিকতার সম্যক উপলব্ধি প্রয়োজন। ১৯০৫এর বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৭ সালের সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসের দ্বিধাবিভক্ত হওয়া এবং শিক্ষিত বেকার যুবকদের অসন্তোষ, ১৯০৫এর সরকারী কার্লাইল সার্কুলার কর্তৃক ছাত্র আন্দোলনকে স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা, ব্রিটিশ সরকার দ্বারা শিক্ষা সংকোচনের প্রচেষ্টা প্রভৃতির সম্মিলিত রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাবের ফসল তদানীন্তন সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ও ক্ষুদিরামের কর্মকাণ্ড। সন্ত্রাসবাদী সশস্ত্র বিপ্লবীরা ছিলেন মূলত মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত।[৪] কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত হলেও তাদের লক্ষ্য চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে সুবিধা অর্জনের প্রতি নিবদ্ধ ছিল না। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু সেই লক্ষ্য যেহেতু মামুলি গঠনতান্ত্রিক রাজনীতির দ্বারা অর্জন করা সম্ভব ছিল না, সেজন্য তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথই নির্বাচন করেছিলেন। তবে তাঁদের উদ্দেশ্য যাই থাক, যে ধরনের সশস্ত্র সংগ্রাম এই বিপ্লবীরা সংগঠিত করেছিলেন, তার সঙ্গে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক ও তাঁদের সংগ্রামের কোন যোগ ছিল না। তাঁরা এই শ্রমজীবীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই ব্যক্তিহত্যা, লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর বোমা-বন্দুক ইত্যাদির সাহায্যে খণ্ড আক্রমণ ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের স্বাধীনতার ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।[৫]

তবে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ক্ষুদিরাম তাঁর সততা, একনিষ্ঠতা,

আত্মত্যাগ, ধর্মনিরপেক্ষতা বা Opposition to Religionsityর সূত্রে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতার কারণে ভারতের জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করে রয়েছেন। ক্ষুদিরামের শহীদপনা (Martyrdom) ও মহামানবতাটুকু বাদ দিয়েও লক্ষ্য করা যায় যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনুভূতিসম্পন্ন। অসহ্য দুঃখকষ্ট, বিপদ-আপদ, এমনকি মৃত্যুকে বরণ করে, প্রতিকার অসম্ভব জেনেও শুধু সেই অনুভূতির জ্বালা নিবারণের জন্য নিজহাতে অন্যায়ের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রতিবিধানের চেষ্টা করবার ঐকান্তিক প্রবৃত্তি ও সৎসাহস ক্ষুদিরাম-চরিত্রকে এক অনন্য রূপ দিয়েছে।

শুধু তাই নয় ক্ষুদিরামের ফাঁসী হবার পর তাকে কেন্দ্র করে সাধারণ বাঙালী জনগণের মননে ও কর্মকাণ্ডে যে ভাবাবেগের তন্ময়তা ও সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তা সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনকে "জনমুখী আন্দোলনে" পর্যবসিত করেছিল। এই সময়েই ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রকৃতিও "Elite action" থেকে "Mass action"এ রূপান্তরিত হয়েছিল।[৬]

সূত্রনির্দেশ

১ চিন্মোহন সেহানবীশ, আমাদের মুক্তি আন্দোলনের নয় ধারা, (সূর্য সেন স্মারক বক্তৃতা), ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ এডুকেশন প্রজেক্ট আমেদনগর, বর্ধমান, পৃ ৫-৬

২ হেমচন্দ্র কানুনগো, বাংলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, পৃ ৭১

৩ সুমিত সরকার, মডার্ণ ইণ্ডিয়া, ১৮৮৫-১৯৪৭, ম্যাক্‌মিলান, পৃ ১২৩

৪ বি. বি. মিশ্র, ইণ্ডিয়ান মিডল্ ক্লাস, অক্সফোর্ড, পৃ ৩৯৫

৫ বদরুদ্দিন উমর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, পৃ ৭৫

৬ সুমিত সরকার, দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইনবেঙ্গল, ১৯০৩-১৯০৮, পিপলস পাবলিশিং হাউস, পৃ ৮২

সরকারী নথিপত্রের দর্পণে বেথুন স্কুল ও কলেজ (১৯০৮-১৯১৪)

শীলা বসু

কলকাতার ৩০০ বছর উদযাপিত হচ্ছে। হচ্ছে নানা আলোচনা, নেওয়া হচ্ছে নতুন প্রকল্প। কিন্তু পুরনোকে বাদ দিয়ে নতুন প্রকল্প কখনই সর্বাঙ্গ-সুন্দর হতে পারে না। তাই পুরনো কলকাতার বনেদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আলোচনা করতে গেলে তার গুণের সঙ্গে দোষত্রুটিগুলিরও আলোচনা প্রয়োজন।

আমরা জানি যে বর্তমান শতকের প্রথমভাগে বাংলার নারীশিক্ষার ইতিহাস খুব উজ্জ্বল নয়। কিছু কিছু নারী উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন সত্যি তবে তাঁদের সংখ্যা ছিল খুব সীমিত। তাঁরা থাকতেন মূলত কলকাতায় ও ঢাকায়। তখনও উচ্চশিক্ষার প্রসার তেমন না হওয়ায় পূর্ববঙ্গ থেকে ছাত্রীরা আসতেন প্রধানত বেথুন কলেজে শিক্ষা নিতে। এই বেথুন কলেজই ছিল নারীশিক্ষার মূল কেন্দ্র। বাংলার নারীশিক্ষার ইতিহাসে বেথুন স্কুল ও কলেজের গুরুত্ব অপরিসীম। তবু এটা স্বীকার করতে হবে যে এই দীর্ঘ ইতিহাসে কলেজকে বহুবার বহু সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সরকারী দায়িত্বের অভাব তো ছিলই তাছাড়া নারীশিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে কতরকম বাধাবিপত্তি ছিল তার বৈচিত্র্য দেখানোর জন্যে নারীশিক্ষার অন্তঃপুরের খবর কম আকর্ষণীয় নয়।

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের চিরাচরিত ধারণা মেয়েদের পিতামাতাদের কুসংস্কারই একমাত্র বাধা। মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে তাঁদের তত আগ্রহ ছিল না যতটা ছিল ছেলেদের বেলায়। তাছাড়া সরকারের বিমাতাসুলভ মনোভাব তো ছিলই। তাই বেথুন কলেজও কলেজিয়েট স্কুলের, একমাত্র সরকারী কলেজ ও স্কুল হওয়া সত্ত্বেও, বিশেষ উন্নতি হয় নি। নানা

গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিকূলতার মধ্যে ১৯০৮-০৯ সাল থেকেই বেথুন কলেজে ছাত্রীসংখ্যা কমতে আরম্ভ করেছিল।[১]

১৯০৮-১৯০৯ সালে কলেজ ও স্কুল হত একই বাড়িতে। কলেজের সমস্ত ক্লাশ হত একটিমাত্র বড় ঘরে। স্কুলেও ছিল সমান স্থানাভাব। এই স্থানাভাব ১৯১৩-১৪ সালেও একই রকম ছিল। এই স্থানাভাবের কথা ১৯০৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম কলেজ পরিদর্শন রিপোর্টেই জানিয়েছিল। একমাত্র সরকারী মহিলা কলেজ হিসেবে এই কলেজ আরও সরকারী সুবিবেচনার দাবী করেছিল। রিপোর্ট অন পাবলিক ইন্সট্রাকশন ১৯০৮-০৯ সালে লিখেছিল : ...as a Government College and the only Arts College in Bengal for women, the Bethune College is entitled to equal consideration with any other Arts College.[২] সরকারী রিপোর্টে আরোও জানা যায় যে নতুন গঠিত পরিচালক সমিতি কলেজের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ নেন নি এবং এটাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে লেখাপড়ার ব্যাপারেও বেথুন স্কুল ও কলেজ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। নীচের সারণী ১ প্রমাণ করে যে শুধু যে পরীক্ষার ফল খারাপ হয়েছিল তা নয় ছাত্রীসংখ্যাও কমতে আরম্ভ করেছিল।

সারণী ১

	১৯০৯			
	বেথুন স্কুল		বেথুন কলেজ	
পরীক্ষা	পরীক্ষার্থিনীদের সংখ্যা	পাশ ছাত্রী সংখ্যা	পরীক্ষার্থিনীদের সংখ্যা	পাশ ছাত্রী সংখ্যা
এনট্রান্স	৮	১	—	—
আই. এ.	—	—	২	১
বি. এ.	—	—	৩	১
	১৯০৭-০৮			
বি. এ.	—	—	৮	৪[৩]

বেথুন কলেজে তখন বাংলা, ইংরাজি, ইতিহাস ও দর্শন পড়ান হত। বিজ্ঞান বিভাগে শুধুমাত্র উদ্ভিদবিদ্যা পড়ান হত। এই বিভাগে উন্নততর শিক্ষা-

ব্যবস্থার ভার সরকার নিয়েছিলেন, কিন্তু ১৯১৯-২০ সালের সরকারী রিপোর্টেও দেখা যায় অবস্থা একই রকম ছিল।

নীচের সারণী ২ থেকে জানা যায় যে ১৯১৩-১৪ সালেও বেথুন কলেজ পড়াশোনায় সন্তোষজনক উন্নতি করতে পারে নি। সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ ডায়োসেসন ও বেসরকারী কলেজ লরেটো হাউস বেথুন কলেজের তুলনায় অনেক এগিয়েছিল।

সারণী ২

আই. এ. ১৯১৩-১৪

কলেজ	ছাত্রীসংখ্যা	পাশকরা ছাত্রী সংখ্যা				
		১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	মোট পাশ করা ছাত্রী সংখ্যা	শতকরা পাশের হার
বেথুন	১৫	৪	৩	—	৭	৪৬.৬
ডায়োসেসন	৯	৩	৫	—	৮	৮৮.৮
লরেটো	৮	৩	৩	১	৭	৮৭.৫

বি. এ. পরীক্ষায়ও একই রকম পরীক্ষার ফল হয়েছিল। সারণী ৩ থেকে সেটা আমরা জানতে পারি।

সারণী ৩

	বি. এ. ছাত্রীসংখ্যা অনার্স	পাশ	১৯১৩-১৪ অনার্স ১ম বিঃ	অনার্স ২য় বিঃ	পাশ	মোট পাশকরা ছাত্রীর সংখ্যা
বেথুন		৭	—	—	৫	৫
ডায়োসেসন	৩	৫	৩	৪	৭	৭

উপরের সারণী থেকে এটা বুঝা যাচ্ছে যে ১৯১৩-১৪ সাল পর্যন্ত বেথুন কলেজ পড়াশুনার ব্যাপারে খুব উন্নতি করতে পারে নি। তারজন্যে শুধু সরকারী অনুদানের অপ্রতুলতাই নয়, অন্যান্য আরো কারণ ছিল।

১৯০২ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন কুমুদিনী দাস। তারপর অধ্যক্ষা হন সুরবালা ঘোষ, তাঁর সময়ে কলেজে তদন্ত কমিটি তৈরী হয়। অবিবাহিতা সত্যবাদিনী শ্রীমতী ঘোষ এই কমিটিকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন কলেজকে দোষমুক্ত করতে।

সরকারী নথিপত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে কলেজের কেরানী ঠিকমত হিসেবপত্র রাখতেন না। তখন কলেজের মাসিক মাইনে ছিল তিন টাকা। সে টাকা ঠিক সময়ে নেওয়া হলেও ঠিক সময়ে ব্যাঙ্ক জমা দেওয়া হত না। অনেকদিন হাতে রেখে ব্যাঙ্কে পাঠান হত। ছাত্রীদের মাইনের রসিদ দেওয়া হত না। টাকা পয়সার হিসেবের খাতা ঠিকমত রাখা হত না। হিসেবের খাতা কলেজের অধ্যক্ষা অথবা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতেন বলে কোন প্রমাণ ছিল না। কিন্তু অধ্যক্ষা কুমুদিনী দাস কর্মচারীর কাজ সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া সত্ত্বেও কোন সতর্কতা অবলম্বন করেন নি।

এখনকার মত তখনও নিয়ম ছিল যে আই. এ অথবা বি. এ. পরীক্ষার্থিনীরা টেষ্টের আগে কলেজের দেয় টাকা মিটিয়ে দেবার পর ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হত। কিন্তু বি. এ পরীক্ষার্থিনী প্রীতিলতা ঘোষাল এবং আই. এ. পরীক্ষার্থিনী ইন্দুপ্রভা বিশ্বাস কলেজের দেয় টাকা জমা না দিয়েই ফাইনাল পরীক্ষায় বসার অনুমতি পেয়েছেন। আবার অনেক সময় দেখা যায় ছাত্রী মাইনে দিয়েছেন, কিন্তু কলেজের খাতায় তার কোন প্রমাণ নেই। তখন কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রীর অভিভাবককে দ্বিতীয়বার মাইনের জন্যে চাপ দিয়েছেন। যে মেয়ে চাকরি করে টাকা উপার্জন করতে পারবে না শুধু বিয়ের বাজারে নাম কিনবার বা সামাজিক প্রতিপত্তির জন্যে একটু লেখাপড়া শেখা তার বেলায় "ঢের হয়েছে আর দরকার নাই" বলে পিতামাতা মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হতেন। হয়ত এর মধ্যে কত মনোযোগী ছাত্রীকে পড়া ছাড়তে হয়েছে। অনেক ছাত্রী টাকা দিয়েও না দেওয়ার তালিকায় নাম উঠিয়েছেন, তাই সরকারী প্রতিবেদনে আমরা দেখতে পাই বেথুন কলেজে ক্রমশই ছাত্রীসংখ্যা কমে যাচ্ছিল। ১৯১৩-১৪ সালে মাত্র পঁয়ষট্টি জন ছাত্রী ছিল। এই ছাত্রী সংখ্যার উপর নির্ভর করে সরকার আর মেয়েদের স্কুল অথবা কলেজ স্থাপনে অগ্রসর হলেন না। কিন্তু সমাজের উপর এর প্রতিক্রিয়া হল গুরুতর। বেশীর ভাগ অভিভাবকই মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে আসতে দ্বিধাবোধ করেন আর মেয়েদের লেখাপড়ায় নিরুৎসাহ হওয়ার একমাত্র অর্থ হল গোটা সমাজ পিছিয়ে যাওয়া।

১৮৯৬ সালে বেথুন কলেজের নিয়মানুসারে এটা ঠিক হয়েছিল যে কলেজের দু'মাইলের মধ্যে যে ছাত্রীরা থাকবেন তারাই শুধু স্কুল বাসের সুবিধে পাবেন। তার চেয়ে দূরের ছাত্রীরা নিজের দায়িত্বে স্কুলকলেজে যাতায়াত করবেন। শালীনতা বজায় রেখে তখনও মেয়েদের স্বাধীনভাবে রাস্তাঘাটে

হাঁটা ছিল দুষ্কর। কাজেই শিক্ষার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অনেকে স্কুলকলেজে মেয়েকে পাঠাতে সাহস করতেন না। যে মেয়ে দুদিন পরে পরের ঘরে যাবে তারজন্যে এত কষ্ট করতেও অনেক অভিভাবকই অনিচ্ছুক হতেন।

কলেজের অধ্যক্ষার এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানের অভাব সর্বত্র দেখা গেল। হোস্টেলের খাতা ভালো করে পরীক্ষা করা হত না যদিও ছাত্রীদের প্রতি মাসে দশ টাকা করে দিতে হত।

একজন সুপারিনটেনডেণ্ট ও তাঁর সহকারী সমেত পাঁচজন শিক্ষিকা ছাত্রীনিবাসে থাকতেন। এঁদের মধ্যে তিনজন শিক্ষিকা বিনা খরচে হোস্টেলে থাকতেন। যখন এই অন্যায় সুবিধে করার ঢালাও ব্যবস্থা হল তখন বদান্যতার কোন সরকারী আদেশ কর্তৃপক্ষ দেখাতে পারেন নি।

ছাত্রীরা টাকা দিয়ে ছাত্রীনিবাসে থাকতেন কিন্তু দেখা যেত ক্যাশ বইতে তাঁদের টাকার কথা লেখা নেই। হোস্টেল সুপারিনটেনডেণ্টকে প্রতি মাসে হোস্টেলের হিসেবের খাতা দেখান হত না। সুপারিনটেনডেণ্ট অভিযোগ করেন যে তিনজন ছাত্রী আশালতা সেন, চন্দ্রমুখী সেরাঙ্গী ও অমরবালা পাল অক্টোবর (১৯১২) মাসের টাকা দিয়েছিলেন, কিন্তু হিসেবের খাতায় তা লেখা হয় নি। তাছাড়া মৃণালিনী সরকার নামে আর একজন ছাত্রীর নাম আবাসিক খাতায় ছিল না। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি হোস্টেল ছেড়ে চলে যান তারপর পরীক্ষার সময় কয়েকদিন থাকেন এবং সেইজন্যে পুরো বছরের টাকা তাঁর কাছ থেকে নেওয়া হয়, কিন্তু উপস্থিতির খাতায় তাঁর নাম ছিল না। আবার অনেক ছাত্রী বছরের মাঝখানে হোস্টেলে এলেও তাঁদের কাছ থেকে পুরো বছরের খরচ নেওয়া হয় নি। কাজেই কোন ব্যাপারেই কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা হত না।

স্কুলের ভেতরের ব্যাপারও একই রকম ছিল। ছাত্রীদের দু'টাকা করে মাইনে দিতে হত। এখানেও মাইনের টাকা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে পাঠান হত না। অনেক দিন হাতে রেখে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হত, অনেক সময় আবার টাকার অঙ্কে ভুল থাকত, ছাত্রীদের দেরীতে মাইনে দেবার জন্যে জরিমানা স্কুল কর্তৃপক্ষ নিতেন কিন্তু তাতে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কোন সই থাকত না।

কলেজে দুটো খরচের খাতা রাখা হত। একটাতে বিস্তারিত হিসেব থাকত এবং অন্যটাতে শুধু কলেজের মাইনের হিসেব রাখা হত কিন্তু সেই খাতার পাতায় কোন নম্বর দেওয়া থাকত না এবং তাতে প্রতিদিন লেখাও হত না যদিও প্রতিদিনই কিছু টাকা তারা পেতেন। অধ্যক্ষা খরচের খাতায় কখনও সই করতেন না

এখানেই ঝামেলার শেষ নয়, কর্মচারীদের ব্যাপারে বেনিয়ম মাত্রা ছাড়িয়েছিল। স্কুল কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ঠিক সময়ে মাইনে পেত না। এমনকি তারা নিজেরা সই করে টাকা নিত না কেরানীবাবু লিখে দিতেন যে তাদের মাইনে দেওয়া হয়েছে। অথবা অনেক সময় অন্য একজন লোক তাদের হয়ে সই করে টাকা নিতেন। বুড়ো আঙ্গুলের টিপ-ছাপ বা অধ্যক্ষার কোন লিখিত নির্দেশ থাকত না। ফলে প্রকৃত ব্যক্তিই মাইনে নিয়েছে তার কোন সঠিক প্রমাণ থাকত না কেরানী এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মাইনে অনেকদিন ফেলে রাখা হত। কিন্তু অধ্যক্ষা এবং প্রধান শিক্ষিকা লিখে রাখতেন যে প্রতি মাসের টাকা ঠিক সময়েই প্রকৃত প্রাপককে দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য খরচের ব্যাপারেও নানারকম গোলমাল ছিল। অধ্যক্ষার সই ছাড়াই আসবাবপত্র কেনা হত। এমনকি পোষ্টাল ষ্ট্যাম্প হোষ্টেলের জন্যে কত যে কেনা হত তার আর ইয়ত্তা নেই। আরও নিচুদিকে নজর দিলে দেখা যায় অসংখ্য ঝাড়ু ও চিমনী হোস্টেলের জন্যে কেনা হত, কিন্তু খাতায় সেগুলি লেখা হত না।

গাফিলতি দেখা যায় বৃত্তির ব্যাপারেও, যে বৃত্তি ছাত্রী ও তাঁর অভিভাবকের কাছে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার উৎস সেখানেও আঘাত করা হয়েছিল। বৃত্তির টাকা দেবার ব্যাপারে কোন নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলা হত না। শান্তা চ্যাটার্জীর ফেব্রুয়ারী মাসের বৃত্তির টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তোলা হচ্ছে এপ্রিল মাসে আর টাকা দেওয়া হচ্ছে জুলাই মাসে। একই ঘটনা ঘটেছে সকলের ক্ষেত্রেই, বৃত্তিপ্রাপ্তা ছাত্রীরা কখনও নিজে সই করে টাকা নিতেন না। অন্যলোক তাদের হয়ে টাকা নিতেন এবং সে সম্বন্ধে বৃত্তিপ্রাপ্তা ছাত্রীর কোন চিঠিও পাওয়া যায় নি কাজেই এখানে প্রশ্ন জাগে প্রকৃত বৃত্তিপ্রাপ্তা ছাত্রী তার বৃত্তির টাকা পেতেন কি না। নির্মলা রায়ের বৃত্তির টাকা সই করে নিয়েছেন মোক্ষদা রায়।

কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিও ছাত্রীদের দেওয়া হত। জ্যোতির্ময়ী ঘোষ ও মোক্ষদা রায়ের বৃত্তির টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তোলা হয়েছে, কিন্তু তাদের দেওয়া হয় নি। অধ্যক্ষা ছাত্রীদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকাটা নিজের থেকে দিয়েছেন, অথচ টাকাটার কোন হিসেব দিতে পারেন নি।

ছাত্রীদের বৃত্তি এবং পুরস্কার দেবার জন্যে ট্রাষ্ট তৈরী হয়েছিল। সেই ট্রাষ্টের টাকা পোষ্টঅফিসে জমা থাকত না। অধ্যক্ষা নিজের কাছে টাকাটা রাখতেন। এই ট্রাস্টের টাকা থেকে "বিদ্যাসাগর স্কলারশিপ" দেওয়া

হত। যাঁরা তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে প্রথম হতেন তাঁদের এই বৃত্তি দেওয়া হত। ১৯১২ সালে বিমলা দাস এই বৃত্তি পান কিন্তু তাঁর হয়ে অমলা দাস টাকা নেন। কিছুদিন পর বিমলা স্কুল ছেড়ে দেবার পর সুনীতিবালা সোমকে বৃত্তিটা দেওয়া হয়। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে বিমলা কেন বৃত্তি পেয়েও পড়াশুনা চালালেন না তবে কি তাঁর হাতে বৃত্তির টাকা পৌঁছাত না।

১৯১২ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্যে গোয়ালিয়র প্রাউজ ফাণ্ড থেকে তটিনী গুপ্তকে এবং আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্যে বেথুন প্রাইজ ফাণ্ড থেকে বিভাবতী মিত্রকে পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু তারও রসিদ হারিয়ে যায়।

সরকার পঞ্চম জর্জের দরবার উপলক্ষে কলেজকে ১০০ টাকা মঞ্জুর করেন। অধ্যক্ষা তারও কোন সঠিক হিসেব দিতে পারেন নি।

পুস্তকাগারের জন্যে ২৬০ টাকা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু ১৯১২-১৩ সালে টাকাটা খরচ করা হয় নি। কুমুদিনী দাস বলেন তিনি মেসার্স থ্যাকার্স স্পিঙ্ক অ্যাণ্ড কোম্পানী থেকে ২০০ টাকার বই লাইব্রেরীর জন্যে কিনেছেন এবং কেরানীর মাধ্যমে টাকাটা কোম্পানীকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে জানা যায় কোম্পানী টাকা পায় নি।

কলেজের তহবিলে সবসময় ৩০০ টাকা জমা থাকত। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ কখনই সে টাকা কলেজের উন্নতির জন্যে ব্যয় করেন নি।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী সিংহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে স্কুলের কর্মচারীদের মাইনের টাকা অন্য কাজে খরচ করা হত বলে ঠিকসময়ে সব কর্মচারীরা মাইনে পেতেন না। হোস্টেলে যারা দরকারী জিনিষপত্র সরবরাহ করত তারাও ঠিকসময়ে টাকা না পাওয়ায় সময়মত জিনিষপত্র পাঠাত না। ফলে ছাত্রীদের উপযুক্ত খাবার দেওয়া হত না এবং তাদের শরীর খারাপ হত এবং লেখাপড়ার প্রতি তারা উদাসীন হয়ে যেত।[৭] কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রতিবেদনে জানা যায় যে অনেকে মনে করতেন এমনকি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও মনে করতেন যে অতিরিক্ত পরীক্ষার চাপে মেয়েদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়।[৮] কিন্তু এরপর অনেক পিতামাতাই মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষা দিতে উৎসাহী হতেন না।

কলেজে শুধু পড়াশোনার উপর জোর না দিয়ে ছাত্রীদের একটু আলাপ-আলোচনা এবং বিশ্রামের জন্যে বিরামাগারের ব্যবস্থা ছিল, তার জন্যে প্রতি ছাত্রীর কাছ থেকে মাসিক এক টাকা করে নেওয়া হত। কিন্তু তার কোন হিসেব ভালোভাবে রাখা হত না। একটা পেনসিল দিয়ে শুধু লিখে রাখা

হত। কারণ সহজবোধ্য। বেশীর ভাগ লেখাই কিছুদিন পরে মুছে যেত। তদন্ত কমিশনের সামনে কুমুদিনী দাস স্বীকার করেন যে স্থায়ী কেরানীবাবু পদত্যাগ করার ফলে অস্থায়ী কেরানীকে দিয়ে কাজ চালাতে হয়েছিল, তাই হিসেব ঠিকমত রাখা যায় নি। কিন্তু ১৯১৪ সালের অধ্যক্ষা সুরবালা ঘোষ বলেন যে কোন অস্থায়ী কেরানীকে কাজে নেবার কোন প্রমাণ কলেজে ছিল না। তবে কেরানীদের মধ্যে কাজের কোন সুনির্দ্দিষ্ট ভাগ না থাকায় কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করা যায় নি।

কলেজের বাৎসরিক মিলন উৎসবে যে টাকা খরচ হয়েছিল বলে কুমুদিনী দাস দাবী করেন, সুরবালা ঘোষ তাতেও সন্দেহ প্রকাশ করেন।

শুধু পড়ালেখায় অবনতি, চাকরীর গণ্ডগোল, হিসেব বইয়ের গরমিল ছাড়াও কেলেঙ্কারীর অভাব ছিল না। বেথুন স্কুলে গানের ক্লাশ হত অথচ অরগ্যানটি ছিল অধ্যক্ষার কোয়ার্টারে। অভিযোগ ছিল যে অধ্যক্ষা কুমুদিনী দাসের মেয়ে অরগ্যানটা বাজাত বলে ওখানে রাখা হয়েছিল যদিও অধ্যক্ষা অভিযোগ অস্বীকার করেন।[৯]

কাজেই দেখা যায় যে শুধুমাত্র জনগণের উৎসাহের অভাব অথবা সরকারী অনুদানের অভাবই বাংলায় নারীশিক্ষার অগ্রগতিকে ব্যাহত করে নি আরও নানা কারণ ছিল। এ কথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে শুধুমাত্র অধ্যক্ষা এবং কেরানীবাবু সব ব্যাপারে দায়ী ছিলেন তা নয়, তখনকার পরিচালক সমিতির গাফিলতিও যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ছিল। দায়িত্ব যাঁরই থাকুক না কেন এতে যে নারীশিক্ষা প্রসারের কাজ ব্যাহত হয়েছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সূত্রনির্দেশ

১ Report on Public Instruction in Bengal for 1908-09, p 39

২ Ibid, pp 39-40

৩ Ibid, p 40 ; Report on Public Instruction in Bengal 1907-08, p 9

৪ Report on Public Instruction 1913-20, p 13

৫ Report on Public Instruction 1913-14, p 4

৬ Ibid, p 5

৭ File $\frac{4c}{85}$ B December, 1916, Nos. 104 105

৮ Report of the Calcutta University Commission 1917-1919, p 22

৯ File $\frac{4c}{85}$ B. December 1916, Nos. 104-105

হাওড়ার লাডলো চটকলে শ্রমিক আন্দোলনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (১৯২৮)

অমল দাস

লাডলো চটকলটি হাওড়া জেলার ছোট্ট শহরতলী চেঙ্গাইল নামক স্থানে অবস্থিত। হাওড়া স্টেশন থেকে বেঙ্গল-নাগপুর লাইনে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে চেঙ্গাইলে পৌঁছোতে। এই স্থানটি হুগলী নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। চটকলটির জন্ম হয়েছিল জেলার অন্যান্য বড় বড় চটকলগুলির জন্মের বহু পরে—বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। এটিই হল জেলার একমাত্র চটকল যার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ আমেরিকানদের হাতে ছিল। হিন্দু ও মুসলমান—উভয় জাতের লোকদের নিয়েই এই চটকলের শ্রমশক্তি গড়ে উঠেছিল। অবশ্য হিন্দু শ্রমিকের সংখ্যাই তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী ছিল; প্রায় সত্তর শতাংশ।

বিংশ শতাব্দীর যে দশকটির আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হচ্ছে সে দশকটি বাংলা তথা সারা ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবিশেষ কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। সে দশকের বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনসমূহ ও ১৯২৮ সালের লাডলো চটকলের শ্রমিক আন্দোলন নানা দিক দিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা তথা সারা ভারতে ঐ সময়ে শ্রমিকদের মধ্যে এক ঘোর অনিশ্চয়তা বর্তমান ছিল। অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনে দেখা দিয়েছিল এক গভীর সংকট। চটকল ও অন্যান্য বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে মালিকগণ তাদের ব্যয় কমাবার জন্য শুরু করল শ্রমিক ছাঁটাই। 'Rationalisation Scheme' বিভিন্ন চটকলগুলিতে চালু হওয়ার ফলে শ্রমিক ছাঁটাই আরও বৃদ্ধি পেল। এই নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের কাজের পরিমাণ বেড়ে গেলেও মজুরী বৃদ্ধি কিন্তু একেবারেই হল না। শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠল। রাজনৈতিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, এমনকি সাম্যবাদী মনোভাবাপন্ন সংস্থাগুলিও শ্রমিকদের আন্দোলনে তাদের পাশে এসে দাঁড়াল।[১] এই

ইতিহাস বিভাগ, বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজ

-বৃহত্তর পটভূমিকাটি মনে রেখেই লাডলো চটকলের শ্রমিকদের প্রতিবাদী আন্দোলন বিচার করা প্রয়োজন।

আলোচ্য প্রবন্ধটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে, প্রধানত ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে লাডলো চটকলে শ্রমিকরা যে বেশ কয়েকটি ছোটখাটো ধর্মঘট করেছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। ১৯২৮ সালটি বাংলা তথা ভারতে শ্রমিক প্রতিবাদী আন্দোলনের দিক থেকে একটি স্মরণীয় বছর। ঐ বছরে শ্রমিক আন্দোলন ও তার ব্যাপকতা ও প্রসারতা চরমতম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। দ্বিতীয় অংশে এই চটকলে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া ও ভাবধারা থেকে যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় এবং সর্বশেষ অংশে, বহিরাগত নেতৃবর্গের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

লাডলো চটকলে ধর্মঘট ও তার ঘটনাবলী

১৯২৮ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু করে নভেম্বর মাসের মধ্যে এই চটকলে পর পর চারটি ধর্মঘট ঘটে। প্রথম ধর্মঘটটি শুরু হয় ৮ মার্চ। চটকলের ২নং মিলের শ্রমিকগণ, সংখ্যায় প্রায় শ পাঁচেক হবে, উপরোক্ত তারিখে কাজ থেকে বিরত থাকল। ধর্মঘটের কারণ হিসেবে যা জানা যায় তাহল, উক্ত মিলের তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে একদল শ্রমিকের কথা কাটাকাটি ও তর্কাতর্কি। ধর্মঘটের ফলে সমস্ত চটকলেই কাজ বন্ধ হয়ে গেল। দশদিন পরে নিঃশর্তে শ্রমিকরা কাজে যোগদান করল এবং কিছু শ্রমিককে বরখাস্ত করা হল।[২]

দ্বিতীয় ধর্মঘটটি ২৩ এপ্রিল শুরু হয়ে ১৭ দিন পর্যন্ত চলেছিল। এই ধর্মঘটে সমস্ত শ্রমিকই (প্রায় ১০ হাজার) যুক্ত ছিল। দৃশ্যত, এই ধর্মঘটটি শ্রমিক নেতাদের চটকলের শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় মালিকপক্ষের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করেই সংগঠিত হয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই মালিকপক্ষ শ্রমিক নেতাদের এই প্রচেষ্টায় বাধা দিয়ে আসছিল। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বিদ্যমান ছিল। মিয়াজান নামে এই চটকলের এক শ্রমিক ও আরও বেশকিছু শ্রমিক চটকলে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য কলকাতায় 'Bengal Trade Union Federation'এর নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সে অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জীকে প্রথম সম্পাদক করে লাডলো চটকলের শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হল। ২১ এপ্রিল ১৯২৮, বঙ্কিমবাবু যখন লাডলো চটকলের কুলী লাইনগুলি থেকে চাঁদা সংগ্রহ

করতে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক তখনই মিলের কর্তৃপক্ষ তাকে মিলের সীমানার ভিতরে প্রবেশ করতে নিষেধ করে এবং সতর্ক করে দেয়। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' চটকলের ম্যানেজারকে লেখা এক চিঠিতে মজদুর লাইনে তাদের প্রবেশের অধিকারের দাবী জানায়। ম্যানেজার এই চিঠি গ্রহণে অস্বীকৃত হলে ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা যায় এবং তারা গোপনে ধর্মঘটের পরিকল্পনা করে। কিন্তু ধর্মঘট ও প্রতিবাদী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ২৩ এপ্রিল মহাদেব সর্দার নামে এক শ্রমিককে খারাপ সুতো তৈরীর জন্য বরখাস্ত করা। মহাদেব সর্দার লাডলো চটকলে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার আন্দোলনে একজন উৎসাহী ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং ইউনিয়নেরও একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। চটকলের সমস্ত শ্রমিকরা তার বরখাস্তের পেছনে সেটাই যে একমাত্র কারণ তা উপলব্ধি করল এবং প্রতিবাদে সেদিনই ধর্মঘট ঘোষণা করল। এই ধর্মঘট ছিল মিলের সর্ববিভাগে। ধর্মঘটের পরদিন কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য কিছু কিছু প্রতিশোধমূলক পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করল। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মজদুর লাইনের জল হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হল। শ্রমিকরা এটা আগে থেকে অনুমান করতে না পারায় তারা তাদের প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করে রাখে নি। সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল এবং দুপুরের খাবারের সময়। ধারে-কাছে কোন পানীয় জলের বিকল্প ব্যবস্থা বা কল ছিল না। তাই তাদের দুর্গতির সীমাও ছিল না। এহেন চরম জলাভাব ও দুর্গতি তাদের কিন্তু ধর্মঘট থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। চটকল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে বহিরাগত শ্রমিক এনে চটকল খোলার অপচেষ্টা চালাতে শুরু করল। ম্যানেজারের শ্রমিকনামধারী গুণ্ডাবাহিনী (এরা ধর্মঘটীদের জায়গায় কাজ করছিল) একদিন চটকলের মালিকের দারোয়ান ও চাকরদের সঙ্গে নিয়ে ধর্মঘটীদের আবাসস্থল আক্রমণ করল লাঠি, বর্শা, কুড়ুল নিয়ে। বহু ধর্মঘটী শ্রমিক এর ফলে গুরুতর আহত হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চেঙ্গাইলের এক জনসভায় তৎকালীন বিখ্যাত সাম্যবাদী নেতা সি পি জি বি-র সদস্য ফিলিপ স্প্রাট ২ মে এই বর্বরোচিত আক্রমণের জন্য চটকলের মালিকের নিজস্ব লোক জমাদারদের (দারোয়ান) দায়ী করলেন এবং শ্রমিকদের 'মারের বদলা মার' দিতে বললেন। ৪০০ শ্রমিক নেতার উপদেশ অনুসরণ করে হঠাৎ সভা ছেড়ে মজদুর লাইনের দিকে এগিয়ে গেল, কারণ সেখানে তাদের কয়েকজন বন্ধু শ্রমিককে কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট করার জন্য কোম্পানীর ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এর ফলে মজদুর লাইনে উভয় পক্ষের বিরাট সংঘর্ষ দেখা দিল এবং উভয়পক্ষের বহুলোক আহত হল।

এসব ব্যবস্থায় কোন ফল হচ্ছে না দেখে কর্তৃপক্ষ নতুন কায়দা শুরু করল। ধর্মঘট ভাঙার জন্য তারা সাধারণ শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য ও নেতৃবর্গের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করতে চেষ্টা করল। ম্যানেজার মহকুমা শাসকের মাধ্যমে শ্রমিকদের একটি ডেপুটেশনের সঙ্গে ধর্মঘটের ব্যাপারে কথা বলতে ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন। কিন্তু তিনি কোন অবস্থায়ই ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলতে বা ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে রাজী হলেন না। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকরা ম্যানেজারের এই অপচেষ্টা সফল হতে দিলেন না। বাধ্য হয়ে ম্যানেজার মিঃ ওয়াশিংটন ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসতে রাজী হলেন, উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর চুক্তি হল এবং ১০ মে ধর্মঘটের অবসান হল। এই চুক্তির ফলে বেশ কিছু শাস্তিপ্রাপ্ত ইউনিয়ন সদস্য শ্রমিককে কাজে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে নেওয়া হল। বাকীদের নির্দিষ্ট সময়ে ফিরিয়ে নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল, যদিও ইউনিয়নকে সরকারীভাবে তখনও স্বীকৃতি দেওয়া হল না তবুও বলা যেতে পারে কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসতে রাজী হয়ে ইউনিয়নের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিল। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিল যে পার্শ্ববর্তী চাকাশীর লরেন্স জুট মিলের শ্রমিকদের মজুরীর হারের সঙ্গে এই চটকলের শ্রমিকদের মজুরীর হারের সমতা আনা হবে। অবশ্য ধর্মঘট চলাকালীন শ্রমিকরা কোন মজুরী পাবে না তা ধর্মঘটীদের পক্ষ থেকে মেনে নেওয়া হল।[৩]

লাডলো চটকলে তৃতীয় ধর্মঘটটি হয়েছিল ১৯২৮ সালের ৪ জুন। এটি একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট যা শুরু করেছিল চটকলের মহিলা শ্রমিকরা। উপরোক্ত তারিখে প্রায় ৬০০ মহিলা শ্রমিক উচ্চমজুরীর দাবী জানিয়ে কাজ বন্ধ করে দিল। তারা এই অভিযোগ করল যে চটকলের প্রধান করণিক গত মে মাসে তাদের মজুরী বৃদ্ধির যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তা এখনও পর্যন্ত পালন করা হয় নি। ধর্মঘট চলাকালীন কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট ভাঙার জন্য সহিংস আক্রমণ, ভয় দেখানো ও জেলে আটক করা ইত্যাদি সব পথই গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করল না। মহিলা শ্রমিকরাও এর বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলল। তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে, ধর্মঘটীদের একটি সভা শেষ হলে এই শ্রমিকরা স্থানীয় বাজারে লুটপাট করে। পুলিসবাহিনী হস্তক্ষেপ করে এবং অনেককে আটক করে। এরপর পুলিসবাহিনী চটকলের ভিতরে গেলে মহিলা শ্রমিকরা তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং পুলিস ও চটকল লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে থাকে। এর ফলে কিছু পুলিস, চটকলের দারোয়ান এবং

একজন ইউরোপীয় অফিসার আহত হয়। এরা সকলেই অবশ্য ধর্মঘটবিরোধী কাজে লিপ্ত ছিল। ম্যানেজার ওয়াশিংটনের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস বহু মহিলা শ্রমিকের বিরুদ্ধে লুটপাট, দাঙ্গাহাঙ্গামার অভিযোগ এনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করল।

এই ধর্মঘটঘট চলাকালে একদিন ম্যানেজার এই ধর্মঘটের মহিলা নেত্রীদের তার অফিসে আসতে বললেন। সে অনুযায়ী তার সঙ্গে দেখা করার জন্য মহিলারা তার অফিসে এল। আসার পর পুলিস, প্রধান জমাদার, অন্যান্য জমাদার তাদের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য ভয় দেখাতে লাগল। সমস্ত দরজা তালাবন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা কাজে যোগ দিতে অনিচ্ছুক হলে অনেক মহিলা নেত্রীকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হল এবং তৎক্ষণাৎ জেলে আটক করা হল। বাকি মহিলা শ্রমিকদেরও নির্দয়ভাবে প্রহারের পর প্রধান জমাদার ও অন্যান্য জমাদার ও কোম্পানী গুণ্ডাবাহিনী জোর করে চুলের মুঠি ধরে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল। প্রতিবাদে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকরা সকলেই স্থানীয় হাট লুটপাট করল এবং অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল। অবশেষে ২৭ জুন যখন কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া মেনে নিতে রাজী হল তখন ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হল। মীমাংসা চুক্তির ফলে স্থির হল যে, ধর্মঘটের জন্য কারোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না; দ্বিতীয়ত, চটকলের প্রধান করণিকের বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারে তদন্ত করা হবে এবং চটকলের প্রধান জমাদারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।[৪]

এই চটকলে ১৯২৮ সালের সর্বশেষ ধর্মঘটটি হয়েছিল ১৯ নভেম্বর। সরকারী বক্তব্য অনুযায়ী চটকলের ১নং মিলের তাঁতীরা উচ্চ মজুরীর দাবীতে প্রথমে কাজ করে এবং এরপর ২নং মিল ও ৩নং মিলের শ্রমিকরা পরদিন সকাল থেকে কাজ বন্ধ করে দেয়। এর ফলে সমস্ত মিলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ১নং মিলের শ্রমিকগণ বিনাশর্তে ২২ নভেম্বর কাজে যোগ দেয়। এরপর অন্য মিলের শ্রমিকরাও আস্তে আস্তে কাজে যোগ দিতে থাকে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে চটকলে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। কিন্তু ইউনিয়নের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা কিশোরীলাল ঘোষ এই ধর্মঘটের কারণ সম্পর্কে অন্য বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী এই ধর্মঘট ২০ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ধর্মঘটের প্রত্যক্ষ কারণ হল এই যে, ম্যানেজার একটি নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেন যে, বিভিন্ন বিভাগের ৫০ জন কর্মীকে কাজ থেকে ছাটাই করা হল। সঙ্গে সঙ্গে

ইউনিয়নের সভা ছাড়াই বা কোনরকম ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বমূলক আলোচনা ছাড়াই শ্রমিকগণ প্রতিবাদে ধর্মঘট শুরু করে।[৫]

শ্রমিকদের বিচিত্র দাবি-দাওয়া—আন্দোলনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত ধর্মঘটগুলিতে লাডলো চটকলের শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ধরন থেকে তাদের বিভিন্ন রকমের সচেতনতা প্রতিফলিত হয়। তাদের শ্রেণী-সচেতনতা, শ্রমিক সংঘ গঠনের সচেতনতা, ঠিক-বেঠিক সম্পর্কে ধারণা, মান-ইজ্জতের ধারণা, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার ধারণা, ন্যায্য মজুরীর ধারণা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার মধ্যে স্পষ্ট ধরা পড়ে।

চটকলগুলিতে শ্রমিকদের 'ন্যায্য' ও 'সুবিচার' এই উভয় সম্পর্কে ধারণা প্রায়ই তাদের প্রতিবাদের পথে ঠেলে দিত। শ্রমিকরা যখন লক্ষ্য করত যে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে তখনই তারা অসন্তুষ্ট হত এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত। তার এই 'ন্যায্য' সম্পর্কে ধারণা প্রচলিত 'প্রথা' বা 'রেওয়াজ' সম্পর্কে তার ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল। 'অন্যায্য' বলতে তারা বুঝত যে অন্যায় তাদের ক্ষেত্রে পূর্বে করা হয় নি, কিন্তু বর্তমানে করা হচ্ছে। ডঃ চিত্রা যোশী ও ডঃ দীপেশ চক্রবর্তী তাদের পৃথক পৃথক আঞ্চলিক কাজে শ্রমিকদের যে 'ন্যায্য', মজুরী সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল তা চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছেন।[৬] তাদের আলোচনার আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে ঠিক একই ধরনের 'ন্যায্য', মজুরী সম্পর্কে ধারণা লাডলো চটকলের শ্রমিক ও হাওড়ার অন্যান্য বহু চটকলের শ্রমিকদের মধ্যে বজায় ছিল।

এখন প্রশ্ন হল, শ্রমিকদের 'ন্যায্য' মজুরী সম্পর্কে ধারণার রূপ কি ছিল? ন্যায্য মজুরী বলতে একটি চটকলের শ্রমিক যা বুঝত তা হল তার প্রতিবেশী চটকলের শ্রমিকবন্ধু একই কাজের জন্য কি মজুরী পাচ্ছে তার হার শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরীর ধারণার ক্ষেত্রে 'contiguity' (সংলগ্নতা) উপাদানটি কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। সুতরাং, যদি কোন মিলের কোন ম্যানেজার কোন কারণে তার মিলে মজুরী বৃদ্ধি করতেন এবং 'সংলগ্ন' চটকলটি তা না করত, তা হলেই শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের বিচারে 'অন্যায্য' কাজ করছে বলে অভিযুক্ত হত। কারণ পার্শ্ববর্তী চটকলের প্রচলিত 'প্রথা'কে লঙ্ঘন করে শেষোক্ত চটকলটি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরীর অধিকার থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করছে।[৭] লাডলো চটকলের শ্রমিকগণ ন্যায্য মজুরী সম্পর্কে তাদের ধারণা

প্রদর্শন করেছিল ১৯২৮ সালের ২৩ এপ্রিল দ্বিতীয় ধর্মঘটের সময়ে। তাদের দাবী ছিল যে সংলগ্ন চাকাশীর লরেন্স চটকলের মজুরীর হারের সঙ্গে তাদের মজুরীর হারের ব্যবধান ঘুচিয়ে সমতা আনতে হবে। কর্তৃপক্ষ অবশেষে তাদের সেই দাবী মেনে নিয়েছিল। এই ন্যায্য মজুরীর ধারণা ও দাবী হাওড়ার ফোর্ট উইলিয়ম, গঙ্গেজ ও হাওড়া চটকলের শ্রমিকদের মধ্যেও ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে পরিলক্ষিত হয়েছিল তাদের ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। এই ধর্মঘটই একই দিনে শুরু হয়ে আবার একই দিনে শেষ হয়েছিল। সফল ধর্মঘটী শ্রমিকেরাই শতকরা ২৫ ভাগ মজুরী বৃদ্ধির দাবী জানিয়েছিল।[৮]

সরকার ও কর্তৃপক্ষের মতে, এই 'ন্যায্য' মজুরী দাবীর পশ্চাতে ছিল 'সংলগ্নতা'র উপাদান। এই উপাদান থেকেই ধর্মঘটের 'জ্বর' অথবা ধর্মঘটের 'ব্যাধি' শ্রমিকদের আঘাত করেছিল এবং তারা মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। অন্যদিকে শ্রমিকদের মতে, 'সংলগ্নতা'র উপাদান নিশ্চয়ই ছিল। কারণ এই উপাদানই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 'ন্যায্য মজুরীর' দাবীতে লড়াই করার প্রেরণা ও শিক্ষা তাদের এনে দিয়েছিল। এর পেছনে কোন ধর্মঘটের 'জ্বর' বা 'ব্যাধি' কাজ করে নি। কর্তৃপক্ষের এই ব্যাখ্যা তাদের মতে একান্তই ভ্রান্ত। বরং শ্রমিকদের সজাগতা, সতর্কতা ও সচেনতার ধারণা থেকেই প্রতিবাদী আন্দোলন উদ্ভূত। বিভিন্ন উপাদান তাদের এই সজাগতা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। (১) কর্মচ্যুত কোন চটকলের শ্রমিকগণ অন্য পার্শ্ববর্তী চটকলে কাজ পেলে বা কাজের অনুসন্ধান করতে গেলে তাদের কাছ থেকে নানা খবরাখবর অন্য চটকলের শ্রমিকরা সংগ্রহ করত ; (২) পাশাপাশি মিলের শ্রমিকরা অনেক সময় একত্রে বসবাস করত ও নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করত ; (৩) স্থানীয় বাজারে তাদের বাজার করার সময় দেখা-সাক্ষাৎ হত এবং খবর তারা জানতে পারত। এ সমস্ত উপাদান একজন শ্রমিককে অন্য মিলের ঘটনা সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দিত এবং প্রয়োজনে এই শিক্ষা তাকে বা তার চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অনুপ্রেরণা এনে দিত।[৯]

শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরীর ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল তাদের মান-সম্মানের ও মর্যাদার ধারণা ; প্রচলিত 'প্রথা' রক্ষার জন্য সংগ্রাম। ১৯২৮ সালের জুন মাসের ধর্মঘটে লাডলো মিলের শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষভাবে মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে এই মান-সম্মান ও মর্যাদার ধারণা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। ধর্মঘট চলাকালীন প্রধান জমাদার ও অন্যান্য জমাদাররা মহিলা শ্রমিকদের ইজ্জত হানি করেছিল। এই ইজ্জত রক্ষার জন্য ধর্মঘটীরা

পাল্টা প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিল। তাদের এই মান-ইজ্জত কিভাবে বিপন্ন হয়েছিল তা পূর্বের অংশে ধর্মঘটের ঘটনা বর্ণনায় দেখানো হয়েছে। জমাদার, পুলিস ও কোম্পানীর গুণ্ডাবাহিনী কর্তৃক মহিলা শ্রমিকদের শরীরে সরাসরি স্পর্শ ও আঘাত শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল এবং সম্মান-রক্ষার্থে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকরা উভয়েই অরাজকতা, হাট লুটপাট প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হল তাদের এই সম্মানহানির প্রতিবাদে। তাদের ক্রোধ ও সংগ্রাম এত চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যে ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত তাদের দাবী মেনে নিয়ে প্রধান জমাদারকে কাজ থেকে বহিষ্কৃত করতে রাজী হলেন।[১০]

এই একই ধর্মঘটে মহিলা শ্রমিকদের মান-অপমানের ধারণার আরও প্রতিফলন দেখা যায়। মহিলা শ্রমিকেরা দাবী তুলেছিল যে, যেহেতু মিলের প্রধান কেরানী গত মে মাসে (১৯২৮) তাদের মজুরী বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেহেতু কর্তৃপক্ষের তা দেওয়া উচিত, এর উত্তরে ম্যানেজার মিঃ ওয়াশিংটন যখন বললেন যে তিনি মিলের কোন ব্যক্তিকে এইরূপ ঘোষণার জন্য নিযুক্ত করেন নি বা প্রধান কেরানীর প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না তখন মহিলা-শ্রমিকরা অত্যন্ত অপমানিত হল। এটা তাদের কাছে মনে হল যে বাড়তি মজুরী পাওয়ার জন্য যেন কর্তৃপক্ষের কাছে তারা সব মিথ্যা কথা বলছে। তাদের অপমানের ও মর্যাদার ধারণা এত প্রবল ছিল যে তারা সত্য-মিথ্যা যাঁচাই করবার জন্য তদন্তের দাবী জানাল এবং এই দাবী বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ। ম্যানেজার তাদের দাবীর কাছে নতিস্বীকার করলেন এবং এই বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিলেন।[১১]

লাডলো চটকলের শ্রমিকদের মধ্যে অপমানবোধ আবার লক্ষ্য করা যায় যখন তাদের ইউনিয়নের প্রথম সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জিকে কর্তৃপক্ষ মিলের সীমানার মধ্যে না ঢোকার জন্য সতর্ক করে দিল। এই ঘটনা ইউনিয়নের সদস্যদের মনে আঘাত করল। কারণ তাদের ইউনিয়নের নেতার অপমান তাদের নিজেদেরই বিরাট অপমান। এর প্রতিবাদে "বেঙ্গল মজদুর ইউনিয়ন কংগ্রেসের" সম্পাদক ম্যানেজারকে এক পত্রে এই মর্মে জানালেন যে মিলের কুলী বস্তীতে তাদের ঢোকায় অধিকার আছে এবং এই সঙ্গে শ্রমিকদের বিভিন্ন অভিযোগের প্রতিও ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ইউনিয়নের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ এবং এই সঙ্গে শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগের প্রতি কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে তিনি চিঠিতে মৃদু প্রতিবাদ জানালেন। এই চিঠি মহাদেব সর্দার নামে এক শ্রমিকের মাধ্যমে ম্যানেজারের হাতে পৌঁছে দেওয়া হল।

ম্যানেজার এই চিঠি গ্রহণে গররাজী হলেন। শুধু তাই নয়, চিঠির খামের উপরে "বেঙ্গল মজদুর ইউনিয়ন কংগ্রেসের' নাম ছাপার অক্ষরে দেখে ম্যানেজার এত ক্রুদ্ধ হলেন যে চিঠি খুলে না দেখে তিনি তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন এবং মহাদেবের সামনেই তা পায়ের তলায় ঘষলেন। এই সঙ্গে মহাদেব সর্দারকেও কাজ থেকে বহিষ্কৃত করলেন। বৃহৎ ইউনিয়নের (বেঙ্গল মজদুর ইউনিয়ন কংগ্রেস) এই এত বড় অপমানের সংবাদ ও ইউনিয়ন সদস্য মহাদেব সর্দারের বহিষ্কারের সংবাদ শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। মিলের শ্রমিক ও ইউনিয়নের সদস্যদের কাছে এটা ছিল সাংঘাতিক অপমানজনক ঘটনা। তাদের মান-মর্যাদার উপর এই আঘাত ও মহাদেব সর্দারের বহিষ্কারের প্রতিবাদে তারা ঠিক ঐ ঘটনার দিনেই বিকেল থেকে ধর্মঘট শুরু করল।[১২]

এতদ্ব্যতীত, মহাদেব সর্দারের বহিষ্কারের প্রতিবাদে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ-ভাবে লড়াই একদিকে যেমন তাদের চিরাচরিত সুবিচারের ধারণার ইঙ্গিত দেয়, অন্যদিকে তেমনি সহকর্মীর প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমনোভাবাপন্নের ধারণার প্রতিফলন ঘটে। এইসব ধারণার উদ্ভব তাদের শ্রেণীগত পরিচয় থেকেই হয়েছে বলা যেতে পারে। এই একই সহমনোভাব ও একই পরিচিতির নিদর্শন পাওয়া যায় লাডলো মিলের মার্চ মাসের প্রথম ধর্মঘটের সময়ে। ঐ সময়ে মিলের তত্ত্বাবধায়ক এবং একদল শ্রমিকের বিরোধকে কেন্দ্র করে মিলের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মিলের 'Co workers'এর সমর্থনে সমস্ত শ্রমিক কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল এবং এই ঘটনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'Co-workers'-এর শব্দটি থেকে শ্রমিকরা একই পরিবার থেকে উদ্ভূত এই ধারণার নিদর্শন পাওয়া যায়।[১৩]

লাডলো চটকলের ধর্মঘটের ঘটনা থেকে আরও একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এই চটকলের এপ্রিল-মে মাসের ধর্মঘট এই ইঙ্গিত দেয় যে, এই মিলের শ্রমিকদের 'লব্ধ' অধিকার সম্পর্কে একটা ধারণা বজায় ছিল। এই ধর্মঘটের সূত্র হবে যেসব শ্রমিক কোম্পানীর কুলী লাইনে বসবাস করত তাদের অনেককেই ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ জোর করে তুলে দিয়েছিল। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে তাদের জমাদার ও ম্যানেজারের গুণ্ডাবাহিনী সহায়তা করেছিল। ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তারা এই চিন্তা পোষণ করল যে, যেহেতু তারা ভাড়া দিয়ে থাকে এবং তারা মিলের কর্মচারী, সেহেতু হঠাৎ কোন নোটিশ না দিয়ে তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করার কোন অধিকার কর্তৃপক্ষের নেই। এই যুক্তি (ঠিক কি বেঠিক সেটা

আলাদা প্রশ্ন) কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে বজায় ছিল এবং কাজ করেছিল। এর ফলে বিরাট গণ্ডগোল দেখা দেয়। ২ মে, ১৯২৮, ৪০০ শ্রমিক একটি সভা ছেড়ে কুলি লাইনের দিকে ধাবিত হয় এই উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানাতে। সেখানে তাদের সঙ্গে ম্যানেজারের গুণ্ডাবাহিনীর ও জমাদারদের সংঘর্ষ হয়। উভয়পক্ষে বহু ব্যক্তি আহত হয়। শ্রমিকদের এই 'লব্ধ' অধিকার সম্পর্কে ধারণা বাংলার অন্য চটকলের শ্রমিক আন্দোলনেও প্রতিফলিত হয়েছে।[১৪]

লাডলো চটকলের শ্রমিক প্রতিবাদের ধরনের মধ্যে তাদের নিজস্ব শ্রমিক সংগঠন গড়ার চেতনতার উপাদানটি ধরা পড়ে। এই চেতনতা পরিলক্ষিত হয়েছিল ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে লাডলো চটকলের প্রথম ধর্মঘটে। ঐ সময়ে ৩০০ বহিষ্কৃত মিল শ্রমিক 'বেঙ্গল মজদুর ইউনিয়ন কংগ্রেসের' নেতৃবর্গকে লাডলো চটকলে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করতে আমন্ত্রণ জানান। নিজ সংগঠন গড়ার অধিকার তাদের আছে এই মৌলিক ধারণা এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ধর্মঘটের পর শ্রমিকরা শুধু 'ইউনিয়ন' গঠন করেই ক্ষান্ত থাকল না, সেই সঙ্গে দলে দলে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তার সদস্য হল। এমনকি সদস্য হওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ একমাসের মধ্যে ১০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করা সত্ত্বেও এবং ইউনিয়নের প্রতি কর্তৃপক্ষ নানা অবিচার করা সত্ত্বেও শ্রমিকরা সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেল ইউনিয়নের নতুন সদস্যপদ গ্রহণের জন্য।[১৫]

বহিরাগত নেতৃবর্গের ভূমিকা

বিভিন্ন তথ্যাদি প্রমাণ করে যে ১৯২৮ সালের মার্চ মাসের ধর্মঘটের উদ্যোগ নীচ থেকে, শ্রমিকদের মধ্য থেকে এসেছিল। এই উদ্যোগ প্রথম নিয়েছিল ২নং মিলের তাঁতীগণ এবং পরে মিলের অন্যান্য বিভাগের শ্রমিকগণ তা অনুসরণ করেছিল। এই ধর্মঘট শুরুর আগে বা ধর্মঘট চলাকালীন শ্রমিকদের কোন মজদুর ইউনিয়ন ছিল না বা বহিরাগত নেতৃবর্গেরও কোন ভূমিকা ছিল না। এর সত্যতা 'বেঙ্গল মজদুর ইউনিয়ন কংগ্রেসের' সম্পাদক কিশোরীলাল ঘোষও স্বীকার করেছিলেন। তার বক্তব্য থেকেই তা প্রমাণিত। তার বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হল। লাডলো চটকলে মার্চ মাসে একটি ধর্মঘট শুরু হল। যেহেতু সেখানে কোন শ্রমিক সংগঠন ছিল না এই ধর্মঘটের পেছনে, সেহেতু এই ধর্মঘট বিফল হল এবং শ্রমিকদের বিনাশর্তে কাজে ফিরে যেতে হল। ৩০০ শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা হল। এই ধর্মঘট ১০ দিন স্থায়ী হয়েছিল এবং 'বেঙ্গল মজদুর ইউনিয়ন কংগ্রেসকে' নবম দিনে ধর্মঘটের কথা জানানো হয়েছিল। কিশোরীলাল বলেন যে, তারা

শ্রমিকরা কাজে যোগদানের পূর্বে সেখানে তাদের সাহায্যে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা ও অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য এই ধর্মঘট শ্রমিক নেতাদের পরবর্তী কাজের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিল। এরপর কিশোরীলাল ঘোষ ও অন্যান্য নেতৃবর্গ সেখানে গিয়ে তিন-চারটি সভা করেন এবং এক মাসের মধ্যে লাডলো চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করা হয়। এই তথ্যাদি নিজেই ইঙ্গিত দেয় যে শ্রমিকরা ধর্মঘটে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।[১৬]

ধর্মঘটের এক মাসের মধ্যে লাডলো চটকলে মজদুর ইউনিয়ন গড়ে উঠলে বহিরাগত নেতৃবর্গের সেখানে অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় ধর্মঘটটি শুরু করার ক্ষেত্রে ইউনিয়নের ভূমিকা বা নেতৃত্ব ছিল না বললেই চলে। এই হঠাৎ ধর্মঘট শ্রমিকদের 'স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগের' ফলেই সম্ভব হয়েছিল। এই ধর্মঘট ইউনিয়নের অজানা ছিল এবং ইউনিয়নের অনুমতি ছাড়াই শুরু হয়েছিল। ধর্মঘট সম্পর্কে ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের বক্তব্যও পরস্পরবিরোধী ছিল। ইউনিয়ন ধর্মঘটের উপযুক্ত সময় হিসেবে সে সময়কে বিবেচিত করে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকরা মহাদেব সর্দারকে যখন কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল তখন প্রতিবাদে সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘট করল।[১৭] ইউনিয়ন যে শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের ধর্মঘট থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিল তা কিশোরীলাল ঘোষ কর্তৃক রাধারমণ মিত্রের (ইউনিয়নের সহ-সভাপতি) মাধ্যমে শ্রমিকদের কাছে প্রেরিত বার্তা থেকে প্রমাণিত হয়। তিনি তাদের কাছে তার যাওয়ার অক্ষমতা প্রকাশ করে ধর্মঘটে যোগদানের বিরূপ ফলাফল তাদের উপলব্ধি করতে বারবার বললেন। চেঙ্গাইলের শ্রমিকগণ ইউনিয়নের অনুমতি ছাড়া বা ইউনিয়ন কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই ধর্মঘটে যোগদান করায় কিশোরীলাল ঘোষ উদ্বেগ প্রকাশ করলেন এবং তার কাছে এই নজির বিপজ্জনক বলে মনে হল। এতদ্সত্ত্বেও, ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটকে সমর্থন জানাল এবং সংগঠনের স্বার্থে শ্রমিকদের জোরালো সমর্থন জানাল।[১৮]

চটকলের মহিলাগণ কর্তৃক তৃতীয় ধর্মঘটটিও তাদের উদ্যোগের ফলশ্রুতি। এই ধর্মঘটটিও ইউনিয়নের সম্মতি বিনা ও অজ্ঞাতে শুরু হয়েছিল। এমনকি ধর্মঘট চলাকালীন সময়েও ইউনিয়নের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জী অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত ছিলেন। ধর্মঘটের তিন-চারদিন পর কিছু শ্রমিকের কাছ থেকে খবর পেয়ে কিশোরীলাল ঘোষ সেখানে উপস্থিত হন। এরপর ইউনিয়ন তিনটি কারণে এই ধর্মঘটে সামিল হয়। প্রথমত, এই ধর্মঘটে

প্রধানত মহিলা শ্রমিকরা যুক্ত ছিল এবং এদের অনেকেই তখনও পর্যন্ত ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণ করে নি। দ্বিতীয়ত, ইউনিয়নের সম্পাদক ধর্মঘট ঘোষণার পর সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু 'বেঙ্গল মজদুর ইউনিয়ন কংগ্রেসের' সম্পাদক কিশোরীলাল ঘোষ যে প্রধান কারণের জন্য শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাহল কর্তৃপক্ষ ও পুলিসের শ্রমিকদের উপর অকথ্য অত্যাচার।[১৯]

১৯২৮ সালের ১৯ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে চতুর্থ ধর্মঘটটি চলেছিল তাও নীচ থেকেই শুরু হয়েছিল। শ্রমিকরাই এই ধর্মঘটে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিল। প্রথম উদ্যোগ নেয় ১নং মিলের তাঁতীগণ এবং অন্যান্য বিভাগের শ্রমিকগণ তাদের অনুসরণ করে। এই ধর্মঘট ইউনিয়নের কোন সভা ছাড়াই বা ইউনিয়নের কোন প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই শুরু হয়েছিল। ইউনিয়নের নেতৃবর্গ এমনকি কিশোরীলাল ঘোষও শ্রমিকদের এই তড়িঘড়ি ধর্মঘটের জন্য অসন্তুষ্ট ছিলেন। নেতৃবর্গ একটি সভা ডেকে এভাবে ধর্মঘট ডাকার সমালোচনা করবার পর অবশেষে কিশোরীলাল ঘোষ ধর্মঘটীদের ধর্মঘট সমর্থন করে এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।[২০]

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া ও ভাবধারার মধ্যে তাদের বিভিন্ন সচেতনতা সুস্পষ্ট। বিভিন্ন দাবী-দাওয়া তাদের শ্রেণীসচেতনতা, শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের সচেতনতা, ন্যায্য ও অন্যায্য সম্পর্কে ধারণা, মান-মর্যাদা, ইজ্জত ও অপমানবোধ এবং ন্যায্য মজুরীর ধারণা ইত্যাদি প্রতিফলিত করে। আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বাতন্ত্র্য, তাদের আন্দোলনে উদ্যোগী ভূমিকা, শ্রমিকদের জমায়েতের চরিত্র নিঃসন্দেহে তাদের লড়াকু মনোভাবের পরিচয় প্রদান করে। লাডলো চটকলের বিভিন্ন ধর্মঘটগুলিতে প্রাথমিক উদ্যোগ নীচ থেকে শ্রমিকদের মধ্য থেকেই এসেছিল। কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নেতৃবর্গ আন্দোলনের পরবর্তী স্তরে শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য ও তাদের সমর্থনে আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করেছিল। চেঙ্গাইল চটকল মজদুর ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল। সাম্যবাদী নেতৃবৃন্দও এই ধর্মঘটগুলিতে শ্রমিকদের সমর্থনে সভা-সমিতিরও চাঁদা তোলার কাজে ব্যস্ত থাকত। বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন স্লোগান ও নতুন কৌশল শ্রমিক নেতারা গ্রহণ করলেন।

সূত্রনির্দেশ

১ দ্রষ্টব্য, রয়েল কমিশন অন্ লেবার ইন ইণ্ডিয়া, ভল্যুম দুই, পৃ ৩৬১-৩৭১, (এরপর আর. সি. এল. আই); হোম ডিপার্টমেন্ট, পলিটিকাল ব্রাঞ্চ

(এরপর পল্ ব্রাঞ্চ) প্রসিডিংস বি, নং ২৬২-২৬৬, ডিসেম্বর ১৯২০ (গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া) (ন্যাশনাল আর্কাইভস্) (এরপর এন. এ. আই)

২ হোম ডিপার্টমেন্ট, পল্ ব্রাঞ্চ, কনফিডেন্টসিয়াল ১/১৯২৮ জুন, জুলাই (এন. এ. আই) ; ডিপার্টমেন্ট অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ এ্যাণ্ড লেবার, ফাইল নং এল ৮৮১ (২২) অফ ১৯২৯। ঐ

৩ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, আর. এল. ইয়র্ক-এর কোর্টে রাধারমণ মিত্রের বক্তব্য, তারিখ ২৮.৩.৩১ (এন. এ. আই)

৪ হোম ডিপার্টমেন্ট, পল্ ব্রাঞ্চ, ১/১৯২৮ জুন, জুলাই ; গণবাণী, বৃহস্পতি-বার, ১৪ ও ২১ জুন, ১৯২৮। (ঐ)

৫ হোম ডিপার্টমেন্ট, পল্ ব্রাঞ্চ, কন্ফিডেন্টসিয়াল, ফাইল নং ১/১৯২৮, নভেম্বর, ডিসেম্বর, রিপোর্টস্ অন্ দ্য পলিটিক্যাল সিচুয়েশান ইন্ বেঙ্গল। (ঐ)

৬ দ্রষ্টব্য, দীপেশ চক্রবর্তী, On Deifying and defying Authority. Managers and Corks in the Jute Mills of Bengal circa 1890-1943' in past & present ; (1983)

৭ ঐ

৮ Report of the Committee On Industrial unrest in Bengal, 1921, Appendix, paras 48, 49, 50

৯ ঐ ; আর. সি. এল. আই, ভল্যুম পঞ্চম, পার্ট এক, পৃ ১৪১

১০ অমৃত বাজার পত্রিকা, ২২ জুন, ১৯২৮ ; দ্রষ্টব্য, চক্রবর্তী, ঐ, পৃ ১৩৯

১১ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, Ext No. p 692, Ext 596 ; গণবাণী, ১৪ জুন, ১৯২৮। (এন. এ. আই)

১২ ঐ, Ext. No. p. 2228 (ঐ) ; ঐ, ইয়র্ক এর কোর্টে রাধারমণ মিত্রের বিবৃতি, ১৯৩১

১৩ Dept. of Industries and Labour, F. No. 881 (22) of 1929 ; Fortnightly Reports ; Home Dept. Poll. Br. Confidential. 1/1918 April, M. C. C. (Meerut Cospiracy Case) Ext. No. p. 2228 ; M. C. C., Statement of Kishorilal Ghosh in the Court of R. L. Yorke, Session judge, Meerut, Vol. 3 (3) No. 1. (N. A. I)

১৪ দ্রষ্টব্য, চক্রবর্তী, ঐ, পৃ ১৪৩ ; রিপোর্ট অন্ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ বেঙ্গল, ১৯২৭-২৮, প্যারা ৩৬, পৃ ২২-২৩ ; দ্রষ্টব্য ; হোম ডিপার্টমেন্ট, পল্ ব্রাঞ্চ, কন্ফিডেন্টসিয়াল, নং ২০৭ (১৯৩৭) (ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট

আর্কাইভস্) ; রিপোর্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসোসিয়েশন, ১৯৩৭, পৃ ১৩৬-১৩৭

১৫ M. C. C. Statement of Radharaman Mitra in the Court of R. L. Yorke, Session judge, Meerut, dt. 28. 3. 31, (N. A. I)

১৬ Reserved from M. C. C. files. (N. A. I.)—A preliminery report sent by Kishorilal Ghosh in his capacity as the Secretary of the Provincial Committee (Bengal) of the All India Trade Union Congress under mandate from the Excutive Council of the Congress in Feb, 1928 at its Meerut in Delhi.

১৭ Dept. of Industries and Labour, F. No. 881 (22) of 1929 (N. A. I.) ; N. C. C. ; Ext. No. 285 (2) ; Ext No. D 84 (7)

১৮. M. C. C., Defence Statement by Kishorilal Ghosh in the Court of R. L. Yorke : 1931, Vol. 3 (1) (N. A. I.)

১৯ ঐ

২০ Dept. of Industries and Labour, F. No. 881 (22) of 1929 ; M. C. C., Defence Statement of Kishorilal Ghosh, (ঐ)

সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রাক-স্বাধীনতা বাংলার শ্রমিক আন্দোলন

নির্বাণ বসু

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা তথা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নানা ধারায় আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। এর মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য নতুন ধারা ছিল। একটি হল আধুনিক সাংবাদিকতা অর্থাৎ পত্রপত্রিকা প্রকাশ, অপরটি হল আধুনিক শিল্পায়ণের ফলে উদ্ভূত নতুন সামাজিক শ্রেণী—শিল্পশ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও সংগঠনের কাজ। আপাতদৃষ্টিতে গোড়ার দিকে এই দুটি ধারার মধ্যে মিশ্রণের কোন সুযোগ ছিল না, কিন্তু কালক্রমে সাংবাদিকতা ও শ্রমিক আন্দোলন কিভাবে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে ওঠে আলোচ্য প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা দেখানোর চেষ্টা করা হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে "সমদর্শী"তে শিবনাথ শাস্ত্রী, "সুলভ "সমাচারে" কেশবচন্দ্র সেন, "সোমপ্রকাশ ও সঞ্জীবনী"তে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে আধুনিক শিল্পায়ণের ফলে ভারতীয় সমাজে কি পরিমাণ আর্থিক বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে এবং শ্রমিকশ্রেণী কি নিদারুণ নিষ্পেষণের শিকার হচ্ছে তা মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করেন।[১] সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৮৭৪ সালে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক "ভারত শ্রমজীবি" নামে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ।[২] সম্ভবত এটিই ভারতে সর্বপ্রথম শ্রমিকসংক্রান্ত পত্রিকা। শশীপদ ইতিমধ্যেই বরাহনগরের চটকল শ্রমিকদের মধ্যে সেবামূলক কাজ, নৈশবিদ্যালয় স্থাপন ও শ্রমিকদের ক্লাব ও বরাহনগর ইনস্টিট্যুট খোলার সুবাদে সুপরিচিত ছিলেন। অবশ্য, এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির মতই এই পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তাছাড়া, শ্রমিকসংক্রান্ত আলোচনা থাকলেও নিরক্ষর ও অশিক্ষিত শ্রমিকশ্রেণী পত্রিকাটিকে "নিজেদের পত্রিকা" বলে মনে করতে পারে নি।

ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এরপর স্বদেশী আন্দোলন ও তৎপরবর্তী যুগে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে সন্ধ্যা, যুগান্তর, বন্দেমাতরম প্রভৃতি বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকায় বহু মূল্যবান ও উত্তেজক সংবাদ ও আলোচনা থাকলেও তার মধ্যে শ্রমিকসংক্রান্ত আলোচনা কোন উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করে নি।

১৯২০এর দশকেই প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। জাতীয় গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন নতুন দিগন্ত সৃষ্টি হয়, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তেমন ধারার সৃষ্টি হয়। প্রথমেই কোন সুসংগঠিত বামপন্থী দলের জন্ম না হলেও, চিন্তাজগতে বামপন্থী ভাবনার বিস্তার ঘটে। এর ফলেই পত্রপত্রিকায় 'শ্রমিকে'র উপর বিশেষভাবে নজর পড়তে থাকে।

১৯২১ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে একাধিক শ্রমিক পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য কী, তা পত্রিকাগুলির প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে জানা যায়। অবহেলিত শ্রমিক ও কর্মচারী শ্রেণীকে তাদের ন্যায্য দাবীদাওয়া ত সম্পর্কে সচেতন করা ও সেই দাবী আদায়ের জন্য তাদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলার অন্যতম হাতিয়ার হিসাবেই পত্রিকাগুলির জন্ম ও প্রচার। কলকাতার শিক্ষিত সমাজসচেতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার দিকে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন তাঁদের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি জানার দিক থেকেও এই পত্রিকাগুলির মূল্য যথেষ্ট। এই পর্বের তিনটি পত্রিকার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩]

দ্বিভাষায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "কর্মী"র জন্ম ১৩২৮ সালের ভাদ্র মাসে (ইং ১৯২১)। পত্রিকাটি সেই সময়কার সুপরিচিত কর্মচারী সমিতি এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত ও পরিচালিত হত। পরিচালকমণ্ডলীতে মুকুন্দলাল সরকার ও কে. সি. রায়চৌধুরী এম. এল. সির মত তৎকালীন যুগে সুপ্রসিদ্ধ "নরমপন্থী" শ্রমিক সংগঠকরা যুক্ত ছিলেন। এঁরা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দেশবন্ধুর অনুগামী কংগ্রেস কর্মীদের তীব্র বিরোধী ছিলেন। "কর্মী"র পরিচালক গোষ্ঠী শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার ফলে শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের বহু সংবাদ এতে পাওয়া যেত। আবার, বিভিন্ন শ্রমিকনেতাদের আভ্যন্তরীণ দলাদলি কলহকোন্দলের বর্ণনা; বিশেষত, ১৯২৩ সালের পর যখন স্বরাজ্য পার্টির শ্রমিক সংগঠকরা প্রবল হয়ে ওঠেন, তখন তাঁদের সমালোচনামূলক বহু "তাজা" খবর প্রকাশিত হতে থাকে।

জ্ঞানাঞ্জন পাল (বিখ্যাত নেতা বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র) ও মুরলীধর বসুর সম্পাদনায় এবং সেকালের সুপরিচিত কর্মচারী সংগঠন "প্রেস কর্মচারী সমিতি"র

উদ্যোগে 'সংহতি' পত্রিকা প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৩০ (ইং ১৯২৩) সালে।[৮] 'সংহতি' পত্রিকায় কেবলমাত্র শ্রমিক সংবাদই থাকত না। অন্যান্য পত্রিকার মত এই পত্রিকাতেও গল্প, বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা প্রবন্ধ, সাময়িক প্রসঙ্গ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর থাকত। তবে প্রত্যেকটি সংখ্যায় শ্রমিক সমস্যার উপর প্রবন্ধ এবং শ্রমিকসংবাদ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। এই বিভাগে শ্রমিকসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ ছাপা হত।

দেশবন্ধুর অনুগামী স্বরাজ্য দলভুক্ত শ্রমিকসংগঠকরা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার জন্য ১৯২৪ সালের অক্টোবরে প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক "শ্রমিক"। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল এক পয়সা। এর উদ্যোক্তা ও সম্পাদিকা ছিলেন প্রখ্যাত শ্রমিকনেত্রী সন্তোষকুমারী গুপ্তা।[৪] শ্রমিকসংবাদ, সংশ্লিষ্ট বহু সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধের পাশাপাশি তাঁদের গোষ্ঠীর শ্রমিক সংগঠন সংক্রান্ত ও অন্য গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে দলাদলির সংবাদও এতে পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে এই পত্রিকাগুলির মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও শ্রমিক আন্দোলনের প্রশ্নে এদের সকলেরই বক্তব্য ছিল যে নিয়মতান্ত্রিক পথে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়ার মীমাংসা না হলে আন্দোলন অনিবার্য। কাজেই শ্রেণীসমঝোতার উপরই তাঁরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু পরিচালক গোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ শ্রেণীসমন্বয়ের ভিত্তিতে গঠিত হলেও, সামগ্রিকভাবে পত্রিকাগুলির অবদান অস্বীকার করা যায় না। কারণ, প্রথমত, আলোচ্য পত্রিকাগুলিতেই সর্বপ্রথম শ্রমিক সমস্যা ও আন্দোলন সম্পর্কে বহু তথ্যাদি পরিবেশিত হত এবং দ্বিতীয়ত, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই ভবিষ্যতের শ্রমিক আন্দোলনের পথ এভাবেই তাঁরা প্রশস্ত করেন।

তথাকথিত "নরমপন্থী" শ্রমিক পত্রিকার পাশাপাশি, ক্ষীণ ধারায় হলেও সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শে বিশ্বাসী পত্রিকারও প্রায় একই সময়ে সূচনা দেখা দেয়। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় এগুলি প্রকাশিত হত। এই ধারায় সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগের' নাম। প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। যদিও এর আনুষ্ঠানিক সম্পাদক ছিলেন ফজলুল হক, কিন্তু এর আসল উদ্যোক্তা ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, মুজাফ্ফর আহ্মদ প্রমুখ। "তাতে গরম গরম লেখা ছাপা হত আর জনগণের, বিশেষ করে মজুরদের কথাও তাতে লেখা হত।"[৫] কাগজখানি কয়েক মাস মাত্র চলেছিল। এরপর কাজী নজরুলের সম্পাদনায় অর্ধ-সাপ্তাহিক "ধূমকেতু" প্রকাশিত হয় ১৯২১ সাল থেকে। এটি বেশ কিছুকাল চলেছিল।

১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে সংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে অনেকগুলি বামপন্থী গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে, যদিও একটি সুসংগঠিত সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব ঘটে প্রায় একদশক পরে (১৯৩৩)। এইসব গোষ্ঠী-গুলির মুখপত্র হিসাবে অজস্র পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হত। ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর নবগঠিত লেবার স্বরাজ পার্টির মুখপত্র রূপে "লাঙল" নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। প্রধান পরিচালক হন নজরুল ইসলাম। ১৯২৬ সালের ১২ আগস্ট এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় গণবাণী। সম্পাদক হন মুজাফ্ফর আহ্মদ। এটি ছিল সদ্যগঠিত পেজেন্টস্ এ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টির বাংলা শাখার মুখপত্র। কয়েক বছর চলার পর ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক গ্রেপ্তারের ফলে পার্টির যখন ছত্রভঙ্গ অবস্থা, তখন পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

বে-আইনী ও গোপন কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে বিভিন্ন নামে ১৯৩২-৩৫ পর্যন্ত বাংলা ও হিন্দী ভাষায় মাসিক ও সাপ্তাহিক অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিছুদিন ধরে একটা কাগজ চলেছে, আবার সরকার থেকে জামানত দাবী করার ফলে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। আবার নতুন নামে কাগজ বের করতে হয়েছে।[৬] এগুলির মধ্যে ছিল মজুর-চাষী (বাংলা সাপ্তাহিক, ডিসেম্বর, ১৯৩১—ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২), দিন-মজুর (বাংলা সাপ্তাহিক, সেপ্টেম্বর, ১৯৩২), মার্ক্সবাদী (প্রথম বাংলাতে মার্কসবাদী তত্ত্ব ও রাজনীতি-মূলক মাসিক পত্রিকা, ১৯৩৩), মার্ক্সপন্থী (বাংলা মাসিক, ১৯৩৪)। ১৯৩৪ সালের প্রথম দিকে সরোজ মুখার্জীকে সম্পাদক করে "গণশক্তি" বাংলা মাসিক প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার ছয় সংখ্যা বার হবার পরে সরোজ মুখার্জীর গ্রেপ্তারের পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে মাসিক গণশক্তি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ১৯৩৯ সালের মধ্যেই মাত্র ছটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর আবার এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়সীমার মধ্যে প্রকাশিত হিন্দী পত্রিকাগুলির মধ্যে ছিল নয়া দুনিয়া, নয়া রাস্তা, জঙ্গী মজদুর, নয়া মজদুর, লালঝাণ্ডা প্রভৃতি। উর্দুতে ১৯৩৭-৩৮ সালে মহঃ ইসমাইলের সম্পাদনায় 'রফিক আল জাদিদ' নামে লিথো করে এক পয়সা দামে এক পাতার কাগজ দৈনিক বের হত। উর্দুভাষী শ্রমিকদের কাছে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র হিসাবে এটি জনপ্রিয় ছিল।[৭] ১৯৩৮ সালে আবদুর রেজ্জাক খাঁর উদ্যোগে এবং জে. মলিহাবাদীর সম্পাদনায় "রোজানা হিন্দ্" নামে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক উর্দু প্রভাতী দৈনিক প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া রোজানা হিন্দ পাবলিশিং হাউস থেকে বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রিকা

প্রকাশিক হত। আবদুল হালিমের সম্পাদনায় "আগে চলো" নামে ১৯৩৮-৩৯ সালে একটি মার্কসবাদী সাপ্তাহিকের কয়েকটি সংখ্যা বেরোয়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কমিউনিস্ট গ্রুপ ও কর্মীদের কাছে কলকাতা কমিটির আবেদন পৌঁছে দেবার জন্য ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে গোপনে প্রকাশিত হয় "দ্য কমিউনিস্ট" নামে ইংরাজী মাসিক। এটি কখনও ছাপাখানায় প্রকাশিত হত, আবার পুলিসের কড়া নজরে পড়লে সাইক্লো করে পার্টির গোপন দপ্তর থেকে প্রকাশ করা হত। ১৯৪২ সালে পার্টি বৈধ হবার আগে পর্যন্ত এটি প্রকাশিত হয়েছে। মার্কসিস্ট তত্ত্বমূলক পত্রিকা মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত মাসিক "নিউ এজ"এ (ডিসেম্বর, ১৯৩৬—অক্টোবর, ১৯৩৯) শ্রমিক-সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আলোচিত হত। বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক ১৯৩৯ সাল থেকে পার্টি আইনসিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। পার্টি আইনী হবার পর ১৯৪২ সালের ৫ জুলাই থেকে ১৯৪৫ সালের ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত দলের কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসাবে ইংরাজী সাপ্তাহিক 'পিপলস ওয়ার' এবং ১৯৪৫ সালের ২৫ নভেম্বর থেকে 'পিপলস এজ' প্রকাশিত হয়।

পার্টি আইনসিদ্ধ হবার পর বঙ্গীয় কমিটির তরফে বাংলা সাপ্তাহিক "জনযুদ্ধ" প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৯৪২ সালের ২ মে থেকে। এরপর যুদ্ধশেষে ১৯৪৫ সালের ২১ ডিসেম্বর থেকে বেরোয় দলীয় বাংলা দৈনিক "স্বাধীনতা"। স্বভাবতই এতে প্রাধান্য দেওয়া হল শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামের, তাদের জীবন সংগ্রামের কাহিনী ও তথ্যবহুল সংবাদের উপর। শ্রমিক সংবাদের জন্য আলাদা বিভাগ ও কৃষক সংবাদের জন্য আলাদা বিভাগ সংগঠিত হল। চার পৃষ্ঠার কাগজের মধ্যে একপৃষ্ঠা শ্রমিকদের জন্য এক পৃষ্ঠা কৃষকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকল। এই শ্রমিক পৃষ্ঠায় সপ্তাহে একদিন থাকত লালঝাণ্ডার ডাক। এই ফিচারটি সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ী নিজে লিখতেন। শ্রমিকদের অবস্থা, মেজাজ, সংগঠনের অবস্থা বিশ্লেষণ করে শ্রমিকদের করণীয় কাজ সম্বন্ধে আহ্বান জানাতেন।[৮]

কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া মার্কসবাদে বিশ্বাসী ও সমাজতন্ত্রী অসংখ্য ছোট ছোট গোষ্ঠী ১৯২০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশে বর্তমান ছিল। তাদের তরফেও পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হত এবং সেখানেও শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের কথা প্রাধান্য পেত।[৯] এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

১৯২৮-৩০ সালে প্রকাশিত কলকাতার সন্তোষ মিত্র, বঙ্কিম মুখার্জী প্রভৃতি পরিচালিত বিপ্লবী গোষ্ঠীর তরফে 'নিউ লাইট' নামে ইংরেজী

সাপ্তাহিক ; প্রায় একই সময়ে চন্দননগর গ্রুপ বলে পরিচিত সশস্ত্র আন্দোলন থেকে মার্কসবাদে আকৃষ্ট একটি শক্তিশালী যুবক গোষ্ঠীর তরফে প্রকাশিত 'লাল নিশান' নামক বাংলা সাপ্তাহিক। লাল কাগজে ছাপা এই পত্রিকার বেশ কয়েকটি সংখ্যা পর পর প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন মণিমোহন মুখোপাধ্যায়। হুগলীর 'আত্মশক্তি' গোষ্ঠী, যাঁরা ইণ্ডিয়ান প্রলেটারিয়ান রিভোল্যুশনারী পার্টি গঠন করেন, প্রকাশ করতেন 'গণনায়ক' (১৯৩২-৩৪)। পূর্বতন 'যশোর-খুলনা' বিপ্লবী গোষ্ঠীর থেকে যাঁরা মার্কসবাদে আকৃষ্ট হয়ে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে থাকেন তাঁরা ১৯৩২ সালে প্রকাশ করেন 'কারখানা'। এঁদের মধ্যে ছিলেন নেপাল ভট্টাচার্য, প্রভাস ব্যানার্জী প্রমুখ। লেবার পার্টির তরফে প্রকাশিত হয় দেবাংশু সেনগুপ্ত সম্পাদিত মাসিক 'ছাত্রদল' (১৯৩৩), দ্বিভাষিক পত্রিকা নয়া মজুর অর 'নিউ ইণ্ডিয়ান মজদুর' নিত্যানন্দ চৌধুরী সম্পাদিত (১৯৩৪), সংঘবাণী, মজদুর দুনিয়া, নয়া জমানা, 'নিউ ফ্রণ্ট' ও পরে 'লেবার ফ্রণ্ট', বলশেভিক এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'পিপলস ফ্রণ্ট' (১৯৪২-৪৩), এছাড়া বিশ্বনাথ দুবের সম্পাদনায় কেবলমাত্র শ্রমিক সংবাদের জন্য গঠিত হয় লেবার নিউজ সার্ভিস। চল্লিশের দশকে লেবার পার্টি থেকে বলশেভিক পার্টি জন্ম নিলে তাদের মুখপত্র হিসাবে 'আওয়াজ' প্রকাশিত হয়। সৌম্যেন ঠাকুরের গোষ্ঠীর (বা আর. সি. পি. আই) পত্রিকা ছিল গণবাণী (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৪), এবং ইংরাজী "রেড ফ্রণ্ট" (১৯৩৮), কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীর তরফে ১৯৩০এর দশকে প্রথম প্রকাশিত হত কিরণচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মজদুর' ; ও পরে শিবনাথ ব্যানার্জীর সম্পাদনায় বাংলা পত্রিকা 'সাথী' ও ইংরাজী "কমরেড"। 'রায়বাদী' বা এম. এন. রায়ের অনুগামীদের তরফে প্রকাশিত হত ধরিত্রী গাঙ্গুলী সম্পাদিত 'ভ্যানগার্ড', 'মাসে'স, 'ইণ্ডিয়ান মজদুর' এবং 'ওয়ার্কার্স এজ', বাংলাদেশের গান্ধীবাদী শ্রমিক সংগঠন 'বেঙ্গল লেবার এ্যাসোসিয়েশন'এর তরফে প্রকাশিত হত হিন্দী পত্রিকা 'শ্রমিক মিত্র'। মুসলিম লীগ সমর্থক বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ লেবার এর মুখপত্র ছিল আবদুল জব্বার সম্পাদিত দ্বিভাষিক 'মজদুর গেজেট'।

শুধু বামপন্থী পত্রপত্রিকায় বা শ্রমিক পত্রিকাতেই 'শ্রমিক' সংবাদ সীমাবদ্ধ ছিল না। শ্রমিকরা ২০এর দশক থেকেই বিশেষত ৩০এর দশকের মধ্যভাগ থেকে বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকাগুলিতেও জায়গা করে নিতে পেরে-ছিলেন। বড় বড় শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের খবর তখন জাতীয় গুরুত্ব পেতে শুরু করেছিল। সাংবাদিকতার ইতিহাসে এই পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। দৈনিক সংবাদপত্রগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন জাতীয়তাবাদী

ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, এ্যাডভ্যান্স, ফরোয়ার্ড, লিবার্টি, বাংলা দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, দৈনিক বসুমতী, মাতৃভূমি, প্রত্যহ ; সরকার সমর্থক দি স্টেটসম্যান, মুসলিম লীগ সমর্থক ইংরেজী স্টার অফ ইণ্ডিয়া ও মর্ণিং নিউজ এবং বাংলা 'আজাদ' ও হিন্দু মহাসভার সমর্থক দি ন্যাশনালিস্ট।

এই দৈনিকগুলির মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকায় শ্রমিকসংক্রান্ত সংবাদ সর্বাধিক প্রাধান্য পেত। ১৯৩৭-৪৭ পর্যন্ত দশ বছরের দৈনিক পত্রিকাগুলি অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে[১০] যে বাংলার প্রত্যন্ত প্রান্তের চা বাগান, কয়লাখনি বা বার্ণপুর লৌহ কারখানার শ্রমিক সংগঠন বা আন্দোলন এই সব দৈনিকে খুব একটা স্থান পায় নি। ১৯৩৮এর বার্ণপুর-কুলটির ধর্মঘটের কিছু খবর অমৃতবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে বেরিয়েছিল। ১৯৪৬এর ধর্মঘটের সময় এরা প্রায় নীরব ; বরঞ্চ স্টার অফ ইণ্ডিয়া এবং ন্যাশনালিস্ট-এ কিছু বেশী খবর পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে দার্জিলিং-এ উত্তাল চা শ্রমিক আন্দোলনের সময়ে স্টেটসম্যান পত্রিকা তাকে বিভীষিকাময় বিশৃঙ্খলারূপে চিত্রিত করে। কমিউনিস্ট প্রভাবিত এই আন্দোলন সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি তুলনায় অনেক নীরব ছিল। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল যে বাংলাদেশের শিল্পগুলির মধ্যে একমাত্র এটিই যেহেতু দেশীয় পুঁজির করায়ত্ত ছিল, তাই এখানের শিল্প বিরোধের খবর-গুলি জাতীয়তাবাদী দৈনিকে কখনও গুরুত্ব পেত না। বরঞ্চ ১৯৩৭ সালের কুষ্ঠিয়া মোহিনী মিলস্-এর শ্রমিক ধর্মঘটের সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা শ্রমিক ইউনিয়নের ভূমিকার তীব্র সমালোচক ছিল।[১১] কলকাতার বন্দর শ্রমিকদের কথা বিস্তৃতভাবে এইসব দৈনিকপত্রে প্রথম আলোচনা হতে দেখা দেয় কেবলমাত্র ১৯৪৭ সালের সাধারণ ধর্মঘটের সময়ে।

চটকল এবং কলকাতা ট্রামের শ্রমিকরা দৈনিক পত্রিকাগুলির পাতায় সবচেয়ে বেশী এসেছে। ১৯৩৯, ১৯৪২, ১৯৪৫ ও ১৯৪৭এর ট্রাম শ্রমিক ধর্মঘট এবং এর স্বপক্ষে ব্যাপক জনসমর্থনের কাহিনী জাতীয়তাবাদী দৈনিকগুলিতে ব্যাপকভাবে বিবৃত হয়েছে। ১৯২৯ সালের প্রথম সাধারণ চটকল ধর্মঘটের কথা জাতীয়তাবাদী দৈনিকগুলি বিশেষত অমৃতবাজারে সবিস্তারে প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে, ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয় সাধারণ ধর্মঘটের কথা এবং এর সমর্থনে জনসমাবেশ ও সভা-সমিতির কথা খুব বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি ধর্মঘটীদের দাবীদাওয়া মুক্তকণ্ঠে সমর্থন করে। ১৯৩৮ সালের জুট অর্ডিন্যান্সবিরোধী আন্দোলনও

যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। আন্দোলনকারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দলাদলির খবরও বেরোত।[১২]

পরিশেষে আমাদের আলোচনা থেকে কয়েকটি যে মূলসূত্র বেরিয়ে আসছে তার উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯২০এর দশক থেকেই শ্রমিক ও তার আন্দোলন পত্র-পত্রিকার নিয়মিত স্থান পেতে শুরু করে। নিয়মতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলন সংগঠকদের হাতে এর সূত্রপাত ঘটলেও, ২০এর দশকের মধ্যভাগে বামপন্থী চিন্তাধারার প্রসার ও অজস্র বামপন্থী গোষ্ঠীর উদ্ভবের ফলেই শ্রমিকশ্রেণী পত্র-পত্রিকায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে থাকে। এই গোষ্ঠীগুলির প্রায় প্রত্যেকেরই নিজস্ব মুখপত্র ছিল, যাতে স্বভাবতই শ্রমিক-কৃষকের সংবাদ প্রাধান্য পেত। তাছাড়া, কেবলমাত্র শ্রমিকদের জন্য বা শ্রমিকসংক্রান্ত পত্র-পত্রিকাও তারা প্রকাশ করত। কিন্তু এইসব পত্রিকাগুলি তা প্রভাতী বা সান্ধ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক যাই হোক না কেন প্রকাশ অনেক সময়ই অনিয়মিত হত। এইসব সংগঠনের আর্থিক ভিত্তি খুব দুর্বল ছিল। সর্বোপরি পুলিশের অত্যাচার ও সরকারী নিষেধাজ্ঞায় প্রায়শই প্রকাশনা বন্ধ রাখতে হত। কিন্তু এইসব দুর্বলতা সত্ত্বেও পত্র-পত্রিকার জগতে শ্রমিক-শ্রেণীর আসন স্থায়ী করার কৃতিত্ব এঁদেরই প্রাপ্য। সেই স্থান প্রতিষ্ঠিত দৈনিক পত্রিকাগুলিও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। এইসব বামপন্থী শ্রমিক পত্রিকাগুলির পরিচালক ও লেখকবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘর থেকে আসা রাজনৈতিক কর্মী। শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করা ও সাংবাদিকতা দুটিই ছিল তাঁদের রাজনৈতিক কাজের অঙ্গ। শ্রমিকদের সমস্যা এবং গভীরতর আর্থনীতিক-সামাজিক প্রশ্নগুলি নিয়ে তারা এইসব পত্রিকাগুলিতে বহু আলোচনা করেছেন। কিন্তু বক্তব্যবিষয়, ভাষার গঠন প্রভৃতি থেকে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর বিশাল অংশই নিরক্ষর ও অশিক্ষিত, সেখানে পত্রিকাগুলি শ্রমিকশ্রেণীর কতখানি অংশকে আলোকপ্রাপ্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। অর্থাৎ 'শ্রমিক' পত্রপত্রিকায় জায়গা করে নিয়েছিল একথা সত্য, কিন্তু পত্র-পত্রিকাগুলি শ্রমিকের কাছে কতখানি জায়গা পেয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।[১৩] এইসব পত্রিকাগুলির পুরনো ধারাবাহিক 'ফাইল' প্রায় দুষ্প্রাপ্য হবার ফলে এই আকর্ষণীয় বিষয়টি নিয়ে আরও গভীর আলোচনা বহুলাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

সূত্রনির্দেশ

১ পঞ্চানন সাহা, হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, নিউ দিল্লী, ১৯৭৮, পৃ ১৭

২ কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ভারতে শ্রমজীবী, কলকাতা, ১৯৭৫ এরপর শশীপদ বরানগর বার্তা' নামেও প্রধানত শ্রমিকদের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন

৩ সনৎ বসু, বিশ শতকের তিনটি বাংলা শ্রমিক পত্রিকা ঐতিহাসিক, দ্বিতীয় বর্ষ ৩য়-৪থ সংখ্যা, ১৯৮০, শীর্ষক প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন

৪ মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, শ্রমিকনেত্রী সন্তোষকুমারী, কলকাতা, ১৯৮৪

৫ মুজাফ্ফর আহ্মদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ ৯৬, এতে নবযুগ প্রথম প্রকাশের তারিখ দেওয়া আছে যে, ১৯২০ কিন্তু সরোজ মুখার্জি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, কলকাতা, ১৯৮৫, ১ম খণ্ড, পৃ ১৮৯তে ১২ জুলাই, ১৯২০ বলে উল্লেখ করেছেন

৬ সরোজ মুখার্জি, প্রাগুক্ত, পৃ ৮২

৭ সুধাংশু দাসগুপ্ত, আন্দামান জেল থেকে মুজাফ্ফর আহ্মদ ভবন, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ ১১৪

৮ প্রাগুক্ত, পৃ ১৪২ ৪৪, দৈনিক ৭০ ২৫,০০০ কপি ছাপা হত, সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্য

৯ ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, লর্ড সিনহা রোডের অফিসে এর একটি তালিকা আছে। সরোজ মুখার্জি, প্রাগুক্ত, এবং রণেন সেন, বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ ১৯৩০ ৪৮তেও এর উল্লেখ আছে কলকাতা, ১৯৮১

১০ এই ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে নির্বাণ বসু, ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্ট ইন ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া, ১৯৩৭ ৪৭ (অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভতে)

১১ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ ৭. ১৯৩৭

১২ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯. ১১. ১৯৩৮

১৩ কুড়ি থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত প্রকাশিত যেসব শ্রমিক পত্রিকার উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সার্কুলেশন সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না তাছাড়া মনে রাখা দরকার যে একটি কপিই বহুজনের মধ্যে হাতে হাতে ঘুরত এমনকি নিরক্ষরদের সামনেও পড়ে শোনান হত।

বিপ্লবী বীণা দাস—একটি অন্য চরিত্র

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

১৯২৮ সাল। দেশে সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন শুরু হয়েছে। এ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বেথুন কলেজ ও স্কুলের ছাত্রীরা হরতাল পালন করে। সরকারী প্রতিষ্ঠানে এ ঘটনা এই প্রথম। বীণা দাস তখন বেথুন কলেজের ছাত্রী—এই হরতালে যোগ দিয়েই প্রথম তাঁর রাজনীতিতে আসা।

এই সময় একদিন সুভাষচন্দ্র বসু এসেছেন ওদের বাড়িতে। বীণা দাস তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আচ্ছা আপনার কি মনে হয়, কিভাবে দেশ স্বাধীন হবে—হিংসার পথে না অহিংসার পথে?"

সুভাষ বসু একটু ভেবে বলেছিলেন, "আসল কথা হচ্ছে একটা কিছু পাবার জন্য আগে পাগল হয়ে উঠতে হয়। স্বাধীনতার জন্য তেমনি আমাদেরও সারা দেশটাকে পাগল করে তুলতে হবে। তখন হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন বড় হয়ে উঠবে না।"

সেদিন আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাও এমনি পাগল হয়েই উঠেছিল। একদিকে চলছে বাংলার কয়েকটি মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়ের একটার পর একটা দুঃসাহসিক মৃত্যুপণ প্রচেষ্টা, অন্যদিকে তেমনি ক্রুদ্ধ আহত ব্রিটিশসিংহের উন্মত্ত আক্রোশ। সে আক্রোশে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছিল। কিন্তু দেশের যৌবন সেদিন রুষ্ট রাজশক্তির ভয়ে পিছিয়ে যায় নি, মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, ঘোষণা করেছিল সংগ্রাম।

"১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী সেনেট হলে কনভোকেশান বসেছে। গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসন অভিভাষণ পাঠ শুরু করেছেন। বীণা দাস নিজের আসন থেকে উঠে এসে গভর্ণরের কয়েক হাত দূর থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। গভর্ণরের কাণের পাশ দিয়ে গুলি চলে গেল। কর্ণেল সুরাওয়ার্দি ডায়াস থেকে ছুটে এসে বীণার গলা টিপে ধরে বসিয়ে দিতে চেষ্টা করতে থাকেন। তবুও বীণার হাতের বাকি গুলি কটা ঐ অবস্থাতেও ছুটেছিল।"

ইতিহাস বিভাগ, সরোজিনি নাইডু মহিলা কলেজ

সারা দেশ চমকে উঠল। কয়েক মাস আগেই ১৯৩১এর ১৪ ডিসেম্বর কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলি করে হত্যা করে শান্তি-সুনীতি; ১৪/১৫ বছরের দুটি মেয়ে। কয়েক মাসের মধ্যে বীণা চেষ্টা করেন গভর্ণরকে মারতে, তারপর টানা কয়েক বছর বন্দীজীবন। আশ্চর্য, আমাদের ইতিহাস থেকে এরা কিন্তু এখানেই মুছে গেলেন। জাতীয় আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে এদের নাম লেখা থাকে, তারপর আর এদের কথা শোনা যায় না। অথচ এরা তো ফুরিয়ে যান নি। দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বরাবরই যুক্ত থাকতে চেয়েছেন। সবসময় পারেন নি—তাই এক প্রচণ্ড হতাশায় ভুগেছেন।

মারা যাবার কয়েক বছর আগেও দেখা করতে গেছি বীণা ভৌমিকের সঙ্গে। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, "আমরা ফুরিয়ে গেছি। আমাদের কথা আর কেউ শুনবে না, এখনকার রাজনীতিতে আমরা অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর।"

১৯৩৯ সালে জেল থেকে ছাড়া পেলেন বীণা দাস, ৭ বছর কারাদণ্ডের পর। মেদিনীপুর জেল, প্রেসিডেন্সি জেল ও হিজলী জেল—এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা। রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপের ফলে মেয়েদের আন্দামানে পাঠানো হয় নি।

"শৃঙ্খল ঝঙ্কারে" বীণা দাস লিখছেন, "১৯৩২ সালের রাজনীতি আর ১৯৪০ সালের রাজনীতি এক নয়। দেশের অবস্থা আগাগোড়া বদলে গেছে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে পড়েছে জনসাধারণের মধ্যে। চারিদিকে দেখা দিয়েছে কিষাণ আন্দোলন, মজদুর আন্দোলন। রাস্তায় ঘাটে প্রায়ই চোখে পড়ে লালঝাণ্ডার শোভাযাত্রা। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব তখন যুবসমাজে খুব বেশী। একটা নতুন আদর্শ, নতুন সমাজব্যবস্থার ছবি সামনে রেখে দেশের বিপ্লবীমনকে তারা আকৃষ্ট করে নিচ্ছে।"

এর মধ্যে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। একদিকে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের তাণ্ডব, অন্যদিকে সীমাহীন লোভে উন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদ। সমগ্র পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। মানুষ আতঙ্কে উত্তেজনায় অস্থির। আমাদের দেশের স্বাধীনতার লড়াই এক নতুন মাত্রায় পৌঁছবার চেষ্টা করছে। অনেকের মনে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে একটা মোহ সৃষ্টি হয়েছে। আন্দামানে বিপ্লবীদের একট বড় অংশ কমিউনিস্ট দলে যোগ দিয়েছে। বীণা দাস লিখছেন:

"রাশিয়ার মাছিমারা অনুকরণ করতে গেলে সমস্যার সমাধান হবে না—স্থানীয় অবস্থার উপযোগী করে নতুন করে মার্কসিজমের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা দরকার—এ কথা অনেকেরই মনে হতে লাগল। "Marxism is not a dead dogma—it is an ever evolving principle."

জেল থেকে বেরিয়ে বীণা দাস যুক্ত হলেন কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে। 'যুগান্তর' দলের অনেকেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। সম্ভবত এই সময় তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতবাদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ যুগটা ছিল এক অস্থিরতার যুগ। এ অস্থিরতার মধ্যে অনেকেই আত্মঅনুসন্ধিৎসায় ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা সমানই প্রবল ছিল। দেশপ্রেমেও কোন ঘাটতি ছিল না, চেষ্টা চলছিল সঠিক পথ অনুসন্ধানের।

বাংলাদেশের রাজনীতিতেও এইসব নতুন চিন্তা—সমাজতন্ত্র, গণপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রভাব ফেলতে লাগল। অথচ সবাই কমিউনিজমের পথকে অনুসরণ করতে রাজী নন। স্থির হল—কংগ্রেসকে সবচেয়ে জনপ্রিয় দল হিসেবে অধিকতর দ্রুত লড়ে সমাজতান্ত্রিকতার দিকে টেনে আনতে হবে এবং কংগ্রেসের মধ্যেই দেশের গণশক্তিকে সংহত করে গণবিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করে, স্বাধীনবেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নতুন আশা নতুন উদ্যম নিয়ে জাতীয় বিপ্লবী বীণা দাসও আত্মনিয়োগ করলেন এই নতুন কংগ্রেসের আদর্শে। সম্ভবত এই চিন্তাভাবনাই তাঁকে টেনে নিয়ে এল শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে। যে অর্থে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃত্ব বোঝায় বীণা দাস কোনদিনই সেরকম শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রীতে পরিণত হন নি। কিন্তু গভীর দেশাত্মবোধ, গণবিপ্লবের স্বপ্ন এবং এক বিরাট মানবিকতা তাকে শ্রমিকদের মধ্যে নিয়ে এসেছে। শ্রমিকদের দুঃখকষ্টকে বোঝার চেষ্টা করেছেন, তাদের সংগঠিত করে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন, তবে তাদের বড় রকমের কোন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে জানি না। সে অর্থে বীণা দাস নেত্রী নন, কর্মী ছিলেন।

" 'ম্যাস ওয়ার্ক' কথাটা শুনতে যত সহজ, কাজে ঠিক ততটা নয়। এর জন্য সম্পূর্ণ একটা আলাদা শিক্ষার দরকার, আলাদা কৃচ্ছ্রসাধনের, আলাদা মনোভাবের।

এত কঠিন বলেই আজ এত বছর ধরে আমরা দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ঐ কথাটা নিয়ে এত চেঁচামেচি করেও সত্যিকারের গণসংযোগ করে উঠতে পারি নি। আজও তাই আমাদের আর দেশের বিপুল জনতার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। ওদের বেদনার ভাষা আমরা বুঝি না, ওরাও বোঝে না আমাদের পুঁথিগত বুলির কচকচি।"

তবে যাঁরা দীর্ঘদিন জেলভোগ করে এসেছেন তাদের মনের জমি খানিকটা প্রস্তুত হয়েছিল। কারণ 'প্রিজন ইজ এ গ্রেট লেভেলার।'

শ্রমিকদের মধ্যে কাজের হাতেখড়ি বীণা দাসের প্রথম হল টালিগঞ্জে

চালকলে। ওখানকার শ্রমিকদের বিশেষ করে মেয়ে ও শিশু শ্রমিকদের অবস্থা খুবই খারাপ। এখানকার শ্রমিকরা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি খাটে, মাঝে ভাত খাবার জন্য কিছু সময়ের জন্য ছুটি পায়। এদের মজুরী হল দিনে পাঁচ আনা কি সাড়ে পাঁচ আনা। মেয়েদের মজুরী পুরুষের চেয়ে কম, অথচ গায়ে-গতরে তাদের সমানই পরিশ্রম করতে হয়। কিছুদিন আগে মজুরী বৃদ্ধি ও অবস্থার একটু উন্নতির দাবীতে এরা ধর্মঘট করেছে। গুলবাহার নামে এক সর্দারনী মনেহয় এ ধর্মঘটের নেত্রী ছিলেন। তিনিও চালকলেই কাজ করেন। মনেহয় কোন বাইরের রাজনৈতিক দল এদের নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় নি, মালিকপক্ষ সর্দারনীকে টাকা ঘুষ দিয়ে ধর্মঘট ভেঙ্গে দেয়। ফলে অবস্থার কোন হেরফের তো হয়ই না উপরন্তু স্বাভাবিকভাবেই কোন রাজনৈতিক বোধ না থাকায় নতুন করে আন্দোলনের কথা তারা ভাবতেই পারল না। তাছাড়া ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের উপর একটা অনাস্থা ও সন্দেহ তাদের মনে দেখা দেয়।

এরকম সময় বীণা দাস যান তাদের মধ্যে কাজ করতে। স্বভাবতই তাদের মনের কাছাকাছি তিনি কোনদিনই হতে পারলেন না। একটা প্রবল অবিশ্বাস থেকে চালকলের মেয়ে শ্রমিকরা তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখল, আর যে রাজনৈতিক বাতাবরণে বীণা দাস বড় হয়েছেন তাতে তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যেতেও পারলেন না। বীণা দাস চেষ্টা করতেন ওদের ছোট ছোট মেয়েদের পড়াশুনা শেখাতে। হয়ত আশা করতেন লেখাপড়া শিখে এদের উন্নতি হবে। কিন্তু কাদের পড়াবেন তিনি? রতনবালা, তবু এদের? রতনবালার মা-বাবা নেই, মাসীর কাছে থাকে। সে বস্তি থেকে পালিয়ে গেল, মাসীও উধাও। কোথায় কে জানে? হয়ত শেষ পর্যন্ত এদের স্থান হয় পতিতালয়ে। আর তবুর ছ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। লাল শাড়ি, সিঁদুরে মাখামাখি হয়ে শিশু যায় শ্বশুরবাড়িতে, বস্তির ছেলেরা বিড়ি খায়, অশ্লীল কথা বলে। বাবা-মার তাতে কোন বিকার নেই। এই তো বস্তির জীবন। অভাব আর অভাব। সবকিছুরই অভাব, অর্থের অভাব, রুচির অভাব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শালীনতা এমনকি জীবনেরও অভাব। এদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্য সমাজের, অন্য চিন্তার বীণা দাস, নিজেকে মেলাতে পারলেন না। এ এক সত্যিই কঠিন কাজ।

পারলেন না যে তা নিজেই বুঝতে পারলেন, আর পারবেনই বা কি করে? একি একার বা দু-একজনের কাজ! কংগ্রেস কি সেদিন একাজে তাঁকে একটুও সাহায্য করেছিল। বীণা দাসের চিন্তাভাবনার সঙ্গে কংগ্রেস

দলের নেতৃস্থানীয়দের চিন্তাভাবনার কোন মিল ছিল কি ? একটা অপরিসীম হতাশা ও দুঃখ নিয়ে বীণা দাস সরে এলেন ওদের কাছ থেকে। তাঁর এই দুঃখ, হতাশা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি লেখেন, "বাবা অনেক সময় বলতেন দেশের দুঃখ দেশের দুঃখ করে তোরা যে পাগল, তার অনেকটাই তোদের কাল্পনিক, মনগড়া। তখন সে কথার উত্তর না দিয়ে, বাবাকে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করত টালিগঞ্জের ওই বস্তিগুলোর মধ্যে।"

বীণা দাসের একজন সহকর্মী কমলা বসু বললেন, লেগে থাকতে পারলে হয়ত কিছু হত, কিন্তু পারলাম না। ওদের অবস্থার উন্নতি করতে পারলাম না। বস্তির ছেলেমেয়েগুলো অসম্ভব নোংরা, জুয়া খেলে, আমাদের সামনেই তাড়ি খায়। কেউ বাধাও দেয় না। খাবার নেই, শিক্ষা নেই, রোগে চিকিৎসা নেই—কি অসম্ভব কষ্ট—কিই-বা আমরা করতে পেরেছি। বীণা দাসরা পারলেন না এখানে কোন ইউনিয়ন তৈরী করতে, বা কোনরকম আন্দোলনের দিকে এদের টেনে নিতে।

১৯৪০-৪১এ হুগলী, হাওড়া অঞ্চলের শ্রমিক সংগঠনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করলেন বীণা দাস। '৪২এর আগস্ট আন্দোলনে গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত এই কাজের সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন।

১৯৩৮এ ছাড়া পেয়ে প্রথম তিনি তাঁর পুরোনো কলেজ বেথুনে যেতেন, উদ্দেশ্য ছাত্রীদের রাজনীতিসচেতন করে স্বাধীনতা আন্দোলনে টেনে আনা। ৮-১০ জন মেয়ে এসেছিল এদের আকর্ষণে, যাদের নিয়ে নিয়মিত ক্লাশ নিতেন কমলা দাশগুপ্ত, বীণা দাস প্রমুখরা। আলোচনা হত, তর্ক হত মার্কসবাদ নিয়ে। কমিউনিজম এদের পছন্দ নয়, তবে রুশ বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যে একটি বড় পদক্ষেপ এটা তাঁরা অনেকেই মনে করতেন। উল্লেখযোগ্য মার্কসবাদকে ভাল করে বোঝার জন্য ওরা তখন সরোজ আচার্যর কাছে গেছেন। ভূপেন দত্তর লেখা পড়েছেন, মানবেন্দ্র রায়ের মতামত নিয়ে আলোচনা করেছেন। শুধু নিজেরা বলতেন না প্রবন্ধ জোগাড় করে ছাত্রীদের পড়তে দিতেন। এখানকার ২-১ জন ছাত্রীর বীণা দাসের সঙ্গে হাওড়া হুগলীর শ্রমিক এলাকার কাজ করতে যান। কমলা বসুও এ সময় বীণা দাসের নিত্যসঙ্গী এবং অন্যতম একজন কর্মী ছিলেন।

শ্রমিক সংগঠনের কাজে বীণা দাসের অন্যতম একজন উৎসাহী সহায়ক ছিলেন তারাদাস ভট্টাচার্য নামে কংগ্রেসের এক ছাত্রকর্মী। কমলা বসু ঐ সময়কার স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, "তারাদাস ভট্টাচার্য একজন সৎ এবং নিষ্ঠাবান কর্মী। তিনিই বীণাদিকে ঐ কাজে উৎসাহ দিয়ে নিয়ে যান।

তারাদাস ওখানেই শ্রমিকদের সঙ্গে থাকত। মালিকরা ওকে যেমন অপছন্দ করত তেমনি ভয় ও সমীহ করত। ঐ এলাকার কারখানাগুলোতে তখন যে কত ইউনিয়ন তৈরী হল তারাদাস হলেন তার সেক্রেটারী এবং বীণাদি হলেন প্রেসিডেন্ট।"

১৯৪০-৪১এ বীণা দাস যেসব শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেগুলি হল ঘুসুড়ীতে রাধেশ্যাম কটন মিল, হনুমান জুট মিল, বেলুড়ে ক্রাউন এ্যালুমিনিয়াম, তাছাড়াও ইস্ট ইণ্ডিয়া রাবার ফ্যাক্টরী, ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং কোম্পানী, কেশোরাম কটন মিল, কেদারনাথ জুট মিল, আদবাদী জুট মিল এবং জে কে ইণ্ডাষ্ট্রিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। বীণা দাস তখন দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা নিযুক্ত হয়েছেন। এবং কংগ্রেস কর্মী হিসেবেই শ্রমিক সংগঠনের কাজে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেস রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে বিশেষ কোন সাহায্য বা সমর্থন তিনি একাজে পান নি।

ইউনিয়নগুলো তৈরী হয়েছে কংগ্রেসের নামেই, কিন্তু কংগ্রেস সমর্থন তো করলই না অনেক সময় শ্রমিক আন্দোলনে মালিকপক্ষ হয়ে বিরোধিতাও করল। শ্রেণীস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তো আর দেশের মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করা যায় না?

অবশ্য শ্রমিকদের আস্থা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাঁরা অর্জন করেছেন। তবে শ্রমিক আন্দোলনে এদের কাজের ধারাটা প্রত্যক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে খানিকটা তত্ত্বগত হয়ে গেছে। অর্থাৎ শ্রমিক ধর্মঘট পরিচালনায় সাহায্য করা বা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া এ জাতীয় কাজ এরা করেন নি। এরা শ্রমিকদের ক্লাস নিতেন। পৃথিবীর নানা দেশের শ্রমিক মজুরের লড়াইয়ের কথা বলতেন, বলতেন অর্থনীতির নানা জটিলতার কথা, বলতেন স্বাধীনতার পর নতুন ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্নের কথা। এদের জন্য নানা বই সংগ্রহ করে লাইব্রেরী তৈরী করেছেন, যাতে এদের পড়ার অভ্যাস হয়—অর্থাৎ এদের জীবন ও রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছেন।

শ্রমিকদের মধ্যে বাঙালী কম, নানা প্রদেশ থেকে নানা ভাষাভাষী দরিদ্র শ্রমিকের সংখ্যাই এসব জায়গায় বেশী। বেশ কিছু মেয়ে শ্রমিকও আছে। সুতাকলে, পাটকলে অনেক মেয়ে কাজ করত। তবে আলাদাভাবে মেয়েদের জন্য এরা কিছু ভাবেন নি বা করেন নি। যেসব ইউনিয়নগুলো গড়ে উঠেছিল তাতে কোন মেয়ে ছিল না। মনেহয় রাজনীতিতে বা ইউনিয়নে মেয়েদের আসার কোন প্রয়োজন বীণা দাস বা কমলা বসুর মত মহিলারাও বোধ করেন নি। সম্ভবত তাঁরা সাধারণ মেয়েরা ততটা রাজনৈতিক

চেতনাসম্পন্ন নয় বলেই মনে করতেন, তাই তাদের ইউনিয়নে আনার কথা মনে হয় নি।

শ্রমিকদের মধ্য থেকে যাতে নেতৃত্বে আসতে পারে তার চেষ্টাও এরা অল্পবিস্তর করেছেন। অভিজ্ঞতা থেকে কমলা বসু বলেছেন, "শ্রমিকদের অধিকাংশই ইউনিয়নে এসেছে। রাধেশ্যাম কটন মিল এবং গ্যালভানাইজিং কোম্পানীতে ইউনিয়ন অফিস চালাত শ্রমিকরাই। এখানে ভাল শ্রমিকনেতা পেয়েছি। মালিকপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় এরা অংশ নিয়েছে।"

একটা কথা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মহিলারাই (যে সময়েই হোক) বলছেন যে, তারা কোনদিন কোন শ্রমিকমহল্লায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন নি। শ্রমিকরা মদ খেয়েছে, বাড়ির বৌ-মেয়েদের মারধোর করেছে, কিন্তু এদের কোনদিন কোন অসম্মান করে নি। রাত করে এসব এলাকা থেকে ফেরাটাও কোন ভয়ের ছিল না। এমনকি ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে, মালিকপক্ষের গুণ্ডা বা দালালদের কাছ থেকে কোনরকম আক্রমণ আসতে পারে, মনে হলে শ্রমিকরাই নেত্রীদের সতর্ক করেছে, প্রয়োজনে সঙ্গে এসে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে।

মাঝে মাঝে বিভিন্ন দাবীদাওয়া নিয়ে এসব কারাখানায় ধর্মঘট হয়েছে। মজুরী বৃদ্ধি, কাজের সময় (ঘণ্টা) কমানো, কাজের সুযোগসুবিধা, চাকুরীর স্থায়িত্ব, মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি এবং ছাঁটাই করার বিরুদ্ধে—ইত্যাদি সব দাবীদাওয়া নিয়ে ধর্মঘট করেছে শ্রমিকরা। কিছু কিছু দাবীদাওয়া কখনও আংশিক মিটেছে, অধিকাংশ সময়ই ধর্মঘটের জন্য শ্রমিক ছাঁটাই হবে না (No victimisation)-এর ভিত্তিতে মীমাংসা করে শ্রমিকরা আবার কাজে যোগ দিয়েছে। কিন্তু ধর্মঘটগুলোতে বড় লাভ হয়েছে—শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ (Unionised) হতে শিখেছে, সাহস করে দাবীদাওয়া নিয়ে মালিকপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পেরেছে। জয়লাভ না হলেও শ্রমিকশ্রেণীর ভিৎ পাকা হয়েছে। বীণা দাস ও অন্যান্য শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব এই কাজটাই ভালভাবে করতে চেষ্টা করেছেন। এরজন্য যে রাজনৈতিক চেতনার দরকার সেই রাজনীতিবোধ জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছেন।

'৪২এর আগস্ট আন্দোলনে বীণা দাস গ্রেপ্তার হলেন ছাড়া পেলেন ১৯৪৫-এ। মনে হয় না তিনি হাওড়া হুগলীর কারখানা অঞ্চলের কাজে আগের মত যুক্ত হতে পেরেছিলেন। শ্রমিকরা অবশ্য তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন।

ইতিমধ্যে অবশ্য তিনি বিধানসভার সদস্যা নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর কাজের পরিধি ও চরিত্রও বেড়েছে এবং পাল্টেছে।

১৯৪৫এ যখন তিনি ছাড়া পেলেন তখন কলকাতা উত্তাল। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষপর্বে এসে দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষ। উত্তেজনা, আশা ও আশঙ্কায় মানুষ অস্থির। ছাত্র, শ্রমিক, কর্মচারীর মনে বিপ্লবের আগুন জ্বলছে। সে এক আলাদা ইতিহাস। সে ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে 'শৃঙ্খল ঝঙ্কারে' বীণা দাস লিখছেন, "ছেলেদের সঙ্গে পুরোপুরি সায় দিতে পারছিলাম না। কিন্তু মনে মনে বিস্ময় আর শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। কেবলি মনে হচ্ছিল এ জিনিস এর আগে এদেশে দেখা যায় নি।" ১৯৪৫এর ২১ নভেম্বর এবং ১৯৪৬এর ফেব্রুয়ারীতে 'রসিদ আলি দিবস'—কংগ্রেসের নেতৃত্ব কোনটাকেই সমর্থন করে নি। "আমরা কংগ্রেস-কর্মীরা মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম। স্রোতের মুখের বাঁধ খুলে গিয়েছে—কলকাতার জনতার স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ। একে থামানো আমাদের সাধ্যের অতীত। না পারি তা চোখ মেলে দেখে যেতে, না পারি তাতে নিজেরা ঝাঁপিয়ে পড়তে।" —একথাও তিনি লিখছেন ঐ একই বইয়ে। তার কয়েক মাস পরেই ১৬ আগস্ট। ১৬ আগস্ট কলকাতা জ্বলে উঠল—না, বিপ্লবের আগুনে নয়, হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গায়। কলকাতার মানুষের রক্তে। সে কলঙ্ক আর লজ্জার কোন সীমা নেই।

শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে এ সময়ের আরেকটি ঘটনা অমৃত-বাজার পত্রিকা ধর্মঘট. যার সঙ্গে সরাসরি বীণা দাস যুক্ত ছিলেন। সেও এই ১৯৪৬। ১৯৪৬এর গোড়ার দিকে অমৃতবাজার পত্রিকার ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। প্রেসের কর্মীরা ইউনিয়ন করতে চায়, কিন্তু কোন কংগ্রেসনেতা সাহায্য করতে রাজী নয়। কারণ অমৃতবাজার জাতীয়তাবাদী কাগজ, অতএব তার মালিকরা অন্যায় করলেও তার প্রতিবাদ করা যাবে না। কংগ্রেসনেতারা অমৃতবাজার পত্রিকাকে চটাতে রাজী নন। তারাদাস ভট্টাচার্য বীণা দাসকে অনুরোধ করায় তিনি রাজী হন। বীণা দাস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হন।

প্রথম প্রথম প্রেস কর্মচারীরা খোলাখুলিভাবে ইউনিয়নের কথা বলতে সাহস পেত না। ২০-২২ জনের বেশী লোক মিটিংএ আসত না। আস্তে আস্তে ভয় কাটল। দু-তিন মাসের মধ্যে প্রায় সকলেই ইউনিয়নে যোগ দিলেন শুধু প্রেসকর্মী নন, অফিস কর্মচারী এবং সাব এডিটররাও ইউনিয়নের সদস্য হলেন। দীর্ঘ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে যারা অমৃতবাজারে কাজ করছেন, যাদের সমস্ত কর্মচিন্তা অমৃতবাজারকে ঘিরে তাঁরাও মাইনে পায় মাত্র ৩০ বা ৪০ টাকা, অনেকে তখন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। 'যে কাগজ জাতীয়তাবাদী বলে

প্রসিদ্ধ, যেখানে প্রতিদিন পাতার পর পাতা ধরে প্রচারিত হয়ে চলেছে কত সোস্যালিজম, কত ট্রেড ইউনিয়নিজম, কত গান্ধীবাদ, প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কত ন্যায়, সাম্য আর সুবিচারের দাবী।" সেখানে এইসব অভাবগ্রস্ত, ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ কর্মচারীরা যেন এক মূর্তিমান বিদ্রূপ।

নতুন যারা কাজে যোগ দিয়েছে তারা শুধু সচেতন নয়, সরবও। তাদের অভিযোগ তোষামোদ, খামখেয়ালী আর স্বজনপোষণে এ কাগজ চলে, মনুষ্যত্বের এখানে কোন দাম নেই। ফলে ধর্মঘট এখানে অবশ্যম্ভাবী। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ বাইরের উস্কানিতে ধর্মঘট হয়েছে। শুধু তাই নয়, কর্তৃপক্ষ প্রচার করতে লাগল "এটা কমিউনিস্টদের কারসাজি, জাতীয়তাবাদী কাগজকে ধ্বংস করার চেষ্টা।" বীণা দাস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জানালেন "ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের মধ্যে একজনও কমিউনিস্ট নেই, সবাই কংগ্রেসের সভ্য, আর আমরা বাইরের যারা আছি প্রত্যেকেই কংগ্রেস কর্মী।" কর্তৃপক্ষ তখন নতুন কৌশল ধরলেন। তাদের বক্তব্য—হয় এরা রাতারাতি কমিউনিস্ট হয়ে গেছে নয়ত কমিউনিস্টদের ফাঁদে পড়েছে।

কংগ্রেসে এাকি ভূমিকা নিল? বলা হল এসব ব্যাপারে কংগ্রেসের নিরপেক্ষ থাকা উচিত। শ্রমিক-মালিকের বিরোধে কংগ্রেসের কর্তব্য হচ্ছে মধ্যস্থতা করা বা সালিসি করা। বীণা দাস লিখছেন, "কিন্তু আমরা যারা বরাবর বলে আসছি কংগ্রেস বিবর্তিত হয়ে হয়ে আজ গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে উঠেছে, আজকে দেশের দুঃস্থ জনসাধারণের স্বার্থ আর কংগ্রেসের স্বার্থ এক। যেখানে ধনিকে-শ্রমিকে, জমিদার-প্রজায় লড়াই কংগ্রেস যেখানে বিনাদ্বিধায় শ্রমিক আর কিষাণের পক্ষ নেবে, কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কংগ্রেসের ভিতরেই আমাদের শ্রমিক ও কিষাণদের সংঘবদ্ধ করা উচিত, অন্য কোন দল করে বাইরে থেকে করার প্রয়োজন নেই—আমাদের এতদিনের সব বিশ্বাস কি তাহলে ভুল?"

তাহলে তো সবকিছু নতুন করে ভাবতে হয়। শ্রমিকরা কংগ্রেসের প্রতি এতে আস্থাইবা রাখবে কেন? কংগ্রেসের নামে সংঘবদ্ধই বা হতে চাইবে কেন? তারা তখন স্বতই ঝুঁকবে সেইসব প্রতিষ্ঠানের দিকে যারা তাদের রুচির লড়াইয়ের দিনে তাদের পিছনে এসে দাঁড়াবে, তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাবে।

ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা নিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের ঐক্য ও সংহতির জোরে ধর্মঘট চালিয়ে গেলেন। পাশে এসে দাঁড়ালেন কংগ্রেস মহিলা সাব কমিটির সম্পাদিকা কমলা দাশগুপ্তা, তাঁর মহিলা কর্মীদের নিয়ে। দরজায় দাঁড়িয়ে পিকেটিং করলেন। কয়েকজন কংগ্রেসকর্মীও আলাদা আলাদাভাবে সাহায্য

করলেন। পাশে এসে দাঁড়াল প্রত্যেকটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণের দানে ও অন্যান্য শ্রমিকপ্রতিষ্ঠানের দানে ধর্মঘটীদের সাহায্যভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছে। অনেক ঝড়ঝাপটা অতিক্রম করে অনেকদিন লড়াইয়ের পর ধর্মঘট মিটল। অনেক দাবীই মেটে নি, এমনকি ধর্মঘটী নেতাকে ছাঁটাই পর্যন্ত করা হল, তবে ইউনিয়নের অধিকার স্বীকৃত হল, লড়াই করার জমি তৈরী হল। ধর্মঘট মেটার পর বীণা দাস চলে গেলেন দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালিতে। শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শেষ হল বীণা দাসের।

মনের মধ্যে সংশয়, কংগ্রেস ছাড়ার কথা ভাবতে পারেন না, তবে নেতাদের ব্যবহারে স্তম্ভিত, বিস্মিত। মনের মধ্যে অনাস্থা উঁকিঝুঁকি মারে। আবার অস্থিরতা, আবার আত্মানুসন্ধানের চেষ্টা। কিন্তু শত্রু না হলেও প্রচণ্ড রকম কমিউনিস্টবিরোধী: পথ খুঁজে পান না—একটা হতাশা, যা শেষজীবন পর্যন্ত তাঁকে অস্থির করে তুলেছে। তবে হতাশা তাঁকে কর্মবিমুখ করে নি—এক কাজ থেকে আরেক কাজে ছুটেছেন—কিন্তু কোথায় যেন একটা অতৃপ্তি থেকে গেছে। অথচ 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার' শেষ করছেন "মানুষের কান্না বুকে নিয়ে একদিন জীবনের যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম। সে কান্নার আজও তো বিরাম নেই! আজও আকাশে বাতাসে শুনি দুঃখের হাহাকার, ক্ষুধার আর্তনাদ, অভাবের অব্যক্ত বেদনা। তাই আজও মনে আনা চলে না ক্লান্তির কথা, মনে আনা চলে না বয়সের অজুহাতে বিশ্রামের অনুসন্ধান। আমাদের বিপ্লবী জীবনের পরিণতি যেন টেনে নিয়ে না যায় একটা নিষ্কর্ম অবসাদের মরুভূমিতে।... পথের শেষ আজও আমার হয় নি।"

সূত্রনির্দেশ

১ শৃঙ্খল ঝঙ্কার, বীণা দাস, ১৩৫৫, বইটি কমলা মুখার্জীর সৌজন্যে প্রাপ্ত, লেখাটির জন্য এই বইটিই মূলত ব্যবহার করেছি—লেখিকা

২ সাক্ষাৎকার, কমলা বসু, ১৪. ১১. ৮৯, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ছিলেন, সে যুগে বীণা দাসের সহকর্মী, বর্তমানে শিক্ষাকর্মে নিযুক্ত

৩ সাক্ষাৎকার, কমলা মুখার্জী, ১০. ১১. ৮৯. এ প্রবন্ধটি রচনা করার উৎসাহ ও প্রভূত সাহায্য পেয়েছি প্রধানত কমলা মুখার্জীর কাছ থেকেই —লেখিকা

৪ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, কমলা দাশগুপ্ত, কলকাতা, ১৩৭০

দেশপ্রাণ শাসমল ও কাঁথি মহকুমায় ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলন

বিমলকুমার শীট

ভারতের যে কোন আন্দোলন সহসা কালবৈশাখীর ন্যায় উপস্থিত হয় নি, আর নিমেষে তা জনমনে লুপ্ত হয়ে যায় নি, প্রাক-স্বাধীন ভারতে এ-রূপ ঘটনার সত্যতা অহরহ চোখে পড়বে। যদি আমরা তা দূরদর্শীর ন্যায় লক্ষ্য করি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও ভারতবাসীর মানসপটে মেদিনীপুর জেলার কাঁথির ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলন এক অনবদ্য স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। এই আন্দোলন সহসা এসে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমাবাসীকে হতচকিত করে দেয় নি। এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন আরম্ভেরও আরম্ভ আছে আর সমাপ্তিরও সমাপ্তি আছে এই মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত মন্তব্যের সারবত্তা খুঁজে পাওয়া যায়। এই আন্দোলন জনমনে বহু আলোচিত নয়, অধিকন্তু যেটুকু আলোচিত তা কালবৈশাখীর সঙ্গে তুলনীয়। আন্দোলনের গভীরে যাওয়া দূরে থাক সামগ্রিকভাবে আন্দোলনের স্বরূপ নিয়েও আলোচনা করা হয় নি। অবশ্য প্রয়াত হিতেশরঞ্জন সান্যাল এই আন্দোলনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে কিঞ্চিৎ সচেষ্ট হয়েছিলেন। বর্তমান আলোচিত প্রবন্ধে আন্দোলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা সম্ভব নয় কারণ সেক্ষেত্রে প্রবন্ধের পরিসর দীর্ঘ হবে এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের নিয়ম লঙ্ঘিত হবে। তাই ক্ষুদ্র পরিসরে আন্দোলনের মোটামুটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করব।

এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ধিত ট্যাক্সদানে অস্বীকৃতি, কিন্তু মূল ছিল গভীরে। যা বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ফুলে-ফলে শোভিত হয়ে বৃহৎ মহীরূহে পরিণত হয়েছিল। তৎকালীন সমাজ অর্থনীতি ও রাজনীতি অবস্থা ছিল এই আন্দোলনের সূতিকাগৃহ। পূর্ব মেদিনীপুরের সর্বপ্রধান জাত মাহিষ্য। সংখ্যার দিক দিয়ে তো বটেই, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নেও মাহিষ্যরাই

ইতিহাসের ছাত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এখানে সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাশালী। ইংরাজ অধিকার বিস্তারের আগে হতেই পূর্ব মেদিনীপুরের অধিকাংশ জমিদার ও ইজারাদার মাহিষ্য।[১] এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা যায় সমগ্র বাংলার সামাজিক অবস্থার মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর ছিল স্বতন্ত্র। এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ—এই দুই প্রাধান্যকারী শ্রেণীর প্রভাব ও সংখ্যা কম ছিল।[২] এই তথ্যের সত্যতা ১৮৭২ সালের নথি থেকে প্রমাণিত হয়। এ সময় কৈবর্তের সংখ্যা ছিল ২৭%, সদগোপের সংখ্যা ৬%, মুসলমানের সংখ্যা ৬%, ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৪·৫%, তাঁতির সংখ্যা ৪%, কায়স্থর সংখ্যা ৪%, উপজাতির সংখ্যা ৫·৫% ও অপরাপর হিন্দুজাতির সংখ্যা ছিল ৯·৫%।[৩] কিন্তু ইতিহাসে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, সংখ্যায় বেশী হওয়া সত্ত্বেও জাতের প্রশ্নে মাহিষ্যদের স্থান বিশেষ ভাল ছিল না।[৪] কিন্তু এ পরিস্থিতি জগদ্দল পাথরের মত মাহিষ্যদের জাতের প্রশ্নে পথরোধ করে নি, বস্তুত জলচল ও নবশাখ জাতগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী স্থানে ছিল মাহিষ্যদের অবস্থান। জাতের পরিচয় উন্নততর করার জন্য মাহিষ্যরা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সচেষ্ট হয়েছিল। পূর্ব মেদিনীপুর জুড়ে এই সময় হতে তাঁর যে অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করেছিল তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত জাতের মর্যাদা বাড়িয়ে তোলা।[৫] ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হতে এই আন্দোলন সংগঠিত রূপ ধারণ করল। কিন্তু এ ঘটনা বিচ্ছিন্ন ছিল না, সারা ভারতের সঙ্গে এর যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে Caste Movement উন্নতিলাভ করে। মহারাষ্ট্রের Non-Brahman Movement উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৭ সালে Caste Movementএর প্রথম সম্মেলন লক্ষ্ণৌতে হয়। তাতে বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও বোম্বাইয়ের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিল।[৬] মাহিষ্যরা 'বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি', স্থাপন করে আন্দোলন জোরদার করে।[৭] কিন্তু কৈবর্তরা মাহিষ্য হিসাবে পরিচিত না হওয়া পর্যন্ত মাহিষ্য আন্দোলন জোরদার হয় নি। ১৮৬৪ সাল থেকে কৈবর্তরা জাতে ওঠার চেষ্টা করার পর বাংলার তিনজন খ্যাতনামা পণ্ডিতদের দ্বারা তাঁরা মাহিষ্য হিসাবে সমাজে স্বীকৃতিলাভ করে।[৮] বর্তমান শতকের একেবারে প্রথম দিকের, ১৯০১ সালের আদমসুমারী হতে মনেহয় ইতিমধ্যে মাহিষ্যদের সামাজিক আন্দোলন বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করেছে এবং সাধারণ মাহিষ্যদের মধ্যে আন্দোলনের প্রসার হয়েছে যথেষ্ট।[৯] মাহিষ্যপ্রধান পূর্ব মেদিনীপুরের সাধারণ চাষী, ছোট রায়ত ও ভাগচাষীর অধিকাংশই মাহিষ্য। ইহাদের পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলনের বিস্তার হবার ফলে স্থানীয় জনজীবনের উপর সম্পন্ন লোকদের নিয়ন্ত্রণ কিন্তু বেড়ে গিয়েছিল।[১০]

শুধু জাতসংক্রান্ত পরিচয়ের প্রশ্নে নয় অর্থনীতি প্রশ্নে এই মহকুমা বিশেষ স্বতন্ত্র ছিল। এক সময় কৃষি ও শিল্পে সুসমৃদ্ধ ছিল এই অঞ্চল, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হতে কৃষি ও শিল্প উভয়েই ধ্বংসমুখে পতিত হয়। সুদূর সাগরপারে ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের ঢেউ এই মহকুমায় আছড়ে পড়েছিল। ইংল্যাণ্ডের মিলের তৈরী সস্তা কাপড় আর কারখানায় প্রস্তুত লবণের আমদানী দেশী প্রস্তুত বস্তুসামগ্রীর বাজার নষ্ট হয়ে গেল। যার দরুন—"বঙ্গদেশের বস্ত্রশিল্প যেরূপ বঙ্গদেশ হতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই রূপে বঙ্গদেশের লবণশিল্পও একদিন বঙ্গদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করে।"[১১] বাংলার কৃষকের এই শিল্পটি নিশ্চিহ্ন হবার ফলে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় পাঁচ লক্ষ অর্ধচাষী লবণ কারিগর (মালঙ্গী) বেকার হয়ে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল।[১২]

এই যখন অবস্থা তখন কৃষির উপর চাপ পড়বে তা স্বাভাবিক। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হতে অববাহিকার উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে ভূমিক্ষয়ের ফলে পূর্ব মেদিনীপুরের নদীগুলি দিয়ে জলপ্রবাহের সঙ্গে বালি নেমে এসেছিল—আর তার পরিণতি—অগভীর নদীর জলবহনে অক্ষমতা, সেই সঙ্গে প্রলয়ঙ্করী বন্যা। ১৮৭০ সাল থেকে ৬০ বৎসরের মধ্যে এই অঞ্চলে নয়বার বন্যা পরিলক্ষিত হয়। শুধু এখানেই শেষ নয়। এই অঞ্চলের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণাবর্তের প্রকোপ বারবার পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণাবর্তগুলির মধ্যেঃ ১৮৩১, ১৮৩২, ১৮৩৩, ১৮৪০, ১৮৪৮, ১৮৫১, ১৮৭৬ এবং ১৮৮৫ অন্যতম। সেই সঙ্গে ১৭৬৬, ১৭৯২, ১৮৫১, ১৮৬৬ এবং ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ যোগ দিয়েছিল।[১৩] এই উপরিউক্ত দুর্যোগ ধনী-নির্ধন সবাইকে ক্লেশ দিয়েছিল। কিন্তু জমিদার, জোতদার ও মহাজনের শোষণের দণ্ড কেবলমাত্র কৃষককে স্পর্শ করেছিল। এই হতদরিদ্র কৃষকরা ঋণের জালে এবং বিভিন্ন বাড়তি আবওয়াবে সর্বদা জড়িত থাকত। জমিদারের ঘোড়া রাখার জন্য অশ্ববৃত্তি ও পূজাপার্বণের খরচ যোগাবার জন্য চাঁদা পর্যন্ত দিতে হত এই কৃষকদের।[১৪] মাজনামুটা জমিদারীর আবওয়াবের তালিকা কৃষকদের নিকট সুপরিচিত।

এ অবস্থায় দৈন্যদশা যে বেড়ে চলবে তা স্বাভাবিক। দৈন্যদশার পরিচয় পাওয়া যায় কৃষকের ক্রমহ্রস্বায়মান জোতের পরিমাণ ও তাহার ঋণভারগ্রস্ততায়। ১৯১১-১৭ সালে মেদিনীপুরে যে জরীপ ও বন্দোবস্ত হয়েছিল তার প্রতিবেদনে কৃষকের দৈন্যদশা খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এতে দেখা যায় জমির চাপ এত বেড়েছে যে রায়তের হাতে জোতের গড় পরিমাণ পাঁচজনের পরিবারের

ভরণপোষণের জন্য সর্বনিম্ন যেটুকু জমির প্রয়োজন, অর্থাৎ বারো বিঘা, তার অনেক নিচে নেমে গেছে কাঁথি, তমলুক ও সদর মহকুমার এই পরিমাণ তিন বিঘার অল্পকিছু বেশী। ঘাটালে আবার তিন বিঘারও কম।[১৫] পূর্ব মেদিনীপুরে, মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, খেজুরী, কাঁথি, এগরা, ভগবানপুর থানার কৃষি জমির বেশীর ভাগটাই ছিল বড় বড় জোতদার বা চাকদারের আয়ত্তাধীন। এদের জোতের পরিমাণ আনুমানিক ৫০ হতে ২,৬৫০ একর পর্যন্ত। কিন্তু ভাগচাষীর অবস্থা ছিল বড় করুণ। সমস্ত কিছু জমিদারদের দেওয়ার পর ভাগচাষীদের হাতে কিছুই থাকত না, নিরন্ন আমৃত্যু দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে ভাগচাষীকে বাঁচতে হত। ১৮৭২ সাল বাংলায় প্রথম সেস বসে; তারপর কয়েক বছর পর সেস ভ্যালুয়েশন হয়। এতে অনেকগুলি কৌতুহল-কর তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত, ছোট আকারের জমিদারী পূর্ববঙ্গে অনেক বেশী (এক লক্ষ তিন হাজার), পশ্চিমে অনেক কম (তের হাজার পাঁচশ মাত্র)। পূর্ব বাংলার প্রতি ছোট মধ্যস্বত্বের গড়পড়তা ভ্যালুয়েশন ৩৯.৪ টাকা—মোটামুটি ৪০ টাকা। আর সে-ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলায় অনুরূপ ভ্যালুয়েশন ৮২ টাকা—ডবলেরও বেশী।[১৬] পূর্ববাংলার মোট ১,০৮,১২৯টি জমিদারীর তলায় ৫,৫০৪টি মধ্যস্বত্ব ছিল, অর্থাৎ গড়ে প্রতি জমিদারীতে মোটামুটি মধ্যস্বত্ব প্রতি জমিদারীতে ৫টি মধ্যস্বত্ব। পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ হিসাব হচ্ছে প্রতিটি জমিদারীতে ৮৮টি মধ্যস্বত্ব। অনেক বেশি।[১৭] এ হতে পশ্চিম বাংলায় প্রজাদের উপর শোষণের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাঁথি মহকুমার কৃষকরা যে যথেষ্ট পরিমাণ শোষিত হচ্ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তাই কৃষকেরা যে, যেকোন বাড়তি ট্যাক্সদানে তাঁদের বহুদিনের ক্ষোভপ্রকাশে ফেটে পড়বেন তাতে নতুন কথা কিছু ছিল না। তা ছিল স্বাভাবিক, ইতিহাসের কার্যকারণ সূত্রের অনিবার্য পরিণতি।

রাজনৈতিক পটভূমি স্বাভাবিকভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পর এসে যায়। কাঁথি মহকুমা রাজনীতিতে অজ্ঞ ছিল না। জাতীয়তাবাদের জন্ম শহরে, পরে তা গ্রামাঞ্চলে বিস্তারলাভ করে।[১৮] জাতীয়তাবাদের জন্মভূমি কলকাতা, আর কলকাতায় এই জাতীয়তাবাদ সযত্নে পালিত হচ্ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী কলকাতার 'ভারতসভা' স্থাপন করেন (১৮৭৬), সেই সময় কাঁথি সহ মেদিনীপুরে মোট ২৯টি ভারতসভার শাখা স্থাপিত হয়েছিল। ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য ভারতসভা টাউন হলে যে সভা আহ্বান করল তাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন যোগদান করে নি। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ও বাংলার বিভিন্ন শহর ও পল্লী থেকে

সহানুভূতি পেতে ভারতসভাকে চেষ্টা করতে হয় নি। কাঁথি অ্যাসোসিয়েশন এই সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল।[১৯] এই সময় মাহিষ্য সম্প্রদায় সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী থেকে দূরে ছিল. এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা ছিল অগ্রগণ্য। তাই মাহিষ্যরা কিছুটা প্রভাব প্রতিপত্তি রাজনীতির মাধ্যমে লাভ করার জন্য চেষ্টা করছিল। অপরদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক যাত্রা শুরু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা সমাপ্ত। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি. সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসে চরম ও নরমপন্থী দলের উদ্ভব কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতি যুবকদের কাছে একপ্রকার ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব সারা বিশ্ববাসীকে আলোকিত করছিল। ঠিক এই সময় ভারতের পশ্চিমাকাশে পূর্ণ তেজে, কৃষকের বেশে, চার্চিলের মতে বিদ্রোহী ফকির মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হয়। সঙ্গে সঙ্গে হিমালয় হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমগ্র ভূমি গান্ধীর দাপটে কেঁপে ওঠে। কাঁথি মহকুমা গান্ধী সমীরণ অনুভব করছিল। সেই সময় ১৯১৯ সালে Village Self Government Act পাশ হয়। যা মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই থেকে স্বতন্ত্র।[২০] এই আইন ১৯২১ সালে কাঁথি মহকুমায় প্রথম প্রয়োগ করা হয় এবং ১৯২১ সালে জানুয়ারীতে ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করা হয়। সাধারণ মানুষের মনে কিন্তু গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না এবং সরকার ও জনসাধারণের সামনে এর কোন চিত্র তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করে নি। ফলে কাঁথি মহকুমার মানুষের মধ্যে এই আশঙ্কা ক্রমাগত দানা বেঁধে ওঠে যে সরকারের ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল অধিক হারে কর আদায় করা। অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন, রুগ্ন, কঙ্কালসার দেহবিশিষ্ট, মৃতপ্রায় কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকেরা চৌকিদারী করই সময়মত দিতে পারে না এবং সেজন্য সরকার প্রায়ই অহরহ তাদের অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করত। এমতাবস্থায় কোনরকম বাড়তি কর দেওয়া তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল।[২১] সুতরাং ঐ মহকুমার সমস্ত মানুষই ইউনিয়ন বোর্ড আইনের বিরোধিতায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল। স্থানীয় সংবাদপত্র 'নীহার' ও 'মেদিনীবান্ধব' জনসাধারণের এই ক্ষোভের কথা প্রকাশ করে এবং সরকারকে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করে। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে সরকার ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

আর এইসময় লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হন এবং মেদিনীপুরের ঘুমন্ত সিংহকে জাগিয়ে তোলেন।[২২] উপরিউক্ত সামাজিক,

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে শাসমলের যোগ এক মহেন্দ্রক্ষণে সংগঠিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্যক্তি ইতিহাস সৃষ্টি করে, না ইতিহাসই ঐতিহাসিক পুরুষের সৃষ্টি করে এ তর্কে প্রবেশ না করেও বলা যায় বীরেন্দ্রনাথের মত ব্যক্তির ভূমিকা ইউনিয়ন বোর্ডবিরোধী আন্দোলন পরিচালনায় যথেষ্ট ছিল। যা তার সমসাময়িক কোন ব্যক্তির পক্ষে তাঁর সমকক্ষ হওয়া ইতিহাসের নিয়মে সম্ভব ছিল না। ১৯২০ সালে অন্ধ্রনেতা রাঘবাচারীর সভাপতিত্বে নাগপুরে কংগ্রেসের ৩৬তম অধিবেশনে জেলা ও লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি সর্বদা পরিত্যাগ করতে হবে না প্রকারান্তরে এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন সম্বন্ধে নাগপুর কংগ্রেস বা তার বিষয়-নির্বাচনী সভা কোনও অভিমত প্রকাশ করে নি। অতএব এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক হয়েছিল। বরিশাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে স্বায়ত্তশাসন আইনের সঙ্গে অসহযোগ করতে হবে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু অল্পদিন পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কাউন্সিল বা কার্যকরী সভা পুনরায় সকলকে অনুরোধ করেন যে, সদ্য সদ্য বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের সঙ্গে অসহযোগ না করলে ভাল। এ ক্ষেত্রে মাহিষ্যদের প্রথম ব্যারিস্টার অনুপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু শাসমল এ ক্ষেত্রে শুনতে পেয়েছিলেন অন্তরের অমোঘ আহ্বান, "একলা চলরে, একলা চলরে।" এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মেদিনীপুর জেলার স্বরাজ অসহযোগ ইত্যাদি কংগ্রেস নীতি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে স্থায়ী আর একটি আন্দোলনে যোগ দিতে হয়েছিল। আমি যে সময়ের কথা বলছি তার কিছুদিন পূর্বে জেলার প্রত্যেক মহকুমার কয়েকটি থানাতে বাংলা গভর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন প্রচলন করেন। এই আইনের বিধান অনুসারে লোকের উপর ১২ টাকার স্থলে ৮৪ টাকা ট্যাক্স হতে পারে। শুনে লোক ভীত-শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, আইনখানি ভাল করে পড়ে সরলচিত্তে এই বুঝে-ছিলাম যে এরদ্বারা দেশের কোন উপকার হবে না। বরং মূর্খ ও দরিদ্র-ব্যক্তির উপর এর দৌলতে নানারকমের উপদ্রব সৃষ্টি হতে পারে।"[১৩] অপর দিকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ১৮৯৫ সালে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে বলেছিলেন ভারতীয় জনসাধারণ বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ, তারাই সর্বাপেক্ষা অধিক কর দিয়ে থাকে, কিন্তু এমন স্বায়ত্তশাসনের মন্ত্রী হিসাবে তিনি দরিদ্রতম মানুষদের আরও কর দিতে বললেন। বীরেন্দ্রনাথ দমলেন না। তিনি বলেন, "তাঁদের অনুরোধকে অমান্য করে মেদিনীপুর জেলার এই আন্দোলনে যোগদান করতে আমার কোন প্রবৃত্তি হচ্ছিল না; কিন্তু শেষে আমার জেলাবাসীর বিশেষ

আগ্রহ ও অনুরোধে ব্যক্তিগতভাবেই এই আন্দোলনে যোগদান করতে হয়েছিল।"[৩৪] ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে আবেগবর্জিতভাবে মহকুমা শাসককে লিখিত পত্রে এই আইনের কুফল ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, প্রথমত, আইনটি পাঠ করলে দেখা যায় যে পাশ্চাত্য সভ্যতার নামে এদেশে যা চলে তার কিঞ্চিতমাত্র দিয়ে বাংলার পল্লীজীবনকে আধুনিক ভাবাপন্ন করে তোলা—ইহাই আইনটির উদ্দেশ্য। বিদেশী শাসন ঠিকভাবে হজম করার শিক্ষা না পেয়ে কেবলমাত্র আইনের দায়ে সেই আদর্শের দিকে নতমস্তকে ছুটতে বাধ্য হওয়া তাঁর মতে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসম্ভব। আইন এমন হওয়া উচিত যাতে প্রাচীন সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আধ্যাত্মিকতার বিনিষ্ট না হয়।

দ্বিতীয়ত, বলা হয়েছে যে বাংলার পল্লী অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এই আইনের সৃষ্টি। নিয়ম এই যে, যে স্থানে স্বায়ত্তশাসন আইন প্রচলিত আছে সেই স্থানের প্রতিনিধিগণ সেখানকার রাষ্ট্রীয় প্রাপ্যের সবটাই নিজেদের প্রয়োজনে ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ব্যয় করতে পারে। কিন্তু আলোচ্য আইনে স্বায়ত্তশাসনে এই নিয়মটি সরাসরি অস্বীকৃত করা হয়েছে। ইউনিয়ন বোর্ডকে এর এলাকার অন্তর্গত বর্তমান সরকারী আয়কে স্পর্শ করার কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নি।

তৃতীয়ত, তাঁর বিশ্বাস এই যে তথাকথিত স্বায়ত্তশাসন আইনের দ্বারা এই প্রদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহুল পরিমাণে ব্যাহত হবে। কারণ এতে বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিতে পরোক্ষভাবে নতুন কর ধার্য করা হচ্ছে। অথচ বিধান এই যে ঐ জমি ১৭৯৩ সালে ১নং রেগুলেশন অনুসারে নতুন কর ধার্য থেকে বরাবর মুক্ত থাকবে।

চতুর্থত, ১৯১৪ সালের প্রথম মহাসমরের ফলে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি। এখন তাদেরকে নতুন কর দিতে বলায় প্রকৃতপক্ষে অশান্তি ডেকে আনা হচ্ছে। যাদের মাসে দু পয়সা ট্যাক্স দেওয়ার ক্ষমতা নেই কেবলমাত্র সেই সকল ব্যক্তির উপর কর ধার্য হবে না, কিন্তু বাকি সকলে এর যাঁতাকলে পড়বেন। এখন ধনীব্যক্তিরা দেশের সর্বত্র ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করেছেন। এরা কি নিজের উপর নতুন কর স্থাপন করে গরীব লোক-দিগকে শাসন করার জন্য আহূত হচ্ছেন? তাঁরা অবশ্যই ঋণ ও টাকার উপর সুদের হার বৃদ্ধি করবেন।

পঞ্চমত, তাঁর বিশ্বাস, আইন অনুসারে যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব হয়েছে তার সবটাই সম্পূর্ণ বৃথা ব্যয়িত হবে। যদি ধরা যায় কুড়িটি গ্রাম-

বিশিষ্ট একটি ইউনিয়নের এই আইন অনুসারে ৬০০ টাকা সংগৃহীত হয়। তা হল প্রত্যেকটি গ্রামের জন্য ৩০ টাকা হিসাবে বরাদ্দ করতে হবে। ইহার অর্থ প্রতি গ্রামের ভাগে মাসে ২.৫০ টাকা হিসাবে অর্থ পাওয়া যাবে। এই অর্থে হাসপাতাল স্থাপন, বিদ্যালয় নির্মাণ, স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পল্লীপথ নির্মাণের ব্যয় কিরূপ সম্ভব হবে? যদি কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিদের উপর সর্বোচ্চ ট্যাক্স বসান হয় তাহলে অনাদায়ী ট্যাক্সের পরিমাণ অত্যন্ত কম হবে। দরিদ্র ব্যক্তির উপর ট্যাক্স বসালে সরকার তাদের উপর নির্দয় নিপীড়ক রূপে গণ্য হবে। কাজেই মধ্যবিত্ত লোকেরাই ট্যাক্সের ভারে দরিদ্র হতে থাকবে এবং সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ এই শ্রেণীর লোকের ধ্বংসসাধন করা হবে।[২৫]

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের সহজ সরল বক্তৃতায় চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গেল। কাতারে কাতারে লোক বীরেন্দ্রনাথের অনুগামী হতে লাগল। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের আহ্বানে সুদূর পূর্ববঙ্গ থেকে মৌলবী Rayhan Uddin Ahmed ছুটে এসেছিলেন। এই সমস্ত জনসভায় হিন্দু-মুসলিম নারীপুরুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনত।[২৬] দেশপ্রাণ স্বয়ং চৌকিদারীর কর প্রদান করে দিয়েছিলেন। তিনি বীরদর্পে ঘোষণা করেছিলেন যে যতদিন ইউনিয়ন বোর্ড তুলে না নেওয়া হয় ততদিন তিনি জুতো পরবেন না। নগ্নপদে, পদব্রজে মহকুমার প্রান্ত থেকে প্রান্তরে প্রচারাভিযান চালিয়ে যান। দারুয়াগ্রাম, রামনগর, চক্রধরপুর, এগরা, পটাশপুর, হোঁড়িয়া, বাসুদেবপুর, খেজুরী, ভগবানপুর, মীরগোদা, বালিসাই, মর্ণীবাগ, ইসলামপুর, বাসন্তিয়া, ফুলেশ্বর, দাঁড়োই, মুকুন্দপুর প্রভৃতি স্থানে আন্দোলনের বহ্নি পূর্ণতেজে বিকশিত হচ্ছিল। অতিরিক্ত কর দিতে অস্বীকার করায় সরকারি আমলারা পুলিশের সাহায্যে কৃষকদের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি, চাষের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বলদ, ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করে নিল।[২৭] আন্দোলন এমনই তীব্র আকার ধারণ করে যে বাজেয়াপ্ত জিনিষগুলি বয়ে নিয়ে যাবার লোক পাওয়া যায় নি। দারুয়া গ্রামে কৃষ্ণপ্রসাদের বাড়ি, মির্জাপুরের পাশের গ্রাম চক্রধরপুরের জমিদার চন্দ্রমোহন আগস্তির বাড়ির ক্রোকী মাল কোন লোক বহন করে নিয়ে যাওয়া তো দূরে থাক ক্রোকী মাল নিলামের সময় হাজার টাকার দ্রব্যসামগ্রী ২ থেকে ৪ টাকায় নিলাম ধরার জন্য কেউ এগিয়ে আসে নি। কারণ তারা নিলাম বয়কট করেছিল।

জনসাধারণের এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ফলে সরকারবাহাদুর অবশেষে উপলব্ধি করে যে, ইউনিয়ন বোর্ড জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। স্বায়ত্তশাসনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ঘোষণা করেন যে

যদি কোন এক স্থানের জনসাধারণ ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরোধিতা করে তবে সরকারের উচিত হবে স্থানীয় জনমতের উপর গুরুত্ব দেওয়া। ডঃ সুরাবর্দি'ও জোর করে ইউনিয়ন বোর্ড চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেন।[২৮] অবশেষে সরকারবাহাদুর ৫০২৫ নং বিজ্ঞপ্তি জারী করে ২২৬টি ইউনিয়ন বোর্ড বাতিল বলে ঘোষণা করেন।

সবশেষে একথা বলা যায় যে দেশবরেণ্য দেশপ্রাণ শাসমলের নামে দু-একটি রাস্তার নাম এবং তাঁর আবক্ষ মর্মরমূর্তি স্থাপন করে তার প্রতি আর আমরা বেশী ঋণ স্বীকার করতে রাজি নই, কারণ এরচেয়ে আর কিছু দেওয়ার আছে বলে মনে করি না। প্রাক স্বাধীন ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত দায়িত্বে সম্পূর্ণ অহিংসভাবে অসহযোগ আন্দোলনে সর্বপ্রথম কৃতিত্বের দাবিদার যে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ, যাকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মুকুটহীন রাজা, এই অভিধায় ভূষিত করেছিলেন সে-কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। বর্তমানে সত্যিই শাসমল সম্পর্কে নতুন মূল্যায়ণের প্রয়োজন। জাতীয় ইতিহাস অহরহ, দিবা-রাত্রি আলোচিত হবে ঠিকই কিন্তু তা আঞ্চলিক ইতিহাসকে অবজ্ঞা এবং তার নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তাকে উপেক্ষা করে নয়। তবেই মহান ভারতের ইতিহাসের ধারা কল্লোলিনী, স্রোতোস্বিনী গঙ্গার মত সবার কাছে প্রাণদায়ী হিসাবে সুস্বাদু হয়ে উঠবে।

সূত্রনির্দেশ

১ রত্নালেখা রায়, চেঞ্জেস ইন বেঙ্গল এগ্রেরিয়ান সোসাইটি, ১৭৬০-১৮৫০, ১৯৭৯, পৃ ১৩২

২ হিতেশরঞ্জন সান্যাল, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, চতুরঙ্গ, বর্ষ ৩৮, কার্তিক ও পৌষ, ১৩৮৩, পৃ ১৮৭

৩ ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্ট অফ বেঙ্গল, তৃতীয় খণ্ড, প্রকাশিত ১৮৭২, পৃ ৪৯-৫১

৪ হিতেশরঞ্জন সান্যাল, পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৭

৫ পূর্বোক্ত

৬ সুমিত সরকার, 'পপুলার' মুভম্যান্ট এ্যাণ্ড 'মিডিল ক্লাস' লিডারশীপ ইন লেট কলোনিয়েল ইণ্ডিয়া : এস. জি. দেউসকর, লেকচারস অন ইণ্ডিয়া হিস্টরী, ১৯৮০, প্রকাশ ১৯৮৩, পৃ ৩০

৭ বিনোদশঙ্কর দাশ সম্পাদিত, মেদিনীপুর : ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, প্রথম খণ্ড, প্রকাশ ১৯৮৯, ২৪৬

৮ রঞ্জতকান্তি রায়, সোসিয়েল কনফ্লিক্ট এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল ১৮৭৫-১৯৪৭, প্রকাশ ১৯৮৪, পৃ ৭৬

৯ হিতেশরঞ্জন সান্যাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭ থেকে ১৮৮

১০ ঐ, পৃ ১৮৮

১১ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, মেদিনীপুর সল্ট পেপারস, পৃ ১৪০

১২ সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রকাশ ১৯৬৬, পৃ ৯৯

১৩ এল. এস. এস ওমেলি, বেঙ্গল ডিসট্রিক গেজেটিয়ারস, মেদিনীপুর, কলকাতা, ১৯১১, পৃ ৯৫-৯৮

১৪ হিতেশরঞ্জন সান্যাল, পূর্বোক্ত, পৃ ৮৬

১৫ বিনোদশঙ্কর দাশ (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত উল্লিখিত, এ. কে. জেমসন, ফাইনাল রিপোর্ট অন সার্ভে এ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন—ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অফ মির্জাপুর ১৯১১-১৯১৭, কলকাতা ১৯১৮, পৃ ১১১-১১২

১৬ বিমলচন্দ্র সিংহ, পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস, প্রকাশ ১৩৬২, আশ্বিন, পৃ ১০-১১

১৭ ঐ, পৃ ১১

১৮ রবীন্দ্র কুমার, এসেজস ইন দি সোসিয়েল হিস্ট্রী অফ মডার্ণ ইণ্ডিয়া, প্রকাশ ১৯৮৩, পৃ ১৩

১৯ মাখনলাল সেন, স্বাধীন রাষ্ট্রে সংবাদপত্র, রামানন্দ বক্তৃতা ১৯৪৯, প্রকাশ ১৯৫৬, পৃ ২৮

২০ হিউজ টিঙ্কার, দি ফাউণ্ডেশন অফ লোকাল সেল্ফ গভর্ণমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান এ্যাণ্ড বার্মা, প্রকাশ ১৯৫৪, পৃ ১১৭-১১৮

২১ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সত্যাগ্রহ ইন বেঙ্গল, প্রকাশ ১৯৭৮, পৃ ১৯ ২০

২২ নরেন্দ্রনাথ দাস, হিস্টরী অফ সিঙ্গাপুর, প্রকাশ ১৯৬২, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৭৮

২৩ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, স্রোতের তৃণ, প্রকাশ ১৩২৯, পৃ ৫-১০

২৪ ঐ, পৃ ১১

২৫ বসন্তকুমার দাস (সম্পা.), স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, প্রথম খণ্ড, প্রকাশ ১৯৮০, পৃ ২৬৫-২৮০

২৬ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ ২৩-২৮

২৭ ঐ, পৃ ২৯

২৮ ঐ, পৃ ৩০-৩২

দুই মহকুমার উপর ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগ ১৯৪২

বাণীব্রত ত্রিপাঠী[১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করার জন্য ভারতবর্ষে 'ভারতরক্ষা আইন' (Defence of India Act) নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল আইন বলবৎ করা হয়েছিল। ভারত সরকার এই ধরনের আইনের প্রয়োজন উপলব্ধি করে প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনকে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে যুদ্ধাবসানে এই জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।[১]

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারত শাসন আইনে'র ৯নং তালিকায় ৭২নং অনুচ্ছেদে ভারতরক্ষা আইনের উল্লেখ করা হয় এবং যা পরবর্তীকালে ১৯৩৯ সালে Defence of India Ordinance নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৩৯ সালে 'ভারতরক্ষা' আইনে বলা হল যে দেশের অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনকে যে-কোন মুহূর্তে পুনরায় সংশোধন করা যাবে। এই আইন পুনরায় ভারত সরকার ১৯৪২ সালে ২২ মে সংশোধন করে যা 'New Delhi Ordinance No-XXIII of 1942' নামে পরিচিত।

এখন প্রশ্ন হল এই আইনের উদ্দেশ্য কি ছিল—কেনই বা বাংলাদেশের কয়েকটি জেলার সঙ্গে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক, এই দুই মহকুমায় বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল ?

১৯৪২ সালে জাপানী সৈন্য ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হলে ব্রিটিশ সরকারের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং যে-কোন মুহূর্তে ভারতবর্ষে জাপানী সৈন্য অনুপ্রবেশের আশঙ্কা দেখা দেয়, তাছাড়া ক্রীপস মিশনের ব্যর্থতা (১৯৪২ এপ্রিল) ব্রিটিশ ভারতের অভ্যন্তরীণ জটিলতা, সবকিছু মিলেমিশে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তাকে আয়ত্তে আনার উদ্দেশ্যে সরকারকে ১৯৩৯ সালের এই আইনকে ১৯৪২ সালে পুনঃসংশোধন করতে হয়। এই সংশোধনী বিষয়গুলির

[১] গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যে ৪নং অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়টির মধ্যে যানবাহন চলাচল সংশোধনী অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

(ক) এই আইনের ৪নং অধ্যায়ে ৬২নং অনুচ্ছেদে বলা হল প্রাদেশিক সরকার প্রয়োজনবোধে মেয়াদ অতিরিক্ত চার মাস পর্যন্ত 'ভারতরক্ষা' আইনকে বাড়াতে পারবে ;

(খ) উক্ত অধ্যায়ের ৬০নং অনুচ্ছেদে আধিকারীকের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা হয়েছিল। পরিবহন আধিকারীক প্রয়োজনবোধে জনগণের স্বার্থে যে-কোন যানবাহনের অনুমোদন বাতিল করতে পারবেন এবং জনস্বার্থের খাতিরে যানবাহনগুলিকে যে-কোন জায়গায় নিয়োগ করতে পারবেন। তাছাড়া প্রাদেশিক সরকার প্রয়োজন অনুভব করলে পরিবহন আধিকারীককে যে-কোন মুহূর্তে যানবাহনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ বা অনুমোদন বাতিল করার জন্য আদেশ দিতে পারবেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তমলুক ও কাঁথি মহকুমার উপর 'ভারতরক্ষা' আইনকে সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা কি ছিল ? মূলত মহকুমা দুটি ছিল সমুদ্রতীরবর্তী এবং জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল এইরূপ সরকার স্থির করেছিল। যাইহোক ১৯৪২ সালে ২৭ মার্চ বাংলা সরকার 'বঞ্চনা' নীতির (Denial Policy) আশ্রয় গ্রহণ করে, যা 'ভারতরক্ষা' আইনেরই অঙ্গবিশেষ। ২৭ মার্চ এক সরকারী ইস্তাহারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাঁরা যেন এই মহকুমার বাই-সাইকেল মালিকগণকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজেদের নিকটবর্তী থানাগুলিতে সাইকেলগুলিকে রেজিস্ট্রি করতে নির্দেশ দেন। বলা হল যে, প্রত্যেক মালিককে একটি রেজিস্ট্রিকৃত প্লেট প্রদান করা হবে। যদি কোন কারণে প্লেটটি হারিয়ে যায় তবে থানায় জানাতে হবে এবং স্ব-খরচে পুনরায় রেজিস্ট্রিকৃত প্লেট গ্রহণ করতে হবে।

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এম. এন. খান এক নির্দেশ জারি করেন এবং ৫ থেকে ২০ এপ্রিলের মধ্যে এই দুই মহকুমায় সকল সাইকেল মালিককে সাইকেল রেজিস্ট্রি করার জন্য নির্দেশ দেন।

২৮ এপ্রিল তদানিন্তন কাঁথির মহকুমাশাসক প্রফুল্লমোহন দাসগুপ্তের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নরূপ :—

"সমুদ্রোতীরবর্তী স্থানের অধিবাসীদিগকে জাপানী শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, আক্রমণ এসে গেছে। ঐ স্থানের নৌকাগুলি যাতে শত্রুর ব্যবহারে আসতে না পারে

সেজন্য নৌকাগুলিকে রাণীচক (ঘাটাল) পাঠানো হচ্ছে, যেহেতু বর্তমানে ঐ স্থানটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। গেঁওখালি নদীর দক্ষিণে কোন নৌকাকে থাকতে দেওয়া হবে না। কিন্তু গেঁয়োখালি হতে নৌকা রাণীচক ও তার উত্তর পর্যন্ত অবাধে চলাচল করতে পারবে। নৌকাগুলি রাণীচকে না পৌছানো পর্যন্ত সরকার থেকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। কোন দাঁড়ি-মাঝিকে অনাবশ্যক রূপে আটকানো হবে না বা যুদ্ধে পাঠানো হবে না। যেসব নৌকা ভেঙে বা অন্য উপায়ে নষ্ট করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না।

উদ্বৃত্ত ধান (Commercial Surplus) অপসারণ সম্বন্ধে যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে তা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কারণ সরকার হতে বাধ্যতমূলক ধান অপসারণের কোন হুকুম দেওয়া হয় নি। সরকার হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে জনগণ স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত ধান বিক্রয় করে ফেলবেন এবং এজন্য সরকার কনট্রাক্টর (Contructor) নিযুক্ত করেছে বিভিন্ন স্থান হতে তারা ন্যায্যমূল্যে ধান খরিদ করবে। অনাবশ্যক ধান এক জায়গায় আটক রাখা (Hoarding) আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। নিত্য-প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারী তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট কতকগুলি নৌকা চলাচল করবে। মিথ্যা গুজব রটাবেন না বা বিশ্বাস করবেন না বরং স্থানীয় সার্কেল অফিসারকে অথবা প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে কে বা কারা রটাইতেছে এবং উহার সত্যতা নিরূপণের চেষ্টা করবেন।"

কাঁথি মহকুমা থেকে রেলস্টেশন ৪০/৪২ কি.মি. দূরে অবস্থিত হওয়ায় আমদানি রপ্তানির জন্যে জলপথই একমাত্র ভরসা ছিল। যেখানে শতাধিক নৌকা সমস্ত কাঁথি মহকুমাবাসীদের প্রয়োজন মেটাতে হিমসিম খেত সেখানে এই মহকুমার জন্য ১৫ খানি নৌকাকে পণ্য পরিবহনের জন্য অনুমতি দান করে। কেবলমাত্র কাঁথির জন্য যে পাঁচখানি নৌকার মালিককে পণ্য পরিবহনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তাঁরা হলেন : খগেন্দ্রনাথ শাসমল, ক্ষেত্রমোহন বেরা, অমূল্যরতন বেরা, (কাঁথি), শ্রীনাথচন্দ্র জানা (শাঁশবাই), নিশিকান্ত মাইতি (গোপালনগর)। এই সমস্ত মালিকদের নৌকাগুলিকে কাঁথি ও ভাঁইটগড়ের মধ্য দিয়ে কলকাতা পর্যন্ত যাতায়াতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

রামনগর থানা : গোবিন্দপ্রসাদ রঞ্জিৎ (বড়রাম মাইতি বাড়) ও নয়াপ্রসাদ করণ (নয়াপুট) এই দুই বোট-মালিকের বোট দুখানিকে কাঁথি, সাতমাইল ও কলকাতার মধ্যে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

ভগবানপুর থানা : প্রাণকৃষ্ণ খামারী (ভাঁইটগড়) ও গোবিন্দপ্রসাদ মাইতি (কৃষ্ণলালচক) এদের দুখান বোটকে ভাঁইটগড় ও কলকাতার মধ্যে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

খেজুরী থানা ঃ প্রফুল্ল মাইতি (গোপিচক) ও প্রফুল্ল গিরি (নাচিন্দা) এদেরকেও একই স্থানের মধ্যে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

এগরা থানা ঃ হারাধন মাইতি (আমতলিয়া) ও নরেন্দ্রনাথ সাহু (দুবদা) এদের বোট দুখানিকে বালিঘাই, সাতমাইল, ভাইটগড় থেকে কলকাতা পর্যন্ত অনুমতি ছিল।

পটাশপুর থানা ঃ হরেকৃষ্ণ সাহু (দারুয়া) ও পঞ্চানন পড়্যা (কানাইদীঘি) এদেরও বালিঘাই, ভাইটগড় ও কলকাতার মধ্যে যাতায়াতের অনুমতি ছিল।

যানবাহন চলাচলের এই বিধিনিষেধ চালু হওয়ার পর বর্ধমান বিভাগের কমিশনার এস. কে. হালদার, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এম. এন. খান এবং পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কাউন্সিল অবস্থা নিরীক্ষণের জন্য সরেজমিনে তদন্ত করতে যান।

ক্রমাগত দু' বছর বন্যার ফলে ধানের উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাছাড়া 'ভারতরক্ষা' আইনে নৌকাগুলি আটকের ফলে বালেশ্বর ও রেঙ্গুন থেকে যে ধান আমদানি হত তা বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কাঁথি মহকুমার বিভিন্ন থানা কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণ (বিপিনবিহারী মহাপাত্র, বলাইদাস মহাপাত্র, গোপীনাথ বেরা, উমাচরণ মণ্ডল, কৌস্তবকান্তি করণ, ডাঃ বিমলচন্দ্র প্রধান, অশ্বিনীকুমার মাইতি ইত্যাদি) জনগণের নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত ধান বিক্রয়ের আবেদন করেন সামগ্রিক অবস্থাকে মোকাবিলার জন্য।

বঞ্চনানীতির দ্বারা যে সমস্ত বাই-সাইকেলগুলিকে তমলুক ও কাঁথি মহকুমা থেকে আটক করা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে ২০৪টি ১৯৪৩ সালের প্রথমার্ধে রিলিফ দানের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সরকার নির্দেশ দেয়। ১৯৪২ নভেম্বরে সরকার এক আদেশ জারি করে। এই আদেশে বাংলার ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিস, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষণা করেন যে, ইতিপূর্বে বর্ধমান বিভাগের পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে যে ২৫টি সাইকেল ম্যাসেঞ্জার সার্ভিসের (messengrs service) জন্য দেওয়ার কথা উঠেছিল সেইরূপ উদ্দেশ্য বর্তমান সরকারের নাই। এই সময় হিজলী ডিভিশানের রিলিফ কাজের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট Executive Engineer-কে চারটি সাইকেল বিক্রয়ে সম্মত হন। এইগুলি 'বঞ্চনা' নীতির দ্বারা আটক জমা থেকে দেওয়া হয়েছিল এবং সাইকেল চারটিকে মেরামতের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৪৩-এর জুন মাসে এক সরকারী আদেশে বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলীর পুলিস বিভাগের ব্যবহারের জন্য মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কতকগুলি বাই-সাইকেল অনুমোদন করেন। এগুলিও 'বঞ্চনা' নীতিতে আটক স্থান

থেকে দেওয়া হয়েছিল এবং সেইগুলিকে মেরামতের জন্য ২৭,৬৬৯ টাকা অনুমোদন করা হয়।

১৯৪৩এর শেষদিকে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 'বঞ্চনা' নীতি অধিকৃত বাই-সাইকেলগুলিকে 'Communications and work' বিভাগকে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তা এ-আর-পি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ওভারশেয়ারের অনুমোদন লাভ করে। ঐ বছর আগস্ট মাসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অধিকৃত সাইকেলগুলিকে জেলা নেতা বা জাতীয় সমর পরিষদকে দিতে সম্মত হন, যদি তারা সাইকেল মালিকদের প্রকৃত ক্রয়মূল্য দিতে সম্মত হন। ঠিক ঐ মাস থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মাসিক ২০ টাকা বেতনের বিনিময়ে অধিকৃত বাই-সাইকেলগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনজন গার্ড নিযুক্ত করেন। ১৯৪৩এর ১ এপ্রিল থেকে নয় মাস পর্যন্ত এই নিয়োগ কার্যকরী থাকবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়। নভেম্বর মাসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খড়্গপুর ২নং ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশানের ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারকে ৪ খানা সাইকেল দিতে সম্মত হন, কিন্তু নির্দেশে বলা হল যে প্রয়োজন শেষে সরকারকে পূর্বের অবস্থা মত ফেরৎ দিতে হবে। ঐ মাসের শেষদিকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খড়্গপুরের Area Warden Workshop এবং Officer Commanding W. S. Companyকে বেশ কিছু সাইকেল বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৫ সালে মার্চের শেষদিকে পুনরায় চারজন গার্ডকে নিযুক্ত করা হয় অধিকৃত সাইকেল-গুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫এ এদের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবে বলা হল।

১৯৪৩ সালে এপ্রিল মাসেই বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, হাওড়া, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলাগুলির মধ্যে নৌ চলাচলের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কীয় একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। মেদিনীপুরের রূপনারায়ণ নদীর উপর কোলাঘাট সেতুটি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অধিকৃত কয়েকটি নৌকাকে মাসিক ৬৮ টাকা বেতনের বিনিময়ে এক বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়। এই নির্দেশ ১৯৪৩ সালের ১০ মার্চ থেকে কার্যকরী হবে বলে ঘোষণা করা হয়। ঐ বছর নভেম্বরের প্রথমদিকে সরকার মাসিক ১২৫ টাকা ভাতার বিনিময়ে 'সত্যনারায়ণ' নামে একটি মোটরলঞ্চকে মেদিনীপুরের হিজলী টাইডেল ক্যানেলে যোগাযোগ রক্ষার নিমিত্ত তিন বছরের জন্য নিয়োগ করে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ বলবৎ থাকবে বলা হয়।

এই দুই মহকুমায় 'বঞ্চনা' নীতি দ্বারা যে সমস্ত মোটরগাড়িগুলিকে অধিকৃত করা হয়েছিল তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অস্থায়ীভাবে কয়েকজন

ড্রাইভার ও ক্লিনার নিয়োগ করা হয় মাসিক ২০ টাকার বিনিময়ে এবং যে-সমস্ত মোটর মালিকদের গাড়িগুলি অধিকৃত হয়েছিল তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকার থেকে মাসিক ৫,৭০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তাছাড়া অধিকৃত মোটরগাড়ির মধ্যে কয়েকটিকে মেদিনীপুর জেলার বাইরেও পাঠানো হয়েছিল। যাইহোক যে সমস্ত ড্রাইভার ও ক্লিনারদের নিয়োগ করা হয়েছিল ঐ বছর ২৬ মে থেকে তাদের কার্যকালের মেয়াদ তিন মাস বৃদ্ধি করা হয় এবং বেতন ২০ থেকে বৃদ্ধি করে ৪০ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বেতন ও কার্যকালের মেয়াদ আরও বৃদ্ধি পায় এবং শেষপর্যন্ত তা ৫০ টাকাতে পৌঁছায়।

১৯৪২ সালে Collective Fines Ordinance চালু হয় যা, 'ভারত-রক্ষা' আইনেরই অংশবিশেষ। ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন' আইনের ৯নং তালিকায় ৭২নং অনুচ্ছেদে এই ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণের সম্পত্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, সরকারী দপ্তরগুলিকে রক্ষা করা এবং আসন্ন যুদ্ধকে প্রতিরোধকল্পে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখা, যদি কোন স্থানের এই সমস্ত বিষয়গুলি জনগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয় তবে সরকার ঐ সমস্ত স্থানের জনগণের উপর এই ফাইন ধার্য করবেন। এমনকি সন্দেহভাজন কোন একটি বিশেষ পরিবারের উপরও এই আইন ধার্য হতে পারে, বলা হয়। এই আইন কেবলমাত্র হিন্দুদের উপর আরোপ করা হয়েছিল, মুসলিমদের উপর নয়।

বাংলাদেশে সমস্ত জেলাগুলির মধ্যে মেদিনীপুরে সর্বাধিক কালেক্টিভ ফাইন ধার্য করা হয়েছিল। নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল:

বর্ধমান—৭৫৫০০'০০ টাকা
বীরভূম—৬৫০০'০০ টাকা
মালদহ—৬৫০০০'০০ টাকা
বাখরগঞ্জ—২০০০০'০০ টাকা
মুর্শিদাবাদ—১২০০০'০০ টাকা
হুগলী—১১৪০০'০০ টাকা
হাওড়া—১০০০'০০ টাকা
দিনাজপুর—৭৫৫০০'০০ টাকা
মেদিনীপুর—২২৯০০০'০০ টাকা
ঢাকা—৫৯২১০'০০ টাকা
ফরিদপুর—১৯৫০০'০০ টাকা
চট্টগ্রাম—২০০০'০০ টাকা

আগস্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরে সরকারী সম্পত্তির সর্বাধিক হওয়ায় ফাইনের পরিমাণ এই জেলার উপর সর্বাধিক ছিল। কিন্তু ১৯৪২ অক্টোবর মাসে সাইক্লোন ও মহামারী এই জেলাকে গ্রাস করে ফেলে। অনুরূপায় অবস্থায় সরকার এই ফাইন অনেক পরিমাণ নাকচ করে।

এই দুই মহকুমায় 'ভারতরক্ষা' আইনে যে সমস্ত ব্যক্তিদের আটক করা হয়েছিল তাদের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দেওয়া হল ঃ

কুমারচন্দ্র জানা, রাসবিহারী পাল, ঈশ্বরচন্দ্র মাল, সুবোধকুমার চক্রবর্তী, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, চণ্ডীচরণ দত্ত, রজনীকান্ত প্রামাণিক, মোহিনীমোহন পতি, রমাকান্ত মাইতি, অমলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র দাস, অবন্তীকুমার পাত্র, ফণীভূষণ দাস, মনোজকুমার সিংহ, সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীলকুমার ধাড়া, গোপীনন্দন গোস্বামী, বরদাকান্ত কুইতি ইত্যাদি। এদের মধ্যে তমলুক মহকুমায় গ্রেপ্তার হয়েছেন (১৯৪২ থেকে) ১৮৬৮ জন, বে-আইনী গ্রেপ্তার ৫,৩৭৬ জন। সরকারী হিসাব অনুসারে কাঁথি মহকুমায় এই গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৭০০০এর কাছাকাছি।

সূত্রনির্দেশ

১ অতুলচন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস, পৃ ৮৪

২ যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ ৫০২ ৫০৭

৩ গোপীনন্দন গোস্বামী, বাংলার হলদিঘাট তমলুক, পৃ ৫৪-৫২

৪ ঐ, মেদিনীপুরের শহিদ পরিচয়, পৃ ৩৭-৬৮

৫ প্রদ্যোতকুমার মাইতি, বিয়াল্লিশের তমলুক ও তাম্রলিপ্ত, জাতীয় সরকার, পৃ ২০-৩০, ৫৭ ৬৩

৬ ঐ, পূর্বাদ্রি পত্রিকা, ২য় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৮৭

৭ তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি, সর্বাধিনায়ক, পৃ ৩৪-৩৭, ৫৭-৫৯

৮ তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, পৃ ১৭০-১৭৮

৯ বঙ্গভূষণ ভক্ত, নন্দীগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ ১৩৪-১৩৫, ১৫৯-১৬৭

১০ তরুণদেব ভট্টাচার্য, মেদিনীপুর, পৃ ৪৩-৪৬

১১ N. N. Das, History of Midnapore, Vol 1, pp-278-279

১২ R. C. Mazumdar, History of Modern Bengal, Vol 11, pp 337-347

১৩ শ্রীভারতন কুমারাপ্পা, গান্ধী মেলা স্মারকগ্রন্থ (১৯৮১), গান্ধীজীর বাংলা সফর, মেদিনীপুর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

১৪ 'নীহার', সাপ্তাহিক পত্রিকা, কাঁথি, ১৯৪২, মার্চ, এপ্রিল, মে, আগস্ট, সেপ্টেম্বর

১৫ 'তাম্রলিপ্ত', সাপ্তাহিক পত্রিকা, তমলুক, ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৭

১৬ Amrita Bazar Patrika, 1942, 1943, 1944, 1945

১৭ The Statesman, 1944, 1945

১৮ Calcutta Gazatte, 1942

১৯ Police Proceedings, 1942, 1943, 1944

২০ Home Political Confidential File, 1942, 1943, 1944, 1945

২১ Intelligence Branch Reports (I. B), 1943, 1944

২২ Special Branch Reports (S. B.), 1942

২৩ Bengal Legislative Assembly Proceeding, 1942, 43, 44, 45

২৪ N. Mansergh, The Transfer of Power, Vol 11, 1942 Letter : Govt. of India Home Dept. to Secy. of Sate, pp 904-905,

বিয়াল্লিশের আগস্ট এবং অগ্নিগর্ভ কলকাতা

কল্লোল ব্যানার্জী

রেলপথ উঠিয়ে ফেললে
তো পা ভেঙে দিলে সরকারের।
তার কেটে দিলে
তো কান কেটে দিলে সরকারের—
থানা জ্বালিয়ে দিলে
তো চোখ গেলে দিলে সরকারের।[১]

ঢোড়াই চরিত মানস-এর বড়কমোঝি-র এই গানে ব্রিটিশবিরোধী গণজাগরণের যে সক্রিয়তার ছবি দেখি—তার প্রকাশকাল ১৯৪২এর আগস্ট মাস। আগস্টের ইতিহাস, ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের বুকে চাপানো জগদ্দল পাথরকে তুলে ফেলারই ইতিহাস। ১৯৪২এর ৩১ আগস্ট ভীত গভর্ণর জেনারেল, টেলিগ্রাম করে চার্চিলকে জানান, "By far the most serious rebellion since that of 1857", যার ব্যাপকতা ও বিস্তারসংক্রান্ত তথ্যাবলী বিশ্ববাসীর থেকে গোপন রাখা হয়েছে, for reasons of military security."[২]

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মত এই ঘুর্ণিঝড়, উদ্বেলিত করেছিল বাংলাকেও। "This is a largescale rebellion and suitable measures are necessary"[৩] বাংলার গভর্ণর হারবার্ট, মেদিনীপুর প্রসঙ্গে ১ নভেম্বর, এই মন্তব্য করার এক মাস আগেই ২৯ সেপ্টেম্বর, অন্যদের সঙ্গে ৭৩ বছরের এক বৃদ্ধা এবং ১৩ বছরের এক বালক, পাশাপাশি একই মৃত্যুরাখীতে নিজেদের আবদ্ধ করেছে—আগস্টের শপথ বুকে নিয়ে, ব্রিটিশ বুলেট বুকে নিয়ে। বৃদ্ধার নাম মাতঙ্গিনী হাজরা ইতিহাসের অনাদৃত নায়ক।[৪]

ঢাকা নগরীতে পুলিশের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষেই বিপুল বসুকে, হৃষিকেষ সাহা-সহ সতেরো জন তরুণ শহীদ মৃত্যুবরণ করেন—ইতিহাসদেবতার প্রসন্ন দৃষ্টিপাত থেকে যারা এখনও বঞ্চিত।[৫]

ইতিহাস বিভাগ, কান্দী রাজ কলেজ

গণদেবতার গ্রন্থিমোচনের সঙ্কল্প, কলকাতা নগরীতেও সমান তেজে ও কাঠিন্যে উচ্চারিত হয়েছে। ১০ আগস্ট, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন (১৮ নম্বর মীর্জাপুর স্ট্রীট—কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি, প্রভৃতিদের যৌথ পরিচালনাধীন) আর্য-সমাজ হলে সভা করেন, প্রতিভা রায়ের পরিচালনায়। প্রহ্লাদ দের বক্তৃতার পর স্থির হয়, দুদিন পর ছাত্র ধর্মঘট হবে।[৬] ঐ দিনই বাংলা সরকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও এর সমস্ত শাখা কমিটি সমূহকে বে-আইনী ঘোষণা করেন।[৭] ১২ তারিখে বহুসংখ্যক স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে শোভাযাত্রা করে বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে এবং বিভিন্ন পার্কে সভা করে। কলকাতায় প্রথম রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয় ১৩ আগস্ট থেকে।[৮] ঐদিন কলকাতার প্রায় প্রত্যেক স্কুল-কলেজে ছাত্ররা ধর্মঘট করে এবং বিরাট ছাত্রমিছিল করে উত্তর কলকাতার প্রত্যেক কলেজের সামনে কিছুক্ষণ মিটিং করে। প্রধান জনসভা হবার কথা ছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। কিন্তু এই মিটিং শুরু হবার উপক্রম হলে সশস্ত্র পুলিশের একটি বিরাট দল উপস্থিত ছাত্রদের উপর নির্বিচারে লাঠি চালায়, ফলে অসংখ্য ছাত্র আহত হয়। এরই মধ্যে তিনজন ছাত্র সভামঞ্চে উঠে ভাষণ দেবার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে।[৯] বিনা প্ররোচনায় পুলিশের এই বর্বর আক্রমণের সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে এবং সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়।

ঐদিন বিকেলে বহু ছাত্র ও কংগ্রেসকর্মীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে ট্রাম ও বাসের আরোহীদের ট্রামে ও বাসে না উঠতে এবং গাড়ীর চালকদের গাড়ী না চালাতে অনুরোধ করে। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের শ্রীমানী বাজারের কাছে এইরূপ একটি দলের উপর পুলিশ গুলি চালায়। বৈদ্যনাথ সেন নিহত হন[১০] এবং কয়েকজন গুরুতররূপে আহত হন। ১৯৪২এর স্বাধীনতাযজ্ঞে কলকাতায় প্রথম শহীদ হলেন বৈদ্যনাথ সেন। কলকাতার এই সংগ্রামের আগুন দ্রুত বাংলার অন্যান্য জেলাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।

কলকাতার আগস্ট আন্দোলনের অস্তিত্বকাল মাত্র কয়েকদিনের, এই চলতি ধারণা সঠিক নয়। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ভাষায় যা ছিল জনগণের "leonine violence."[১১] কলকাতায় তা ১৯৪২এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সক্রিয় থাকে, এমনকি ১৯৪৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী আই-বি সাব ইনস্পেক্টর জগদিন্দ্রনাথ মজুমদার ছুরিকাহত হন এবং ২ মার্চ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সত্বর মুক্তির দাবীতে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে, প্রভাত দাসগুপ্তর সভাপতিত্বে ১৪০০ ছাত্রর উপস্থিতিতে মিটিং হয়েছিল।

কলকাতার আগস্ট আন্দোলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ঃ

(ক) ট্রামের দড়ি কেটে বিভিন্ন স্থানে ট্রাম চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ট্রামে আগুন ধরানোর চেষ্টা হয়। বহু ট্রাম ভস্মীভূত হয়।

(খ) ছাত্রদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও রাস্তার লড়াইতে অংশ নেয়। উত্তর কলকাতার হাতিবাগান থেকে কলেজ স্ট্রীটে, শিয়ালদহ অঞ্চল ও সেনট্রাল এভেনিউ এবং দক্ষিণ কলকাতারও বেশ কয়েকটি অঞ্চল জুড়ে রণাঙ্গনের বিস্তার ঘটে।[১২]

(গ) রাস্তার লড়াইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল রাস্তার ব্যারিকেড রচনা করে লড়াই করা। অসংখ্য চিঠি ফেলার বাক্স, ইলেকট্রিক ফিউজ বক্স, ফায়ার অ্যালার্ম বক্স, ল্যাম্পপোস্ট ভেঙে ফেলে এবং ডাস্টবিন ও ঠেলাগাড়ী ইত্যাদি দিয়ে রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করা হয় এবং এর আড়াল থেকে সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ চলে বিশেষত উত্তর কলকাতায়। সংঘর্ষের তীব্রতা বোঝানোর জন্য একদিনের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে—১৪ আগস্ট, সেনট্রাল এভেনিউ ও বিডন স্ট্রীটের সংযোগস্থলে পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণে আট ব্যক্তি আহত হয় এবং ঐদিনই সার্কুলার রোডে পুলিশের গুলিতে দু'জন নিহত হয় ও কয়েকজন আহত হয়। আহতদের মধ্যেও কেউ কেউ পরে মৃত্যুবরণ করে। রাস্তার ব্যারিকেড রচনা করে ব্রিটিশ পুলিশ-মিলিটারির সঙ্গে বিদ্রোহী জনতার দীর্ঘদিন ধরে লাগাতার লড়াই, কলকাতার ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম।

দিনের বেলায় খণ্ডযুদ্ধে অনেক স্থানে পুলিশ ও মিলিটারি পশ্চাৎ অপসারণ করত, যারা প্রতিশোধ নেবার জিঘাংসায় ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে রাস্তায় বেরিয়ে নিরীহ পথচারীদের গুলি করে খুন করত। সব মিলিয়ে এটা সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা, যার সাক্ষী ক্রান্তি কবিতার রচয়িতা সমর সেন। (ক্রান্তি কবিতার রচনাকাল ১৯৪২-৪৩)

"পথে আজ লোক নেই, জবাবী হামলা হলো শুরু
কারাগার অবারিত দ্বার, গ্রামে গ্রামে বিপর্যয় ;
রাস্তায় নিরস্ত্র লোক হৃৎপিণ্ডে আহত, সন্ধ্যা রক্তাক্ষরা।"

(ঘ) প্রথম থেকেই রাস্তার লড়াইয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল ট্রামের আরোহী-দের টুপি ও নেকটাই খুলে সেগুলোকে পদদলিত করা—যা ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী ঘৃণার অন্যতম প্রকাশ।[১৩] সম্ভব হলে পুলিশ-মিলিটারির হেলমেটও এইভাবেই সম্মানিত করা হত! হাতিবাগান-গ্রে স্ট্রীট অঞ্চলের আগস্ট আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় কর্মী বিশ্বনাথ মাল জানিয়েছেন হাতিবাগানের

মোড়ে ইউরোপীয় পোষাকে অর্থাৎ ফুলপ্যান্ট ও মাথায় শোলার টুপি দিয়ে যেসব সরকারভক্ত বাঙালীবাবু অফিসে যেত, তাদেরকে বিশ্বনাথবাবুরা গান্ধীটুপি ও ধুতি পরবার অনুরোধ করতেন এবং তাদের হাতে গান্ধীটুপি ও গান্ধীব্যাজ দিতেন। বিশ্বনাথবাবুর মতে তাদের এই আবেদন সম্বন্ধে শোলার টুপিওয়ালাদের প্রতিক্রিয়া ছিল হয় তারা ধুতি পরতেন, নয়ত অন্য কোন রাস্তা দিয়ে ঘুরে অফিসে যেতেন।

এছাড়া বিশ্বনাথবাবু জানিয়েছেন সেন্ট্রাল এভেনিউ দিয়ে ইউরোপীয় সৈন্যদের লরী গেলেই ইট ছোঁড়া হত—তাই মার্কিন সৈন্যরা নিজেদের ব্রিটিশ নয় বলে চিহ্নিত করার জন্য নিজেদের লরী ও জিপের উপরে এবং সামনের কাঁচে আমেরিকার পতাকা লাগাত। মার্কিন সৈন্যভর্তি গাড়ী, জনতা ঘেরাও করলে অফিসাররা বেরিয়ে এসে নিজেদের আমেরিকান বলে পরিচয় দিত, জনতাও আর আক্রমণ করত না। অন্যদিকে ব্রিটিশসৈন্যরা সর্বদাই লরী বা জিপে রাইফেল তাক করে যেত আক্রমণোদ্যত অবস্থায়—যা দেখেই বোঝা যেত, তারা ব্রিটিশ। জনতার আক্রমণে পুলিশ-মিলিটারির বহু লরী ও জিপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(ঙ) রাস্তার লড়াইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজ এবং বিভিন্ন পার্কে জনসভা হয়। দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ কলেজ ছাড়াও হাজরা পার্ক ও রাসবিহারী এভেনিউর ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে জনসভা হত—যেগুলোতে ছাত্র-ছাড়াও বহু সাধারণ নাগরিক যোগ দিতেন এবং জননেতারা বক্তৃতা দিতেন। ক্রমে ছাত্রদের উপস্থিতি ছাড়াই নাগরিকদের জনসভা হতে থাকে। প্রায় প্রত্যেক জনসভাতে পুলিশ লাঠি চালিয়ে সভা ভাঙতে থাকে।[১৪]

(চ) কলকাতার আন্দোলনে মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। বনলতা সেন, নির্মলা রায়, সুষমা রায়, প্রতিভা রায়চৌধুরী, কমলা দাসগুপ্তা—এরা প্রত্যেকেই আন্দোলনে যুক্ত থাকা অবস্থায় ১৯৪২ সালেই ধরা পড়েন। সুষমা রায় এক বছর এবং অন্যরা তিন বছর প্রেসি-ডেন্সী জেলে ছিলেন। এরা সবাই উত্তর কলকাতার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরা ছাড়াও আরো অনেক মহিলা, আগস্ট আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন এবং কারারুদ্ধ হন।[১৫]

(ছ) দক্ষিণ কলকাতার আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেয় কালচার ক্লাব। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন[১৬] মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, অরুণ দত্ত, অমলেন্দু গাঙ্গুলী, নয়ন সেন—এরা আন্দোলনকে সংঘটিত করেন : সাদার্ণ এভেনিউ থেকে গড়িয়াহাটের মোড় হয়ে ভবানীপুরের জগুবাবুর বাজার পর্যন্ত ছিল এদের

কার্যকলাপের পরিধি—ছাত্রবিক্ষোভ, হরতাল-ধর্মঘট, ট্রাম ও পোস্টঅফিসে অগ্নিসংযোগ, পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ—সর্বত্রই জনতাকে নেতৃত্ব এরাই দেন। ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে এরা সবাই গ্রেপ্তার হয়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন।

(জ) আগস্ট আন্দোলন চলার সময় কলকাতায় একটি গুপ্ত বেতার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়—যেখান থেকে আন্দোলনের সংবাদ প্রচার ও কর্মীদের প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের নির্দেশ দেওয়া হত। এই গুপ্ত বেতারকেন্দ্রের সমস্ত কর্মী গ্রেপ্তার হলে বেতারকেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়।[১৭] সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হলে এর প্রতিবাদে ১৯৪২এর ১৮ আগস্ট থেকে দেশীয় সংবাদপত্রগুলো নিজেদের প্রকাশনা বন্ধ রাখে।

(ঝ) আগস্ট আন্দোলন চলাকালীন কলকাতায় বিভিন্ন প্রচারপত্র বিলি করা হয় ও দেওয়ালে আটকানো হয়। ১৯৪২এর ৩১ আগস্ট আপার সার্কুলার রোডের একটি বাড়ী থেকে যেসব প্রচারপত্র পুলিশ আটক করে—তার মধ্যে ছিল ইংরাজী ভাষায়ঃ[১৮]

(1) To British and American Soldiers

(2) An appeal to the members in Government Service

(3) Train Travelling is dangerous

(4) To all employees of the Tata Iron and Steel Company Limited, Jamshedpur

(5) Programme of work

হিন্দিভাষায় লেখা লিফলেটগুলোর মধ্যে ছিল :

(1) Bengal Ke Mazduron se-Nibedan

(2) Sipahio ! Ap Hamare Bhai Ho

(3) Shah-bash Hindusthani police ke Sipahi

(4) Keya Ap Bhi Chhote Rahogey

বাংলাভাষায় লেখা দুটো লিফলেট পাওয়া যায়, যেগুলোর নামে পুলিশের রিপোর্টে ইংরাজী ভাষায় দেওয়া আছে :

(1) A. I. C. C. instructions to the workers in Bengal

(2) Labourers on the way to freedom

বিদ্রোহী জনতার মেজাজ ও মানসিকতা এই প্রচারপত্রগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। পুলিশ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত এই প্রচারপত্রগুলোর মধ্যে দিয়ে লক্ষ্যণীয় হল—শ্রমিকশ্রেণীকে ও পুলিশকর্মীদের আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ

করার আহ্বান জানানোর এবং সম্ভবত ব্রিটিশপক্ষত্যাগী পুলিশকর্মীদের অভিনন্দন জানানোর প্রচেষ্টা।

(ঞ) বাহ্যিক আবরণে অহিংসার পূজারী হয়েও হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের পথে হেঁটে চলার প্রবণতা কলকাতার কোন কোন নেতার ছিল। বাংলা গোয়েন্দা পুলিশের বড়কর্তার প্রতিবেদনে জানা যায়, যুগান্তর দলের নেতা সুধীর ঘোষ, ১৯৪৩ সালের ২৬ জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে, কলকাতার সমস্ত পুলিশস্টেশন দখল করবার পরিকল্পনা করেন। তিনি গেরিলাযুদ্ধের জন্য দল গঠনও করতে চান। সুধীরবাবুর জন্য বোমার খোল তৈরী করেন 'বেলেঘাটা পন্তীর ওয়ার্কস'-এর কানাই ব্যানার্জি ; যে প্রতিষ্ঠানটি, সংশোধিত সন্ত্রাসবাদীদের জীবিকাসংস্থানের জন্য সরকারী আনুকূল্যে পরিচালিত হত। পুলিশ রিপোর্টে সুধীর ঘোষ "বোতল বোমা" (বোতলের মধ্যে পেট্রল, কেরোসিন, সেলুলয়েড ফিল্ম ও রবার ভরা থাকত) নির্মাণে সিদ্ধহস্ত বলে চিহ্নিত হয়েছেন, যদিও ১৯৪২এর ১৩ নভেম্বর গ্রেপ্তার হবার পর তিনি নিজেকে "a champion of non-violence" বলে দাবী জানান।[১৯]

১৯৪২এর কলকাতার নগরদেহে যে উত্তাপ সঞ্চার করেছিল, তার তাপমাত্রা মাপবার এটা একটা প্রাথমিক প্রচেষ্টা এটা সেই রক্তচিহ্নিত ৪২, যখন ফজলুল হকের সরকারী হিসেবেই আগস্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে পুলিশ ও মিলিটারির গুলি কলকাতায় কুড়িজনকে খতম করে ;[২০]

এটা সেই অগ্নিগর্ভ ৪২, যার অগ্নিকন্যা আসামের কণকলতা বড়ুয়া ২০ সেপ্টেম্বর বিদ্রোহী মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে, নচিকেতার স্পর্ধায়, ব্রিটিশ রাইফেল থেকে কয়েক গজ এবং মৃত্যু থেকে কয়েক মুহূর্ত দূরে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করে মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্র "দেশের জন্য মরবার অধিকার সবারই আছে।"[২১]

এটা সেই গৌরবোজ্জ্বল ৪২, যার নারায়ণী সেনাদের একজন উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস নেতা বাবা রাঘব দাস ধৃত হয়েও পুলিশের কাছে জানায় নিজের প্রত্যয়—"This spontaneous rising of the oppressed···people shall go down in history as one of unprecedented importance ···and I feel proud to have participated in it."[২২]

কলকাতার রাজপথ ও গলিতে, ৪২এর সেই গণদেবতার পদচারণা, জরিপ ও বিশ্লেষণ, আমাদের প্রচেষ্টার লক্ষ্য।

সূত্রনির্দেশ

১ ঢোড়াই চরিত মানস, দ্বিতীয় চরণ, সতীনাথ ভাদুড়ী

২ Linlithgow to Churchill ; Mansergh edited The Transfer of Power, 1942-47, Vol II, p 853

৩ Governor's Secretariat Papers, R/3/2/36/IOL উদ্ধৃত হয়েছে অমলেশ ত্রিপাঠীর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস (১৯০৮-১৯৪৭) নামক রচনায়, যা সম্প্রতি দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে

৪ মাতঙ্গিনী হাজরা এবং লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৪ বছরের পুরীমাধব প্রামাণিক, নরেন্দ্রনাথ সামন্ত এবং জীবনচন্দ্র বেড়া-- 'স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম', দ্বিতীয় খণ্ড, গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য

৫ যুগসন্ধির স্মৃতি, নির্মল রায়চৌধুরী ; আগস্ট বিপ্লব : একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি, নিতাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়, গণবার্তা পত্রিকা, আগস্ট বিপ্লব বিশেষ সংখ্যা, ১২ আগস্ট ১৯৮৯ ; খুবসম্ভব জ্ঞান চক্রবর্তী লিখিত ঢাকা জেলার "কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস" গ্রন্থেও, ঢাকা নগরীতে সতেরো জন শহীদের উল্লেখ আছে।

৬ আগস্ট বিপ্লব ও কলকাতার ছাত্রসমাজ, রূপক গুহ, গণবার্তা পত্রিকা, আগস্ট বিপ্লব বিশেষ সংখ্যা

৭ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, সুপ্রকাশ রায়

৮ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, সুপ্রকাশ রায়, স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, দ্বিতীয় খণ্ড, গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য

৯ গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য

১০ গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য, সুপ্রকাশ রায়

১১ Government goaded the people to the point of madness. They started leonine violence, Gandhi to Linlithgow, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৪৩

১২ সুপ্রকাশ রায়ের গ্রন্থ এবং সংগৃহীত অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে সংঘর্ষের এলাকা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে

১৩ গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য ; আগস্ট বিপ্লবী বিশ্বনাথ মাল মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১৪ আগস্ট বিপ্লব ও কলকাতার ছাত্রসমাজ, রূপক গুহ

১৫ যুগসন্ধির স্মৃতি গ্রন্থের লেখক নির্মল রায়চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১৬ নির্মল রায়চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১৭ সুপ্রকাশ রায়, গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য, এছাড়া 'G' অর্থাৎ গিরিধারীলাল কৃপালনীকে পাঠনো 'A' অর্থাৎ আনন্দ চৌধুরীর খাদি গ্রুপ, কলকাতার আগস্ট আন্দোলনের নেতা, ১৯৪২এর ৬ নভেম্বর তারিখের চিঠিতে, রেডিও ট্রান্সমিটার এখনও পান নি, বলে আনন্দবাবু জানিয়েছিলেন। এই চিঠি পুলিশের হাতে বাজেয়াপ্ত হয়। Quit India Movement, British Secret Report, edited by P. N. Chopra, Appendix A (20). p 336

১৮ Quit India Movement, British Secret Report edited by P. N. Chopra

১৯ Extract from DIG of Police, I B Bengal's review, in Quit India Movement, edited by P. N. Chopra, Appendix 1, pp 378-379

২০ সুপ্রকাশ রায়, গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য, বাংলার প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি অনুসারে আগস্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে সরকারী বুলেটে ২০ জন নিহত ও ১৫২ জন আহত হয় কিন্তু বিভিন্ন হাসপাতালের হিসাব অনুসারে আহত বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার

২১ আগস্ট বিপ্লবে নারী, গণবার্তা পত্রিকা

২২ Quit India Movement, edited by P. N. Chopra, Appendix E, p 383

হিন্দু মহাসভা ও সাম্প্রদায়িকতা

রত্না চক্রবর্তী (বাগচী)

বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে অন্যতম সংকটের কারণ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির তৎপরতা। কিন্তু এটি আধুনিক রাজনীতিতে কোন নতুন সংযোজনে নয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে থেকেই এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি ক্রিয়াশীল ছিল এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল ধারাটিকে এরা বারবার আঘাত করেছে—ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসামের মুসলিম লীগের কথা স্মরণে আসে। তাদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবী, স্বাধীনতাকামী জাতীয় চেতনাসম্পন্ন দলগুলির সঙ্গে অসহযোগিতা এবং সর্বোপরি পাকিস্তান গঠনের দাবী—এসব কিছু পর্যালোচনা করে ভারত বিভাজনের পূর্ণ দায়িত্ব এদের উপর চাপিয়ে দিয়ে আমরা সাধারণত নিশ্চিত হই। (তবে ভারত বিভাজনের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের দায়িত্বকে আমি কোনভাবেই অস্বীকার করছি না।) আমরা ভুলে যাই যে পাশাপাশি আরও কয়েকটি সাম্প্রদায়িক শক্তি তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং এদের আপোষহীন মনোভাব তৎকালীন রাজনীতিকে যথেষ্ট জটিল করে তোলে। হিন্দু মহাসভা এমনই একটি রাজনৈতিক সংগঠন। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার রাজনৈতিক লক্ষ্যে মূলত কোন পার্থক্য ছিল না। উভয়েই ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে চাইত। কিন্তু কংগ্রেসের মত একটি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংগঠন থাকা সত্ত্বেও হিন্দু মহাসভার উদ্ভবের প্রয়োজন কেন দেখা দিল—এটা চিন্তা করার বিষয়। আবার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মত জাতীয় চেতনাসম্পন্ন মানুষ কেন কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে হিন্দু মহাসভায় যোগ দিলেন অথবা সাভারকরই বা কেন তাঁর বিপ্লবী আদর্শকে পাশে সরিয়ে রেখে একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেন—এ প্রশ্নও থেকে যায়। এছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু মহাসভার অবদান কতখানি, হিন্দু মহাসভার আদর্শ কি হিন্দু-মুসলমান দুই

ইতিহাস বিভাগ, হুগলী মহসীন কলেজ

সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে পিছিয়ে দেয় নি—এইসব প্রশ্নের সদুত্তর খোঁজার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির উদ্ভবের পিছনে অন্যতম কারণ নিরাপত্তা-হীনতাবোধ। ব্রিটিশশাসন ভারতে স্থায়িত্বলাভের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী এদেশে এক নতুন ধরনের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন করে, যা ভারতবাসীদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। ব্রিটিশ-রাজত্ব শুরু হওয়ার আগে এদেশে একজন মানুষের সামাজিক দায়িত্ব এবং শাসকের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হত প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং প্রাচীন মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রাচীন ঐতিহ্য মূল্যহীন হয়ে পড়ল। এর সঙ্গে খাপখাওয়াতে না পেরে এদেশের মানুষ অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে এবং বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার হয়। নিজেকে ফিরে পাওয়ার তাগিদে আত্ম-অন্বেষণ শুরু হল নিজ নিজ গোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে। অধিকাংশ সময়ে এ কাজে প্রাচীন ধর্মের সুমহান ঐতিহ্য তাদের প্রেরণা যুগিয়েছিল।[১]

গোড়ার দিকে কংগ্রেসের সদস্য হিসাবেই এরা কাজ শুরু করে। একদিকে ভারতের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বিদেশী শক্তিকে প্রতিরোধ করার তাগিদে প্রাচীন ধর্মের আশ্রয়ে নিজ নিজ গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার বাসনা একই সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু কংগ্রেস যেহেতু একটি সর্বভারতীয় সংগঠন, কোন বিশেষ একটি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা এর নীতি হতে পারে না। আর তাছাড়া, জাতীয় দল হিসাবে কংগ্রেস বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে আপোষের পথও বেছে নিয়েছিল। সুতরাং কংগ্রেসের রাজনীতিতে গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ প্রাধান্য পায়। কিন্তু কংগ্রেসের এই নীতি তার অন্তর্ভুক্ত সব গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। অনেক মুসলিম নেতার ধারণা হয়েছিল যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যে হিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় রয়েছেন তারা মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। অন্যদিকে গোঁড়া হিন্দু নেতারা কংগ্রেসকে দায়ী করছিলেন এই বলে যে মুসলমানসমাজের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে কংগ্রেস হিন্দু-স্বার্থকে অবহেলা করছে। আর যেহেতু কংগ্রেস এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে ধর্মমতনির্বিশেষে যে-কোন ব্যক্তি যোগ দিতে পারে, হিন্দুগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব এই সংগঠন কখনই নিরপেক্ষভাবে পালন করতে পারবে না। এই চিন্তাধারার মধ্যেই হিন্দুদের জন্য যে পৃথক সংগঠনের প্রয়োজন রয়েছে—এই বোধ সুপ্ত রয়েছে।

প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার পুনরুত্থানে যাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের সেই বিশ্বাস কেমনভাবে এল, তা বোধহয় একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসক-গোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতীয়রা সমঝোতার সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। নিজেদের অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য ব্রিটিশ শাসকদের কাছে আবেদন নিবেদনের মধ্যেই তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থেকেছে। এই মানসিকতার পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ ভাগে। সেই প্রথম ভারতীয়রা ব্রিটিশ শাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা শুরু করে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। একদল পশ্চিমের অনুসরণে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হয়। অপরপক্ষ প্রাচীন হিন্দুধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা যে পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির থেকে কোন অংশে হেয় নয়, বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে তা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে—একথা তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত। তারা মনে করত হিন্দুজাতির অধঃপতন ও তাদের জাতীয় চেতনা বিস্মৃত হওয়ার জন্যই বিদেশীরা ভারতবর্ষ শাসন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম মুসলমানরা এসে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে এবং তারপর ব্রিটিশরা ভারতীয়দের শোষণ করছে। বিদেশী শাসকদের অত্যাচার ও হিন্দুদের লাঞ্ছনা, অবমাননা ক্রমশই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে অর্থাৎ বিদেশী শাসকদের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করে প্রাচীন যুগের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি ভারতে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে—এটাই তাদের লক্ষ্য। স্বাধীন ভারতে প্রাচীন গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুসমাজের রীতিনীতির পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের হিন্দু দর্শন ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই হিন্দু সংস্কৃতি, যা ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন পরাধীন থাকার ফলে তার প্রকৃতস্বরূপ হারিয়ে ফেলেছে, তাকে পুনরায় ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে।[২] (ক ও খ)

প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দাবী, হিন্দু জনতাকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা প্রথম থেকেই এদের একটা সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়েছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুমেলার প্রবর্তন, মহারাষ্ট্রে শিবাজী ও গণেশ উৎসবের প্রচলন এবং ১৮৯৯তে ভি. ডি. সাভারকারের নেতৃত্বে মিত্রমেলা বা অভিনব ভারত সোসাইটি গঠন (সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানো যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল)—অর্থাৎ হিন্দু জনতাকে একত্রিত করার

জন্য পুনরুত্থানবাদীদের এরকম সকল প্রচেষ্টাই এমন ছিল সেখানে হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্মমতের (বিশেষত মুসলমানদের) অংশগ্রহণ সম্ভব ছিল না। সে যুগের অন্যতম প্রাচীন পুনরুত্থানবাদী সংগঠনটি ছিল আর্যসমাজ।[৩]

অতএব শুরু থেকেই হিন্দুদের পৃথক সংগঠন গড়ার একটা প্রবণতা রয়েই গিয়েছিল। এই প্রবণতা আরও জোরদার হয় মুসলিম গোষ্ঠীর কর্মতৎপরতার ফলে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলমানরা তাদের নিজস্ব সংগঠন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করে। কোন ইতিবাচক চিন্তা-ধারার ফসল হিসাবে মুসলিম লীগের জন্ম হয় নি। বিচ্ছিন্নতাবোধ, হিন্দু গোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে সবসময় একটা বঞ্চিত হওয়ার ধারণা—এককথায় হীনমন্যতাবোধ মুসলিম সমাজকে জড়িয়ে নিয়ে ফিরছিল। একদিন যে ভারতবর্ষকে তারা শাসন করেছে সেখানে তারা শুধু পরাধীন নয়, হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে—এই আতঙ্ক তাদের সংগঠিত হতে বাধ্য করেছে। তাদের এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ছিল না। হিসাব করলে দেখা যায় যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে নির্বাচিত যে সরকারী সদস্যদের মধ্যে ৪৫ শতাংশই চাকুরিজীবী হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত আর মাত্র ১২ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। যদিও মুসলিমরা তখন ভারতের মোট লোকসংখ্যার প্রায় ২৩ শতাংশ। মুসলিমসমাজে শিক্ষিতের হার যে অনেক কম ছিল এ ব্যাপারে কারোরই দ্বিমত নেই। কিন্তু অতীতে ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের আইনসভায় মনোনয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছে অথচ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্রিটিশরা তখন মুসলমানদের ঐ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। চাকুরীর ক্ষেত্রেও মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। যদিও প্রশাসনের উঁচু পদগুলিতে ভারতীয়দের সংখ্যা এমনিতেই কম ছিল কিন্তু এখানেও হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় ছিল অনেক বেশী। সুতরাং আত্মরক্ষার তাগিদে মুসলমান গোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে মুসলিম লীগের জন্ম হল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশদের বাংলা ভাগের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর ব্রিটিশরা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ দ্বারা হিন্দু শক্তিকে দুর্বল করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগের পৃথক নির্বাচনের অধিকারকে স্বীকৃতি জানাল। এভাবে ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম অভিজাতদের ছত্রচ্ছায়ায় মুসলিম লীগ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে মুসলিম লীগে মৌলবাদীদের প্রাধান্য মুসলিম লীগকে একটি চরম হিন্দু-বিদ্বেষী সংগঠনে পরিণত করেছিল।[৪]

এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে এবং কংগ্রেসের মুসলিমদের প্রতি পক্ষপাত-মূলক আচরণের প্রতিবাদে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে হিন্দুসভা প্রতিষ্ঠিত হল। পাঞ্জাবে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকারী ছিল সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়। কিন্তু ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জমি সংক্রান্ত আইনকানুন হিন্দুদের অর্থনৈতিক ভিৎ কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং তারপরই মোরলে-মিণ্টো সংস্কার অনুসারে যখন মুসলমানদের পাঞ্জাবে আইনসিদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলে ঘোষণা করা হল তখন হিন্দুদের আধিপত্য প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল। এই অবস্থায় হিন্দু-স্বার্থরক্ষার জন্যই হিন্দুসভা গঠনের প্রয়োজন দেখা দিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পরপর পাঞ্জাব হিন্দসভা বাৎসরিক অধিবেশনের আয়োজন করতে থাকে এবং ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে শেষপর্যন্ত সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভার জন্ম হয়।[৫]

প্রথমদিকে হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য ছিল যে কোন উপায়ে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা. "The object of the Sabha, as then defined, was to save Hiuduism from 'the atheists and free thinkers' who in their reformist zeal helped in unsettling prevailing beliefs and customs". অখণ্ড হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও জাতিভেদ প্রথার উপর গড়ে উঠবে। অন্যভাবে বলতে গেলে হিন্দু মহাসভা তখন ছিল একটি "Conservative theocratic force, typically Brahmanic in outlook and behaviour in relation to women and low castes". এই ভাবধারার বীজ লুকিয়ে আছে খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে সামন্ততন্ত্র বিকাশের মধ্যে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী ভারতের ইতিহাসে সামন্ততন্ত্র বিকাশের যুগ। সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপত্তির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এই সময় জমির মালিক হিসাবে ব্রাহ্মণরা রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ফেলেছিল। তাদের সঙ্গে ক্ষমতার লড়াইয়ে এঁটে ওঠা বণিকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বণিকশ্রেণীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সারা ভারতে (একমাত্র পূব ভারত ছাড়া) বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে প্রচলিত ধর্ম-শাস্ত্রের নতুন ব্যখ্যার সাহায্যে ব্রাহ্মণরা ভারতে কঠোর জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তন করে। চণ্ডালের স্পর্শ তো দূরের কথা তার ছায়া মাড়ালেও পাপ—এই ধারণা দ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। শূদ্র ও আরও নিম্নবর্ণের লোকদের চরম অবমাননা শুরু হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই বিশ্বাস জন্মলগ্নে হিন্দু মহাসভাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।[৬] 'Age of Conseat Bill'এর যাঁরা

বিরোধিতা করেছিলেন (Tilak, Khaparde) তাঁরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হিন্দু অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার ভার নিয়েছিল এই সংগঠন। হিন্দু জনগণের সঙ্গে তখনও পর্যন্ত এর যোগাযোগ গড়ে ওঠে নি।[৭]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন (১৯১৪-১৮) হিন্দু মহাসভার দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। যুদ্ধজনিত জরুরী অবস্থায় চাকুরীর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আগের মতে নিজ নিজ অঞ্চলে কোনমতে দিন-যাপন না করে ভারতবাসী ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতেও পরিবর্তন শুরু হয়। ভারতবর্ষের রাজ-নীতিতে যে ভারতবাসী আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে—এই সচেতনতাও তখনও নতুন ভাবে জেগে ওঠে। শুধু তাই নয়, তৎকালীন রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা যে ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে—এটি আরও স্পষ্ট হয়। এই পরিস্থিতিতে হিন্দুদের ক্রমান্বয়ে ইসলামীকরণ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম জাতীয়তাবাদের উত্থান হিন্দু মহাসভাকে ধর্মীয় ভিত্তিতে সারা ভারতের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করতে প্রেরণা যোগায়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনও এই সময় থেকেই লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৫র ৯ এপ্রিল হিন্দু মহাসভার হরিদ্বার সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে 'Hisdus might be reduced even to a minority for they made no coverts to increase their numbers, On the contrary, they were faced with the problem of how best to arrest their diminution [I. O. P/T (1625) pp 9-10] especially of the untochables who from centuries of neglect and contempt had constastinted a natural object of conversion to Islam or Christanity'.[৮]

১৯২১এ গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন তুলে নেওয়ার পরপরই যখন সারা ভারতে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতিবোধ নষ্ট হয়ে গিয়ে ক্রমাগত দাঙ্গা চলতে থাকে তখন এই একই আশঙ্কার প্রতিধ্বনি শোনা যায় ১৯২৩এ হিন্দু-মহাসভার বেনারস অধিবেশনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বক্তব্যে। তিনি সারা ভারতে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাদের অসহায় অবস্থার কবল থেকে মুক্ত করে নতুন উদ্যম ও শক্তিতে ভরপুর করে তোলার উপর বিশেষ জোর দেন। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রস্তাব রাখেন। এছাড়াও স্বেচ্ছায় যারা মুসলিম ধর্মগ্রহণ করেছে বা জোর করে যাদের মুসলিম

ধর্মগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে—উভয়কেই পুনরায় হিন্দু গোষ্ঠীতে ফিরিয়ে নেওয়ার আবেদন রাখেন। জাতিভেদ প্রথা বিলোপ করে হিন্দুগোষ্ঠীর এই বৃহত্তর ঐক্যের প্রস্তাবে সর্বপ্রথম বাধা আসে হিন্দু মহাসভার প্রাচীনপন্থীদের তরফ থেকে। অচ্ছুৎদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অবাধ মেলামেশা এবং অচ্ছুৎদের পৈতে গ্রহণের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে হিন্দুসমাজকে সংস্কারবাদীরা ঐকবদ্ধ করতে চেয়েছিল, প্রাচীনপন্থীদের তা মোটেই মনঃপুত হয় নি। সংস্কাসবাদীরা প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশ অমান্য করেছেন এই অভিযোগ এনেছিলেন প্রাচীনপন্থী নেতৃত্ব (দীনদয়াল শর্মা)। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে এ নিয়ে পুনরুত্থানবাদী সংস্কারপন্থী ও প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে অনেক বিতর্ক হয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য রক্ষণশীল নেতৃত্ব পরাভব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন।[৯]

তবে হিন্দু মহাসভার দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন যে সুদূরপ্রসারী হয় নি, তার প্রমাণ মেলে যখন আমরা দেখি বিংশ শতাব্দীতেও বিশেষ করে বম্বে ও মাদ্রাজে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অচ্ছুৎদের ছায়ার সংস্পর্শে এলে অপবিত্র হয়ে পড়বে—একথা বিশ্বাস করে। হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে বরাবরই ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এবং হিন্দু মহাসভা নিজেকে যতই হিন্দুদের একমাত্র সংগঠন বলে ঘোষণা করুক না কেন উচ্চবর্ণের বিশিষ্ট মর্যাদার ধারণা এই সংগঠনের মানসিকতায় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে নিম্নবর্ণের মানুষকে এই সংগঠন কাছে টানতে পারে নি। পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্রদের মধ্যে অবশ্য হিন্দু মহাসভা তার কিছু সাংগঠনিক কাজকর্ম চালিয়েছিল।[১০]

কিন্তু সে প্রচেষ্টাও সার্থক হয় নি। পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্ররা শেষ পর্যন্ত জোট বেঁধেছিল মুসলিম লীগের সঙ্গে। এর একটা কারণ আগেই বলেছি এই সংগঠনের উচ্চবর্ণের প্রাধান্যদানের মানসিকতা আর দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক। হিন্দু মহাসভার অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও এদের মধ্যে উৎসাহ জাগাতে পারে নি। অখণ্ড হিন্দুস্থানের অর্থনৈতিক ভিত্তি কি হবে এ প্রসঙ্গে ১৯৪৩এর ৩১ ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় N. C. Chatterjee বলেছিলেন 'Sketch at an economic programme for national reconstruction with a definite bias for the country-side. Go back to the villages and take to collective farming on co-operative basis and weed out frogmentation of holding and antiquated methods of cultivation. Our economic nationalism should be planned with a view to develop our rural industries'. তবে নমঃশূদ্ররা তাদের

অর্থনৈতিক শোষণের আশু সমাধান এর মধ্যে খুঁজে পায় নি বরঞ্চ ভেবেছিল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মেলালে হয়ত তাদের অবস্থা কিছুটা পরিবর্তিত হবে।

সঠিকভাবে বলতে গেলে 'হিন্দু মহাসভা' একটি হিন্দু রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২৪এ বেলগাঁও অধিবেশনে হিন্দু মহাসভা কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে স্বাক্ষরিত লক্ষ্ণৌ চুক্তির (১৯১৬ খ্রীঃ) ঘোরতর বিরোধিতা করে। লক্ষ্ণৌ চুক্তির দ্বারা কংগ্রেস মুসলিম লীগের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবীকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল। অন্যদিকে কংগ্রেসের এই আচরণে হিন্দু মহাসভা হিন্দুধর্মের বিপন্নতার আভাস পেয়েছিল। অবশ্য হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যাঁরা সমর্থক ছিলেন তাঁদের মোহভঙ্গ শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের পরিকল্পনা, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের নীতি তাঁরা সুনজরে দেখেন নি। বিশেষত গান্ধীজীর মুসলিম তোষণ নীতি তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিল। ১৯২০এ মুসলিমরা ব্রিটেনের তুরস্ক আক্রমণের প্রতিবাদে খিলাফত আন্দোলন শুরু করে। গান্ধীজী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাতে মুসলিমদের সমর্থন পাবার আশায় খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। এমনকি অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম একটি দাবী ছিল যে ব্রিটিশরা তুর্কী সাম্রাজ্য সংক্রান্ত মুসলিম দাবী পূরণ না করায় কংগ্রেস এই আন্দোলন শুরু করেছে। এরপরই গান্ধীজী অহিংস প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে সবরকম সরকারী প্রতিষ্ঠান বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন। অনেক হিন্দু পুনরুত্থানবাদী নেতা আন্দোলনের এই ধারাকে সমর্থন তো করেনই নি, আবার অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনকে যুক্ত করাও তাদের কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছিল।[১১]

প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর এই নীতি তেমন ফলপ্রসু হয় নি। চৌরিচৌরার হিংসাত্মক ঘটনার পর গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন আচমকা তুলে নেন। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্প্রীতিও ভেঙ্গে পড়ে। ১৯২১এ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের মালাবার উপকূলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। মুসলমানদের আক্রমণাত্মক মনোভাব, জোর করে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা হিন্দুদের ভয় পাইয়ে দেয়। অনেকেই মনে করেন রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মুসলিমরা এই পথ বেছে নিয়েছে; কংগ্রেস মুসলিম আচরণের প্রতিবাদ করলেও হিন্দু নেতাদের ধারণা হয় যে যতটা জোরের সঙ্গে মুসলিমদের এই আক্রমণাত্মক আচরণের প্রতিবাদ করা উচিত ছিল কংগ্রেস তা করে নি।

গোঁড়া হিন্দুনেতা ও কংগ্রেসের মধ্যে মানসিক ব্যবধান তাই বৃদ্ধি পেতেই থাকে।

১৯২১ ও ১৯২৩এর মধ্যে সারা ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের এত অবনতি ঘটে যে চারিদিকে একটা উত্তপ্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। মুসলিম রাজনীতিতে মৌলবাদীদের প্রাধান্য, তাদের পবিত্র যুদ্ধ ও ইসলামিক জাতীয়তাবাদের জিগির হিন্দু নেতাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। দেশের বিভিন্ন অংশে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য হিন্দু মহাসভার শাখা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ যে সকল অঞ্চলে অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করেছিল যেমন পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, বিহার—সেই স্থানগুলিতে হিন্দু মহাসভার নতুন নতুন সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। এমনকি মাদ্রাজ ও বাংলায় যেখানে আগে হিন্দু মহাসভার তেমন কোন প্রভাবই ছিল না, সেখানেও হিন্দু সংগঠন গড়ে ওঠে। অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের মধ্যে দূরত্বও বাড়তে থাকে। ১৯২৫এ হিন্দু মহাসভার অষ্টম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে লালা লাজপত রায় প্রকাশ্যে বলেন যে, কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন হিন্দু সংগঠন আন্দোলনকে দুর্বল তো করছেই, এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলনকেও অনেক পিছিয়ে দিচ্ছে।[১২] তবে বিশের দশকেও কংগ্রেসের হিন্দু নেতারাই বিশেষ করে মহাসভাকে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। এম. আর. জয়াকার, সি. ওয়াই. চিন্তামণি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জয়রাম দাস দৌলতরাম এবং আরও অনেকে কংগ্রেসের সদস্য হয়েও হিন্দু মহাসভা আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।[১৩]

কিন্তু তিরিশের দশকে কংগ্রেসে ও হিন্দু মহাসভার মতপার্থক্য আরও প্রবল হয়। কংগ্রেসের আদর্শ ও পরিকল্পনা উভয়ই হিন্দু মহাসভার নেতাদের কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল। মুসলমানদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনে সামিল করতে গিয়ে কংগ্রেস মুসলিম গোষ্ঠীর প্রতি যে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে তাতে হিন্দু স্বার্থ বিপন্ন হতে বাধ্য—এই ছিল মহাসভার ধারণা। হিন্দু-মুসলিম উভয় গোষ্ঠীর মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা আসবে অথবা স্বাধীনতার পরে উভয়েই একই রাষ্ট্রে মিলেমিশে পাশাপাশি বসবাস করবে—কংগ্রেসের এই স্বপ্ন যে সর্বাংশে ভ্রান্ত এ-ব্যাপারে হিন্দু মহাসভার নেতারা একমত ছিলেন।[১৪] হিন্দু মহাসভার এই যে বিশ্বাস তা যে দেশবাসীর মনে যথেষ্ট সাড়া জাগাতে পেরেছিল তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে আইনসভার সাধারণ নির্বাচনে। সেখানে কংগ্রেসকে অনেক পিছনে ফেলে হিন্দু মহাসভা এগিয়ে যেতে পেরেছিল।

১৯৩০ দশকের শেষ ভাগে ও চল্লিশের দশকে হিন্দু মহাসভার সংগঠন আরও জোরদার হয়। দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে হিন্দু মানসিকতা প্রবল, তাদের উপর এর প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। কেবলমাত্র হিন্দু স্বার্থ-রক্ষা নয় যে-সকল প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে যাতে কোনমতে হিন্দু-স্বার্থ বিপন্ন হতে না পারে—এ ব্যাপারে মহাসভা উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে।[১৫] হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্রম অবনতি এবং ক্রমাগত দাঙ্গা মানুষের সাম্প্রদায়িক চেতনাকে অতিমাত্রায় সচেতন করে তোলে এবং এটাই বোধহয় হিন্দু মহাসভার জনপ্রিয়তার একটা বড় কারণ। এছাড়া সাভারকার, মুঞ্জে ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মত জননেতার যোগদানে হিন্দু মহাসভা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। হিন্দু অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে এবং হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য কেউই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না—এই পরিস্থিতিতে হিন্দুদের নিজস্ব সংগঠন ছাড়া আগ্রাসী মুসলিম দাবীর সামনে হিন্দুরা নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়বে এই চিন্তাই এ সকল নেতাদের হিন্দু মহাসভায় যোগ দিতে উৎসাহ যুগিয়েছে। গান্ধীজীর ক্রমাগত বয়কটের ডাক ও সর্বশেষে এ্যাসেম্বলি বয়কটের আহ্বান (১৯৩০ খ্রীঃ) শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিল। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নির্দল প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে দাঁড়ান এবং ১৯৩৭এ নির্দল প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করার পর হিন্দু মহাসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। বাংলার মন্ত্রীসভায় মুসলিম লীগের প্রাধান্য ও কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তায় হিন্দু মধ্যবিত্ত স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে—এই ভয়ই তাঁকে হিন্দু মহাসভায় যোগ দিতে প্রেরণা যোগায়।[১৬]

এ সময় দেশের রাজনীতিতে হিন্দু মহাসভা ক্রমশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। ভারত ভাগের এরা ছিল ঘোর বিরোধী। মুসলিমদের পাকিস্তান গঠনের দাবী পরিস্থিতির চাপে কংগ্রেস মেনে নিলেও হিন্দু মহাসভা শেষ পর্যন্ত অখণ্ড ভারতবর্ষের দাবীতে অটল ছিল। অখণ্ড ভারতবর্ষ ও হিন্দুজাতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সাভারকার বলেছেন যে, ভারতবর্ষ হিন্দু জাতিরই আদি বাসস্থান। ভাষা, জাতি, সামাজিক রীতি-নীতি ধর্মের দিক থেকে বিভিন্ন পার্থক্য থাকলেও সকলে একই হিন্দুজাতির অন্তর্গত। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে একটি ভৌগোলিক অবস্থান রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছে কিন্তু একমাত্র হিন্দুজাতিকে কেন্দ্র করেই যে এই উপমহাদেশ গড়ে উঠেছে অর্থাৎ এর জাতিগত বিষয়টিকে ব্রিটিশরা বরাবরই উপেক্ষা করে এসেছে। সাভারকার আরও বলেছেন যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশেই একদা আর্যরা বসবাস করত এবং তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎপত্তিস্থলও সেখানেই। কালক্রমে

আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। আর্য ও অনার্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সম্মিলনেই গড়ে উঠেছে এই হিন্দুজাতির ভারতবর্ষ। প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার যে ঐতিহ্য তার সঙ্গে যে একাত্মতা অনুভব করে—সে-ই প্রকৃত হিন্দু। প্রকৃত হিন্দু বলে সেই নিজেকে দাবী করতে পারে যে উত্তরে সিন্ধুনদ থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে নিজের পিতৃভূমি বলে স্বীকার করে নেয় এবং ভারতবর্ষকে যে পুণ্যভূমি বলে মনে করে। এই ব্যাখ্যা অখণ্ড ভারতবর্ষের আদর্শকেই তুলে ধরেছে। এই বিশ্লেষণ আরও পূর্ণতা পায় যখন N. C. Chaterjee বলেছিলেন যে, হিন্দু মহাসভার আদর্শই ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি না ভাষাভেদ, প্রান্তভেদ (The gulf between the provinces, languages and sects) দূর করা যায়।[১৭] এখন এই যে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের উপর ভিত্তি করে যে রাজনৈতিক দলের আদর্শ গড়ে উঠেছে, তা কখনোই ভারতে বসবাসকারী সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা ভারতবর্ষ তো কেবল হিন্দুদের আবাসভূমি নয়। হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রথম থেকেই তাই বিদ্বেষভাবাপন্ন মুসলিম গোষ্ঠীর বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি করেছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম জাতীয়তাবাদের দায়িত্বও এ-ক্ষেত্রে কম নয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের এলাহাবাদ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ইকবাল প্রস্তাব রেখেছিলেন যে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানকে নিয়ে উত্তর-পশ্চিম মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা হোক। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কেমব্রিজের কিছু মুসলিম ছাত্র মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করে এবং সেটিই চৌধুরী রহমত আলি কর্তৃক প্রকাশিত 'Now or Never' পুস্তিকাটির মূল বিষয়। তাদের বক্তব্য ছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা ভারতবর্ষে সকল রকম সমতা নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছে। ইসলাম ভারতে বিপন্ন। অতএব উপরোক্ত প্রদেশগুলি এবং কাশ্মীরকে নিয়ে একটি মুসলিম ফেডারেশন গড়ে তোলা প্রয়োজন। পাকিস্তান নামটি এখানেই প্রথম উচ্চারিত হয়। এই বিভেদকামী প্রবণতা আরও জোরদার হয়েছিল ১৯৩৭এর পর থেকে। তখন থেকেই তারা মুসলিম স্বার্থ ও মুসলিম স্বাধীনতাকে ভারতবাসীদের স্বার্থ ও ভারতবাসীর স্বাধীনতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবতে থাকে। ডঃ সৈয়দ আবদুল লতিফ অখণ্ড ভারতের আদর্শ অবাস্তব বলে মনে করে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'A Federation of Cultural Zones' নামক পুস্তিকায় সংস্কৃতির বিভিন্নতা অনুসারে ভারতকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দেন। পাঞ্জাবের সার মহম্মদ শাহ্ নবাব

মনে করেছিলেন যে ডঃ লতিফের পরিকল্পনা যুক্তিযুক্ত হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ সম্ভব নয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'Confederacy of India' বইতে তিনি ভারতকে পাঁচটি দেশে ভাগ করার প্রস্তাব দেন—উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু অঞ্চল, মধ্যভাগে হিন্দুরাজ্য, রাজপুত রাজ্যগুলিকে নিয়ে রাজস্থান, দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি নিয়ে দক্ষিণ অঞ্চল ও সবশেষে বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল ও আসামকে নিয়ে আরও একটি পৃথক রাষ্ট্র। অর্থাৎ তাঁর প্রস্তাবে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম এই দুই অঞ্চলই মুসলিম সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ছিল। সার সিকন্দর হায়াৎ খান আবার ভারত ভাগের মধ্যে না গিয়ে তাঁর 'Outlines of a Scheme of Indian Federation'এ ভারতে মুসলিম অধিকার ও সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য ভারতকে সাতটি আঞ্চলিক গোষ্ঠীতে ভাগ করার কথা বলেছিলেন। ১৯৩৯এ ব্রিটিশ সরকার 'August offer'-এ লীগকে ভেটো ক্ষমতা প্রদানের দ্বারা আরও সাহসী করে তুলেছিল। ১৯৩৯এ ডিসেম্বরে কংগ্রেস যখন ব্রিটিশ সরকার তাদের দাবী—'যুদ্ধের পর অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা'—পূরণ না করায় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিল লীগ সেই দিনটিকে (২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৯) 'মুক্তির দিন' হিসাবে পালন করে। এরপরই ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগ পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব নেয়। এভাবে সারা ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনা ও সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এরই ফল হিসাবে জাতীয় আন্দোলনের গতি শুরু থেকেই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্তির বিষয়টিও পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।[১৮]

সূত্রনির্দেশ

১ Walter K. Anderson & Sridhar D. Dumle, The Brotherhood in Saffron : The Rashtriya Swayamsevak Sangh & Hindu Revivalism, p 1

২ ক Walter K. Anderson & Sridhar D. Damle, The Brotherhood in Saffron : The Rashtriya Swayamsevak Sangh & Hindu Revivalism, pp 10-11

২ক Amales Tripathi, The Extremist Challenge ; 1st Chapter. Extremism In Indian Politics—Ideological Environment, pp 1-46, Orient Longmans, 1967

৩ Walter K. Anderson & Sridhar D. Damle, The Brotherhood In Saffron : The R. S. S. & Hindu Reviralism, p 17

৪ B. B. Misra, The Indian Political Parties : An Historical Analysis of Political Behaviour upto 1947. Oxford University Press, 1976, pp I54-61

৫ B. B. Misra, The Indian Political Parties : An Historical Analysis of Political Behaviour upto 1947, Oxford University Press, 1976, pp 161-62

৬ Romlia Thapar, A History of India, pp 241-50

৭ M. R. Jayakar, The Story of My life, Vol II, Bombay, Manaktalas, 1967, (Asia Publishing House. pp 517-18

৮ B. B. Misra, The Indian Political Parties : An Historical Analysis of Polical Behaviour upto 1947, Oxford University Press, 1976, p 164

৯ Walter K. Anderson & Sridhar D. Damle, The Brotherhood In Saffron : The R. S. S & Hindu Revivalism, pp 28-29

১০ Dr. Sekhar Bandopadhaya, A Peasant Caste In Protest : The Namasudras of Eastern Bengal, 1872-1937

১১ Walter K. Anderson & Sridhar D. Damle, The Brotherhood In Saffron : The R. S. S & Hindu Revivalism, pp 26-28

১২ পূর্বোক্ত

১৩ B. B. Misra, The Indian Political Parties : An Historial Analysis of Political Behaviour upto 1947, Oxford University Press, 1976, p 164

১৪ A Bird's Eye-View into The Hindu Movement with Special Reference to Bengal-Publicity Department. All India Hindu Mahasabha, Reception Committee

১৫ পূর্বোক্ত

১৬ B. D. Graham, S. P. Mukherjee and the Communist Alternative Soudings in Modern South Aaian History, ed, D. A. Low, pp 333-74, London : Weidenfeld & Nicholson, 1968

১৭ Walter K. Anderson & Sridhar D. Damle, The Brotherhood in Saffron : The R. S. S & Hindu Revivalism, pp 33-34

১৮ B. B. Misra, The Indian Political Parties : An Historical Analysis of Political Behaviour upto 1947, Oxford University Press, 1976, pp 413-33

কলকাতায় নৌ-বিদ্রোহের প্রতিধ্বনি (১৯৪৬)

তাপস রায়

১৯৬৫ সালের ২৯ মার্চ কলকাতায় 'কল্লোল' নাট্যজগতে ইতিহাস তৈরী করল। বিষয়বৈচিত্র্যে, মঞ্চ স্থাপত্যে, প্রয়োগে এবং নাট্যানুরাগে এটি দিগদর্শন এনে দিল ভারতীয় নাটকে। ১৯২৫এ রাশিয়ায় নির্মিত সের্গেই আইজেনস্টাইনের ব্যাটলশিপ পটেমকিন যেমন কিংবদন্তী ও পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি হয়ে আছে। দু'টির বিষয়বস্তুই নৌ-বিদ্রোহ। একটি রাশিয়ায় ১৯০৫এর অন্যটি ভারতবর্ষের বোম্বাইতে ১৯৪৬এর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষলগ্ন থেকে ভারতবর্ষ বিপ্লব ও বিদ্রোহে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। বিশেষত যখন নেতাজীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় সৈন্যদল (INA) ভারতবর্ষে এল।[১] রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বাহিনী (RIN), যাদেরকে এই জাতীয়তাবাদী উত্তাপ থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, দ্রুত INA-র জাতীয়তাবাদী বীরত্বগাথায় অভিভূত হয়ে পড়ে। মূলত রাসবিহারী বসু, যিনি জাপান থেকে INA-র সংগঠনের চালিকাশক্তি ছিলেন, তিনিই নৌ-সংগঠনে অন্তর্লীন যোগাযোগ ও নৌ-বাহিনীর যুব রেটিংদের মনে জাতীয়তাবাদের বীজমন্ত্র রোপন করেন।[২] আর প্রত্যক্ষই 'তলোয়ার' জাহাজের রেটিংরা যাঁরা নিজেদের 'Azad Hindi' বলে পরিচয় দিতেন, ১৯৪৬এর বীরোচিত বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৩] এঁরাই ১৯৪৫এর নৌ-দিবসে RIN-এর Signal School-এর দেয়ালে দেয়ালে লিখেছিলেন—'ভারত ছাড়', 'ব্রিটিশদের হত্যা কর' ইত্যাদি স্লোগান। ২ ফেব্রুয়ারী C-in-C Auchinleckএর আগমন উপলক্ষে অনুরূপ স্লোগান। আর ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬এ বোম্বাই উপকূলে আছড়ে পড়ল ভারতবর্ষে এ-শতকের সর্বপ্রথম ও সম্ভবত সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবটি।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের যে দিকটি আমাদের আলোচ্য, তাহল কলকাতায় এই বিপ্লবের আঁচ কিভাবে লেগেছিল। প্রথমে আমরা দেখে নেব

ইতিহাসের গবেষক

নৌ-সৈনিকদের কার্যকলাপ ও তার প্রতিক্রিয়া। অন্য পর্যায়ে বিবিধ স্তরের মানুষের প্রত্যুত্তর।

বোম্বাই ও করাচির উত্তাল ক্ষেত্র দু'টির পরেই কলকাতা ছিল নৌ-ধর্মঘটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কলকাতায় এই বিদ্রোহের শুরু ১৯ ফেব্রুয়ারী। আর ৬ দিনব্যাপী কলকাতার নৌ-ধর্মঘট বোম্বাইয়ের আগুন স্তিমিত হয়ে যাবার পরও চলতে থাকে। কলকাতার বন্দর ঘাঁটি HMIS Hoogly প্রথম এই বিদ্রোহে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সময় খিদিরপুর ডকে রাজকীয় নৌ-বাহিনীর একটি মাত্র জাহাজ HMIS Rajputna ছিল। HMIS Hoogly-র ৩০০ রেটিং প্যারেড গ্রাউণ্ডে একটি সভায় মিলিত হয়। দশজনের এক স্ট্রাইক কমিটি গঠন করে। তাঁদের দাবী ছিল ঃ (ক) বোম্বাইয়ের বন্দী রেটিংদের মুক্তি, (খ) বিদ্রোহী রেটিংদের কোন ক্ষতিসাধন না করা, (গ) নৌ-বাহিনীতে সমস্ত বিভাগে সাম্য আনা আর (ঘ) দ্রুত সামরিক কার্য থেকে নিস্কৃতি। ২০ ফেব্রুয়ারী এই সংবাদ অন্য জাহাজ ও রেটিংদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করে মহিলা রেটিংদের বীর মহিলারা।[৪] খিদিরপুরের HMIS Rajputna-র রেটিংদের ধর্মঘটে যোগ দিতে আহ্বান জানান হয়। আর ২১ ফেব্রুয়ারী কলকাতাস্থ সমস্ত নৌ-ঘাঁটিগুলি ধর্মঘটে সামিল হয়। ইতিমধ্যে লর্ড সিনহা রোডের নৌ অফিসার মেসের পাচক, খাদ্য পরিবেশক ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীরাও ধর্মঘটে সামিল হয়।[৬] ২২ ফেব্রুয়ারী প্রায় ৫০০ রেটিং ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে।[৭] বোম্বাই ও করাচির মত কলকাতার রেটিংরা শুধু নৌবিভাগে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্যের জন্য এ সংগ্রাম চালায় নি। কলকাতার এক রেটিং সংবাদ মাধ্যমকে জানান ঃ "The pent-up discontent of the RIN ratings against the British atrocities that are being perpetrated all over India, has found expression at last in these strikes at Bombay, Karachi, Madras, Calcutta and elsewhere. Our fight is not merely a fight for bread. It is also a fight for freedom"[৮]

২৪ ফেব্রুয়ারী রেটিংদের এক প্রতিনিধিদল কলকাতায় সফররত মিঃ জিন্নার সঙ্গে দেখা করলে মিঃ জিন্না ধর্মঘট তুলে নিতে বলেন। ২৫ তারিখ সকালে রেটিংরা একপ্রকার বন্দী হয়ে পড়ে শত শত সৈনিক বেয়নেট উঁচিয়ে ক্যাম্প ঘিরে রাখে, টহলদারী পুলিশ লরী টহল দিতে থাকে। ২৬ ফেব্রুয়ারী তারা কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কলকাতার অদূরে হাবড়াস্থিত ভারতীয় বিমানবাহিনীর ১০নং স্কোয়াড্রনের সমস্ত সভ্যরা

২২ ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি সভা করেন। সেখানে নৌ ধর্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি এবং কর্তৃপক্ষের আচরণের নিন্দা করা হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারী তাঁরা এক দাবী তালিকা কমাণ্ডিং অফিসারের কাছে পেশ করেন। এই প্রস্তাবে আছে ঃ "দেশের অবস্থা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণ ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণ শেষ করে স্বাধীন ও সুখী জীবনযাপনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। আমরা বিমানবাহিনীর লোকেরাও আমাদের দেশের ও জাতির প্রতি আমাদের মনোভাব আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে জানাবার সুযোগ নিচ্ছি।...জবরদস্তির দ্বারা ন্যায্য দাবী দমন করা যায় না। নাৎসী বিবাদের কৌশল আজ ব্যর্থ। তাই আমরা দাবী করি যে, আমরা ভারতবাসী। কাজেই দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মত প্রকাশ করবার এবং তদনুযায়ী কাজ করবার অধিকার আমাদের আছে। নৌ কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের ফলে নৌবাহিনীতে ধর্মঘট হয়েছে এবং ব্রিটিশ বাহিনীর দুর্ব্যবহারের ফলে সশস্ত্র প্রতিরোধ দরকার ছিল—এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা তাই নৌ-বাহিনীর প্রতি গভীর সহানুভূতি জানাই[৯] এবং অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করি।"

বোম্বাইয়ে বিমান বাহিনীর উপর পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে ডালহৌসি স্কোয়ারে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ১৫০ জন ব্যক্তি অনশন ধর্মঘট শুরু করে ২২ ফেব্রুয়ারী এবং কাজ বন্ধ করে দেয়। ব্রিটিশ অফিসাররা তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করেন। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেন, বোম্বাইয়ের ঘটনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁরা Statesman পত্রিকায় এর না উল্লেখ প্রমাণ হিসেবে দেখান। কিন্তু এই চাতুরী কার্যকরী হয় নি।[১০]

আগেই উল্লেখ করা গেছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে যে Popular explosions ঘটেছিল, তার মূলে ছিল INA। কলকাতায় ১৯৪৫এর ২১ নভেম্বর ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে ফরোয়ার্ড ব্লক ছাত্রদের একটি মিছিল বেরোয়, দাবী INA বন্দীদের মুক্তি। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় কমিউনিস্ট ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রকর্মীরা এবং মুসলিম কলেজ ছাত্রদের একটি দলও। ত্রিদলীয় পতাকা একসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। পুলিশের গুলিতে একজন হিন্দু ও একজন মুসলিম ছাত্রের মৃত্যুতে ২২ ও ২৩ নভেম্বর কলকাতা বিদ্রোহে উত্তাল হয়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ধর্মঘট হয় ট্রাম কর্মচারীরা, ট্যাক্সি ড্রাইভাররা এবং বিভিন্ন কারখানায় কর্মবিরতি হয়—পুলিশের ও সামরিক গাড়ি (আনুমানিক ১৫০) পুড়িয়ে ফেলা হয়। জনতা রেলপথ অবরোধ করে, পথ অবরোধ করে! পুলিশ গুলি চালিয়ে

অবস্থা আয়ত্তে আনে—৩৪ জন নিহত ও ৩০০ জনের মত আহত হয়। অন্তর্লীন অগ্নিপ্রবাহের উড্ডীয়ণ ঘটে আবার ১১ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬এ।

কলকাতা উত্তাল INAর আবদুল রশিদের ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে। এসময় এক জনজাগরণ ঘটে যায়—সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ঐক্যের দাবী ফুটে ওঠে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সমাবেশে যখন মুসলিম লীগের সুরাবর্দী, গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতা সতীশ দাশগুপ্ত এবং কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী একত্রে ভাষণ দেন। নভেম্বরের মত এ আন্দোলনেও অবশ্যই কমিউনিস্ট নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল অনেক সংগঠিত ও গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতার অবস্থা নভেম্বরের থেকেও খারাপ হতে থাকে। Industrial কলকাতা এক অর্থে প্যারালাইসড হয়ে যায়। কমিউনিস্ট নেতৃত্বে কলকাতা ও শহরতলীর চটকলগুলি দু'দিন বন্ধ থাকে, ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় (চুঁচড়া, নৈহাটিতে)। পথে পথে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষ হতে থাকে। পরিণামে ৮৪ জন নিহত ও ৩০০ জন আহত হয়। একটা সার্বিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ছবি ফুটে ওঠে।

এই স্রোতেরই অন্য ঘটনা বোম্বের নৌবিদ্রোহ। সুমিত সরকার এই ঘটনাত্রয়ীকে একসূত্রে গেঁথে বলেছেন : wave of popular explosions।[১১] গৌতম চট্টোপাধ্যায় বাংলার আন্দোলন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : In 1945, an unarmed uprising of the entire people of Calcutta against British rule was indeed sparked off by the famous student's action on November 21st 1945.[১২] এ উক্তির প্রয়োজন হল যে বাংলার ছাত্ররা সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতায় ও স্বাধীনতার জন্য কতটা সংবদ্ধ ও মোটিভেটেড ছিল।

কলকাতায় এ আন্দোলনে অন্যতম হাতিয়ারটি ছিল যুব-ছাত্ররা। এরা জনগণের মধ্যে শুধু সহানুভূতি নয় এই বিপ্লবের আঁচ চারিয়ে দিতে চেয়েছিলেন পরিকল্পিতভাবে। এই যুব-ছাত্ররা হঠাৎ করে আন্দোলনের জন্য কলকাতার পথে নামে নি, বোম্বাই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে। কলকাতায় ইতিপূর্বের দু'টি আন্দোলনই দেখা গেছে ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকা। এই যুব-ছাত্রদের একটি বড় অংশ All India Students' Federationএর অনুমোদনপুষ্ট, যাদের মূল কাজ ছিল INAর ত্রাণ তহবিল গঠন করা।

২২ ফেব্রুয়ারী করাচী ও বোম্বাই-এ বিক্ষুব্ধ জনতার উপর গুলি চালনার প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতার কোন কোন স্কুলে ধর্মঘট হয়। সকালে জগুবাবুর বাজারের কাছে ছাত্ররা ট্রাম বন্ধ করার চেষ্টাও করে।

ছাত্ররা বিভিন্ন স্থানে সভার আয়োজন করে যেমন, ২৩ ফেব্রুয়ারী ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্কুল কলেজের ছাত্রদের একটি সভায় আয়োজন করেন কলকাতা সিটি ছাত্র ফেডারেশনের তরফে গৌতম চট্টোপাধ্যায়। কমলা হাইস্কুল, কেশব এ্যাকাডেমি, মেট্রোপলিটান মেইন, মিত্র ইনস্টিটিউশন মেইন ও বহুবাজার মতিলাল শীল হাইস্কুল, কারমাইকেল কলেজ, বিজ্ঞান বিভাগ, ওরিয়েন্টাল এ্যাকাডেমি, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও মেট্রোপলিটান বালিকা বিভাগে সম্পূর্ণ ধর্মঘট হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্র ফেডারেশনের ডাকা সভায় ছাত্রনেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেন: 'ধর্মঘটী নাবিকরা কংগ্রেস-লীগ ও লালঝাণ্ডাকে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। আমরা ছাত্রগণ তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইতেছি, তাঁহাদের ন্যায্য দাবী সমর্থন করিতেছি।' কেশব একাডেমির গোপেন মিত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকর্মী রণজিৎ গুহ, রণজিৎ আদিত্য, সালে আহমেদ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অজিত বসুমল্লিক প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে মিঃ মীরহোসেন ধর্মঘটীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ছাত্রীকর্মী অলকা মজুমদার বলেন, এই বিপ্লবী অভ্যুত্থানে মহিলারাও পিছিয়ে নেই। তার প্রমাণ শ্রীমতী দোন্দে প্রাণ দিয়েছেন।

২৩ ফেব্রুয়ারী কলেজ স্কোয়ার ও হাজরা পার্কেও ছাত্র সভার আয়োজন করা হয়। দ্বিজেন বসুর সভাপতিত্বে Bengal Students' Bureau দেশপ্রিয় পার্কে বেলা ৩টার সময় অন্য একটি ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে। যেখানে বোম্বাইতে পুলিশে গুলি ও লাঠি চালনার উপর তীব্র নিন্দা করা হয়।

শুক্রবার অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারীতেও Bengal Provincial Students' Federationএর আহ্বানে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক জনসমাবেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর অত্যাচারের নিন্দা করা হয়। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দত্ত সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত রমেন ভট্টাচার্য BPSFএর সম্পাদক বলেন দেশজুড়ে রাজকীয় জাতীয় নৌবাহিনীর এই বিদ্রোহ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। এ সমাবেশে ভাষণ দেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখার্জী, শ্রীযুক্ত অরুণ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত শ্যামলাল ক্ষেত্রী, শ্রীযুক্ত নির্মল রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত পৃথ্বিশ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কমল ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত কালিপদ ঘোষ।

ছাত্ররা Demonstration করে ২২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে রাস্তায় নামে। ভবানীপুরে আশুতোষ মুখার্জী রোডে ছাত্ররা ট্রাম বাস থামায় এবং যাত্রীদের নেমে যেতে অনুরোধ করে। রাস্তাজুড়ে ছাত্রদের মিছিল দেখা যায়।[৩]

২৩ ফেব্রুয়ারী কলেজ স্কোয়ারে BENGAL Provincial Students' Federationএর সভায় ছাত্ররা দমননীতির বিরোধিতা করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাঁদের প্রস্তাবে উল্লেখ ছিল[১৪] যে এই নতুন সচেতনতাকে ভারতের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি মদত দেবে এবং সঠিক নেতৃত্বে জনগণের মধ্যে প্রচার করবে। ঐ সভায় সংগঠন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনয় সেন বলেন যে জাগরণ সমস্ত দেশব্যাপী লক্ষ্য করা গেছে ঐ ঘটনার তা সমঝোতার মাধ্যমে নষ্ট করার চেষ্টা চলছে, এর বিরুদ্ধে ছাত্রদের দাঁড়াতে হবে এবং পরবর্তী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।[১৫] শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখার্জীর বক্তব্য ছিল যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই পরিস্থিতিকে স্বাধীনতায় পরিণত করার কাজে ব্যর্থ হয়েছেন।[১৬] অন্যান্য বক্তারা ছিলেন শ্রীযুক্ত অমিয় ব্যানার্জী, শ্রীযুক্ত সৌরীন ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত চিত্ত চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বীরেন কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত অজিত লাহিড়ী এবং শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।[১৭]

দ্রুতলয়ে ছাত্র মিছিল-মিটিং কলকাতা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ২৩ ফেব্রুয়ারী Bengal Students' Bureau-র সভা হয় নৌ রেটিং ও সমস্ত বিমান বাহিনীর (RIAF) উপর পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে।[১৮] ২৩ ফেব্রুয়ারী কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে ছাত্র ফেডারেশনের সভা হয় নৌরেটিংদের পক্ষে। ঐদিন ছাত্র কংগ্রেসের কর্মীরা ধর্মঘটের বিরোধিতা করলে AISF এবং Bengal Students' Federationএর উদ্যোগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিশাল ছাত্র সমাবেশ ঘটে।[১৯]

নৌবাহিনীর প্রতিবাদী রেটিংদের সমর্থনে এবং বোম্বাইতে বিক্ষোভকারী জনসাধারণের উপর গুলি চালনার প্রতিবাদে ২৩ ফেব্রুয়ারী কলকাতা ও শহরতলীতে লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। হুগলীর মাহেশ বেঙ্গলবেণ্টিং, বঙ্গলক্ষী, রামপুরিয়া ও বঙ্গেশ্বরী সুতাকলে এবং অন্যান্য কিছু ছোট কারখানার প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। মাহেশের একটি জনসভায় শ্রমিকনেতা দীনেশ ভট্টাচার্য ও কমরেড সাধু বক্তব্য রাখেন। খিদিরপুর অঞ্চলে লিপটন ও ব্রুকবণ্ড চা কারখানায় ধর্মঘট হয়। টালিগঞ্জ ও বালিগঞ্জ ভারতীয় লোহা কারখানায় ধর্মঘট শুরু হবার পর ম্যাকিনতোশবার্ণ, এয়ারকণ্ডিশনিং কর্পোরেশন, বেরুট বামেন্স, অন্নপূর্ণা মেটাল ওয়ার্কস, ভারত ব্যাটারী, লেধলী ও অন্যান্য কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। বেলেঘাটা, ইণ্টালি ও নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলে সমস্ত কলকারখানায় ধর্মঘট হয়। হাওড়ায় বেলুড় লোহা কারখানায়, বেলুড় রেল ওয়ার্কসপ, গেস্টকীন, টার্ণার মরিসন, হ্যার্ডফিল্ডস, সালিমার পেণ্টস, সালিমার রোপ, ভিক্টোরিয়া স্টিমরোল, পোর্ট এঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন।

হয়েল, রবসন, বার্নেট, ইণ্ডিয়া ফ্যান, এ. কে. সরকার, পটারী, ম্যাককার লেন প্রভৃতি কারখানার শ্রমিক ও কয়েকটি রাবার ফ্যাক্টরী, বি, এণ্ড. এ রেলওয়ের এবং কর্পোরেশন ওয়ার্কশপের শ্রমিকগণ শোভাযাত্রা বের করেন এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জনসভায় পৌঁছান। রাজাবাজার ট্রাম ডিপো থেকে শ্রমিকরাও একটি শোভাযাত্রা বের করেন ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জনসভায় পৌঁছান। শোভাযাত্রার স্লোগান ছিল—"ভারতীয় নাবিকদের দাবী মানা হোক", "পুলিশ ও মিলিটারী জুলুম বন্ধ হোক", কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট এক হও"। রেলওয়ে কর্মচারীরা এই প্রথম জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেন, ধর্মঘটে সামিল হন। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সমস্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রায় ১০০ মাইল এই অচলাবস্থার মধ্যে পড়ে। ভোর থেকেই বি. এণ্ড. এ রেলওয়ের লোকোসেডের মজুররা শিয়ালদহ, নারকেলডাঙা, চিৎপুরে ধর্মঘট শুরু করেন। সিগন্যাল স্টোর্স, পাম্পিং স্টেশন, ইলেকট্রিক ডিপার্টমেণ্ট প্রভৃতি বন্ধ হয়ে যায়। মজুররা দল বেঁধে স্লোগান দেয়… "জাহাজী পল্টন কী মাং পুরী করো", "কমিউনিস্ট-লীগ-কংগ্রেস এক হো"। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জনসভায় রেলওয়েজ কর্মচারী ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক কে. সি. চৌধুরী ভাষণ দেন।[১৯ক]

বোম্বাইয়ের ঘটনা কলকাতার বুদ্ধিজীবী, বিশেষত চাকুরীজীবী ও পেশাজীবী সাংবাদিক, সংবাদপত্র পরিচালকদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। অবশ্যই রাজনৈতিক অবস্থানগত দিক থেকে তাঁদের কার্যকলাপের ভেদও ছিল দুস্তর। বোম্বাইয়ের একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় দিয়ে শুরু করা যাক। দেখা যাবে সংবাদমাধ্যমগুলি যেমন এই বিদ্রোহের পক্ষে জনজাগরণের সাহায্য করেছে, তেমনি এই দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগকে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ ও গুণ্ডামী বলে ঝুলিয়ে দেবার দেবার চেষ্টা হয়েছে। 'The Times of India-র ২৬ ফেব্রুয়ারীর সম্পাদকীয়র শিরোনামা ছিল 'এক ভয়ানক ঘটনা', যাতে বলা হয়েছে, "the grim fact stands out clearly that the political extremists are completely out of hand…" এবং একই পাতায় "The Moral" বলে অন্য শিরোনামায় তিনি ভারতীয় জনগণের হয়ে মতামত দিতে শুরু করে বললেন, "Indian public opinion, which will shortly be called upon to mould the destinies of the country, must rouse itself to discredit these violent exteemists." অনুরূপভাবে কলকাতার পত্রিকা 'The Statesman' ২০ ফেব্রুয়ারীর একটি রিপোর্টে বোম্বাইয়ের ঘটনাকে 'গুণ্ডামী' আখ্যা দেয়।

২৩ ফেব্রুয়ারী সম্পাদকীয়তে লেখা হল, "অসন্তোষ, জনসাধারণের বিশৃঙ্খলা, হিংসা সমস্ত পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে। আর ভারতবর্ষে এটা ঘটেছে রাজকীয় নৌবাহিনীর মধ্য দিয়ে। যাদের বিদ্রোহ বা কর্তব্যপালনে অস্বীকার জাতীয় নেতৃত্বের কাছে আরো বেশী উদ্বেগজনক সংকট সৃষ্টি করেছে।" কলকাতার একটি সংবাদপত্র 'Morning News'এর সম্পাদক আবদুল রহমান সিদ্দিকি ১ মার্চ 'In advisable' নামে একটি সম্পাদকীয়তে জনগণ, রাজনীতির সঙ্গে সামরিক বাহিনীর বিচ্ছিন্নতা বোঝাতে চাইলেন। বললেন ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক নেতারা নাকি তাদের 'ভাড়াটে সৈন্য' আখ্যা দেয় এবং অকপটে ঘোষণা রাখলেন: "We however, will not hesitate to condemn the recent uprisings which proved that the services have allowed themselves to be victimised by political agitators." অন্যদিকে ২২ ফেব্রুয়ারীর অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করল এ বিদ্রোহ শুধু খাদ্যের জন্য নয়: "The disturbances in Bombay and Karachi are an unmistakable evidence of the change that has taken all sections of the population as if by a storm." হেমচন্দ্র নাগ, 'Hindusthan Standard' পত্রিকার সম্পাদক ২৫ ফেব্রুয়ারী এক সম্পাদকীয়তে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। বলেন সর্দার প্যাটেল বা মৌলানা আজাদ নয়, সমস্ত দেশ ধর্মঘটীদের পেছনে আছে। প্রশ্ন তোলেন "কেন কংগ্রেস ও লীগ এর উপর থেকে সমর্থন তুলে নিল? এতো দেশের সম্মিলিত দাবী।" ২৩ ফেব্রুয়ারী অন্য একটি সম্পাদকীয়তে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশিত হয়: "British Imperialism has no friend in India to-day, stooges have found it out and are impatient to throw off its oppressive yoke. That is the lesson of the discontent." কলকাতার আর একটি পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র জি. অধিকারী কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেন: (১) "জাতীয় নেতৃত্ব কোন পথে...ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, না ঘৃণ্য আত্মসমর্পণ?" (২) "বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের যুগ সমাগত" (৩) "এই কি কংগ্রেসের নেতৃত্ব" (৪) "আপসের লোভে তোষণ নীতি" ইত্যাদি।

নৌবিদ্রোহের সংগঠন ও নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগেই দেখা গেছে বিপ্লব ছকটি ছিল রাশিয়ার ১৯০৫এর বিপ্লব ছকের অনুরূপ এবং নৌবাহিনী থেকে যুদ্ধোত্তরকালে সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটানোর জন্য পরিকল্পনা করে সমর বিভাগে যোগদান করেছিল

কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টরাই।[২০] অনিরুদ্ধ দেশপাণ্ডে উল্লেখ করেছেন যে, এই বিদ্রোহের প্রস্তুতি পথে রেটিংরা যে 'Sailors' Association গঠন করেছিল তার সঙ্গে All India Students' Federationএর নিবিড় যোগ ছিল।[২১] কলকাতায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিই নৌবিদ্রোহের সমর্থনে গণ-আন্দোলনের উদ্যোগ ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[২২] ২৩ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। আহ্বায়ক কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলা কমিটি।[২৩] একই দিনে ছাত্র সভারও আয়োজন হয় সিটি ছাত্র ফেডারেশনের আহ্বানে।[২৪] ঐ দিনই নৌ-ধর্মঘটীদের সমর্থনে কলকাতার পথে 'লালঝাণ্ডার' ডাকে লক্ষাধিক শ্রমিকের ধর্মঘট হয়।[২৫] ২৪ তারিখেও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বন্ধ ডাকে। এই প্রতিবাদ আন্দোলন ডাকে কলকাতার ট্রাম কর্মচারীরাও এবং সমস্ত কলকাতা কার্যত অচল হয়ে পড়ে।[২৬] ২৬ তারিখের ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলা কমিটির ডাকা সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কে. পি. চট্টোপাধ্যায়। ঐ সভায় কমিউনিস্ট নেতা কমরেড সোমনাথ লাহিড়ীর বক্তব্য ছিল এই বিদ্রোহ ও সারা ভারতব্যাপী উত্তাল গণআন্দোলন প্রমাণ করে শ্রমজীবী মানুষ আর অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।[২৭] সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বোম্বাই ঘটনার পর্বে উল্লেখ করেন কমিউনিস্ট পার্টি জনগণকে ভুল পথে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং জনগণের স্বাদেশিকতাকে ব্যবহারের চেষ্টা করছে তাদের নিজেদের স্বার্থে।[২৮] ব্রিটিশ শাসন কর্তারাও এ বিদ্রোহে কমিউনিস্ট-হাত দেখতে পান। বস্তুতপক্ষে এই বিদ্রোহে কমিউনিস্ট পার্টির একটি নির্দিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও কলকাতার কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এই ঘটনাকে জাতীয় নেতৃত্বের মতই কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। কিছুদিন আগে রসিদ আলি দিবস উপলক্ষে বা নভেম্বরে যে কলকাতা উত্তাল হয়ে উঠেছিল শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সেইভাবে জনজাগরণ ও আন্দোলনকে ব্যাপক আকার দেবার প্রচেষ্টা দেখা যায় না। বিদ্রোহ স্তিমিত হতেই আন্দোলনের রেশও শেষ হয়ে যায়। আর সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে এখানেই দেখা গিয়েছিল হিন্দু-মুসলিম বিভেদের নগ্নচিত্র। সেখানে কোন মন্ত্রবলে নয়, আদর্শের ভিত্তিতেই এই ঐক্য সম্ভব হয়েছিল তা বলা যেতেই পারে। কলকাতার কমিউনিস্ট নেতাদের দেখা গেল বেশী মাত্রায় নির্বাচনের দিকে ঝুঁকে পড়তে। যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তেমন কলকাতাতেও কমিউনিস্ট নেতৃত্বের এদিক অন্বেষণের বিষয়।

কলকাতায় এই বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করতে পারে নি। পারে নি মূলত দুটি কারণে। কলকাতা নৌবন্দরে RINএর খুব বেশী শক্তি ছিল না।

বোম্বাইয়ের রেটিংদের মোটিভেশন, প্রস্তুতি এবং শক্তি ছিল অনেক বেশী। এবং মূলত ব্রিটিশশক্তি দ্রুত কলকাতার বিদ্রোহ দমনে গোপনীয়তাসহ ব্যবস্থা নিয়েছিল সমর বিভাগের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। গৌতম চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন : "there was a case of mutiny in Eastern Command, when in Calcutta, in late February 1949 two of the Indian Pioneer Units refused to obey orders. The incident was settled quickly and in secrecy. The mutineers were rounded up by the British and the Gurkha troops at night, to avoid causing troubles in Calcutta and the leaders were soon after tried by the Court Martial and sentenced all, without any news of the episode leaking out either to politicians or the press".[২৯]

সুমিত সরকার স্বাধীনতা-পূর্ব (১৯৪৫-১৯৪৭) গণআন্দোলনগুলির মধ্যে একটি স্পষ্ট যোগসূত্র খুঁজে পান এবং গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, এইসব গণআন্দোলনের আধিক্যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেশভাগের মূল্যেও সমঝোতা আলোচনা চালাতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৩০] এবং এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের গভীরতা, বিশেষ করে সামরিক বিভাগের বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা ও চুক্তির জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে।[৩১] এই নৌবিদ্রোহ আরো বেশী তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, এরা সমর বিভাগ, পরাধীন দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে অগ্রসর হয়েছিল এবং নিপীড়িত জনগণও একসঙ্গে এগিয়ে এসেছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায়।[৩২]

সূত্রনির্দেশ

১ Souren Nag, The Post-war Upsurge, the Indian National Congress and the Transfer of Power, Seminar paper, RIN Uprising Commemoration Committee, 1983, Jadavpur University

২ সাক্ষাৎকার : ফণীভূষণ ভট্টাচার্য নৌ-বিদ্রোহের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী। এছাড়া অনিরুদ্ধ দেশপাণ্ডে তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণাপত্র, Sailors and

the Crowd : Popular protest in Karachi, 1946, The Indian Economic and Social History Review, Vol. XXVI, No. 1, 1989তে দেখিয়েছেন INA ভারতীয় সমরবিভাগের প্রতিটি ক্ষেত্রে কিভাবে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত করেছিল। Menserghএর Transfer of Power, Vol. VI-ও এ-পর্বে দ্রষ্টব্য

৩ Souren Nag, প্রাগুক্ত

৪ প্রায় ৫০ জন WRINএর কর্মী ধর্মঘটে যোগ দেয়, Amrita Bazar Patrika, 22nd Feb, 1946

৫ V. M. Bhagwatkar, Royal Indian Navy Uprising and Indian Freedom Struggle, p 124, Amravati, 1989

৬ তদেব, পৃ ১২৫

৭ The Times of India, 22nd Feb, 1946

৮ Subrata Banerjee, The RIN Strike, p 93, New Delhi, 1954

৯ Peoples' Age, 3. 3. 1946

১০ তদেব

১১ Sumit Sarkar, Popular Movements and National Leadership, 1945-47, Economic and Political Weekely, Annual Number, 1982

১২ Gautam Chattopadhyay, Bengal's Student Movement in N. R. Roy (Ed) Challenge : A Saga of India's Struggle for Freedom, p 573, New Delhi, 1984

১৩ Star of India. 22nd February, 1946

১৪ The Sunday Hindusthan Standard, 24th February, 1946

১৫ তদেব

১৬ তদেব

১৭ তদেব

১৮ Hindustan Standard, 23rd February, 1946

১৯ V. M. Bhagwatkar. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৩

১৯ক এই প্যারাটির সূত্র সমকালীন সংবাদপত্রসমূহ

২০ সাক্ষাৎকার, ফণীভূষণ ভট্টাচার্য

২১ Anirudh Deshpande, প্রাগুক্ত, পৃ ১-২

২২ V. M. Bhagwatkar, প্রাগুক্ত, পৃ ১ ২

২৩ স্বাধীনতা, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬

২৪ তদেব, ২৪ ফেব্রুয়ারী

২৬ V. M. Bhagwatkar, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৩

২৭ Peoples' Age, 3rd March, 1946

২৮ Amrita Bazar Patrika, 28th Februyry, 1946

২৯ Gautam Chattopadhyay, The Naval Revolt of 1946 and the Unfinished Revolution in the Souvenir, published by the RIN Uprising Commemoration Committee, Calcutta, 20th February, 1983

৩০ Sumit Sarkar, প্রাগুক্ত

৩১ Bhagwatkar, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৫ : Biswanath Bose, RIN Mutiny 1946, pp 179-80

৩২ New Delhi, 1988

২১ জানুয়ারী, ১৯৪৭ঃ ভিয়েতনাম দিবস পালনে বাংলার ছাত্রসমাজ—একটি সমীক্ষা

ব্রততী হোড়

১৯৪৫ সালে ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটলো। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি, বিশেষ করে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ, দুর্ভিক্ষজাত নৈতিক ভাঙ্গন, দুর্ভিক্ষের ফলে দীর্ঘদিন বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে থাকা, ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে ভাঙ্গন—এই ঘটনাগুলির ফলে বাংলাদেশে রাজনীতি বিমুখতা, হতাশা ও দুর্নীতি, সমাজ-জীবনে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই নৈতিক অধঃপতন ঘটানোর সুচতুর সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার প্রতিরোধে আন্দোলনকে নতুন করে সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করবার দায়িত্ব এসে পড়েছিল বাংলার ছাত্রদের উপর। যুদ্ধের শেষদিকে বি পি এস এফ-র প্রাদেশিক সম্মেলন এবং কলকাতায় '৪৪এর ডিসেম্বরে এ আই এস এফ-র সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকে এর চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটল ১৯৪৫এর ২৯ আগস্ট, একই সঙ্গে 'বন্দীমুক্তি' ও কোচবিহারে কলেজের ভিতর ছাত্র-ছাত্রীদের উপর নৃশংস পুলিশী আক্রমণের প্রতিবাদে সারা বাংলাদেশ জুড়ে 'কোচবিহার দিবস' পালন, ঐ বছরই ২১ নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে সংগ্রাম, '৪৬এর ১১ ফেব্রুয়ারীতে আজাদ হিন্দ ফৌজেব ক্যাপ্টেন রশীদ আলীর মুক্তির দাবীতে সংগ্রাম, বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের সমর্থনে সংগ্রাম, ডক শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে সংগ্রাম, ২৯ জুলাই ডাক ও তার ধর্মঘটীদের সমর্থনে ধর্মঘট, ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সেদিনের ছাত্রসমাজ, বিশেষত ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র ঐক্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন জ্ঞাপন করে প্রতিটি দিন নতুন নতুন সংগ্রামে নিয়োজিত হয়ে গণসংগ্রামের এই মূল স্রোতধারাতে গতি এনে দিয়েছিল। এক উন্নত মতাদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ছাত্র ফেডারেশনকে এই ভূমিকা পালনে যোগ্য করে

ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ

তুলেছিল। একই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে ঐ বছরগুলির নঞর্থক ভূমিকাও ছিল—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্ব ও তার কর্মী-বাহিনী দেশের মধ্যে যেমন সংগ্রাম করেছেন, তেমনি পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য সংগ্রামের স্রোতধারায় ছাত্র আন্দোলনকে প্রবাহিত করেছেন। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারীতে হ্যানয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সারা এশিয়ার ছাত্রদের ডাক দিল: ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের দস্যু আক্রমণের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়াতে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২১ জানুয়ারী, ১৯৪৭ সালে বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশন, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী কবল থেকে ভিয়েৎনামের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে 'ভিয়েতনাম দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত করে। সমর্থন জানান সারাবাংলা ছাত্র কংগ্রেস এবং মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ। ছাত্রদের দাবী ছিল: দমদম বিমানবন্দর দিয়ে ফরাসী বিমান চলাচল বন্ধ করা। আরো পূর্বে ১৯ জানুয়ারী নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি এস. এ. ডাঙ্গে এবং এস. এস. মিরাজকার এবং জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য বি. টি. রণদীভে[১] একটি বিবৃতিতে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি মৃণালকান্তি বসুর প্রস্তাবিত, সমস্ত ফরাসী জাহাজ—যেগুলি ভিয়েতনামের উদ্দেশ্যে অস্ত্র এবং সৈন্য নিয়ে যাচ্ছে—তাদের বয়কটের সমর্থন জানান। ঐ একই দিনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী, পণ্ডিত নেহরুর উদ্দেশ্যে আবেদন রাখেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামনে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তুলে ধরতে এবং এইভাবে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে।[২]

ভিয়েতনামের সংগ্রামের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা ২১ জানুয়ারী সেদিন কলকাতায় যে মিছিল বের করে, তার উপর পুলিশ পাঁচবার গুলি চালায়—শহীদ হন দু'জন ছাত্র ধীররঞ্জন এবং সুখেন্দুবিকাশ, ১৯ জন গুলিবিদ্ধ হয়, আরো ৫০ জন লাঠির আঘাত পায় এবং প্রায় ২০০ জন[৩] ছাত্র গ্রেপ্তার হয়। ঐ দিনের ঘটনা সম্বন্ধে সরকারী মন্তব্য ছিল এইরকম—"কলকাতায় মিছিল এবং সভাসমিতির করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেন ছাত্র সংগঠনগুলি এবং তারই ফলে শহরের দুটি জায়গায় গোলযোগ দেখা যায়।"[৪] বিভিন্ন স্থানে পুলিশের উপর বোমাবর্ষণের উল্লেখও এই বিবৃতিতে ছিল। ঐ দিনের ঘটনা সম্বন্ধে Peoples' Age লেখে—"ব্রিটিশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, কলকাতা, পুনরায় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের নিশান উত্তোলন করল। কলকাতার রাজপথে পুনরায়

রক্ত ঝরল, কলকাতার যুবসমাজের উত্তপ্ত রক্ত। কিন্তু এইবার তা আগস্টের বিভীষিকাময় রাত্রির উন্মত্ত ভ্রাতৃহত্যার রক্ত নয় বরং পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের গৌরবময় প্রতিরোধের রক্ত।"[৫]

পুলিশের গুলিচালনা এবং ২ জন ছাত্রের মৃত্যুর ফলে প্রতিবাদে পরের দিন অর্থাৎ ২২ জানুয়ারী সারা বাংলায় ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট হয়। কলকাতার রাজপথে আবার ব্যারিকেড ওঠে এবং রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে সংগ্রামে ছাত্রদের সঙ্গে সামিল হন শ্রমিক ও জনসাধারণ। প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার[৬] জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ। এর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ, মাত্র ১ দিনের আহ্বানে, ১৬ আগস্টের উন্মত্ত ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার পরে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলের জনসভায় বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস ফেডারেশন, অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস কংগ্রেস, স্টুডেন্টস ব্যুরো, অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ, কলকাতা মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ, ঢাকা মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ, রেভ্যুলিউশনারী কমিউনিস্ট পার্টি, গার্লস স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন, স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার কমিটি, অল বেঙ্গল মেডিকেল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন, ফরোয়ার্ড ব্লক স্টুডেন্টস ব্যুরো, সোস্যালিস্ট স্টুডেন্টস ব্যুরো-র প্রতিনিধিরা মৃত এবং আহত ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে পুলিসী বর্বরতাকে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছেন। দুটি পুস্তিকা ঐ জনসভায় বিতরণ করা হয়—প্রথমটি 'আবার কলকাতার রাজপথ রক্তে লাল' এবং দ্বিতীয়টি 'সাম্রাজ্যবাদী আঘাতের উত্তরে আঘাত হানো'। ভিয়েতনামের সংগ্রাম চিহ্নিত হল 'আমাদের সংগ্রাম' হিসাবে। মুক্ত ভিয়েতনাম দীর্ঘজীবী হোক এবং ভিয়েতনামের সমর্থনে ফরাসী দূতাবাসে যাওয়ার আহ্বান জানানো হল।[৭] ২৩ জানুয়ারী বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জরুরী সভায় সরকারের কাছে একটি দাবীপত্র পেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে তা মিটানো না হলে ৫ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হবে। দাবীগুলি ছিল—প্রথমত, ২১ জানুয়ারী গুলিবর্ষণে নিহত এবং ঐ দিনের ঘটনায় আহত ছাত্রদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া; দ্বিতীয়ত, গুলিবর্ষণের জন্য তদন্ত কমিটি স্থাপন এবং দোষী পুলিশী কর্মচারীদের শাস্তিবিধান; তৃতীয়ত, সমস্ত ধৃত ছাত্রদের অবিলম্বে মুক্তিদান এবং চতুর্থত, ১৪৪ ধারা উঠিয়ে নেওয়া।

ভিয়েতনামের সমর্থনে ছাত্রদের লড়াই ছড়িয়ে পড়ল মৈমনসিংহেও। সেখানেও ছাত্র মিছিলের উপর পুলিস তিনবার গুলি চালায়, শহীদ হন অমলেন্দু

ঘোষ নামে একজন স্কুলের ছাত্র এবং গুলিবিদ্ধ হন অনীতা বসু নামে ডিগ্রী ক্লাসের একজন ছাত্রী। কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং ফরোয়ার্ড ব্লক ধিক্কার জানান পুলিশী বর্বরতাকে। পূর্ণ হরতাল পালিত হয় শহরে। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল বরিশালে, চট্টগ্রামে এবং শ্রীহট্টে। বাংলাদেশ ছাড়াও বাঙ্গালোর, পণ্ডিচেরী, বম্বে এবং দিল্লীতে ২৩ জানুয়ারী, ২১ জানুয়ারী কলকাতায় গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে এবং ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে, হরতালের ডাক দেওয়া হয়।

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের বিরোধিতা সত্ত্বেও ৫ ফেব্রুয়ারীর সাধারণ ধর্মঘট সফল হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারীর Peoples' Age-এ হরতালে যোগদানকারী শ্রমিকদের একটা সংখ্যা দেওয়া হয়।[৮]

গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করল ছাত্র আন্দোলন। দমদম বিমানবন্দর দিয়ে বেশ কয়েক মাসের জন্য বন্ধ হয়ে গেল ফরাসী বিমান চলাচল।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে ভিয়েতনামের আন্দোলনের সমর্থনে সংহতি জ্ঞাপন করে বাংলার এই ছাত্র আন্দোলন শেষপর্যন্ত চাপা পড়ে গেল। কেননা এর অব্যবহিত পরেই ক্ষমতা হস্তান্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ সাময়িকভাবে জাতীয় সমস্যাগুলিতে আলোকপাত করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় নি—২১ জানুয়ারীর গুরুত্ব দেখা গেল পরবর্তীকালে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় যুব সম্মেলন—যা একদিক থেকে দেখলে সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী কমিউনিস্ট ঐক্য আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য পর্ব। কেননা এই সম্মেলন থেকেই ঐতিহাসিক আহ্বান ধ্বনিত হয় এশিয়ার সমস্ত ছাত্র ও যুব সমাজের কাছে; সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস ও প্রতিহত করার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে। এই সম্মেলনে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা পরবর্তীকালে দক্ষিণ ও দঃ পূঃ এশিয়ার দেশগুলির আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই দিক দিয়ে দেখলে এটি ছিল এশিয়াজোড়া কমিউনিস্ট গেরিলা আক্রমণের পারস্পরিক যোগাযোগের দিকে এগোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা ইতিপূর্বে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মাধ্যমে রক্ষিত হত। কিন্তু ১৯৪৩এ কমিণ্টার্ণ লোপ পেলে আবার এইভাবে নতুন রীতিতে আন্তঃযোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। স্বল্পপরিসরে সংক্ষেপে একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। নৃপেন চক্রবর্তীকে লেখা 'দি স্টুডেণ্টস'এর সম্পাদক সুব্রত সেনগুপ্তের চিঠি (১৪-৩-৪৭) থেকে জানা যাচ্ছে যে ভারতে অবস্থিত ভিয়েতনামের মুখপাত্র এম. টি. চাউ তাঁকে জানাচ্ছেন যে কলকাতায় ভিয়েতনাম দিবসে মৃত ছাত্রদের স্মরণে

স্যায়ামের স্মরণসভায় ১০,০০০ ভিয়েতনামী যোগ দেন।[৯] এম. টি. চাউ দিল্লী প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদককে ২ সেপ্টেম্বর 'ভিয়েতনাম স্বাধীনতা দিবস' পালনের অনুরোধ জানিয়ে আশা প্রকাশ করছেন যে ২১ জানুয়ারীর মাধ্যমে ভারতের ছাত্রদের মধ্যে এবং ভিয়েতনামের ছাত্রদের সঙ্গে যে ঐক্যের সেতু গড়ে উঠেছে, কলকাতায়, মৈমনসিংহে এবং স্যায়ামের রাজপথে, তা ২ সেপ্টেম্বর আরো এগিয়ে যাবে।[১০] বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায়, এম. টি. চাউকে ঐ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে তাঁকে ঐদিন কলকাতার বিভিন্ন কলেজে এবং জনসভায় বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছেন।[১১] আবার এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব-পাকিস্তান শ্রমিক সম্মেলনের পক্ষ থেকে কমরেড শামসুল হক, গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ জানাচ্ছেন যাতে ৬ এবং ৭ সেপ্টেম্বরের তাঁদের সম্মেলনে, এম. টি. চাউকে বক্তব্য রাখতে চট্টোপাধ্যায় অনুরোধ করেন, যদি চাউ ২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসেন।[১২] ১৯৪৭এ বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব-ছাত্র প্রতিনিধিদল ভারতে এলে, কলকাতায় বিশাল ছাত্র সম্বর্ধনা সভায় 'ভিয়েতনাম দিবসে'র সংগ্রামে আহত ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীর দেহের বুলেটটি ফরাসী যুব নেতাকে উপহার দেওয়া হলে তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে কলকাতার সংগ্রামী ছাত্রদের তাঁরা কথা দিচ্ছেন যে তাঁদের বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে ফরাসী বন্দর থেকে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অস্ত্র যেতে দেবেন না। ১৯৫৮এ ভারত ভ্রমণকালে স্বয়ং হো-চি-মিন দুই ছাত্র নেতা কমলাপতি রায় ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে তাদের মারফৎ ১৯৪৭র বাংলার ছাত্রসমাজ এবং ছাত্র ফেডারেশনকে বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানান।[১৩]

দ্বিতীয়ত, ১৯৪৫এর শেষার্ধ হতে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের স্ফুরণ ঘটতে থাকলেও ১৯৪৬এর ১৬ আগস্ট রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সাময়িকভাবে সারা দেশ সেই ভেদপন্থী স্রোতে ভেসে যায়। সেই রাজনৈতিক দুর্যোগে ২১ জানুয়ারী ছিল একটি রূপোলী রেখা। ঐদিন হাওড়ার ছাত্রদের মিছিল হ্যারিসন রোডে পুলিশ কর্তৃক আক্রান্ত হলে কলাবাগানের মুসলমান অধিবাসীরা তাদের আশ্রয় দেন। স্মরণে রাখা যেতে পারে যে ১৬ আগস্টের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অন্যতম কেন্দ্র ছিল এই কলাবাগান। যখন বাংলা তথা সমগ্র ভারতের রাজনীতিতে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং বিদ্বেষসঞ্জাত দাঙ্গা একটি অন্যতম নঞর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ প্রায় স্পষ্ট, তখন ছাত্রদের নেতৃত্বে ২১, ২২ জানুয়ারী এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে

যৌথ উদ্যোগে ৫ ফেব্রুয়ারী ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত লড়াই। ৫ ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘট থেকে মুসলমান ছাত্র, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে দূরে রাখার জন্য সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াচ দিয়ে কংগ্রেস ও লীগের তরফ থেকে প্রচার করা হয়েছিল যে এই ধর্মঘটের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল লীগ মন্ত্রীসভাকে হেয় করা ও নতুনভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সৃষ্টি করা। বি পি টি ইউ সি-র সহ-সভাপতি ডঃ আবদুল মালেক এই জঘন্য মিথ্যা প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ করে যথার্থই বলেন যে, "এখনও বিদেশী আমলাতন্ত্র ও ধনিক-শ্রেণীই আসলে দেশের শাসক। তারাই আসল কলকাঠি ঘুরাচ্ছে ও পদে পদে দেশের শান্তি ও অগ্রগতি ব্যাহত করছে। এই ধর্মঘট তাদেরই বিরুদ্ধে।"[১৪]

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যে গণআন্দোলনের ঢেউ ভারতবর্ষে দেখা গেছিল তার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল ১৯৪৫এর শেষার্ধে এবং ১৯৪৬র গোড়ায়। ঐ গণঅভ্যুত্থানের যথার্থ পরিণতি লাভ সম্ভব হলে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে শান্তিতে দেশভাগ করা এবং লাভের বখরা নিয়ে হিসাব-নিকাশ করা অনেকটাই কঠিন হত। কিন্তু গণআন্দোলনের এই পর্বে কংগ্রেস নেতৃত্ব দিচ্ছে না, ফলে যুব সংখ্যার এক বিরাট অংশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে। ৫ ফেব্রুয়ারীর সাধারণ ধর্মঘট এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যদিও ২১ জানুয়ারী ভিয়েতনাম দিবস পালনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানালেও ২২ জানুয়ারী কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক কালীপদ মুখার্জী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে শান্তিরক্ষার জন্য আবেদন জানিয়ে "এমন কোন কর্মে লিপ্ত হতে নিষেধ করেন যা প্রতিক্রিয়াশীল এবং অসামাজিক উপাদানসমূহকে উৎসাহ দেয়।"[১৫] এই প্রসঙ্গে অপর এক নেতা শরৎ বসুর উল্লেখ করা প্রয়োজন। ২১ জানুয়ারী এক বিবৃতিতে তিনি 'ভিয়েতনাম দিবস' পালনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দাবী করেন কিন্তু ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্যে তিনি জানান যে—'সভাসমিতি এবং মিছিল করে ভিয়েতনামের মুক্তির সংগ্রামকে সাহায্য করা যাবে না।'[১৬] যদিও ইতিমধ্যেই ভিয়েতনামের মুখপাত্র এম. টি. চাউ ভিয়েতনামের জনগণের পক্ষ থেকে, ভিয়েতনামের সংগ্রামের সমর্থনে, শরৎচন্দ্র বসুকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।[১৭] ৩১ জানুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এক বিবৃতিতে এই আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসের প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত করেন—"কংগ্রেস মনে করে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষত সাম্প্রদায়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন সাধারণ ধর্মঘটের যৌক্তিকতা গ্রহণীয় নয়।"[১৮] বস্তুত ২৩ জানুয়ারীই কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালিনীর

সাংবাদিকদের কাছে বিবৃতিতে পরিষ্কার হয়ে গেছিল যে কংগ্রেস কি ধরনের ভূমিকা ৫ ফেব্রুয়ারীর সাধারণ ধর্মঘটে গ্রহণ করবে। যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক সরকার 'বাধ্য হয়েছে' সভা-সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করতে, তা 'মেনে চলা' সকল নাগরিকের "কর্তব্য"।[১৯] সুতরাং কংগ্রেসীদের প্রতি কোনরকম নিষেধাজ্ঞা 'অগ্রাহ্য' করতে নিষেধ করেন কৃপালিনী। অথচ এই 'নিষেধাজ্ঞা' বা ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছিল '৪৬-এর আগস্টের দাঙ্গার পরে। এই 'নিষেধাজ্ঞা' জারীর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার কলকাতায় সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে থামিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল শান্তি স্থাপনের অজুহাতে। ২৩ জানুয়ারী এই 'নিষেধাজ্ঞা' উঠিয়ে নেওয়া ছিল বি পি টি ইউ সি কর্তৃক পেশ করা দাবীপত্রের অন্যতম শর্ত। বাংলার 'সোস্যালিস্ট' গভর্ণর বারোজ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের জানিয়েছিলেন যে কলকাতার ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হবে না। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর এবং ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী ও জুলাই মাসের গৌরবোজ্জ্বল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিনগুলি কলকাতার বুকে আর ফিরে আসতে পারবে না বলেই ব্রিটিশ পুলিশের ধারণা ছিল। তারা ভেবেছিল ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে দেওয়া হয়েছে তাই চলতে থাকবে। ৫ ফেব্রুয়ারীর হরতাল সম্বন্ধে কংগ্রেসের মতই একই মনোভাব লক্ষ্য করা গেছিল মুসলিম লীগেরও। সুরাবর্দী ঐ দিনের প্রস্তাবিত সাধারণ ধর্মঘটকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'কৃত্রিম' বলে। এইভাবে কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তার ফলে একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্বে যেমন সংকীর্ণতা দেখা যাচ্ছে তেমনি অপরদিকে সোস্যালিস্টরা এসে যাওয়ায় রাজনৈতিকভাবে র‍্যাডিকালিজম বেড়ে যাচ্ছে।

চতুর্থত, ১৯৪৫ সালের ২১ নভেম্বর যে বৈপ্লবিক নিশান তুলে ধরেছিলেন ছাত্ররা, তার ধারা ১৬ আগস্টের কালরাত্রিতেই শেষ হয়ে গেল না। ১৪ মাস পরে পুনরায় সেই নিশান তার সমস্ত গৌরব নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল। এখানেই ২১ জানুয়ারীর কৃতিত্ব। জাতীয় জীবনের সংকটময় মুহূর্তেও ছাত্রসমাজ তাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা ভোলে নি। ১৯৫৮ সালে ভিয়েতনামের ভারতে নিযুক্ত কনসাল জেনারেল একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, ...'তখন ১৯৪৭র জানুয়ারীতে কলকাতা শহরে ভারতীয় ছাত্র ও যুবকেরা আমাদের সমর্থনে যে সংগ্রাম করেছিলেন, পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তা আমাদের মনে নতুন জোর ও সাহস এনে দিয়েছিল। ইতিহাসের সেই কঠিন মুহূর্তে আপনাদের সমর্থন ভিয়েতনামের মানুষকে শুধু

উৎসাহই দেয় নি, আমাদের জয়লাভে বাস্তব সাহায্যও করেছিল।'[২০] উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুব সম্মেলনের শেষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিন সাম্রাজ্যবাদী ভাড়াটিয়া ঘাতকের দল আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হঠাৎ হামলা করে ২ জন সোভিয়েত যুব প্রতিনিধিকে হত্যা করার চেষ্টা করলে ২ জন সংস্কৃতি-কর্মী সুশীল ও ভাবমাধব শহীদ হন। এইরকম অসংখ্য সংগ্রাম এবং তাতে ছাত্রদের অংশগ্রহণের নিদর্শন সে-যুগের ছাত্র আন্দোলনে পাওয়া যাবে।

পঞ্চমত, স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষপর্বে কংগ্রেস যেমন গণআন্দোলনে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, অন্যদিকে ঐ পর্বে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভূমিকাও লক্ষ্য করা যেতে পারে। পার্টির লাইন পাল্টাচ্ছে, ১৯৪৬র মধ্যভাগে For The Final Bid For Power দলিল গৃহীত হচ্ছে, এর ফলে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের উপরে এতদিন পার্টি যে জোর দিয়ে এসেছিল, তার পরিবর্তে এখন থেকে সংগ্রামী লাইন নিচ্ছে। কংগ্রেসের সঙ্গে পার্থক্য ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৪৫এর শেষদিকে যে গণআন্দোলনের জোয়ার শুরু হচ্ছে, তাতে কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। ভিয়েতনাম দিবস ও ৫ ফেব্রুয়ারীর সাধারণ ধর্মঘট সম্বন্ধে রণেন সেন মন্তব্য করছেন এইভাবে, "পার্টি (কমিউনিস্ট পার্টি) এইভাবে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, সম্মেলন, ধর্মঘট ও হরতালের মধ্য দিয়ে নিজের শক্তি সংহত করে, আরও বিভিন্ন জনসমষ্টিকে সংগ্রামের পতাকাতলে সমবেত করে। পার্টির শক্তি ও প্রভাবের সামনে অন্যান্য দলের প্রভাব ও ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে পড়েছিল।"[২১] একথা সত্য হলেও কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু শেষপর্যন্ত সক্রিয় নেতৃত্ব দিতে অথবা সে রকম কোন অবস্থান নিতে পারছে না।

ষষ্ঠত, 'ভিয়েতনাম দিবস' উপলক্ষে ময়মনসিংহ শহরে গুলিচালনা শহর ও গ্রামের লড়াইকে এক গ্রন্থিতে যুক্ত করে। ময়মনসিংহে তখন তেভাগা আন্দোলন চলছে। ঐ সময়ে শহরে গুলিচালনার প্রতিবাদে ময়মনসিংহের সমস্ত মানুষ পথে নামে এবং প্রতিবাদে সভা ও শোভাযাত্রা প্রতিদিন চলে। আশু দত্ত এইভাবে তার মূল্যায়ণ করেছেন, "এইভাবে গ্রামাঞ্চলে তেভাগা ও টংকবিরোধী সংগ্রামের পাশে পাশে শহরের বিক্ষোভ আন্দোলন এই জেলায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এক নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করে।"[২২]

সপ্তমত, জাতীয় জীবনের এক সংকটময় পরিস্থিতিতে বিশেষত আগস্টের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডবের পর 'ভিয়েতনাম দিবস' উপলক্ষে যে অভূতপূর্ব

ঐক্য পুনরায় দেখা গেল তা কিন্তু যথাযথভাবে প্রকাশ এবং প্রচার হল না, এমনকি জাতীয়তাবাদী দৈনিকপত্রগুলিতেও। 'ভিয়েতনাম দিবস' উপলক্ষে গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পরের দিন সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল। পূর্ব হতে খবর পাঠালেও বেশির ভাগ সংবাদপত্রেই কিন্তু সে বিষয় কোন সংবাদ প্রকাশিত হল না, সরকারী সর্তকবার্তায়। এমনকি যে যুগান্তর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুলিশকে 'সাম্রাজ্যবাদী কুকুর' বলে অভিহিত করেছিল, বলেছিল 'স্বাধীনতার পবিত্রবেদী মাটির পরিবর্তে রক্তমাংসে তৈরী,'[২৩] তার কলমও ২২ জানুয়ারীর প্রস্তাবিত সাধারণ ধর্মঘটের খবর ছাপে নি। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের মুখপত্র হিসাবে স্টেটসম্যান তার ভূমিকা যথাযথ পালন করেছিল। ২১ জানুয়ারীর ঘটনায় পুলিশের ভূমিকার সমর্থন করে ব্রিটিশ বিরোধিতাকে, লীগ বিরোধিতা হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল।[২৪] কিন্তু এক উজ্জ্বল বৈপরীত্য ছিল "স্বাধীনতা"। সংগ্রামের খবর মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি ভিয়েতনাম দিবসে আহত ছাত্ররা হাসপাতালে ভর্তি হলে তাদের দূরাবস্থা সম্বন্ধেও জনগণকে অবহিত করেছিল।[২৫] জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারীর পরও ফরাসী বিমানের ভিয়েতনামে হানা দেওয়া এবং সেজন্য পুনরায় তেল নেওয়ার জন্য দমদম বিমানবন্দরে নামার খবরও 'স্বাধীনতা' প্রকাশ করেছিল—যে সংবাদ, আইনসভায়, তৎকালীন সদস্য সোমনাথ লাহিড়ী পৌঁছে দিয়েছিলেন।[২৬]

সূত্রনির্দেশ

১ Peoples' **Age**, 26. 1. 47

২ ibid

৩ মুক্তির সংগ্রামে ভারত, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ ১৯২

৪ The Statesman, 22. 1. 47

৫ Peoples' Age, 2. 2. 47

৬ ibid

৭ S. B. file no. P M 943/47

৮ কলকাতা—১৮,৫০০ শ্রমিক, হাওড়া—৪৮,০০০ শ্রমিক, হুগলী— ২৪,৫০০

শ্রমিক, ২৪ পরগণা—১ লক্ষ ৩০ হাজার, সরকারী কর্মচারী—১০,০০০, সওদাগরী অফিস—২০,০০০, ব্যাঙ্ক কর্মচারী—১০.০০০, বীমা কর্মচারী—৮,০০০, ছাত্র সংখ্যা—৫০,০০০, মোট—৩ লক্ষ ৯১,০০০

৯ S. B. file no. P M 943/47

১০ ibid

১১ ibid

১২ ibid

১৩ গৌতম চট্টোপাধ্যায়, বাংলার সংগ্রামী ছাত্র আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির অবদান : 'কমিউনিস্ট' ; পার্টির অর্ধ-শতক পূর্তি স্মারকপত্র, সি পি আই, কলকাতা, পৃ ১২৮

১৪ মনোরঞ্জন রায়, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা ১৯৮৭, পৃ ১৬৫

১৫ স্বাধীনতা; ২৩ জানুয়ারী, ১৯৪৭

১৬ পূর্বোক্ত

১৭ S. B. file no. P M 943/47

১৮ Amrita Bazar Patrika, 2. 2. 47

১৯ Amrita Bazar Patrika, 24. 1. 47

২০ গৌতম চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ, চারুপ্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ 'সংযোজনী' এ

২১ রণেন সেন, বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-৪৮), বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ ১৬০

২২ আশু দত্ত, ময়মনসিংহে তেভাগা আন্দোলনের এক অধ্যায়, তেভাগা রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, কলকাতা

২৩ যুগান্তর, ২২. ১. ৪৭

২৪ "Who is responsible" ? The Stateman, 23. 1. 47

২৫ S. B. file no. P M 943/47

২৬ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের তৎকালীন সভাপতি ছাত্রনেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায় এই তথ্য আমায় দিয়েছেন এইজন্য আমি ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁর কাছে ঋণী।

এছাড়া অন্যান্য যে বই ও সংবাদপত্র থেকে নেওয়া :

২৭ সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, ২য় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ ৪২২-৪২৩

২৮ সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, কলকাতা, ১৯৮৬

২৯ পঞ্চানন সাহা, History of working class movement in Bengal, Peoples' Publishing House, New Delhi, 1978, p 202-203

৩০ সুপ্রকাশ রায়, বিদ্রোহী ভারত, বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ ২৫৫

৩১ স্বাধীনতা, কলকাতা (দৈনিক)

৩২ Peoples' Age, বম্বে (সাপ্তাহিক)

৩৩ Amrita Bazar Patrika, কলকাতা (দৈনিক)

৩৪ The Statesman, কলকাতা (দৈনিক)

৩৫ Hindusthan Standard, কলকাতা (দৈনিক)

৩৬ যুগান্তর, কলকাতা (দৈনিক)

কলকাতায় উদ্বাস্তু সমস্যা (১৯৪৭-৫৪)

বাপী দে

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার কাছে একটি স্থায়ী সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল। কলকাতায় উদ্বাস্তু সমস্যার রূপরেখা চিত্রিত করতে হবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সমস্যার সমাধান অর্থাৎ কলকাতায় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত বাস্তবে কতদূর করতে পেরেছিল তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। পাশাপাশি সমান্তরালভাবে উদ্বাস্তুরা কিভাবে নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরা করে নিয়েছিল তাও আলোচনা করতে হবে আবশ্যিকভাবেই। পুনর্বাসনের পথে উদ্বাস্তুদের যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার এই সময়কার ইতিহাসকে একটি নিষ্ঠুরতম অধ্যায়রূপে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু কলকাতায় এই ব্যাপক সমস্যার সামগ্রিকরূপ পুঙ্খাপুঙ্খভাবে তুলে ধরা যেহেতু এই স্বল্পপরিসরে অসম্ভব, তাই কয়েকটি বিশেষ দিক তুলে ধরব মাত্র। আলোচনার সময়সীমা ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

পূর্ববঙ্গের সীমানার নিকট যাদের বসবাস ছিল তারা পায়ে হেঁটেই সীমান্ত পার হয়েছিল। রেলপথের যাত্রীরা প্রধানত বানপুর ও বনগাঁর সীমানা এবং দর্শনার নিকটবর্তী সীমান্ত অঞ্চল পার হয়ে আসছিল। সঙ্গতিপন্ন পরিবারগুলি ঢাকা থেকে বিমানযোগে দমদম বিমানবন্দরে আসত। দমদম বিমানবন্দরসহ এই সীমান্তবর্তী শিবিরগুলিতে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের নাম তালিকাভুক্ত করে তারা যে উদ্বাস্তু তার প্রমাণস্বরূপ তাদের পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছিল। তারপর যে পরিবারগুলি আশ্রয়শিবিরে যেতে চাইত তাদের বিশেষ ট্রেনযোগে শিয়ালদহ স্টেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হত। চূড়ান্ত সংকটের সময় গড়ে দশ হাজার লোক প্রতিদিন স্টেশনের প্লাটফর্মে অবস্থান করছিল।

শিয়ালদহ স্টেশনে প্রতিদিন কয়েক হাজার উদ্বাস্তু থাকত। তাদের

ইতিহাসের গবেষক

সাহায্যের জন্য কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণ মিশন, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও ভারত সেবাশ্রমের পাশাপাশি এই সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকগুলি উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতি গড়ে উঠেছিল। সরকারের আর্থিক সহায়তায় এই কল্যাণ সমিতিগুলি স্টেশনের উদ্বাস্তুদের মধ্যে খাদ্য বিতরণের দায়িত্ব নিয়েছিল। জানা যায় যে, 'অল বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' এবং 'সেনট্রাল ক্যালকাটা রিলিফ এ্যাণ্ড পীস কমিটি'ও সম্মিলিতভাবে প্রত্যহ প্রায় দুই শত উদ্বাস্তুকে খিচুড়ি বিতরণ করেছিল। 'ইণ্ডিয়ান রেডক্রশ' ও আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান শিশু ও অক্ষম ব্যক্তিদের দুগ্ধ সরবরাহ করে। তাছাড়া অন্যান্য সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানগুলি সময়ে সময়ে দুধ ও বার্লি সরবরাহ করেছিল শিশুদের জন্য। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অত্যল্প। স্টেশনে উদ্বাস্তুদের সেবা করতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বাস্তু সমাগম হয়েছিল। কাজের সঙ্গতি রক্ষা করতে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজ্যপাল ডঃ কৈলাশনাথ কাটজুর সভাপতিত্বে গড়ে তোলা হয়েছিল 'ইউনাইটেড কাউন্সিল অফ রিলিফ এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার।'

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। মেন, নর্থ, সাউথ তিনটি স্টেশনেই যাত্রীদের বিশ্রামাগারগুলি উদ্বাস্তুদের ভীড়ে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বিভিন্ন প্লাটফর্মে ঠিক যেখানে ট্রেণগুলি থামে সেই প্রান্তসীমা পর্যন্ত উদ্বাস্তুরা স্থান নিয়েছিল। এমনও দিন গেছে যেদিন স্টেশনে একত্রে ১৬ হাজার উদ্বাস্তু গা ঘেষাঁঘেষি করে বাস করছিল। ফলে স্টেশনের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। উদ্বাস্তুদের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে তাদের বৃষ্টিতে ভিজতে হচ্ছিল না। বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু সমাবেশের ফলে এবং উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিচর্যার অভাবে স্টেশনে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। শিয়ালদহ স্টেশনেই তাদের যে দুর্ভোগ হয়েছিল তা তৎকালীন সংবাদপত্রের একটি বিবৃতি তুলে ধরলেই বোঝা যাবে। ১৯৫৩ ১৩ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

"বুধবার (১১ জুলাই) প্রবল বারিবর্ষণের ফলে স্টেশনে সমবেত কয়েক সহস্র উদ্বাস্তুকে চরম দুর্দশা ভোগ করিতে হয়। ঐদিন এখানে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ১১ হাজারের বেশী। বিছানাপত্র লইয়া যে-সকল উদ্বাস্তু পরিবার স্টেশনের বাইরে বাস করিতেছেন তাদের সমস্ত কিছু ভিজে যায়। অপরাহ্নে যারা রান্না করছিলেন স্টেশনের বাইরে তাদের সে প্রচেষ্টা পণ্ড হয়।...বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু সমাবেশের ফলে স্টেশনে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। অনেক উদ্বাস্তু ১৫ দিন হইতে ৩০ দিন পর্যন্ত শিয়ালদহ

স্টেশন এলাকায় বসবাস করছে। ইহাদের স্থানান্তরের বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করার ফলে দিনের পর দিন অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে থেকে ইহাদের অনেকেই নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন—যক্ষ্মা, জলবসন্ত, বসন্ত ইত্যাদি রোগে।...সেবাকর্মীরা বলেন যে, ইতিপূর্বে যাদের সরকারী আশ্রয়শিবিরে পাঠানো হয়েছিল উপযুক্ত ও নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের অভাবে অথবা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে এ'দের একটা বড় অংশ স্টেশনে ফিরে আসে।"

যাহোক শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সুবিধামত উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আশ্রয়শিবিরে পাঠান হত। কিন্তু প্রতিদিন স্টেশনে এত ভীড় হত যে দুদিনের আগে সেখান থেকে নতুন আগত উদ্বাস্তুদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করা সম্ভব হত না। কেননা, দূরবর্তী আশ্রয়শিবিরে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেও কয়েকদিন দেরী হয়ে যেত। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ট্রানজিট ক্যাম্প বা অস্থায়ী আশ্রয়শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অর্থাৎ স্থায়ী আশ্রয়-শিবিরে যাবার পূর্বে যে কয়দিন অপেক্ষা করতে হবে, সেইদিনগুলি অতিবাহিত করার জন্যই এই অস্থায়ী আশ্রয়শিবিরগুলি স্থাপিত হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে কলকাতার কিছু কিছু পাটের গুদাম হুকুমদখল করে এইজাতীয় ক্যাম্প গড়ে তোলা হয়েছিল। ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে পালা করে তাদের আবার বিভিন্ন স্থায়ী বা রেগুলার ক্যাম্পে পাঠান হত। এই উদ্দেশ্যে কলকাতার কাছে দুটি বড় পাটের গুদাম ভাড়া করা হয়েছিল। একটি অবস্থিত ছিল কাশীপুর গানফাউণ্ড্রি রোডে এবং অপরটি ছিল উল্টোডাঙ্গার খালের পূর্বপারে।

এতদসত্ত্বেও উদ্বাস্তু আগমনের হার বৃদ্ধি পেতে থাকলে স্টেশনের প্লাটফর্মেই অনেক উদ্বাস্তু পরিবারকে পড়ে থাকতে হচ্ছিল। যাহোক উদ্বাস্তুদের জন্য রিসেপশন কেন্দ্র থেকে শুরু করে শিয়ালদহ স্টেশন, ট্রানজিট ক্যাম্প, স্থায়ী আশ্রয়শিবির—প্রতিটি স্থানেই চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল, শৌচাগার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা, খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। শিবিরগুলিতে উদ্বাস্তুদের ডোল এবং ক্যাশডোল বা নগদ অর্থ দেবার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।

কলকাতার আশ্রয়শিবিরগুলিতেও যে উদ্বাস্তুদের চরম দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা ভুক্তভোগী এবং সমকালীন সংবাদপত্রের বিবৃতি থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি বিবৃতি প্রসঙ্গত নেওয়া যেতে পারে। ১৯৫০এর ১৫ জুলাই সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল যে, "উত্তর কলকাতার কাশীপুরে দুটি বড় পাটগুদামে অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে চার হাজারের উপর উদ্বাস্তু কালাতিপাত করছে। এই গুদাম দুটির চতুর্দিকে খোলা নর্দমা এবং ময়লা জল ও আবর্জনা পরিপূর্ণ। মাছির উপদ্রব ও দুর্গন্ধে আবহাওয়া অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। প্রতিদিন

প্রায় ৪০ মন চালের ভাত রান্না করা হয় ময়লা জলের নর্দমা পরিবেষ্টিত উন্মুক্ত স্থানে যা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক। আশ্রিতদের মাথাপিছু যে দৈনিক খাদ্য দেওয়া হয়েছিল তা পর্যাপ্ত নয়। পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থাও সন্তোষজনক ছিল না। দিনের বেলাও পর্যাপ্ত আলো ছিল না।"

প্রকৃত অর্থে যতগুলি দৃষ্টান্ত নেওয়া হোক না কেন দেখা যাবে উদ্বাস্তুরা প্রায় সর্বত্রই চরম দুর্দশার মুখোমুখি হয়েছিল। উদ্বাস্তুরা যেসকল সমস্যার মুখোমুখি প্রায়সর্বত্রই হচ্ছিল তা হল যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, পর্যাপ্ত পোশাক সরবরাহের অভাব, সর্বোপরি যথেষ্ট পুনর্বাসন স্থানের অভাব। তাছাড়া সর্বত্রই পয়ঃপ্রণালী ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত দুর্বল।

কলকাতার আশ্রয়শিবিরে আশ্রয়প্রাপ্ত উদ্বাস্তুরা ছাড়াও বাকি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের তিনটি ধারা এখানে লক্ষ্য করা যায়। উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা ছিল অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ তারা সরকারের উপর নির্ভর না করে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের প্রচেষ্টায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নিতে উদ্যমশীল হয়ে উঠেছিল। প্রথমদিকে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণীর বা ভদ্রলোকশ্রেণীর। এই আগত ভদ্রলোকশ্রেণীর উদ্বাস্তুদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (১) ভাড়া বা খাজনা গ্রাহক-শ্রেণী—জমিদার, তালুকদার, বাড়ীভাড়ার উপর নির্ভরশীল মানুষ ইত্যাদি; (২) পেশাজীবীশ্রেণী—উকিল, এডভোকেট, মোক্তারসহ আইনজীবী; ডাক্তার কবিরাজ সহ চিকিৎসক; এঞ্জিনীয়ার, ওভারসীয়ার ইত্যাদি; পুরোহিত, পণ্ডিত, গণক, হস্তরেখাবিদ ইত্যাদি যারা অধিকাংশই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত; (৩) চাকুরীজীবীশ্রেণী—বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক; শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মী; জমিদারী সেরেস্তার কর্মী; জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মী; (৪) ব্যবসায়ীশ্রেণী—বৃহৎ শিল্পপতি, ক্ষুদ্র শিল্পপতি, কুটীরশিল্প-কেন্দ্রের অথবা ছোট কারখানার মালিক, ওষুধের দোকানের মালিক, আড়তদার ইত্যাদি। এই মধ্যবিত্তশ্রেণী বাড়ীভাড়া করে নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিতে পেরেছিল। এরা অধিকাংশই শহরাঞ্চলে বিশেষত, কলকাতায় পুনর্বাসনের চেষ্টা করেছিল। কারণ, বিশেষত কলকাতায় ব্যবসা, চাকরী অথবা পেশা অবলম্বনের সুবিধা অনেক বেশী। এরা তাই অনেক বেশী ভাড়া দিয়েও কলকাতায় বাড়ীভাড়া নিতে লাগল। কেউ কেউ উঠল কলকাতায় তাদের আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে। এরা শিক্ষাগত যোগ্যতা অথবা আর্থিক সামর্থ্যের জোরে পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল।

দ্বিতীয় ধারায় পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় সেইসকল উদ্বাস্তুদের মধ্যে, যারা এতটা অবস্থাপন্ন না হলেও যথেষ্ট উদ্যমশীল ছিল। এদের প্রয়োজন ছিল বসবাস করার জন্য বাড়ী। এদের জন্য সরকার অনেকগুলি বাড়ী হুকুমদখল করে এবং সেগুলিকে ছোট ছোট ফ্ল্যাটের আকারে বিভিন্ন পরিবারকে ভাড়া দিয়েছিল। এই প্রয়োজনেই গুরুসদয় দত্ত রোডের মিলিটারী কুটীরগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল। বাড়ীর ব্যবস্থা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় ধারার পুনর্বাসন লক্ষ্য করা যায় সেইসকল উদ্বাস্তুদের মধ্যেই যাদের জন্য দুর্ভাগ্যক্রমে বাসস্থানের কোন ব্যবস্থাই সরকার করে উঠতে পারে নি। ফলে তারা নিজেরাই এই সমস্যার সমাধান করে নিতে উদ্যোগী হয়েছিল, যেমনভাবে তারা নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে চলেছিল। কলকাতায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নির্মিত মিলিটারী ব্যারাকগুলি এরা দখল করে নিয়েছিল। কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের নিউ আলিপুর ও লেক অঞ্চলের এইজাতীয় ব্যারাকগুলি অতিদ্রুত এইশ্রেণীর উদ্বাস্তুরা দখল করে নিয়েছিল।

কলকাতায় গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড কলোনীগুলির পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল এই জবরদখলীকৃত কলোনীগুলি। শুধুমাত্র কলকাতা মেট্রোপলিটনে ১৯৫০-৫৪এর মধ্যে ৫৩টি গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড কলোনী গড়ে উঠেছিল। এই কলোনীগুলিকে সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কলকাতায় কিছু প্রাইভেট কলোনীও গড়ে উঠেছিল। যাহোক যাদবপুরের বিজগড় কলোনী ছিল কলকাতা অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের নিজেদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্রথম উপনিবেশ। তবে এই কলোনীটি এবং দক্ষিণ কলকাতায় নাকতলা এক নম্বর কলোনীটি উদ্বাস্তুরা আইনসঙ্গতভাবেই গড়ে তুলেছিল।

জবরদখল কলোনীগুলি এত বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্তত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে সেগুলি কোন্ কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার কোন লিখিত বিবরণ বা রেকর্ড পাওয়া যায় না। এইজন্য এই জবরদখল কলোনীগুলিকে ১৯৫৭এর পূর্ববর্তী ও ১৯৫০এর পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত কলোনী বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। জবরদখল কলোনী গড়ে ওঠার পেছনে দুটি প্রধান কারণ ছিল : (১) সরকার ছিন্নমূল জনগণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সময়ের বসবাসের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছিল (২) এই ছিন্নমূল মানুষদের কলকাতায় স্থান পাবার প্রবল ইচ্ছা।

কিন্তু কলকাতায় এই জাতীয় জনগণের একটা পা রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এর ফলেই উদ্বাস্তুরা কলকাতা মেট্রোপলিটনে এবং তার চারপাশে

আশ্রয়স্থান নির্মাণের জন্য খাসজমি পেলেই তা দখল করে নিচ্ছিল—তা সরকারের জমি হোক অথবা ব্যক্তিগত মালিকানার জমিই হোক। জনগণকে আকৃষ্ট করার একটা চিরন্তন ক্ষমতা এবং বিভিন্ন জীবিকা অবলম্বনের সুযোগ করে দেবার ক্ষমতা কলকাতার ছিল। কলকাতায় নানা পণ্যদ্রব্যের বেচাকেনা করেও অল্প মূলধনে জীবিকা অর্জন করা যায়। নিম্নমধ্যবিত্তরা অন্য কোন কাজের উপযুক্ত না হওয়ায় কারখানায় শ্রমিককের কাজ করতে লাগল। এখন কলকাতার সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলে বাস করতে পারলে সেটা সম্ভব হয়। কলকাতায় শেষপর্যন্ত আর কিছু না হোক অন্তত ভিক্ষে পাওয়া যায়।

কিন্তু বৈধ উপায়ে তো অল্প ক্ষেত্রেই কলকাতায় বাসস্থান সংগ্রহ করা সম্ভব। যেখানে সম্ভব নয় সেখানেও তা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ যা বহন করার সামর্থ্য এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের ছিল না। অপরদিকে কলকাতায় ও তার আশেপাশে অঞ্চলে অনেক খালি জমি পড়েছিল যেখানে কলোনী স্থাপন করে পুনর্বাসন পাওয়া যেতে পারত। সাধারণত এইসব জমির অবস্থাপন্ন ধনী মালিকেরা মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় জমি খালি ফেলে রেখেছিলেন। দক্ষিণ কলকাতার উপকণ্ঠে এই ধরনের জমি প্রচুর ছিল। শেষপর্যন্ত এই সকল খালি জমি দখল করেই উদ্বাস্তুরা কলকাতা ও তৎসংলগ্ন স্থানে বসবাসের ব্যবস্থা করে নিতে থাকে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে জবরদখল কলোনী অতি দ্রুত নানা-স্থানে গড়ে উঠেছিল। আজ যে মাঠ খালি পড়ে আছে কাল ভোরে দেখা গেল সেখানে অনেকগুলি উদ্বাস্তু পরিবার তাদের মালপত্র নিয়ে হাজির হয়েছে। এই ব্যাপারে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ করত। এদের মধ্যে থেকেই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে কেউ কেউ জমি দখল এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে তা ছোট ছোট অংশে ভাগ করে দিয়ে উপনিবেশ গড়ার কাজকে দ্রুততর করে দিত। তারপর এই পরিবারগুলি ধীরে ধীরে সাধ্যমত বাড়ী তুলে নিত। সীমিত আর্থিক সামর্থ্যহেতু দেওয়াল হত দরমার এবং ছাদ হত টালির।

জবরদখল কলোনীগুলি এত দ্রুত গড়ে উঠত যে, মালিক বাধা দেবার সময় পেত না। তাছাড়া সংঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে বাধা দেওয়া সম্ভবও হত না, মামলা করেও সুবিধা হত না। এইভাবে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে এক সংকটের সৃষ্টি করেছিল। এইসময় রাজনৈতিক দলগুলিও উদ্বাস্তুদের নিজেদের দলের সমর্থনে আনার জন্যে তাদের ন্যায়-অন্যায়, আইনসম্মত—বেআইনী সকল দাবীকে সমর্থন জানাতে থাকে। এইভাবেই উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছিল। কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলীতে এই রাজনৈতিক দলগুলির সহায়তায়

উদ্বাস্তরা বেআইনীভাবে জমি দখল করে জবরদখল কলোনী গড়তে শুরু করেছিল। তাছাড়া সরকারী উদ্যোগে 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা আইন'এর সহায়তায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া ছিল অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং অনিশ্চিত ব্যাপার। সুতরাং অনোন্যপায় হয়েই এরা জবরদখল কলোনী গড়ে তুলেছিল।

কলকাতায় জরবদখল কলোনীগুলি গড়ে উঠেছিল টালীগঞ্জ, যাদবপুর, কসবা, দমদম, সন্তোষপুর, সোদপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে। ১৯৫০এর অক্টোবরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে জবরদখল কলোনীগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত হয়েছিল তদন্তের পর। তাতে দেখা যায় যে, বৃহত্তর কলকাতায় ১৩৩টি কলোনী গড়ে উঠেছিল যাতে ২১,৩৭৭টি পরিবার পুনর্বাসন পেয়েছিল। অন্য একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় প্রাক-১৯৫০এ এবং ১৯৫০এর পরবর্তীকালে কলকাতা মেট্রোপলিটনে গড়ে উঠেছিল ২৬৮টি জবরদখল কলোনী। এর মধ্যে প্রায় ৬৬% (মোটামুটি ১৭৮টি) কলোনী মূল কলকাতা শহরের বাইরে; প্রায় ১৮% (মোটামুটি ৪৭টি) গ্রাম্য অঞ্চলে এবং প্রায় ১৬% (মোটামুটি ৭৩টি) কলকাতা পৌর অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। কলোনীগুলি 'কাটজু কলোনী', 'বিধান কলোনী', 'নেতাজী কলোনী' ইত্যাদি নামে নামাঙ্কিত হয়েছিল। কলকাতার এইসকল কলোনী-গুলির মধ্যে বেলঘরিয়ায় অবস্থিত 'শহীদ যতীনদাস কলোনী', যাদবপুরের নিকট অবস্থিত 'বিবেকনগর কলোনী', 'নেতাজীনগর কলোনী' ইত্যাদি কয়েকটি ছিল বৃহদাকার কলোনী। এইভাবে সামান্য আইনবিরোধী কাজ করে অর্থাৎ জমি জবরদখল করে তারা সরকারকে এক বিরাট দায়িত্বের বোঝা থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

কোন বিকল্প ব্যবস্থা না করে সরকার এই জবরদখল কলোনীগুলি উচ্ছেদ করত না এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার শেষপর্যন্ত একটি আইন পাশ করেছিল যা "দি রিহ্যাবিলিটেশন অফ ডিসপ্লেসড্ পার্সনস অ্যাণ্ড এভিকশন অফ পার্সনস ইন আন-অথরাইজড অকুপেশান অফ ল্যাণ্ড এ্যাক্ট ১৯৫১" নামে পরিচিত। এই আইনটিকে বলা যেতে পারে জবরদখল কলোনীগুলির বৈধীকরণের ভিত্তিস্বরূপ যেগুলি ১৯৫০এর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এই আইনে আরও বলা হয়েছিল যে উপযুক্ত বিকল্প জমি যদি না পাওয়া যায় তাহলে জবরদখলীকৃত জমিগুলিকেই সরকার ক্রয় করে বৈধীকরণ করবে এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেবে।

কিন্তু বৈধীকরণের কাজটি ছিল অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ। কেননা,

সরকারকে জবরদখলীকৃত জমির মালিকদের সঙ্গে কথা বলতে, জমি জরিপ করতে ইত্যাদি প্রাথমিক পর্যায়গুলিতেই অনেক সময় লেগে যেত। দ্বিতীয়ত, সকল জবরদখলকারীই কিন্তু প্রকৃত উদ্বাস্তু ছিল না। তৃতীয়ত, এই পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের পরিমান যথেষ্ট ছিল না। চতুর্থত, কিছু ক্ষেত্রে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা বৈধীকরণের কাজকে শ্লথ করে তুলেছিল।

কিন্তু বৈধীকরণের কাজে যত দেরি হচ্ছিল এই সকল কলোনীগুলির উদ্বাস্তুদের মধ্যে তত অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল শেষে বিভাগীয় মন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে একটি মধ্যবর্তী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। স্থির হয়েছিল যে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে দখলকারী পরিবারগুলিকে একটি লিখিত স্বীকৃতি দেওয়া হবে যার নাম 'অর্পণপত্র'। ১৯৫৪র ১৩ মার্চে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীমতি রেণুকা রায় প্রথম আগরপাড়ায় মহাজাতিনগর কলোনীর পরিবারগুলির হাতে এই 'অর্পণপত্র' তুলে দিয়েছিলেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি জবরদখল কলোনীগুলির বৈধীকরণ-সংক্রান্ত পূর্বোল্লিখিত আইনটির জন্য প্রস্তাবিত বিলের সমালোচনা করেছিল প্রথম থেকেই। বিরোধীপক্ষের বক্তব্য ছিল যে, সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে মানবিক দিক থেকে আইনের জটিলতার মধ্য দিয়ে দেখেছিল। ১৯৫১এর এপ্রিল বিধানসভার তৃতীয় অধিবেশনে জ্যোতি বসু এই বিলের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই বিলটি ছিল কলোনীগুলি ভেঙ্গে দেবার সঙ্কেত, যেগুলি উদ্বাস্তুরা নিজেদের চেষ্টায় গড়ে তুলেছিল।

অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি এবং নারী আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধায়ক মণিকুন্তলা সেন তাঁর 'সেদিনের কথা'য় লিখেছিলেন যে, "...জবরদখল জমিগুলো উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে উদ্ধারের জন্য সরকার পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে মারামারি পেটাপেটি করতেও কসুর করল না। সরকারের চোখে তখন মানুষের চেয়ে আইনটাই বড় হয়ে উঠেছিল। মালিকের জলাজমিকে উদ্ধার করেও বসতি গড়া যাবে না, এই আইনটাই যেন তাদের কাছে শেষ কথা। কিন্তু যেসব উদ্বাস্তু একবার চালার তলায় মাথা দিতে পেরেছে, সরকার সেখান থেকে তাদের আর নড়াতে পারে নি। 'জান দেব তো ধান দেব না'র মতো আর একটি শ্লোগান উঠল— 'জান দেব তো ঘর দেব না'। একবার পুলিশ ঘর ভাঙ্গে আবার ওরা ঘর তোলে। দেশটাকে যাঁরা টুকরো করলেন, ইংরেজদের বদলে সেই নেতাদের

স্বাধীন সরকারই এদের আর একদফা লাঠিপেটা করলেন! অথচ এই উদ্বাস্তুদের ঠাঁই দেওয়ার জন্য তারা ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ঠিক তেভাগার লড়াইয়ের মতন ২/৩ বছর পেটাপেটি করে অবশেষে সুরাবর্দি সরকারের মতই কংগ্রেসী সরকারও হার মানলেন। সরকার যাদের অবাঞ্ছিত বলে পেটালেন, তাদের কাছে কংগ্রেসী সরকারও তেমন আর 'বাঞ্ছিত' রূপে রইলেন না।"

যাহোক সকলপ্রকার বাধা অতিক্রম করে ১৯৫০এর মধ্যে গড়ে ওঠা জবরদখল কলোনীগুলির প্রায় অধিকাংশ কলোনীকেই ১৯৬৪এর আগস্টের মধ্যে বৈধীকরণ করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৫০এর ৩১ ডিসেম্বরের পরে গড়ে ওঠা এই জাতীয় কলোনীগুলিকে বৈধীকরণের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল সত্তরের দশক থেকে।

কিন্তু উদ্বাস্তুদের মধ্যে কলকাতায় বাস করতে চাওয়ার প্রবল ঝোঁক-থাকার ফলেই কলোনীগুলিতে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। কলকাতার কলোনীগুলিতে প্রচুর উদ্বাস্তু একত্রে থাকবার ফলে এবং তাড়াহুড়ো করে কলোনী বা বস্তিগুলি নির্মাণের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলোনী বা বস্তির পরিবেশ ছিল অত্যন্ত খারাপ, অপরিছন্ন, অস্বাস্থ্যকর, পথঘাট অত্যন্ত কদর্য। এই সকল বিষয়ে কর্পোরেশনের নিকট আবেদন করেও কোন সুফল পাওয়া যেত না।

উদ্বাস্তুদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গবাসীদের প্রথমদিককার সহানুভূতি ক্রমে ক্রমে কিভাবে অন্তর্হিত হল পরিশেষে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। গোড়ার দিকে উদ্বাস্তুদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গবাসীদের সহানুভূতি যথেষ্টই ছিল, কিন্তু ক্রমশই তা ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল। আসলে পুনর্বাসনের কাজে জমি ও চাকুরীতে উদ্বাস্তুদের ভাগ দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, অন্যান্য সরকারী-বেসরকারীর চাকুরীর ক্ষেত্রে অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গবাসীদের অধিকারে ভাগ বসানোয় উদ্বাস্তুদের প্রতি এরা শেষপর্যন্ত সহানুভূতিশীল হবার পরিবর্তে কঠোর হয়ে পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের উপযুক্ত জমি পাওয়া ক্রমশ দুষ্কর হয়ে উঠলে পুনর্বাসনের কাজ কঠিন হয়ে পড়েছিল। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য জমি সংগ্রহ করতে হলে পশ্চিমবঙ্গবাসীদেরই জমি সংগ্রহ করতে হচ্ছিল। এর ফলে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মনোমালিন্য বেড়েই যাচ্ছিল।

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এক অর্থে প্রবলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। এমনকি ক্রমে সরকারের ভূমি সংগ্রহের চেষ্টা

নানাভাবে ব্যাহত হয়েছিল। যখনই কোন খালি জমির সন্ধান পেয়ে সরকারের পক্ষ হতে ভূমি সংগ্রহ আইনের সাহায্যে তা নেবার চেষ্টা হয়েছিল তখনই জমির মালিক সংশ্লিষ্ট অফিসে নানা আপত্তি দেখিয়ে আইনগতভাবে যতখানি সম্ভব বাধা দিয়েছিল। সেখানে সফল না হলে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে বাধা দেওয়া হত। কলকাতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতারা উপরমহলে তদ্বির করে প্রাণপণে তাদের জমি খালাস করিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। অবশ্য নিজের স্বার্থে টান পড়লে সহানুভূতি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। ফলে ব্যবহারযোগ্য জমির বিশেষ অভাব দেখা দিয়েছিল। ফলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগকে তখন সুন্দরবনের মত জায়গায় এমন জমির সন্ধান করতে হচ্ছিল যাতে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের স্বার্থে আঘাত না লাগে।

সূত্রনির্দেশ

১ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ১৯৭০, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা

২ ঝুমা চক্রবর্তী, দি রিফ্যুজি প্রবলেম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল : দি গভর্ণমেন্ট, দি অপোজিশান, দি পিপল, ১৯৪৭-৫৫

৩ সরোজ চক্রবর্তী, মাই ইয়ারস উইথ ডঃ বি. সি. রায়, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৮২

৪ এ হ্যাণ্ডবুক অফ গভর্ণমেন্ট পলিসি এ্যাণ্ড প্ল্যানস ফর দি রিসেটেলমেন্ট অফ রিফ্যুজি পপুলেশান, জুলাই, ১৯৪৮ (গভর্ণমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল)

৫ প্রণতি চৌধুরী, রিফ্যুজি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল—এ স্টাডি অফ দি গ্রোথ এ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ রিফ্যুজি সেটেলমেন্ট উইথ ইন দি সি. এম. ডি, (অকেশনাল পেপার)

৬ মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, প্রথম প্রকাশ, ২৩ শ্রাবণ, ১৩৯০, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা

৭ জ্যোতি বসু, এ্যাসেম্বলী প্রসিডিংস, ৫ এপ্রিল ১৯৫১, তৃতীয় অধিবশন, খণ্ড ৩, সংখ্যা ৩, পৃ ১৪২

৮ যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, এ্যাসেম্বলী প্রসিডিংস, ১৬ মার্চ, ১৯৫৩, নবম অধিবেশন (বাজেট) খণ্ড ৯, সংখ্যা ২, পৃ ১২৩৭-১২৪০

৯ আভা মাইতি, এ্যাসেম্বলী প্রসিডিংস, ২১ আগস্ট, ১৯৬৪, উনচল্লিশতম অধিবেশন, খণ্ড ৩৯, সংখ্যা ১, পৃ ১৪১৪

১০ আনন্দবাজার পত্রিকা, জুলাই, ১৯৫০

উত্তরখণ্ড আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আনন্দগোপাল ঘোষ

১

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের জেলা পঞ্চক—মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার সরকারী ও বেসরকারীভাবে উত্তরবঙ্গ নামেই সমধিক পরিচিত। এই অঞ্চলকে নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবীর আন্দোলনই উত্তরখণ্ড আন্দোলন নামে পরিচিত। এই দাবীর প্রবক্তা উত্তরবঙ্গের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলী জাতি—রাজবংশী সমাজের একাংশ। এই দাবী আদায়ের জন্য রাজবংশী সমাজের একাংশ উত্তরখণ্ড নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন ১৯৬৮ সালে। এই দল এখন আবার দ্বিধাবিভক্ত—উত্তরখণ্ড দল ও কামতাপুর গণ পরিষদ নামে। এই দাবী উত্থাপনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরাই এই নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

উত্তরবঙ্গ নাম না নিয়ে এরা উত্তরখণ্ড নাম গ্রহণ করলেন কেন—এ সম্পর্কে একটি মত প্রচলিত আছে সেটি হল জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সের চা বাগানে প্রচুর সাঁওতাল শ্রমিক কাজ করেন। এ ছাড়া মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরেও সাঁওতাল রয়েছেন। এদের একটা বিরাট অংশ ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এদের সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যেই উত্তরখণ্ড নামটি গ্রহণ করা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের উত্তর ও ঝাড়খণ্ডের খণ্ড নিয়ে উত্তরখণ্ড নাম হয়েছিল।[১] তবে রাজ্যের নাম হিসেবে তাঁরা কামতাপুর নামের ঐতিহাসিক অঞ্চলের নামই বেছে নিয়েছিলেন। কামতাপুর নামে রাজ্য কেন চাচ্ছেন তাও পরিস্কার নয়। কারণ কামতাপুর রাজ্যের গৌরব ছিল খেন রাজবংশ। খেন বংশের পতনের পর কোচ রাজশক্তির উদ্ভব হয়। খেন এবং কোচ—কোন রাজবংশের সঙ্গেই উত্তরখণ্ড দলের রাজবংশী ক্ষত্রিয়রা ঐতিহাসিকভাবে একাত্মতা অনুভব করেন না। কারণ কোচ ও খেন উভয় জনগোষ্ঠী থেকেই উত্তরবঙ্গের

ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজবংশী ক্ষত্রিয়রা নিজেদের আলাদা ভাবেন। সর্বোপরি কামতাপুর নামক রাজ্যের আদি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কায়স্থ পালবংশের বৈদ্যদেব।

উপরের আলোচনা থেকে উত্তরখণ্ডের ভৌগোলিক সীমা ও উত্তরখণ্ড নামকরণের একটা সূত্র পাওয়া গেল। এবারে পৃথক রাজ্যের দাবীর পটভূমিকা বিশ্লেষণ করা যাক।

২

অবিভক্ত বঙ্গদেশের রাজশাহী বিভাগে রাজবংশীরা এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ছিলেন। এছাড়া বিহারের পূর্ণিয়া, নেপালের তরাই অঞ্চল (ঝাপা ও মোরং জেলায়), আসামের গোয়ালপাড়া জেলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতেন। বিহারের পূর্ণিয়া ও নেপালের তরাই অঞ্চল বহুপূর্বেই আলাদা প্রশাসনিক অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু গোয়ালপাড়া জেলার সৃষ্টি ইংরেজরাই করেছিলেন। গোয়ালপাড়া পূর্বে রংপুর জেলার অংশ ছিল। ইংরেজ কোম্পানী প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে রংপুর জেলা ভাগ করে উত্তর রংপুর জেলা সৃষ্টি করেছিলেন। উত্তর রংপুর জেলা গোয়ালপাড়া নামেই পরিচিত ছিল। উত্তর রংপুর জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করেন ইংরেজ সরকার। এর ফলে রাজবংশী অধ্যুষিত উত্তর রংপুর জেলা চিরকালের জন্য আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। সে সময়ের রাজবংশী সমাজপতি এই প্রশাসনিক মানচিত্রের পরিবর্তনের তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। পারলে তাঁরা এই পরিবর্তনের প্রতিবাদ করতেন এবং সে সময় রংপুর জেলা যদি ভাগ না হত, তাহলে ভবিষ্যৎ রাজবংশী অধ্যুষিত একটা প্রদেশ বা রাজ্য হত না, একথা বলা যায় না। কারণ ১৮৭৬ সালে আসামকে যখন চীফ কমিশনারস প্রভিন্স করা হয় তখন তাতে মাত্র পাঁচটি জেলা যুক্ত হয়েছিল। অবিভক্ত উত্তরবঙ্গে রাজবংশী অধিবাসী অধ্যুষিত জেলার সংখ্যা পাঁচের বেশীই ছিল। সর্বোপরি আসামের পাঁচটি জেলার অসমীয়া অধিবাসী অপেক্ষা অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রাজবংশীয় অধিবাসীর সংখ্যা বেশী ছিল। অতএব পৃথক রাজ্য বা প্রদেশ তখনই একটি হতে পারত।[২] হয় নি যখন, তখন পরবর্তী সময়ের কথায় আসা যাক।

এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই রাজবংশীরা সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেন। মূলত জাত ও বর্ণগত কারণেই এই ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই ঐক্যবদ্ধতার আন্দোলন পরিচালনার জন্য রাজবংশী

ক্ষত্রিয় সমিতি গড়ে তুলেছিলেন।[৩] এটি সমস্ত রাজবংশী সমাজের কেন্দ্রীয় সমিতি হিসেবে মর্যাদা পেয়েছিল। সামাজিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই সমিতি গঠিত হলেও বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই সমিতি জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শুরু করেছিলেন। ১৯২০ থেকে ১৯২৯ সালে বঙ্গদেশে যে কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ক্ষত্রিয় সমিতি প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন। এছাড়া ১৯৩৭ এবং ১৯৪৬ সালের এ্যাসেম্বলি নির্বাচনে জয়লাভও করেছিলেন। এই নির্বাচনে ক্ষত্রিয় সমিতির প্রার্থীরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। ক্ষত্রিয় সমিতির নির্বাচিত প্রার্থীরা এ্যাসেম্বলিতে পূর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচিত তপশিলী প্রতিনিধিদের সঙ্গে যৌথভাবে Independent Scheduled Caste Party গঠন করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হল ক্ষত্রিয় সমিতি এভাবে জাতীয় কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের মতন সর্বভারতীয় দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন কেন? ক্ষত্রিয় সমিতি মনে করত বঙ্গদেশের কংগ্রেস হল বর্ণ হিন্দুদের নিয়ন্ত্রিত সংগঠন। কমিউনিস্ট পার্টিকেও তাঁরা তাই মনে করত। রাজবংশীরা তাই নৃগোষ্ঠীগত ও বর্ণগত স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রথমে সামাজিক সমিতিতে পরিণত করেছিলেন। এখানে রাজবংশীদের নৃগোষ্ঠীগত ও বর্ণগত অবস্থান সম্পর্কে দু-একটি কথা না বললে পৃথক রাজ্যের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোটি ধরা যাবে না।

নৃগোষ্ঠীগতভাবে রাজবংশীরা ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এদের চেহারার সঙ্গে বঙ্গদেশের অবশিষ্ট অঞ্চলের লোকেদের চেহারার তফাৎ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্ণগত অবস্থানও বিশেষ ধরনের। এরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবী করেন। অথচ বঙ্গদেশের সামাজিক কাঠামোতে ক্ষত্রিয় বলে কোন শ্রেণীর অবস্থান স্বীকৃত নয়। এর ফলে মানসিকভাবে এরা নিজেদেরকে আলাদা ভাবতে শুরু করেছিলেন এবং এই আলাদা ভাবনা থেকেই আলাদা সামাজিক এবং স্বাধীনতার পূর্বেই রাজবংশী সমাজ একটা 'separate identity' গড়ে তুলেছিলেন।

৩

উত্তরবঙ্গের তপশিলী জাতির জন্য প্রথম একটি পৃথক রাজ্যে দাবী জানিয়েছিলেন অ-রাজবংশী তপশিলী জননেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। ইনি পূর্ববঙ্গের নমশূদ্র সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৪ মে দার্জিলিং

জেলার খড়িবাড়িতে একটি জনসভায় তিনি এই দাবী জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন দেশবিভাগ যদি হয় তাহলে রাজবংশীদের জন্য 'রাজস্থান' নামে একটি রাজ্য বা প্রদেশ গঠন করতে হবে। এই প্রস্তাবিত রাজ্য গঠিত হবে জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর জেলা, রংপুর ও দার্জিলিং জেলার কিছু অংশ এবং বিহারের পূর্ণিয়া এবং আসামের গোয়ালপাড়া নিয়ে।[৪] এই অঞ্চলগুলি রাজবংশী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ছিল। কিন্তু যেখানে রাজবংশী সবচেয়ে বেশী ছিল সেই দেশীয় রাজ্য কোচবিহারকে কিন্তু প্রস্তাবিত রাজস্থান প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করা হয় নি। সম্ভবত এটি দেশীয় রাজ্য ছিল তাই যোগেনবাবুর প্রস্তাবিত রাজস্থান প্রদেশে স্থান পায় নি। এই প্রস্তাবিত রাজস্থান প্রদেশ সম্পর্কে রাজবংশী সমাজের প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায় নি।

৪

স্থানীয় রাজবংশী সমাজের পক্ষ থেকে প্রথম পৃথক রাজ্যের দাবী উঠেছিল দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের রাজবংশীয় সমাজের একাংশের পক্ষ থেকে। এই দাবীর প্রবক্তা ছিলেন কোচবিহার হিতসাধনী সভা। এই সভার উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। গবেষকদের ধারণা কোচবিহার রাজ্যের ইংরেজ 'রেজিমেণ্ট' এবং মহারাণী ইন্দিরা দেবীর ব্যক্তিগত সচিব হায়দ্রাবাদের নিজামের আত্মীয় নবাব খসরু জঙ্গের আগ্রহেই হিতসাধনী সভা গঠিত হয়েছিল। হিত-সাধনী সভার গঠনের মধ্যেই সভার চরিত্র ও উদ্দেশ্য নিহিত আছে। রাজবংশী হিন্দু ও মুসলমান জোতদারদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল হিতসাধনী সভা। এছাড়া এ সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কামরূপীয়া ব্রাহ্মণরা। এরা সিলেখী ও মৈথিলী নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে হিতসাধনী সভা ছিল স্থানীয় মানুষের সংগঠন। এই সভা ভাটিয়াদের (পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে আগত বর্ণ-হিন্দুদের ভাটিয়া বলত) বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল। হিতসাধনী সভার সদস্যরা মনে করত বর্ণহিন্দু ভাটিয়ারাই প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করে রেখেছেন।[৫]

এই হিতসাধনী সভা স্বাধীনতার পরে দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের ভারত-ভুক্তির প্রশ্নে কোচবিহারকে একটি পৃথক রাজ্য হিসেবে ঘোষণার দাবী জানিয়েছিলেন। তবে হিতসাধনী সভার পৃথক রাজ্যের দাবী মূলত কোচবিহার রাজ্যকে কেন্দ্র করেই তৈরী হয়েছিল।

হিতসাধনী সভার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন সতীশচন্দ্র সিংহরায়

সরকার। ইনি উকিল এবং দিনহাটা অঞ্চলের জোতদার ছিলেন। কিছুকালের জন্য কোচবিহার রাজ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। সতীশচন্দ্র সিংহরায় সরকারের নেতৃত্বেই হিতসাধনী সভা আপামর কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের মঞ্চে পরিণত হয়েছিল।

হিতসাধনী সভার আর একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন খানচৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ। ইনি মাথাভাঙ্গা অঞ্চলের জোতদার ছিলেন এবং রাজ সরকারের রাজস্বমন্ত্রী হয়েছিলেন। এরা ছাড়া যাঁরা হিতসাধনী সভার কর্ণধাররূপে বিবেচিত হতেন তাঁরা হলেন জলধর সাহা, কামিনীকুমার বর্মন, গজেন্দ্র বসুনীয়া, মৌলভী মজিরুদ্দিন আহমেদ, বীরেন্দ্র নারায়ণ, করমুদ্দিন বসুনীয়া প্রমুখ।[৬]

এই হিতসাধনী সভাই কোচবিহার রাজ্যের আইনসভা ও মন্ত্রী পরিষদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করত। একজন বাদে সব মন্ত্রীই ছিলেন রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত। একমাত্র অ-রাজবংশী মন্ত্রী ছিলেন চৌধুরী সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী। ইনি জমিদার ছিলেন এবং অর্থ ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছিলেন।

হিতসাধনী সভা স্বাধীনতার পর নাম পরিবর্তন করে কোচবিহার স্টেট প্রজা কংগ্রেস নাম গ্রহণ করেছিল এবং এই নামেই তাঁরা বিভিন্ন সংস্থার সভায় প্রতিনিধি পাঠাতেন।

হিতসাধনী সভা তথা রাজ্য প্রজা কংগ্রেসের প্রতিবাদী সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠেছিল কোচবিহার রাজ্য প্রজামণ্ডল। এই প্রজামণ্ডলের সভাপতি ছিলেন একজন রাজবংশী। ইনিও উকিল ছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে ইনি গান্ধীবাদের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজ্য প্রজামণ্ডল কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন।

হিতসাধনী সভার দাবী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কোচবিহারকে পৃথক রাজ্য না করলেও কেন্দ্রশাসিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এরপরেই কোচবিহারকে নিয়ে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছিল। আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কোচবিহার রাজ্যকে আসামের সঙ্গে সংযুক্তির দাবী জানিয়েছিল। আসামের রাজ্যপাল সার আকবর হায়দারীও কোচবিহারকে আসামের সঙ্গে সংযুক্তির স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন।[৭] এসব সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলাতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

হিতসাধনী সভা তথা রাজ্য প্রজা কংগ্রেসের রাজনীতির প্রভাব জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলেও পড়েছিল। ডুয়ার্সের রাজবংশী হিন্দু ও মুসলমানদের একাংশ কোচবিহারের অধীনে যাওয়ার জন্য প্রচার শুরু করেছিলেন। এদের যুক্তি ছিল ডুয়ার্স ভুটান ও ব্রিটিশ কর্তৃক দখলের পূর্বে কোচবিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব এখন যখন ব্রিটিশরা চলে যাচ্ছেন তখন তাঁরাও কোচবিহারের দিকে যাবেন।[৮] এদের এ দাবী অবশ্য গুরুত্ব পায় নি।

হিতসাধনী সভার ও ডুয়ার্সের রাজবংশী হিন্দু-মুসলমানের দাবী সফল না হলেও এদের চিন্তা থেকে পৃথক রাজ্যের দাবীটি একেবারে মুছে যায় নি। কোচবিহারের পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তির পরেই এর বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৪৯ সালের ৩০ অক্টোবর কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, সিকিম এবং দার্জিলিঙের প্রতিনিধিরা দার্জিলিঙে একটি সভায় মিলিত হয়ে পৃথক রাজ্যের দাবী জানিয়েছিলেন। এই সভায় কোচবিহার রাজ্যের প্রজা কংগ্রেস, দার্জিলিঙের গোর্খা লীগ, সিকিমের প্রজা সম্মেলন ও জলপাইগুড়ির গোর্খা লীগের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভা সম্পর্কে কোচবিহারের চীফ কমিশনার ভি. আই. নানজাপ্পা ভারত সরকারকে এক প্রতিবেদনে লিখেছিলেন হিতসাধনী সভা কোচবিহারকে দার্জিলিং অথবা আসামের সঙ্গে সংযুক্তিতেই বেশী আগ্রহী।[৯] এই সভায় উত্তরখণ্ড প্রদেশ সংঘ নামে একটি রাজ্যের দাবী জানানো হয়েছিল। এরা প্রধানমন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপিও দিয়েছিলেন।[১০] কিন্তু কোন কাজ হয় নি। আশ্চর্যের বিষয় যে প্রস্তাবিত উত্তরখণ্ড প্রদেশ সংঘে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের নাম ছিল না। অথচ সিকিম ঢুকে গিয়েছিল।

১৯৫২ সালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যখন দার্জিলিঙে এসেছিলেন তখনও উত্তরখণ্ড প্রদেশ স্থাপনের দাবী জানানো হয়েছিল।[১১] প্রধানমন্ত্রী এবারও বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন নি।

১৯৫৫ সালের ২১ মে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের দু'জন সদস্য সর্দার কে. এম. পানিক্কর এবং কুঞ্জরু দার্জিলিঙে এলে 'সর্ব সম্প্রদায় জেলা সংগঠন' নামে একটি সংস্থা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং ও সিকিম নিয়ে একটি পৃথক রাজ্য গঠনের দাবী জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং নিয়ে উত্তরখণ্ড রাজ্যের দাবী জানিয়েছিল। কিন্তু রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন এ দাবী মেনে নেন নি। কোচবিহার জেলা কংগ্রেস কমিটিও একটি স্মারকলিপি দিয়েছিলেন কোচবিহারের

স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য এবং গোয়ালপাড়াকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য।[১২]

৬

রাজ্য পুনর্গঠনের পর সুদীর্ঘ দেড় দশক উত্তরাংশের সমতলের জেলাগুলিতে পৃথক রাজ্য গঠনের কোন আন্দোলনের খবর পাওয়া যায় না। প্রথম যুক্তফ্রণ্ট গঠন হওয়ার পর থেকে পৃথক রাজ্যের দাবীটি আবার মাথাচাড়া দিতে থাকে বলে অনেকের ধারণা। এ ধারণার সমর্থনে কোন লিখিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন কাকতালীয় ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে নবপর্যায়ের পৃথক রাজ্য গঠনের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠনের একটা negative যোগসূত্র আছে। কাকতালীয় ঘটনাগুলো কি ছিল দেখা যাক।

প্রথমত, যুক্তফ্রন্টের কোনো কোনো শরিকের জঙ্গী ভূমি দখল আন্দোলন উত্তরাঞ্চলের রাজবংশীয় জোতদারদের মনে ভীতির সৃষ্টি করেছিল। এটা ঠিক যে জঙ্গী ভূমি দখল আন্দোলন সব জোতদারদের ঘুম কেড়ে নিলেও উত্তরাঞ্চলের রাজবংশী জোতদাররা একটু বেশী মাত্রায় ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তার কারণও স্পষ্ট। রাজবংশী সমাজ পুরোপুরি একটি ভূমিনির্ভর সমাজ। স্বাভাবিকভাবেই ভূমি দখল আন্দোলন তাঁদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। ভূমি এ অঞ্চলে তখনও সামাজিক প্রতিপত্তির প্রতীক হিসেবেই বিবেচিত হত। ১৯৫৩ সালে আইনগতভাবে জমিদারী প্রথা রহিত হলেও তার সঠিক রূপায়ণ বাস্তবে হয় নি। ফলে রাজবংশী জোতদারদের অবস্থানের তেমন পরিবর্তন ঘটে নি। তাই নয়া ভূমি দখল আন্দোলন স্থানীয় রাজবংশী জোতদারদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের নকসাল আন্দোলন ঐ অঞ্চলের রাজবংশী জোতদারদের নিকট ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া এই নয়া জঙ্গীভূমি দখল আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন পুরানো ভাটিয়া, নয়া পূর্বপাকিস্তানাগত উদ্বাস্তু ও নেপাল থেকে আগত নেপালীরা। খাস জমি দখলের সুযোগও এরাই বেশী নিয়েছিলেন। তুলনায় রাজবংশী ভূমিহীন কৃষক সেরূপ সুযোগ পায় নি।

দ্বিতীয়ত, প্রথম যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে কংগ্রেস অন্যত্র হেরে গেলেও উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে তাঁদের শক্তির বিশেষ তারতম্য ঘটে নি। এ অবস্থা দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের সময় অব্দি বজায় ছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৭ সালেই প্রথম কংগ্রেস এ অঞ্চল থেকে উৎখাত হয়।

নব পর্যায়ে পৃথক রাজ্যের দাবী নিয়ে যাঁরা আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন

তাঁদের অনেকেই কংগ্রেসের কর্মী বা কংগ্রেস সমর্থক ছিলেন। কিছু ছিলেন সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য। দেশ বিভাগের পর প্রায় একদশক ধরে উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ও চা বাগানে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির (কে এম পি পি) ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কে এম পি পি-ও রাজবংশী কৃষক ও জোতদারদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলেছিল। কে এম পি পি অবশ্য একটি বাড়তি সুবিধা পেয়েছিল। সেটা হল এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। এ ছাড়া উত্তরখণ্ড দলের প্রধান ধ্বনি ছিল বন্দেমাতরম ও জয় হোক।[১৩] বন্দেমাতরম ধ্বনি গ্রহণ করা মানেই কিন্তু এরা কংগ্রেসী নয়। উত্তরখণ্ডীরা মনে করেন উত্তরবঙ্গের মাটিতেই সন্ন্যাসীরা প্রথম বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়েছিল সন্ন্যাসীদের উত্তরসূরী হিসেবেই তাঁরা বন্দেমাতরম ধ্বনিকে গ্রহণ করেছিলেন, কংগ্রেসের ধ্বনি হিসেবে নয়। তবে উত্তরখণ্ড দলের সঙ্গীত হল "উত্তর বাংলা জননী আমার"।

এই সমস্ত কারণেই অনেক বামপন্থী তাত্ত্বিকের ধারণা হয়েছে নব পর্যায়ে পৃথক রাজ্যের যে দাবী উত্তরখণ্ড দল জানাচ্ছে তা কংগ্রেসের মদতপুষ্ট। উত্তরখণ্ড দল যখন শুরু হয়েছিল তখন এই অভিযোগের মধ্যে কিছু যুক্তি থাকলেও, বর্তমানে তা একেবারেই ভিত্তিহীন। উত্তরখণ্ড দল ও কংগ্রেসের সম্পর্ক এখন বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। এবার উত্তরখণ্ড দলের আন্দোলনের কথায় আসা যাক।

৭

উত্তরখণ্ড দল ১৯৬৯ সালের ৫ জুলাই জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার ঐতিহ্যমণ্ডিত জল্পেস মন্দিরে গঠিত হয়েছিল।[১৪] ঝাড়খণ্ড ও দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম দলের ভাবাদর্শে এই দল গঠিত হয়েছিল। এই দল গঠনের সময় উল্লেখযোগ্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন কলীন্দ্রনাথ বর্মন, ওয়াজ-উদ্দিন আহমেদ, পঞ্চানন মল্লিক, সুমা ওঁড়াও, সীতানাথ রায় ও জল্পেস মন্দিরের পুরোহিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এদের মধ্যে কলীন্দ্রনাথ বর্মন সমাজতন্ত্রী দলের কর্মী, ওয়াজউদ্দিন আহমেদ, পঞ্চানন মল্লিক কংগ্রেস, সুমা ওঁড়াও ঝাড়খণ্ডী ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে কংগ্রেসী লোকদের নিয়ে গঠিত হলেও কংগ্রেসের সঙ্গে শীঘ্রই উত্তরখণ্ডীদের বিরোধ শুরু হয়েছিল। এই বিরোধ শুরু হয়েছিল North Bengal Development Council গঠন নিয়ে। উত্তরখণ্ড দলের দাবী ছিল এই Council-এ উত্তরখণ্ড দলের লোক নিতে হবে। সিদ্ধার্থশংকর রায় এই দাবী মানেন নি। সিদ্ধার্থবাবু এ সময় কেন্দ্রীয়

মন্ত্রী ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীও ছিলেন। এই ঘটনার পর উত্তরখণ্ড দল গোর্খা লীগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং জল্পেস মন্দিরে একটি সভা ডেকেছিলেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ডম্বর সিং, নরনারায়ণ নারজিনারী, রবি সরকার, কলীন্দ্রনাথ বর্মন, পঞ্চানন মল্লিক প্রমুখ। কংগ্রেসের সঙ্গে এই বিরোধের পরিণতিতেই উত্তরখণ্ড দল ১৯৭২ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং নয়জন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। নির্বাচনে প্রত্যেক প্রার্থীরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। ফলে দল ভাঙ্গতে শুরু করেছিল। তাছাড়া পুলিশের ভয়ে, 'মিসা' প্রভৃতি কারণে অনেকেই পুনরায় কংগ্রেস (শাসক) দলে ফিরে গিয়েছিল। এরপরেই জরুরী অবস্থা জারী হয়েছিল।

উত্তরখণ্ড দল এই টালমাটাল অবস্থার মধ্যেই ১৯৭৭ সালে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। ভোটের ফলাফল ১৯৭২ সালের অনুরূপই হয়েছিল। উত্তরখণ্ড দলের নির্বাচনী জনপ্রিয়তা বোঝার জন্য ১৯৮২ সালের নির্বাচনী চিত্রটি তুলে দিচ্ছি।

জলপাইগুড়ি জেলা নির্বাচনী কেন্দ্র

	কেন্দ্রের নাম	প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোট
১।	ধূপগুড়ি (তপশিলী)	পঞ্চানন মল্লিক	২১৫০
২।	ময়নাগুড়ি (")	"	২৯৫৯
৩।	জলপাইগুড়ি (সাধারণ)	রুক্মিনী রায়	৮৯৯
৪।	রাজগঞ্জ (তপশিলী)	হরেন্দ্রনাথ বর্মন	১২৬৪
৫।	মাদারীহাট (আদিবাসী)	জুলিয়াস তপনো	২২৬৫

দার্জিলিং জেলা নির্বাচনী কেন্দ্র

	কেন্দ্রের নাম	প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোট
১।	ফাঁসীদেওয়া (আদিবাসী)	এডওয়ার্ড তিরকে	৩১৭৩

কোচবিহার জেলা নির্বাচনী কেন্দ্র

	কেন্দ্রের নাম	প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোট
১।	কোচবিহার পশ্চিম (সাধারণ)	জনাবউদ্দিন ব্যাপারী	২২৭
২।	কোচবিহার উত্তর (সাধারণ)	রবীন্দ্রনাথ সরকার	৭৬৬
৩।	মেখলিগঞ্জ (তপশিলী)	মণীন্দ্রনাথ রায়	১১১৪

উত্তরখণ্ড দলের নির্বাচনী কেন্দ্র দেখে মনে হয় এদের যদি কিছু প্রভাব থেকে থাকে, তবে তা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলার সমতলে পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহে তাঁরা কোন প্রার্থীই দাঁড় করতে পারেন নি।[১৫]

উত্তরখণ্ড দলের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের অধিবাসী এবং আদিপর্বে উত্তরখণ্ড দলের বিস্তার ও এই জেলাদ্বয়ের কিছু এলাকাতেই হয়েছিল। দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলে উত্তরখণ্ডের বিস্তার একটু পরেই হয়েছিল। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির মতন তরাই অঞ্চলের জোতদাররাও নকসালী আন্দোলন থেকে বাঁচার জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এই প্রতিরোধ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সোস্যালিস্ট পার্টির কর্মী দার্জিলিং জেলার চটেরহাটের অধিবাসী সম্পদ রায়। ইনি নিজেও জোতদার ছিলেন। সম্পদবাবুরা মনে করতেন নকসালী জমি দখলকারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) উদ্বাস্তু, নেপাল থেকে আগত ভূমিহীন কৃষক ও বিহারের হিন্দীভাষী আদিবাসী কৃষক। স্থানীয় রাজবংশী বা অন্য জনগোষ্ঠীর ভূমিহীন কৃষক খুব কমই ছিল। সম্পদ রায়ের সশস্ত্র প্রতিরোধবাহিনী এই সময়েই উত্তরখণ্ডে মিসে যায় এবং উত্তরখণ্ড দল নতুন শক্তি নিয়ে আবার মাঠে নামে। লক্ষ্য করা গেছে নকসাল আন্দোলনে নিহত তরাইয়ের জোতদারদের অধিকাংশই ছিলেন রাজবংশী।[১৮] যাইহোক তরাই অঞ্চলে উত্তরখণ্ড দলের বিস্তার হলেও পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহে এদের সংগঠন গড়ে উঠতে পারে নি।

৮

আশির দশকে উত্তরখণ্ড দল 'ভাটিয়া খেদাও আন্দোলন' শুরু করেছিল। ১৯৮০-এর শেষে এই আন্দোলন কিছু কিছু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আসামের 'আসুর' প্রভাবেই এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং কিছু গ্রামের নয়া উদ্বাস্তুদের একটি বিরাট অংশ নিজেদেরকে সংহত করতে আরম্ভ করেছিল। এই নয়া উদ্বাস্তুরা হলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত গ্রামের নমশূদ্রসমাজ। এই সময় থেকেই নমশূদ্র কৃষিজীবীদের সঙ্গে উত্তরখণ্ডের প্রত্যক্ষ বিরোধ শুরু হতে থাকে। এর মূল কারণও ভূমি। নমশূদ্র উদ্বাস্তু কৃষকরা রাজবংশী কৃষকদের জমি কিনে চাষবাস করে অল্পদিনের মধ্যেই আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন করতে পেরেছে। অন্যদিকে রাজবংশীসমাজের মধ্যে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলছে।[১৭]

নমশূদ্র রাজবংশী বিরোধের আরো একটা কারণও আছে। সেটা হল উত্তরখণ্ড দল দাবী করেছে ১৯৭১ সালের পরে যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তাঁরা বিদেশী। এ ধরনের দাবী উত্তরবঙ্গের আরো একটি নৃগোষ্ঠীগত

সংগঠন—উত্তরবঙ্গ তপশিলী জাতি ও উপজাতিও (উতজাস নামে পরিচিত) করেছে।[১৮] কোচবিহারের কোচ-রাজবংশী ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারও দাবী করেছে। অর্থাৎ ১৯৭১ সালই বিদেশী নির্দশক বছর হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধের পরে ব্যাপকহারে যে উদ্বাস্তু আগমন ঘটেছিল তার একটা বিরাট অংশই ছিল তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত বিশেষ করে নমশূদ্র গোষ্ঠীভুক্ত। স্বভাবতই দ্বিতীয় উদ্বাস্তু হওয়ার ভয়ে নয়া নমশূদ্র উদ্বাস্তুরা সভা-সমিতির মাধ্যমে নিজেদেরকে সংগঠিত করছেন।[১৯]

৯

আশির দশকের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল উত্তরখণ্ড আন্দোলন 'আসুর' সাফল্যে নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। আসুর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও গড়ে উঠেছিল এবং এই সময়েই উত্তরখণ্ড আন্দোলনের নতুন আর একটি শলাপরামর্শ কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল কোচবিহারের অদূরে মধুপুরের শংকরদেবের মন্দিরে। শং রদেব আসাম ও কোচবিহারে ধর্মীয় মহাপুরুষের জাতীয় সম্মান পেয়ে থাকেন। মধুপুর ধামের এই মন্দিরে শংকর-দেবের জন্মদিন উপলক্ষে আসামের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা এসে থাকেন। ১৯৮৩ সালে হিতেশ্বর শইকিয়া, কবীর রায় প্রধানী (ইনি রাজবংশী), মুকুট শর্মা এসেছিলেন। ১৯৮৬ সালে আসামের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মোহন্ত এসেছিলেন।

আসামের মন্ত্রী, রাজনীতিবিদদের মধুপুর ধামে যাতায়াত দেখে অনেকেই মনে করছেন অসম গণপরিষদের (অ গ প) নেতাদের সঙ্গে উত্তরখণ্ডীদের যোগসূত্র দৃঢ় হচ্ছে এবং একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে 'আসু' আন্দোলনের সাফল্য উত্তরখণ্ডীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। আসুর ধাঁচে উত্তরখণ্ড দল ১৯৮৭ সালের ২৫ জুন জলপাইগুড়ি জেলার আলতাগ্রাম নামক স্টেশনে রেল-রোকো আন্দোলন শুরু করেছিল। এই আন্দোলনে তিন হাজার উত্তরখণ্ডী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে চারজন উত্তরখণ্ডী মারা গিয়েছিলেন। উত্তরখণ্ডীরা এ-জন্য ২৫ জুনকে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে থাকেন।

এই রেল-রোকো আন্দোলনের শোচনীয় ব্যর্থতার পরই উত্তরখণ্ড দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় ১৯৮৭ সালের অক্টোবরে উত্তরখণ্ড ও কামতাপুর গণ পরিষদ নামে।[২০] উভয় দলের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ নেই। লক্ষ্যও এক। বিরোধ শুধু লক্ষ্য পুরণের পথের প্রশ্নে।

সূত্রনির্দেশ

১ সাক্ষাৎকার, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উত্তরখণ্ড দলের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

২ 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা,' আনন্দগোপাল ঘোষ, উত্তরণ, ১৯৯০, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্র সংস্থার মুখপত্র

৩ রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, উপেন্দ্রনাথ বর্মন, ১৯৮১, পৃ ৬২

৪ মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৯, পৃ ২২-২৩

৫ দি স্টোরি অফ দি ইন্টিগ্রেশন অফ দি কোচবিহার স্টেট উইথ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন, আনন্দগোপাল ঘোষ, দি হিস্টোরিক্যাল রিভিউ, ভলিউম ২, প্রথম খণ্ড

৬ হিস্ট্রি অফ অল ইণ্ডিয়া গোর্খা লীগ ১৯৪৩-১৯৪৭, কৃপাল সিং ও ভাই নীহার সিং সম্পাদিত, পৃ ৮৫

৭ কোচবিহার পিপলস এ্যাসোসিয়েশনস প্রসিডিংস, এই সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক তারাপদ চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত সংগ্রহাগারে রক্ষিত

৮ ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালের বাংলায় লেখা দুটি প্রচারপত্র

৯ হিস্ট্রি অফ অল ইণ্ডিয়া গোর্খা লীগ, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৩

১০ হোয়াই গোর্খাল্যাণ্ড, প্রান্ত পরিষদ, ১৯৮৬, পৃ ১২

১১ গোর্খাল্যাণ্ড এ্যাজিটেশন, রাজেন্দ্র বৈদ, ১৯৮৮, পৃ ৮৫ ; (এটি গোর্খাল্যাণ্ড সম্পর্কিত ইংরেজী ও হিন্দী তথ্যের সংকলন)

১২ এ মেমোরাণ্ডাম অন মেইনটেনান্স অফ স্টাটাস কুয়ো অফ কোচবিহার এ্যাণ্ড রি-এ্যামালগামেশন অফ দি গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্ট ইন আসাম উইথ ওয়েস্ট বেঙ্গল দি কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটি, ১৬ মে, ১৯৫৫

১৩ উত্তরখণ্ড দলের সংবিধান, ১৫ আগস্ট, ১৯৮০

১৪ মেমোরাণ্ডাম টু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, দি অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার অফ ইণ্ডিয়া অন টোয়েন্টি ফোর্থ আগস্ট ১৯৮১ বাই দি উত্তরখণ্ড দল

১৫ ১৯৮২ সালের নির্বাচনী পরিসংখ্যানের প্রাসঙ্গিক অংশ এবং পশ্চিমবঙ্গ, ৪ জুন ১৯৮২ (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র)

১৬ সাক্ষাৎকার, সম্পদ রায়, সাধারণ সম্পাদক, উত্তরখণ্ড দল, ২৯ এপ্রিল, ১৯৮২

১৭ উত্তরখণ্ড দলের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো, ১৯৮২

১৮ উত্তজাআসের ভোট বয়কট আন্দোলন কেন? একটি প্রচার পুস্তিকা; মোঃ জামালউদ্দিন মিঞা, ভূপেন্দ্রনাথ বর্মন, চাম্পারাম কুজুর, এতোয়া মারাণ্ডি, গৌতম চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

১৯ মাদারীর মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, দেবেশ রায়, প্রতিক্ষণ, শারদ সংখ্যা, ১৩৯৪; এই অংশ পরে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত নামক সুবৃহৎ উপন্যাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং অংশে রাজবংশীদের সঙ্গে নয়া উদ্বাস্তু নমশূদ্র কৃষকদের বিরোধের বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে

২০ কেন কামতাপুর? পঞ্চানন মল্লিক, ৫৩৯, শঙ্করাব্দ, রাখী পূর্ণিমা; একটি প্রচার পুস্তিকা

বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়
(১৯৩৫-১৯৩৯)

অমিতাভ চন্দ্র

১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯, বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই দ্বিতীয় পর্যায় ছিল "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ণের যুগ। একই সঙ্গে এই যুগ ছিল বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির ও আন্দোলনের বিকাশের যুগ। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূল স্রোতে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ আন্দোলনকেও শক্তিশালী করে তোলে, কমিউনিস্ট পার্টিরও শক্তিবৃদ্ধি ঘটায়। এই পর্যায়েই বিভিন্ন ছোট ছোট কমিউনিস্ট গ্রুপের ও বামপন্থী দলের সদস্যদের স্বীয় গ্রুপের ও দলের স্বাধীন অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান পার্টিকে শক্তিশালী করে তোলে। এই পর্যায়েই বেঙ্গল লেবার পার্টির কমিউনিস্ট সদস্যারা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ঘটান। কমিউনিস্টরা "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্বকে বাস্তব রূপদানের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে (সি. এস. পি.) ও কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কাজ করতে থাকেন। এই পর্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সদ্য আন্দামান-মুক্ত, জেলমুক্ত ও বিভিন্ন ডিটেন্‌শন্ ক্যাম্প্-মুক্ত জাতীয় বিপ্লবীদের একটা বড় অংশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। পূর্বতন জাতীয় বিপ্লবীদের যোগদানের ফলে কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও জনসাধারণের চোখে মর্যাদাবৃদ্ধি উভয়ই ঘটে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এই যুগে কমিউনিস্ট পার্টির কাজের বিস্তৃতি ঘটে। পার্টির সদ্যগঠিত জেলা কমিটিগুলির অধিকাংশেরই দায়িত্বে ছিলেন পার্টিতে যোগদানকারী এই জাতীয় বিপ্লবীরা। জেলায় জেলায় পার্টিকে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে এঁদের অবদানই সবচেয়ে বেশী। এই সময়েই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা প্রভৃতি গণ-সংগঠন ও শ্রেণী-সংগঠন গড়ে ওঠে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেরও কাজের বিস্তৃতি ঘটে এই যুগে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ

এই সবকটি গণ-সংগঠন ও শ্রেণী-সংগঠনেই অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন কমিউ-নিস্টরা। অ-কমিউনিস্টদের সঙ্গে একযোগে কমিউনিস্টরা এই সংগঠনগুলি পরিচালনা করতেন এবং শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের নিজস্ব দাবিদাওয়াভিত্তিক আন্দোলনে ও বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন।[১]

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির ও আন্দোলনের এই পর্যায় সম্পর্কে ভবানী সেনের মন্তব্য ঃ "১৯৩৭-এর আগে পর্যন্ত পার্টি ছিল অল্পসংখ্যক কমরেডের সমষ্টি যারা পরস্পরের কমরেড আবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গও বটে। তাই তখন-কার পার্টি যেন এক পরিবারের লোক—পারিবারিক চক্র। এখন বিভিন্ন দল থেকে নতুন নতুন সভ্য, বিভিন্ন অভিযান থেকে নতুন নতুন উপাদান পেয়ে পার্টি অনেক বড় হয়ে উঠতে লাগল—পারিবারিক বা ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার বন্ধন দিয়ে তাকে আর বেঁধে রাখা যায় না। অথচ পার্টির ভেতরে রাজনৈতিক ঐক্য তখনও দৃঢ়-সংবদ্ধ হয় নি। কাজেই পার্টির মধ্যে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা তখনও আসে নি।…সংগঠনের এই আদিম অবস্থা পার্টির রাজনীতিক প্রভাব ও সংগঠন বাড়ার শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াল। তখন পার্টি-সংগঠনের দিক থেকে শুরু হল চক্রস্তর থেকে পার্টিস্তরে উঠবার জন্য সংগ্রাম।"[২] ভবানী সেন এই পর্যায়কে চিহ্নিত করেছেন চক্র স্তর থেকে পার্টিস্তরে উত্তরণের পর্যায় হিসাবে। তাঁর মতে প্রকৃতপক্ষে এই উত্তরণ ঘটল ১৯৩৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসের মধ্যে।[৩]

বর্তমান নিবন্ধে মুখবন্ধ ও সূত্রপাতে উল্লিখিত সবকটি বিষয়ই আমি ছুঁয়ে যাব। স্থানসংক্ষেপের কারণে এই নিবন্ধের পরিসরে বিষয়গুলির বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হবে না। স্থানসংক্ষেপের কারণেই আমার আলোচনা হবে মূলত কলকাতাভিত্তিক, জেলাগুলির উল্লেখ থাকবে প্রসঙ্গক্রমে। এই একই কারণে এই নিবন্ধের মূল অভিনিবেশ হবে এই পর্যায়ের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা আলো-চনাপ্রসঙ্গে ছুঁয়ে যাব, ইচ্ছা থাকলেও বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হবে না।

পট-পরিবর্তনের বছর—১৯৩৫

১৯৩৫ সালের গোড়া থেকেই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের লাইন পরিবর্তনের ইঙ্গিত ভারতে এসে পৌঁছতে থাকে। লাইন পরিবর্তন-সংক্রান্ত দলিলপত্র বাংলার কমিউনিস্টদের হাতে আসে। এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত নিয়ে বাংলার কমিউনিস্ট মহলে আলোচনা শুরু হয়।

"International Press Correspondence (Inprecor)"-এর ৯ মার্চ

১৯৩৫ (Vol. 15, No. 10)-সংখ্যায় প্রকাশিত 'Problems of the Anti-Imperialist Strnggle in India'—শীর্ষক প্রবন্ধে[৪] কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতৃত্বের, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের ও কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের (তখনও এঁদের "left" national-reformists হিসাবে অভিহিত করা হচ্ছে) তীব্র সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্টদেরও সমালোচনা করে লেখা হয়—"However, the Communist Party of India in the past committed a number of mistakes and incorrect actions as regards its participation in the anti-imperialist struggle. This could be especially felt at the crucial moment in 1930. ···The task of the Communists was not to limit themselves simply to general appeals to fight for an anti-imperialist and anti-feudal revolution, but to go into the midst of the struggling masses, to try and rally them to their side, giving chief prominence to the concrete demands of the struggle against imperialism and putting the tactics of the united front into effect.···This inability to link up the most active participation in the struggle against imperialism in the front ranks of the fighting masses with the exposure of national-re formmism, facilitated the growth of sectarian moods and tendencies, which even today are for from being overcome.[৫] ইঙ্গিত ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

১৯৩৫ সালের মে মাসের গোড়ার দিকেই কমিণ্টার্ণ'-এর তরফ থেকে Piatnitzsky ভারতের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে ভারতের কমিউনিস্টদের উপদেশ দেন যে, তাঁরা যেন কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কংগ্রেসকেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রধান মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেন এবং তাঁদের গোপন কমিউনিস্ট কাজকর্মের প্রকাশ্য আবরণ (cover) হিসাবে কংগ্রেস কমিটি-গুলিকে ব্যবহার করেন।[৬]

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস—১৯৩৫

১৯৩৫ সালের ২৫ জুলাই থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম ও শেষ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল মস্কোতে। এই সপ্তম কংগ্রেসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জর্জি ডিমিট্রভ তাঁর

সুবিখ্যাত "United Front" ("যুক্তফ্রন্ট") তত্ত্ব পেশ করলেন। ১৯৩৫ সালের ২ আগস্ট তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ডিমিট্রভ খুব পরিষ্কারভাবে বললেন—"In India the Communists must support entend and participate in all anti-imperialist mass activities, not excluding those which are under national-reformist leadership. While maintaining their political and organisational independence, they must carry on active work inside the organisations which take part in the Indian National Congress, facilitating the process of crystallization of a national revolutionary wing among them, for the purpose of further developing the national liberation movement of the Indian peoples against Brltish imperialism."[৭] অনেক আলাপ-আলোচনার পর সপ্তম কংগ্রেস ডিমিট্রভের "United Front" ("যুক্তফ্রন্ট") তত্ত্ব গ্রহণ করল। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে কমিণ্টার্ণের সুস্পষ্ট নির্দেশ গেল—ফ্যাসিবাদ-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ব্যাপক "যুক্তফ্রন্ট" গঠন কর।

১৯৩৫ সালের—"যুক্তফ্রন্ট"-এর লাইন গ্রহণ—কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত

১৯৩৫ সালের শেষদিকে ভারতের কমিউনিস্টদের হাতে এসে পৌঁছল Imprecor-এ প্রকাশিত "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্ব। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন Acting General Secretary সোমনাথ লাহিড়ীর ডাকে কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী মিটিং গোপনে অনুষ্ঠিত হয় নাগপুরে। বহু তর্ক-বিতর্কের ও সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর কেন্দ্রীয় কমিটি "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্ব অনুযায়ী কংগ্রেসে প্রবেশ করে এবং কংগ্রেসকেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের মূল ও প্রকাশ্য মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে কাজ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। বাংলাদেশের কমিউনিস্টরাও এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। সোমনাথ লাহিড়ী, রণেন সেন প্রমুখ বাংলার কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসে যোগ দেন এবং কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন।[৮] সূচনা হয় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের—"যুক্তফ্রন্ট" যুগের।

দত্ত-ব্রাডলি থিসিস—১৯৩৬

১৯৩৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি Imprecor-এ প্রকাশিত হল গ্রেট ব্রিটেনের

কমিউনিস্ট পার্টির (সি. পি. জি. বি.) দুই নেতৃস্থানীয় সদস্য রজনী পাম দত্ত ও বেন ব্রাডলির লেখা 'The Anti-Imperialist People's Front'—নামক প্রবন্ধ, যা সাধারণভাবে 'Dutt-Bradley Thesis' ('দত্ত-ব্রাডলি থিসিস') নামে সুপরিচিত।[৯] সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত ডিমিট্রভের "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্বের ভিত্তিতে কিভাবে ভারতে কমিউনিস্টরা এই "United National Front" গড়ে তুলবেন, সেই আলোচনাই ছিল 'দত্ত-ব্রাডলি থিসিস'-এর বিষয়বস্তু। 'থিসিস'-এ বলা হল ভারতের কমিউনিস্টদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ভিত্তিতে কংগ্রেসের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা, যুব সংগঠন প্রভৃতি সমস্ত গণসংগঠনের ঐক্যভিত্তিক ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ—বিরোধী "যুক্ত ফ্রন্ট" গড়ে তোলা।[১০] 'থিসিস্'-এ আরও বলা হল কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী, ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, কমিউনিস্ট এবং বামপন্থী কংগ্রেসী সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে এক ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম গড়ে তোলা। বলা হল কংগ্রেসের সংবিধান, নীতি, সংগঠন ও নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য এই সম্মিলিত শক্তিগুলির প্রচেষ্টা চালানো উচিত। আরও বলা হল বর্তমান কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত র‍্যাডিক্যাল শক্তিগুলির সম্মিলিত প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি (সি. এস. পি.) এই ব্যাপারে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।[১১] কংগ্রেসের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে 'দত্ত—ব্রাডলি থিসিস'-এ বলা হয়—"The National Congress can play a great part and a foremost part in the work of realising the Anti-Imperialist People's Front. It is elven possible that the National Congress, by the further transformation of its organisation and programme, may become the form of realisation of the Anti-Imperialist People's Front, for it is the reality that matters not the name."[১২]

'দত্ত ব্রাডলি থিসিস'-এ নির্দেশিত "যুক্তফ্রন্ট" সম্পর্কে Overstreet and Windmiller এর মন্তব্যের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে—"This meant an alliance (that is, a united front from above) with the Congress Socialist Party, and penetration) that, is, a united front from below) of the Indian National Congress as a whole."[১৩]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই পর্যায়ের কাজকর্মের রূপরেখা নির্ধারণ

করে দিল 'দত্ত—ব্রাডলি থিসিস'। কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমশ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে আরম্ভ করল; কমিউনিস্টদের সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী মানসিকতার বিরূপতাও ক্রমশ কাটতে আরম্ভ করল। ফলস্বরূপ কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিস্তার ঘটতে থাকল। কিন্তু একই সঙ্গে কংগ্রেস সম্পর্কে অহেতুক মোহের এবং কমিউনিস্ট পার্টির পরবর্তীকালের বিভিন্ন সময়ে "দক্ষিণপন্থী" বিচ্যুতির মূলও সম্ভবত নিহিত ছিল এই 'দত্ত—ব্রাডলি থিসিসেই।' এই পর্যায়ের কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মে এর প্রতিফলনও পড়তে দেখা যায়।

"যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশে কমিউনিস্টদের কাজকর্ম

"যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্ব ও 'দত্ত-ব্রাডলি থিসিস' অনুযায়ী বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে ও কংগ্রেসে যোগ দেন এবং অনেক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের মধ্যপদে ও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির উচ্চ পদেও আসীন হন। সি পি আই ও সি এস পি মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, বেশ কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতা সি এস পি-র সদস্য হবেন এবং দায়িত্বশীল পদ গ্রহণ করবেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের কয়েকজন প্রভাবশালী কমিউনিস্ট নেতা সি এস পি-তে যোগ দেন এবং ১৯৩৭ সালে শিবনাথ ব্যানার্জি, গুণদা মজুমদার প্রমুখ সোস্যালিস্টদের সঙ্গে দুই কমিউনিস্ট নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও নৃপেন চক্রবর্তী সি এস পি-র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন।[১৩] ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হরিপুরা কংগ্রেসে বঙ্কিম মুখার্জী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, মুজফ্ফর আহ্মদ, সোমনাথ লাহিড়ী, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (এ আই সি সি) সদস্য নির্বাচিত হন।[১৫] কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্কিম মুখার্জী ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির (বি পি সি সি) সহ-সভাপতি এবং পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ও কমল সরকার ছিলেন সহ-সম্পাদক।[১৬] তাঁরা ছাড়াও বি পি সি সি-র কার্যনির্বাহক কমিটিতে, বি পি সি সি-তে এবং বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিতেও অন্যান্য কমিউনিস্টরা স্থান পেয়েছিলেন।

"যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্ব ও 'দত্ত-ব্রাডলি থিসিস' অনুসারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিট-ব্যুরোর পক্ষ থেকে ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে 'For the National United Front' নামে এক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[১৭] এই প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় ঐক্যের

উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বামপন্থী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মূলত জোর দেন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর। সি পি আই-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক নেতৃত্ব সাধারণভাবে এই লাইন অনুসরণ করে চললেও ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনের সময় বামপন্থী ঐক্যের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক নেতৃত্বের মতপার্থক্য দেখা যায়। প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

জাতীয় বিপ্লবীদের, বিভিন্ন বামপন্থী দলের ও লেবার পার্টির সদস্যদের সি পি আই-তে যোগদান

কমিউনিস্ট মতাদর্শ-গ্রহণকারী জাতীয় বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ ১৯৩৫ সালের ২৬ এপ্রিল আন্দামানের সেলুলার জেলে গোপনে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন কমিটি গঠন করেন। পয়লা মে সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।[১৮] মোটামুটি একই সময়ে বিভিন্ন জেলে ও বন্দীশিবিরেও অনুরূপ কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গঠিত হয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী ছাড়া পেলেও প্রধানত ১৯৩৭ সাল থেকেই সাজাপ্রাপ্ত ও বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি শুরু হয়। বন্দীমুক্তি চলে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। মুক্তিপ্রাপ্ত জাতীয় বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যেই বিভিন্ন জেলার পার্টি বিস্তৃত হয় এবং অবিভক্ত বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত জেলায় পূর্ণাঙ্গ পার্টি কমিটি অথবা নিদেনপক্ষে পার্টি সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। সদ্যগঠিত এই কমিটি-গুলির অধিকাংশেরই দায়িত্বে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানকারী এই জাতীয় বিপ্লবীরা।[১৯]

ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনারী পার্টি, যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘ, সাম্যরাজ পার্টি প্রভৃতি বামপন্থীদলের অস্তিত্ব এই পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এই দলগুলির অধিকাংশ সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ঘটান।

এই পর্যায়ের একটি বড় ঘটনা বেঙ্গল লেবার পার্টির কমিউনিস্ট সদস্যদের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। ১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকে বেঙ্গল লেবার পার্টির সমস্ত কমিউনিস্ট সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। লেবার পার্টিকে অবশ্য তুলে দেওয়া হয় নি। স্থির হয়, বে-আইনী

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা লেবার পার্টিকেই প্রকাশ্য platform বা bed cover হিসাবে ব্যবহার করবেন। এই মিলনের ফলে লেবার পার্টির নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন. প্রমোদ সেন ও কমল সরকার হন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্য এবং নন্দলাল বসু হন কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য। কিন্তু এই মিলন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মূল রাজনৈতিক মতাদর্শগত ও বিশ্লেষণগত মতপার্থক্য এবং তার সঙ্গে খুঁটিনাটি সাংগঠনিক বিরোধ ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকায় নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন সমগ্র লেবার পার্টি গ্রুপটিই ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে এসে বলশেভিক পার্টি অফ ইণ্ডিয়া নামে একটি নতুন পার্টি গঠন করেন। ১৯৪৪ সালের ২৪ মে আবার বলশেভিক পার্টির অধিকাংশ সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।[২০]

কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলন

১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির প্রথম সম্মেলন গোপনে অনুষ্ঠিত হয় বেহালার বুড়ো শিবতলায়। গোপনে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার স্বাভাবিক কারণ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি তখন বে-আইনী। এই সম্মেলনে শ্রমিক কমিউনিস্ট মন্মথ (মণি) চ্যাটার্জীর জায়গায় গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলন চন্দননগরে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধিরা যোগ দেন। তখন বাংলায় ২৫০ জন পার্টিসভ্য ছিলেন। এই সম্মেলনে নৃপেন চক্রবর্তী প্রাদেশিক পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৯৩৯ সালেরই শেষভাগে গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত তিনিই ছিলেন প্রাদেশিক সম্পাদক। ১৯৩৫ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তত্ত্বাবধানে গঠিত কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক হন কালী মুখার্জী। ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনের আগেই কলকাতা জেলা কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হয়। কালী মুখার্জীর জায়গায় সরোজ মুখোপাধ্যায় এই কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।[২১]

কমিউনিস্ট শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৩৫ সাল থেকে বলা যেতে পারে বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি ও

আন্দোলন তার শৈশবাবস্থা কাটিয়ে উঠে সবে শক্তিসঞ্চয় করছে, কিন্তু তা তখনও এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে নি যা একক ক্ষমতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারে। কিন্তু তার শত্রুকে চিনে নিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কোনও ভুল হয় নি। ১৯২৯ সালের "মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা"-সূত্রে কমিউনিস্টদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৩৫ সালে বাংলা সরকার কমিউনিস্ট পার্টির "কলকাতা কমিটি", তার নিয়ন্ত্রণাধীন কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন ও সমস্ত কমিউনিস্ট-মতাবলম্বী সহযোগী সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৯৩৬ সালের ২৪ নভেম্বর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৩৬ জন কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের বিরুদ্ধে "কলকাতা কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা" শুরু করে। একই সময়ে আরও ১৪ জন কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের বিরুদ্ধে "চেতলা (কলকাতা) রেড গার্ড কেস" শুরু করা হয়। এই দুই মামলায় মোট ৩২ জন কমিউনিস্টের সাজা হয়। ১৯৩৮ সালের প্রথম দিকে তাঁরা সকলেই জেল থেকে ছাড়া পান।[২২]

জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত এই সময়ের ব্রিটিশ সরকারের গোপন দলিলে দেখা যায় যে, সরকার যাঁরা বিদেশী শাসন এই কারণে ব্রিটিশ সরকারের উৎখাত চান (অর্থাৎ জাতীয় বিপ্লবীদের), তাঁদের থেকেও যাঁরা ধনতান্ত্রিক শাসন এই কারণে সরকারের উৎখাত চান (অর্থাৎ কমিউনিস্টদের) বড় বিপদ বলে মনে করছে শেষোক্তদের (কমিউনিস্টদের) বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করছে।[২৩]

কমিউনিস্ট-আতঙ্ক প্রচারের কাজটি সুচারুরূপে করা হত কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী "The Statesman" ও অন্যান্য সংবাদপত্রের তরফ হতে। বর্তমান নিবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আমি ১৯৩৬ সালের ১২ জুন "The Statesman" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখানো রিপোর্টের উল্লেখ করছি। রিপোর্টটির শিরোনামটিই ছিল আতঙ্ক-উদ্রেককারী—"Red" Agents in Indian Villages : Recruits From Terrorists : Grave Situation : Armed Uprising Aimed.[২৪] এই সম্পর্কে অধিকতর মন্তব্য সম্ভবত নিষ্প্রয়োজন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কোনও আশু পরিকল্পনা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, কমিউনিস্টরা এই পর্যায়ে এই ধরনের কোনও প্রচারের কাজেও লিপ্ত ছিলেন না।

বাংলাদেশে কমিউনিস্টদের কার্যকাল—১৯৩৫-১৯৩৯

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে কমিউনিস্টদের কাজকর্মের কোনও বিস্তারিত বিবরণে যাচ্ছি না, কারণ সেটি একটি পৃথক নিবন্ধের বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এই নিবন্ধের পরিসরে আমি কেবলমাত্র এই পর্যায়ে (১৯৩৫-১৯৩৯) বাংলায় কমিউনিস্টদের কাজকর্মের একটি রূপরেখা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। (১) ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করা এবং এই দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ছিল কমিউনিস্ট কর্মসূচীর অন্তর্গত। (২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের (Federation) বিরোধিতা এবং ১৯৩৫ সালের "দাস সংবিধান" ("Slave Constitution") বাতিল করার এবং সংবিধান পরিষদ (Constituent Assembly) গঠন করার দাবি জানানো ছিল কমিউনিস্টদের এই পর্যায়ের অন্যতম প্রধান কাজ।[২৫] (৩) গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার এবং সমস্ত রকমের "কালা কানুন" বাতিল করার দাবিতে লড়াইয়ের সামনের সারিতে ছিলেন কমিউনিস্টরা। (৪) বিনাবিচারে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের এবং অন্তরীণাবদ্ধ সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে ব্যাপক গণ-আন্দোলনেও কমিউনিস্টদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। (৫) ফ্যাসিবাদের ও যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা এবং তীব্র ফ্যাসিবিরোধিতা ও যুদ্ধবিরোধিতা ছিল কমিউনিস্টদের এই যুগের কাজকর্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গ।[২৬]

(৬) ভারতের অন্যান্য স্থানের মত বাংলাদেশেও এই যুগে শ্রমিক আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন এই পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের ও ধর্মঘটের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল ১৯৩৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী থেকে ১০ মে অবধি ৭৪ দিনব্যাপী দ্বিতীয় সারা বাংলা চটকল শ্রমিক ধর্মঘট। এই যুগের সমস্ত শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটেই কমিউনিস্টদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।[২৭] (৭) ১৯৩৬ সালের ১৬-১৭ আগস্ট তারিখে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সংগঠনী কমিটি ১৯৩৭ সালের ২৭-২৮ মার্চ বাঁকুড়া জেলার পাত্রশায়েরে প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার রূপ নেয়। কৃষক আন্দোলনে আসে এক নতুন জোয়ার। এখানেও কমিউনিস্টদের দেখা যায় অগ্রণী ভূমিকায়।[২৮] (৮) ১৯৩৬ সালের ১২ অক্টোবর বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা ছাত্র আন্দোলনেও নতুন করে প্রাণসঞ্চার করে। ছাত্র ধর্মঘট হয়ে ওঠে ছাত্র আন্দোলনের প্রধানতম অস্ত্র। এখানেও প্রথম সারিতে দেখি কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মীদের।[২৯]

জাতীয় ঐক্য, না বামপন্থী ঐক্য—১৯৩৯

১৯৩৯ সালের কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনের জন্য সুভাষচন্দ্র বসুকে সভাপতি (তখন বলা হত রাষ্ট্রপতি) পদে পুনর্নির্বাচিত করার জন্য কমিউনিস্টরাই প্রথম দাবি জানান "National Front" পত্রিকার মাধ্যমে।[৩০] ১৯৩৯ সালের ২৯ জানুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টি সহ সমস্ত বামপন্থীদের সম্মিলিত প্রার্থী সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি (রাষ্ট্রপতি) হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হন।[৩১] ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষ বসুর বিরুদ্ধে আনীত পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতায় কমিউনিস্টরা সামিল হন।[৩২] কিন্তু পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হবে, না কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের মত নিরপেক্ষ থাকা হবে, সেই নিয়ে কমিউনিস্টদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। সি. পি. আই পলিট ব্যুরো প্রথমে সি. এস. পি'র মত নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু অজয় ঘোষ, সোলি বাটলিওয়ালা এবং সোমনাথ লাহিড়ী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রমুখ বাংলার প্রতিনিধিদের চাপে কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী মিটিং ডাকা হয়। ঐ কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং-এ পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত বাতিল করে পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই ব্যাপারে সর্বাধিক আগ্রহী ছিলেন বাংলার কমিউনিস্টরা।[৩৩] এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা দরকার যে, পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ভরদ্বাজ, আশরফ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা যে বক্তৃতা দেন তার থেকে বঙ্কিম মুখার্জী ও নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের ভাষণের সুর ছিল আলাদা। ভরদ্বাজ, আশরাফ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দিলেও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর এবং কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বিশেষ বিরূপ সমালোচনা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু বঙ্কিম মুখার্জী ও নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার তাঁদের বক্তৃতায় বাম-পন্থী ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। ফলস্বরূপ কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের তরফ থেকে তাঁদের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে "বাম-সংকীর্ণতার" ও "ঐক্য-বিরোধিতার" অভিযোগ আনা হয়।[৩৪]

৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই পর্যায়ের আলোচনা এই প্রবন্ধের পরিধিভুক্ত নয়।

সূত্রনির্দেশ

১ অমিতাভ চন্দ্র, বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগ, ১৯২৮-১৯৩৫, ইতিহাস অনুসন্ধান, (চতুর্থ খণ্ড), গৌতম চট্টোপাধ্যায়, (সম্পাদিত), কে. পি. বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ ৪৬৬-৯৩

২ ভবানী সেন, রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট, ১৯৪৩ সালের ১৮-২৯ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শাখা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনে পঠিত ও সম্মেলনে গৃহীত, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের শাখা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তরফে নিরঞ্জন সেন কর্তৃক আরও কয়েকটি দলিল সহ বাংলায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৪৩, পৃ ৭-৮ (প্রথম প্রবন্ধ)। উদ্ধৃতাংশে বানান আমি মূলানুগ রেখেছি। উদ্ধৃতাংশে ব্যবহৃত শব্দের বানানের সঙ্গে এই নিবন্ধের অন্যত্র ব্যবহৃত একই শব্দের বানানের পার্থক্য আছে।

৩ তদেব, পৃ ৯

৪ Problems of the Anti-Imperialist Struggle in India, International Press Correspondence, (Inprecor), Vol. 15, No 10, 9th March, 1935, pp 289-92. Home/Poll. F. No. 7/9/1935

৫ Ibid., pp 290-91 ; Home/Poll /F. No. 7/9/1935

৬ Intelligence Branch (I. B.), Government of Bengal, File No. 929/35 (Year 1935), লেখকের সঙ্গে রণেন সেনের সাক্ষাৎকার ২৭. ১২. ১৯৮৮

৭ Georgi Dimitrov, Selected Speeches and Articles, (With an Introduction by Harry Pollitt), Lauerance & Wishart Limited, London, 1951, p 92 ; George Dimitrov, Against Fascism and War, (With a Forward by James West), International Publishers Co., New York, 1986, p 66 ; Georgi Dimitrov, United Front of the Working Class Against Fascism Report to the Seventh World Congress of the Communist Internation 1935, Culture Publishers,

Calcutta, May, 1968, (Reprint). p 66 ; Georgi Dimitrov, "Fascism and the Unity of the Working Class, (1935) in Gangadhar Adhikari (ed.), From Peace Front to People's War, Second Enlarged Edition, People's Publishing House, Bombay, June, 1944, p 68 "Inprecar", Vol. 15 No. 37, 20th August, 1935 p 971

৮ I. B., File No. 929/35, রণেন সেনের সাক্ষাৎকার, ২৭ ১২.১৯৮৮

৯ R. Palme Dutt and Ben Bradley, The Anti-Imperialist People's Front, pp 1-8 R. Palme Dutt and Ben Bradley, The Anti-Imperialist People's Front ; Inprecar Vol. 16, No. 11, 29 February, 1936, pp 297-300 ; The Communist, The Official Organ of the Communist Party of India, (Section of the Communist International), Vol I, No 7, March, 1936, Calcutta and Bombay, pp 23-30

১০ Ibid., p 4 ; Inprecor p 298 ; The Communist, p 25

১১ Ibid., p 7 ; Inprecor, p 299 ; The Communist, p 28

১২ Ibid., p 3 ; Inprecor, p 298 ; The Communist, p 25

১৩ Gene D. Overstreet and Marshall Windmiller, Communism in India, The Perennial Press, Bombay, 1960, p 161

১৪ লেখকের সঙ্গে রণেন সেনের সাক্ষাৎকার, ২. ৫. ১৯৮৬, ১৫. ১. ১৯৮৭ ; লেখকের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার— ৩. ৯. ১৯৮৬

১৫ National Front, Vol II, No 1, February 12, 1939, Bombay, p 9 ; রণেন সেন, বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-৪৮) ; বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, মে, ১৯৮৯, পৃ ১০৫ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম খণ্ড (১৯৩০-১৯৪১), গণশক্তি পত্রিকা দপ্তর, কলকাতা, মে, ১৯৮৫, পৃ ১২৪ ; লেখকের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার—৩. ৯. ১৯৮৬ তরী হতে তীর মণীষা, কলকাতা, মে, ১৯৮৬, পৃ ২৮৩, ২৯০

১৬ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৯০

১৭ T. G. Jacob and P. Bandhu, Intorduction—Communist

Party of India and India's Independence Struggle During the Second World War," in P. Bandhu and T. G. Jacob (ed.), War and National Liberation : C. P. I. Documents-1939-1945, Odyssey Press, New Delhi, October, 1988, p XVI

১৮ নলিনী দাস, স্বাধীনতা-সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী, মনীষা, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৭৪, পৃ ১৪৭

১৯ সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৩৮-৪৯, ১৭৮-৮৩, ২১০, ২৩১ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১০০-০১ ; লেখকের সঙ্গে রণেন সেনের সাক্ষাৎকার, ২৮. ৪. ১৯৮৬, ২. ৫. ১৯৮৬, ৬. ৫. ১৯৮৬, ৮. ৫. ১৯৮৬

২০ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, অমিতাভ চন্দ্র, বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি, সংগঠন ও রাজনীতি (১৯৩২-১৯৪৪)', ইতিহাস অনুসন্ধান (তৃতীয় খণ্ড), গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কে. পি. বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ ৪৫৯ ৬৬

২১ সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮৯, ৯৬, ১৩০ ৩১, ১৭৯, ২১৩, ২৩১, রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১২৯-৩০ ; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার, ২৮. ৪. ১৯৮৬, ১৫. ১. ১৯৮৭ ; লেখকের সঙ্গে সুধাংশু দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার, ১০. ১. ১৯৮৭

২২ সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, প ৯৬-৯৭ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১০৫

২৩ Home / Poll / F. No. 22 / 100 / 1935

২৪ The Statesman, Calcutta, Friday, June 12, 1936, p 2 ; Home / Poll / F. No. 7 / 11 / 1936

২৫ National Front, Special A. I. C. C. Number, Vol I, No. 31, September 18, 1938, Bombay, pp 1, 4 ; National Front, Vol. I, No. 49, January 22, 1939, p 1 ; Bandhu and Jacob (ed.), op. cit., p xvi

২৬ To All Anti-Imperialist Fighters : Gathering Storm, Published by the Central Committee, Communist Party of India, (Section of Comintern), December, 1936, pp 1-16

২৭ Sukomal Sen, Working class of India : History of Emer-

gence and Movement (1830—1970)", K. P. Bagchi and Company, Calcutta, 1979, pp 348-71 ; Panchanan Saha, History of the Working-class Movement in Bengal, People's Publishing House, New Delhi, August, 1978, pp 142-77

২৮ মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৮২, পৃ ৬৭-১০২

২৯ গৌতম চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতা, সংগ্রামে বাংলাব ছাত্রসমাজ, চারু-প্রকাশ, কলকাতা, মার্চ, ১৯৮০, পৃ ৩৬-৫০ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১০৪

৩০ "National Front'', Vol. I, No. 35, Octorber 16, 1938, p 4

৩১ National Front, Vol. I, No. 51, February 5, 1939, p 1

৩২ Joiprakash Narayan and P. C. Joshi, 'On Tripuri', National Front, Vol. II, No. 6, March 19, 1939, p 89

৩৩ রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১১৩-১৪ ; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার ২৮. ৪. ১৯৮৬ ; লেখকের সঙ্গে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার ১২. ৬. ১৯৮৬

৩৪ P. C. Joshi, 'Tripuri', and Ajoy Kumar Ghosh, 'Communists At Tripuri' ; National Front Vol. II, No. 6, March 19, 1939, pp 96-97, 100 (Joshi) and p-101 (A. K. Ghosh, ; Special Branch (S. B.), Government of Bengal, File No. S. R. 506/1939 (Part I)

আডোয়ার যুদ্ধ

অনিমেষ চক্রবর্তী

আডোয়া উত্তর ইথিওপীয়ার টিগ্রে প্রদেশের একটি ছোট শহর। একদা শহরটি ছিল টিগ্রে প্রদেশের রাজধানী। ১৮৯৬ সালের ১ মার্চ এই শহরে ফ্রান্সেসকো ক্রিসপীর সাম্রাজ্যবাদী ইতালীর সঙ্গে ইথিওপীয়ার যুদ্ধে আগ্রাসী ইতালী পরাজিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে সেই যুদ্ধের পটভূমিকা ও তাৎপর্য আলোচিত হবে।

১৯৩৫ সালে ফ্যাসিস্ট ইতালী ইথিওপীয়া অধিকার করে। তখন বিতাড়িত সম্রাট হাইলে সেলাসী লীগ অফ নেশানসে আবেদন করেন। বিশ্বে তখনই আবিসিনিয়া বা ইথিওপীয়া সম্বন্ধে কৌতূহল-বৃদ্ধি পায়। ইথিওপীয়া পরিচিত হয় Ethiopia of Haile Sellasie রূপে। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ দশকে এবং এ শতাব্দীর প্রথম দু' দশক ইথিওপীয়া বলতে লোকে বুঝত, মেনেলিকের দেশ বলে। আবার মেনেলিকের পরিচয় ছিল, Menelik of Adowa রূপে। ফ্যাসিস্ট ইতালীর ১৯৩৫ সালে ইথিওপীয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যের পিছনে রয়েছে আডোয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ। আডোয়া যুদ্ধের গুরুত্ব এখানেই।

ইথিও-সম্রাট দ্বিতীয় মেনেলিকের জন্ম ১৮৪৪ সালে সম্ভ্রান্ত সামন্ত বংশেই। ১৮৮৯ সালে ইথিওপীয়ার নেগুসে নেগুস্ত (আক্ষরিক অনুবাদ, রাজার রাজা) বা সম্রাট হবার পূর্বে তিনি ছিলেন দেশের মধ্যভাগের মালভূমি সোয়া প্রদেশের শাসনকর্তা। জীবনে তিনি অগণিত যুদ্ধ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন একমাত্র আফ্রিকান শাসক যিনি ইউরোপীয় জাতিগুলোর সঙ্গে সমান তালে তাঁর রাজ্যের পূর্বে, দক্ষিণে এবং পশ্চিমে, তিনদিকে ঐতিহ্য অনুসারে অ-ইথিওপীয় বা মূল ইথিওপীয়ার বাইরের বহু অঞ্চল জয় করে বর্তমানে ইথিওপীয়ার যে রাজনৈতিক মানচিত্র দেখা যায় তা সৃষ্টি করেছিলেন। Penguin African Library-র A short History of Africa-র লেখকদ্বয়,

---

ইতিহাস বিভাগ ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজ রাণীগঞ্জ

Roland Oliver এবং J. D. Fage মেনেলিক সম্বন্ধে যে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তা থেকেই আফ্রিকার একটি দেশের শাসক হিসেবে মেনেলিকের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। 'Menelik of Ethiopia is commonly regarded by European historians as an exceptional' case, as a scrambler for Africa who happened to be an African ruler'. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে যখন ইউরোপীয় জাতিগুলি আফ্রিকা মহাদেশকে অনাথের সম্পত্তি মনে করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করছিল, তখন আফ্রিকান শাসক হয়ে ঐ জাতিগুলির সমপর্যায়ে নিজের রাজ্যের তিনদিকে নতুন নতুন অঞ্চল অধিকার করে সাম্রাজ্য বিস্তার করা সে-যুগে কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। Wax and Gold-এর লেখক Donald Levine যথার্থই বলেছেন, যদি মেনেলিক মধ্য আফ্রিকা, অর্থাৎ বর্তমান ইথিওপীয়ার দক্ষিণও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ইথিওপীয়ার অন্তর্ভুক্ত না করতেন তবে ইউরোপীয় জাতিগুলো ঐ অঞ্চলে সাম্রাজ্যবিস্তার করতই। কিন্তু মেনেলিক ঐ অঞ্চলগুলি জয় করেছিলেন বলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা অন্ততপক্ষে একজন আফ্রিকান শাসকের অধীনে থাকার সুযোগ পেয়েছিল।

যাহোক, দ্বিতীয় মেনেলিকের জীবনের অসংখ্য যুদ্ধের মধ্যে দুটির গুরুত্ব অপরিসীম। একটি মুসলমান হারারের বিরুদ্ধে, অপরটি ইতালীর বিরুদ্ধে আডোয়ার প্রান্তরে। আডোয়া যুদ্ধের পটভূমি বর্ণনের জন্য প্রয়োজন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইউরোপীয় জাতিগুলির সাম্রাজ্যবাদী বা ঔপনিবেশিক নীতির দিগ্‌পরিবর্তন, নব্য জাতিরূপে আত্মপ্রকাশের পর ইতালীর শিশুসুলভ তড়পানি, নেপীয়ারের নেতৃত্বে ইঙ্গো-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ইথিওপীয়া অভিযানে সহজ সাফল্যের ফলে ইউরোপে ইথিওপীয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, ব্রিটিশ সরকারের প্রবঞ্চনা ইত্যাদি বহু বিষয়েরই কিছু ধারণা। কিন্তু স্বল্পপরিসর এ প্রবন্ধে বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই বলেই শুধুমাত্র অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলির আভাস দেব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অন্তত ষাটের দশক পর্যন্ত ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের ক্ষেত্রে একটু অবসন্নতা এসেছিল। এমনকি ১৮৫২ সালে ডিসরেলীর মত গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদীও নাকি বলেছিলেন, 'These wretched colonies will all be independent in a few years and are millstones around our necks'. ষাটের দশক পর্যন্ত বিসমার্কেরও বিশ্বাস ছিল, 'England is abandoning her colonial policy : she finds it too costly'. কিন্তু সত্তরের দশক

থেকেই শুরু হয় scramble for colonies। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের পিছনে বহু কারণের মধ্যে অন্যতম ছিল জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির অভিপ্রায়। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর না হলে ইউরোপীয় রাজনীতিতে কল্কে পাওয়া যেত না। ফলে সুইডেন, নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি কয়েকটি দেশ ছাড়া তৎকালীন ইউরোপের প্রায় সব দেশই গত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যস্থাপনের প্রতিযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য, শিল্পবিপ্লবগত প্রয়োজন, পরিকাঠামোগত সুবিধা প্রভৃতি কারণের জন্য ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের পক্ষে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ইউরোপে এমন দেশও ছিল যার জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই পরিকাঠামোগত অপ্রস্তুতিকে অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র জাতীয় গর্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই এ রেষারেষিতে নেমে পড়েছিল। শেষোক্ত শ্রেণীর অন্যতম ছিল ইতালী।

১৮৬১ সালে তুরিনের সংসদ অধিবেশন বা দ্বিতীয় ভিক্টর এম্মানুয়েলকে ইতালীর রাজা হিসেবে ঘোষণা থেকে পরবর্তী চার দশক আভ্যন্তরীণ নানা দুর্বলতার জন্য ইতালী এমন একটা শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে নি যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সমপর্যায়ে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যস্থাপনে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু ফ্রান্সেসকো ক্রিপসীর নেতৃত্বে ইতালী সে-প্রচেষ্টা করতে গিয়েই ১৮৯৬ সালের ১ মার্চ আডোয়ার যুদ্ধে ইথিওপীয়ার কাছে পরাজিত হয়। আধুনিক যুগে একটি আফ্রিকান দেশের কাছে একটি ইউরোপীয় শক্তির পরাজয়ের এটাই ছিল প্রথম ঘটনা।

আডোয়া যুদ্ধের পটভূমিকা আলোচনার জন্য আমাদের পিছুতে হবে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। সে বছরের ১৩ এপ্রিল ইথিওপীয়ার সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোরাস ব্রিটিশ অভিযানের নেতা নেপীয়ারের কাছে পরাজিত হয়ে আত্ম-সমর্পণের পূর্বে আত্মহনন করেন। ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বন্দীদের ম্যাগডালা দুর্গের কারাগার থেকে মুক্ত করে নেপীয়ার ইথিওপীয়া ত্যাগ করেন ৬ জুন। ব্রিটিশ বাহিনীর অতিসহজে জয়লাভে ইউরোপে একটি ধারণার সৃষ্টি হয় যে ইথিওপীয়া একটি অতি দুর্বল দেশ এবং তদুপরি সামন্তপ্রভুদের পারস্পরিক সংঘর্ষে জর্জরিত; সুতরাং অতিসহজেই সেদেশে সাম্রাজ্যবিস্তার সম্ভব। ১৮৬৮-৭০ সালে এ রকম ধারণার পশ্চাতে বাস্তবতা ছিল। কিন্তু পরবর্তী পঁচিশ বছরে যে অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে সেটা অনেক ইউরোপীয় শক্তি, বিশেষত ইতালী অনুধাবন করতে পারে নি।

যাহোক, পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে নেপীয়ার ম্যাগডালা দুর্গ অভিযানে

সাহায্যদানের বিনিময়ে, ইথিওপীয়ার উত্তরাঞ্চল, টিগ্রের সামন্ত শাসনকর্তা রাস কাসাকে ব্রিটিশ অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করে যান। ব্রিটিশদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রের বলে রাস কাসা হয়ে যান থিওডোরামের পরবর্তী ইথিওপীয়ার সিংহাসনের দাবীদারদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। স্বভাবতই অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে রাস কাসা ১৮৭২ সালে চতুর্থ ইহনোস বা জন নাম নিয়ে নেগুসে নেগুস্ত বা সম্রাট হন।

১৮৭২ থেকে ১৮৮৯ পর্যন্ত সতের বছর ইহনোস ছিলেন সম্রাট। সর্বদাই তাঁকে এক হয় বিদেশী আক্রমণকারী অথবা আভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্ত শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ইতালীর সঙ্গে বিরোধের বীজ তাঁর রাজত্বেই বোনা হয়েছিল।

মূল ইথিওপীয়ার মালভূমির পূর্বদিকে লোহিতসাগরের পশ্চিম উপকূল বরাবর সমভূমি খ্রীস্টিয় ষোড়শ শতাব্দী থেকেই মুসলমান অটোম্যান তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই উপকূল ভাগ আইনত অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে হলেও কার্যত ছিল কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত। প্রত্যেকটিরই শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান। লোহিতসাগরের তীরে এই উপকূলেই ছিল মাসওয়া এবং আসাব নামে দুটি বন্দর। নেপীয়ার যখন ম্যাগডালা দুর্গ অভিযানের পর প্রত্যাবর্তনের পথে তখনই ১৮৬৮ সালের ২০ মে মাসওয়ার স্থানীয় সুলতান বন্দরটি মিশরের নতুন শাসক ইস্মাইল পাশার হাতে অর্পণ করেন। মাসওয়া লাভ করার পর ইস্মাইল সামান্য পশ্চিমে আইলেৎ নামে আর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য দখল করে মাসওয়ার সঙ্গে যুক্ত করেন। এভাবেই কয়েক বছরের মধ্যেই দক্ষিণে হারারসহ লোহিতসাগর ও এডেন উপসাগরের পশ্চিমের সমগ্র উপকূল ভাগের সমভূমি অঞ্চল মিশরীয়দের অধিকারে চলে যায়। অন্যদিকে সুদান সীমান্তে ইথিওপীয়ার আরো কয়েকটি স্থান অধিকার করে ইস্মাইল পাশা মূল ইথিওপীয়া অধিকারে অগ্রসর হলে চতুর্থ ইহনোসের হাতে পরপর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হন। এ সময় ইহনোস ব্রিটিশদের সাহায্য প্রার্থনা করে নিরাশ হন।

এরপরেই ইস্মাইলের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। সুয়েজখাল খননের পরে ব্রিটিশ ও ফরাসী চক্রান্তে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হল তোয়োফিক। কিন্তু ক্রমাগত ব্রিটিশ ও ফরাসী খবরদারীতে অসন্তুষ্ট হয়ে কিছু মিশরীয় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ও সৈন্যবাহিনী আরবী পাশার নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ দমন করেছিল সেই বিদ্রোহ দমন করে ব্রিটিশরা এককথায় মিশরকে একটি আশ্রিত রাজ্য বা প্রটেক্টরেটে পরিণত করে। আরবী পাশার এই ব্যর্থ বিদ্রোহের পর ইহনোস ব্রিটিশদের

কাছে মাসওয়ার উপর ইথিওপীয়ার কর্তৃত্ব প্রার্থনা করেছিলেন। উপকূলভাগ বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণে থাকার জন্য ইথিওপীয়া হয়ে পড়েছিল একটি স্থলবেষ্টিত দেশ, সুতরাং সামুদ্রিক আমদানী রপ্তানী ছিল খুবই অসুবিধাজনক। এ অসুবিধা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল সমগ্র উপকূলভাগ শত্রুভাবাপন্ন মুসলমানদের অধীনে থাকার জন্য। অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ইথিওপীয়া ছিল পরনির্ভর। উপকূলভাগ শত্রু অধিকৃত থাকার জন্য অস্ত্র আমদানী ছিল অসম্ভব। মাসওয়া বন্দরের উপর কর্তৃত্ব প্রার্থনার পশ্চাতে ছিল এটাই প্রধান কারণ। কিন্তু ব্রিটিশরা সাংবিধানিক অজুহাত (মাসওয়া সাংবিধানিকভাবে মিশরীয় সাম্রাজ্যের অধীন, সুতরাং ব্রিটিশরা অসহায়) দেখিয়ে ইহনোসের প্রার্থনাপূরণে অপারগতা জানায়। অথচ সুদানে মহম্মদ আহ্‌মদ বা মাহদীর বিদ্রোহের সময়ে ইঙ্গ-মিশরায় সৈন্যবাহিনী অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে ব্রিটিশদের প্রাক্তন মিত্র ইহনোসের শরণাপন্ন না হয়ে কোন উপায় ছিল না। ব্রিটিশদের সাহায্যদানের বিনিময়ে এবারেও ইহনোস মাসওয়ার উপরে ইথিওপীয়ার কর্তৃত্ব প্রার্থনা করলে প্রথমে ব্রিটিশরা পুরোনো অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। তবে পরে অবস্থার বিপাকে পড়ে মাসওয়ার উপর ইথিওপীয়ার পূর্ণ কর্তৃত্বের পরিবর্তে মাসওয়া দিয়ে ব্রিটিশ প্রহরাধীনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী ও অন্যান্য পণ্যের আমদানী রপ্তানীর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্রিটিশরা ইথিওপীয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি করে। এখানে উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক নয় যে এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ইহনোস যে সাহায্য ব্রিটিশদের দিয়েছিলেন তার দ্বারাই ছ'টি ব্রিটিশ গ্যারিসন সুদানে মাহ্‌দীর বিদ্রোহীর হাত থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। কিন্তু স্বভাবসুলভভাবেই ব্রিটিশরা তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করে নি।

মাসওয়া থেকে সাড়ে চারশ' মাইল দক্ষিণে লোহিতসাগরের তীরেই আসাব আর একটি বন্দর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বন্দর হিসেবে আসাবের কোনই গুরুত্ব ছিল না। যেহেতু সমুদ্রের তীরে অবস্থিত সেহেতু নামেই বন্দর। আমদানী রপ্তানি কিছুই হত না। আসাবের তিনদিকেই ঘিরে ডানকিল মরুভূমি এবং একশ' মাইল পশ্চিমে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। যে জাহাজগুলো মাসওয়ায় দাঁড়াত না সেগুলি প্রয়োজন হলে কয়লা তোলার জন্য আসাবে ভিড়ত। এহেন একটি গুরুত্বহীন বন্দরই ১৮৬৯ সালে ইতালীর Rubittino Navigation Company ছ' হাজার ডলারের বিনিময়ে স্থানীয় সুলতানের কাছ থেকে কিনে নেয়। বাণিজ্যের প্রয়োজনে যে Rubittion Company আসাব ক্রয় করে নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৮৮৫ সালে যখন ইতালী আসাবকে উপনিবেশ হিসেবে ঘোষণা করল। ঔপনিবেশিক স্বার্থ

মীমাংসার জন্য ঐ বছরই আহুত হয়েছিল বার্লিন সম্মেলন। ঐ সম্মেলনে আসাব ইতালীয়ান উপনিবেশ হিসেবে স্বীকৃতও হয়।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিযোগিতায় ব্রিটেনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফ্রান্স, ইতালী নয়। লোহিতসাগরের দক্ষিণমুখে ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড স্থাপন করলে লোহিতসাগরের পশ্চিম তীরে পূর্ব আফ্রিকায় তারা আর যাতে অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য ব্রিটিশরা উৎসাহিত করতে আরম্ভ করে ইতালীকে। ব্রিটিশনীতি যে কতখানি দুমুখো ছিল তার প্রমাণ মাসওয়া বন্দর। ইহনোস যখন ব্রিটিশদের কাছে মাসওয়ার উপর ইথিওপীয়ার কর্তৃত্ব চেয়েছিলেন তখন ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার হিয়ুট মাসওয়ার রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা পরিবর্তনে ব্রিটিশদের নিরুপায়তার কথা জানান। অথচ ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশদের উৎসাহেই ইতালীয়ানরা মাসওয়া অধিকার করে নেয়। ব্রিটিশদের প্ররোচনার কথাও ইতালী সগর্বে ঘোষণা করতে ভুল করে নি। তবে ইহনোস যখন ব্রিটিশনীতির এ ছলনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ব্রিটিশদের পীড়াপীড়িতে স্থানীয় ইতালীয়ান গভর্ণর রিয়ার এ্যাডমিরাল কাইমী (Caime) মাসওয়া দিয়ে বিনা বাধায় ইথিওপীয়ার অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাসমূহ প্রমাণ করবে এ-প্রতিশ্রুতি ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী।

বস্তুত, লোহিত সাগরের পশ্চিম তীরে মাসওয়া ও আসাব অধিকার ছিল পূর্ব আফ্রিকায় এক বিস্তীর্ণ উপনিবেশ স্থাপন প্রচেষ্টায় ইতালীর প্রথম পদক্ষেপ। ফ্রান্সের টিউনিশিয়া অধিকারের প্রতিবাদ ছিল এই পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য ইতালী মাসওয়া অধিকারের পরেই ইথিওপীয়ার উত্তর-পূর্ব দিকে ইরিত্রিয়ার মালভূমির পাদদেশে সাহাতি ও উয়া নামে দুটি অঞ্চল অধিকার করে নেয়। এ অঞ্চলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা রাস আলুলা প্রথমে ভদ্রভাষায় প্রতিবাদ করে কোন ফল না পেয়ে ১৮৮৭ সালে অস্ত্রের দ্বারা ইতালীয়ানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে চাইলে আডোয়া যুদ্ধের পূর্বেই ডোগালীর (Dogali) যুদ্ধে ইতালীর সৈন্যবাহিনী ইথিওপীয়ায় সর্বপ্রথম পরাজয় বরণ করে। ডোগালীর পরে ইতালীয়ানরা গুডেৎ ও গূড়ারের যুদ্ধেও পরাজিত হয়। ফলে পরপর তিনটে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে উত্তর-পূর্ব দিকের আগ্রাসী নীতি ত্যাগ করে সাময়িকভাবে শুধুমাত্র আসাব ও মাসওয়া নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়। কিন্তু প্রতিশোধস্পৃহায় মাসওয়া বন্দর দিয়ে ইথিওপীয়ার বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

মাসওয়া বন্দরের গুরুত্বই হল উত্তর ইথিওপীয়ার সঙ্গে বাণিজ্য। উত্তর ইথিওপীয়ায় ইতালী উপনিবেশ স্থাপন করবে সে আশায় ১৮৮৫ সালের

পরে বহু ইতালীয়ান ব্যবসায়ী মাসওয়ায় এসেছিলেন। ডোগালী, গুডেৎ এবং গূঢ়ারের যুদ্ধে পরাজয়ের পর উত্তর ইথিওপীয়ায় উপনিবেশ স্থাপনে ব্যর্থতা ও মাসওয়া বন্দর ইথিওপীয়ার বাণিজ্যের জন্য বন্ধ করার ফলে এ ব্যবসায়ীদের আশা নির্মূল হয়। ইথিওপীয়ার সঙ্গে একটি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এঁরা ইতালীয় সরকারকে চাপ দিতে থাকে। কিন্তু শত্রুতা থেকে হঠাৎ মিত্রতার প্রস্তাব করাও অসম্মানজনক। তাই ইতালী মধ্যস্থতা করার জন্য ব্রিটিশদের শরণাপন্ন হল। ইতালীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ইহনোসের কাছে পাঠালেন স্যার জেরল্ড পোর্টার নামে এক ঝানু কূটনীতিককে। কিন্তু ইতালীর দাবী বিরাট। মাসওয়া থেকে উত্তরে সুদান সীমান্ত পর্যন্ত সাহাতী, উয়া, কেরেন প্রভৃতি অঞ্চলসহ এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। এই অঞ্চলগুলি দাবীর পশ্চাতে ইতালীর কোনই যুক্তি ছিল না। সবকটি অঞ্চলই বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই ইথিওপীয়ার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত। মিশরের ইসমাইল পাশার ভাড়াটে সেনাপতি ওয়ার্ণার মুজিঙ্গার (Werner Muzinger) মিশরের পক্ষে মাত্র ক'বছর পূর্বে বলপূর্বক কেরেন কেড়ে নেবার পরে মাহদীর নৌ-বিদ্রোহীদের হাতে অবরুদ্ধ ব্রিটিশ গ্যারিসনগুলির উদ্ধারে সাহায্যের বিনিময়ে ইহনোস ব্রিটিশদের কাছ থেকে কেরেন পুনরায় লাভ করেছিলেন। সাহাতী এবং উয়াও ইতালীয়ানরা অন্যায়ভাবে দখল করলে রাস আলুলার হাতে ডোগালী, গুডেৎ এবং গূঢ়ারের যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইথিওপীয়াকে প্রত্যার্পণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ন্যায়-অন্যায়ের কোনই গুরুত্ব ছিল না। বিশেষত, আফ্রিকা মহাদেশের ক্ষেত্রে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সব অন্যায়ই ছিল ন্যায়। পূর্বেই বলেছি, লোহিত-সাগরের পশ্চিম তীরে ইতালীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রসারে ব্রিটেনের সায় ছিল। ফলে স্যার জেরল্ড পোর্টার ইতালীর দাবী মানার জন্য ইহনোসকে চাপ দিলে গত্যন্তর না দেখে শেষপর্যন্ত ইহনোস ইতালীর দাবী মেনে নিয়ে নিজ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে এক বিরাট অঞ্চলে ইতালীর উপনিবেশ স্থাপন স্বীকার করতে বাধ্য হন।

ব্রিটিশদের কাছ থেকে এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা ব্রিটিশমিত্র ইহনোসের কাছে ছিল অচিন্তনীয়। সম্রাট চতুর্থ ইহনোসের সঙ্গে ব্রিটিশদের এ আচরণ ছিল তৎকালীন লোহিতসাগরাঞ্চলের ব্রিটিশ বাণিজ্যদূত এবং Modern Abyssinia গ্রন্থের লেখক, A B Wylde-র ভাষায় 'One of the vilest bits of treachery'। ইহনোসের পূর্বসুরী থিওডোরাসের কারাগার থেকে

ব্রিটিশ বন্দীদের মুক্ত করার সময় ইহনোস যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। মাহ্‌দীর অবরোধ থেকে ব্রিটিশবাহিনী উদ্ধার করার সময়ও তাঁরই সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল ব্রিটিশদের। অথচ নিজ দেশের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে তিনি যখন মাসওয়ার উপর কর্তৃত্ব প্রার্থনা করেছিলেন তখন ব্রিটিশরা সাংবিধানিক এক বাজে ওজর তুলে তাঁর প্রার্থনা নামঞ্জুর করে। কিন্তু ইতালীয়ানদের মাসওয়া দখলের সময় সেই ওজর হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে নিজের রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি অন্য রাষ্ট্রের অধীনে অর্পণ করার জন্য চাপ দিতে ব্রিটিশদের বিবেকে বাধে নি। ব্রিটিশরা সর্বদাই আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ইহনোসকে ব্যবহার করে কাজ ফুরোলে ছেঁড়া জুতোর মত দূরে নিক্ষেপ করেছে।

বস্তুত, ইতালীর দাবী মেনে না নিয়ে ইহনোসের উপায় ছিল না। দেশের পশ্চিম সীমান্তে সুদানের মাহ্‌দীর দরবেশরা তখন ইথিওপীয়া আক্রমণে উদ্যত। এ সঙ্গে উত্তর-পূর্বে ইতালীর সঙ্গে শত্রুতা বৃদ্ধি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর পরিকল্পনা ছিল মাহ্‌দীর আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি ইতালীয়ানদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু তার পূর্বেই মাহ্‌দীর দরবেশদের সঙ্গে যুদ্ধে ১৮৮৯ সালে যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ইথিওপীয়ার ইতিহাসে ১৮৮৯ সালটি ছিল একটি চরম ভাগ্যবিপর্যয়ের বছর। একদিকে ইহনোসের হঠাৎ মৃত্যুতে যেমন শুরু হয় চিরাচরিত উত্তরাধিকারের জন্য গৃহযুদ্ধ, অন্যদিকে তেমনি দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। এই চরম বিশৃঙ্খলার ফয়দা লুটে নেয় ইতালী। বিনাবাধায় ইতালীয়ানরা সমগ্র ইরিত্রিয়ান মালভূমি দখল করে এমনই ঘাঁটি গড়ে তোলে যে কোন ইথিওপীয়ান সম্রাটের পক্ষেই ১৯৪১ সালের পূর্বে ইরিত্রিয়া থেকে তাদের বিতাড়িত করা সম্ভব হয় নি। এমনকি ১৮৯৬ সালে আডোয়ার যুদ্ধে জয়লাভের পরেও নয়।

ইহনোসের পরে ইথিওপীয়ার সম্রাট হন দ্বিতীয় মেনেলিক। ইহনোসের সঙ্গে রক্তের কোন সম্পর্কই মেনেলিকের ছিল না। উত্তরাধিকার স্বীকৃত হয়েছিল ইহনোসের সঙ্গে মেনেলিকের সম্পাদিত এক চুক্তির দ্বারা। কী পরিস্থিতিতে এবং কোন ঘটনাপ্রবাহের ফলে মেনেলিক সিংহাসনে বসেছিলেন, তা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের শুধু এটুকু জানলেই যথেষ্ট যে উত্তরাধিকার সূত্রেই মেনেলিক ইথিও-ইতালীয়ান শত্রুতার উত্তরাধিকারী হন এবং তাঁরই সময় এ শত্রুতা চরমে ওঠে; যার পরিণতি আডোয়ার যুদ্ধ।

ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বার্থসংঘাত মীমাংসার জন্য আহুত ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বার্লিন সম্মেলনে আফ্রিকা মহাদেশে সাম্রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে একটি নীতি স্থির হয়েছিল। ঐ নীতি অনুসারে যদি কোন ইউরোপীয় শক্তি আফ্রিকা মহাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী কোন অঞ্চল অধিকার করে নেয়, তবে ঐ উপকূলের পশ্চাৎভূমির উপরেও সেই শক্তির আধিপত্য স্বীকৃত হবে। অর্থাৎ ঐ পশ্চাৎভূমিতে সেই জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যস্থাপনে অগ্রসর হবে না। তবে একথা বার্লিন চুক্তির স্বাক্ষরকারী অন্যান্য দেশগুলিকে জানাতে হবে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ইতালী ইথিওপীয়ার সমুদ্র উপকূলে আসার এবং ঐ বছর মাসওয়ার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। সুতরাং বার্লিন চুক্তি অনুসারে লোহিতসাগরের পশ্চিম উপকূলের পশ্চাৎভূমি, অর্থাৎ ইথিওপীয়ায় সাম্রাজ্যস্থাপনে ইতালীরই ছিল একমাত্র অধিকার, ইতালীয়ানরা যে শুধু ইরিত্রিয়া অধিকার করেই সন্তুষ্ট থাকবে না, সমগ্র ইথিওপীয়া আত্মসাৎ করাই যে তাদের চরম উদ্দেশ্য, একথা মেনেলিক জানতেন। আবার ইরিত্রিয়া থেকেও যে তাদের হঠানো যাবে না, সেটাও তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। অবস্থার যথার্থতা বুঝতে পেরে ইতালী যাতে ইরিত্রিয়া ছাড়া আর কোন অঞ্চল গ্রাস করার চেষ্টা না করে সেজন্য সম্রাট হবার দু' মাসের মধ্যেই ইতালীর সঙ্গে তিনি একটি 'চিরকালীন শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি' (The Treaty of Perpetual Peace and Friendship with Italy, May 2, 1889.) স্বাক্ষর করেন। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল উত্তর ইথিওপীয়ায় টিগ্রে প্রদেশের রাজধানী ম্যাকেলের কাছে উচ্চিলি নামে একটি ছোট পাহাড়ী শহরে। এজন্য সংক্ষেপে এটির নাম হয় উচ্চিলির চুক্তি। চুক্তিতে মেনেলিক ইরিত্রিয়ার উপর ইতালীর আধিপত্য স্বীকার করে নেন; বিনিময়ে ইতালীও ইরিত্রিয়া বাদে মেনেলিককে সমগ্র ইথিওপীয়ার স্বাধীন ও সার্বভৌম সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এও ঠিক হল যে ইতালী অধিকৃত বন্দরগুলির মাধ্যমে ইথিওপীয়া অস্ত্রশস্ত্র সহ বৈদেশিক পণ্য আমদানী করতে পারবে।

এর পরে উচ্চিলি চুক্তির বিভিন্ন শর্তের বিশদ আলোচনার জন্য মেনেলিক তাঁর মামাতো ভাই রাস মেকোনেনকে (শেষ সম্রাট হাইলে সেলাসীর পিতা) রোমে পাঠালেন। সেখানেও রাস মেকোনেনকে ইতালীয়ান সরকার একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিনিধির সম্মানই দিয়েছিল। মেকোনেন রোমে আলোচনা করে ঐ চুক্তির আরো কয়েকটি সর্ত যোগ করলেন। এ ছাড়াও ইথিওপীয়ার উন্নতিমূলক কাজে সাহায্যের জন্য ইতালী ইথিওপীয়াকে চল্লিশ

লক্ষ লিয়ার (Lira) ঋণ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল। কিন্তু এত গভীর বন্ধুত্ব ধোপে টিকল না। উগ্র জাতীয়তাবাদে উদ্বেলিত আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তখন ইতালীর প্রয়োজন আফ্রিকা মহাদেশে একটি বড়সর উপনিবেশ। আসাব মাসওয়া বন্দর ও ইরিত্রিয়ার রুক্ষ মালভূমি নিয়ে বেলজিয়াম, পর্তুগাল, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের আসরে ইতালীর কল্কে পাওয়া সম্ভব ছিল না। বিনাযুদ্ধে কপটতার আশ্রয়ে ইথিওপীয়ার উপরে আধিপত্য প্রদর্শন করে আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চাইল ইতালী।

উচ্চিলি চুক্তির বয়ান ছিল দুটি ভাষায়—একটি ইতালীয়ান, অপরটি ইথিওপীয়ার রাজভাষা বা জাতীয় ভাষা আমহারিকে। চুক্তির সপ্তদশ সর্ত নিয়ে মতান্তর দেখা দিল। আমহারিক ভাষায় যে বয়ানটি ছিল তাতে সপ্তদশ সর্তের অর্থ হল—যদি ইউরোপের কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে ইথিওপীয়ার কূটনৈতিক আদানপ্রদানের প্রয়োজন হয় তবে **ইচ্ছে করলে** (গুরুত্ব প্রদানের জন্য বড়হরফ বর্তমান লেখকের) ইথিওপীয়া তা ইতালীর মাধ্যমে করতে পারে। অন্যদিকে ইতালীয়ান ভাষায় ছিল—ইথিওপীয়া এ ধরনের যোগাযোগ ইতালীর মাধ্যমে করতে বাধ্য (বড়হরফ লেখকের)। সুতরাং উচ্চিলি চুক্তির ইতালীয়ান ভাষার বয়ান অনুসারে ইথিওপীয়া হয়ে পড়ে ইতালীর প্রেটেকটরেট বা আশ্রিত রাজ্য। ফলে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পাঁচ মাস পরেই ১৮৮৯ সালের ১২ অক্টোবর বার্লিন চুক্তির ধারা অনুসারে ইতালী সব ইউরোপীয় রাষ্ট্রদের জানিয়ে দেয় যে ইথিওপীয় উচ্চিলি চুক্তির দ্বারা ইতালীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়েছে। ইতালীর এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটেন ইথিওপীয়াকে ইতালীর আশ্রিত রাজ্যের স্বীকৃতি দিয়ে ইতালীর সঙ্গে ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকা (কেনিয়া/ উগাণ্ডা) ও ইথিওপীয়ার সীমানা নির্ধারণের একটি চুক্তি করে নিল।

ইতালী যে উচ্চিলি চুক্তির অপব্যাখ্যা করে সমস্ত ইউরোপে প্রচার করেছে, একথা জানতে পেরেই মেনেলিক ইতালীর রাজা প্রথম উমবারতোর কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে চুক্তির দু'টি বয়ানের অমিলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বলাবাহুল্য, ইতালীয়ান সরকার নিশ্চুপ ত রইলই, উপরন্তু গার্দাফুই উপসাগর ও লোহিতসাগরে নৌমহড়া বৃদ্ধি করে এটাই প্রমাণ করতে চাইল যে তারা যা ব্যাখ্যা প্রচার করেছে সেটাই ঠিক।

মেনেলিক খুব ভালভাবেই বুঝতে পারলেন যে এবার তাঁকে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী জালে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। ইতালী তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে বা অন্য ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করতে পারে। এ আশঙ্কায় ইতালী ইথিওপীয়াকে যে ঋণ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল তা গ্রহণ

করতে তিনি অস্বীকার করলেন। এমনকি উপহারস্বরূপ ইতালী থেকে তিনি যে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি লাভ করেছিলেন, তার আনুমানিক মূল্যও তিনি নগদ অর্থে মিটিয়ে দিলেন।

মেনেলিক জানতেন এবার ইতালীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ অনিবার্য। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য তিনি ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানীবন্দর জিবুটি দিয়ে ফ্রান্স ও রাশিয়া থেকে অস্ত্র আমদানী শুরু করলেন। ১৮৯০ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত দু' বছরে এভাবে তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার রাইফেল ও প্রায় এক হাজার ছোট-বড় কামান আমদানি করে নিজের শক্তি বাড়িয়ে নিলেন। বহির্বিশ্বে কিন্তু প্রচারিত হয়ে গেল ইথিওপীয়া ইতালীয় প্রটেকটরেট।

বেশ কিছুটা সামরিক শক্তি সঞ্চয় করে ১৮৯১ সালে তিনি আবার আর একটি চিঠি পাঠালেন ইতালীর রাজার কাছে। এ পত্রের ভাষা পূর্বেকার চেয়ে অনেক কড়া। এবার ইতালীয়ান সরকার নিশ্চুপ না থেকে ইথিওপীয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় পাঠালেন কাউন্ট এন্তোনেলী নামে এক প্রতিনিধিকে।

আদ্দিস আবাবায় মেনেলিকের রাজসভায় কাউন্ট এন্তোনেলীর সঙ্গে মেনেলিকের কথোপকথনের একটি চমকপ্রদ বর্ণনা পাওয়া যায় সে-সময়কার রাজকীয় রাজনামাকর গেবরে মেলানীর লেখায়। নানারকম যুক্তি দেখিয়ে অনেক তর্কাতর্কির পরেও যখন তিনি মেনেলিককে উচ্চিলি চুক্তির ইতালীয়ান ভাষ্য গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হন তখন নাকি তিনি অনেকটা হুমকীর সুরেই বলেন, 'জাতীয় সম্মান ক্ষুণ্ণ করে বর্তমানে ইতালীয়ান সরকারের পক্ষে বিশ্বে নতুন করে প্রচার করা সম্ভব নয় যে উচ্চিলি চুক্তির ব্যাখ্যায় ইতালীয়ান সরকার ভুল করেছিল।' এ উক্তির পর মেনেলিক, তাঁর পররাষ্ট্রীয় বিষয়ে পরামর্শদাতা, ম'শিয়ে ইল্‌গ প্রভৃতিরা যখন চিন্তা করছেন ঠিক কি প্রত্যুক্তি করা যায় তখন নাকী সাম্রাজ্ঞী তাইতু (মেনেলিকের মহিষী) হঠাৎ বলে বসেন, 'বিশ্বে ইথিওপীয়ারও সম্মান আছে। আমাদের পক্ষেও স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয় যে ইথিওপীয়া ইতালীর আশ্রিত রাজ্য। আন্তর্জাতিক সম্মানটা তোমাদের একচেটিয়া নয়।'

কাউন্ট এন্তেনেলীর দৌত্য ব্যর্থ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয় নি। উভয় পক্ষই এক বছর রইলেন চুপচাপ। মেনেলিকই প্রথম বরফ ভাঙ্গলেন। ১৮৯৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী তিনি উচ্চিলি চুক্তি বর্জনের কথা প্রচার করলেন। এ অবস্থায় সম্মান রক্ষার জন্য ইতালীর পক্ষে একমাত্র রাস্তা খোলা রইল অস্ত্রের মাধ্যমে অর্ধসভ্য, অনুন্নত আফ্রিকা মহাদেশের ইথিওপীয়া নামে একটি দেশের দর্পচূর্ণ করে ঐ দেশে সরাসরি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন

করা। ঠিক সে সময়ই যদি ইতালী তা করত তবে হয়ত জয়মাল্য তাদের গলায় পরত। কিন্তু এর পরের দু' বছর ইতালী রইল নিশ্চুপ হয়ে। ইতালীর এই নিষ্ক্রিয়তায় পূর্ণ সুযোগ নিলেন মেনেলিক। এই দু' বছর তিনি জিবুটি বন্দর দিয়ে জোরকদমে ফ্রান্স ও রাশিয়া থেকে অস্ত্র আমদানী করে নিজের শক্তি বাড়িয়ে নিলেন।

বস্তুত, ১৮৯৩ বা ১৮৯৪ সালে ইরিত্রিয়া উপনিবেশে ইতালীর সামরিক প্রস্তুতি এমন ছিল না যে মেনেলিকের মত শক্তিশালী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। স্বদেশ থেকে ইরিত্রিয়ায় তাঁরা অস্ত্র আনতে শুরু করে ১৮৯৪-এর শেষের দিকে। তবে ইতালীই প্রথম আক্রমণ করে। ১৮৯৫ সালের জানুয়ারী মাসে তারা টিগ্রের শাসনকর্তা রাস মেনগাসাকে (সম্রাট চতুর্থ ইহনোসের পুত্র) আদিগ্রাৎ, ম্যাকেলে এবং আম্বা আলাগীর যুদ্ধে পরাজিত করে সমগ্র টিগ্রে প্রদেশ দখল করে নেয়। রাস মেনগাসার পরাজয়ের পর ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসে মেনেলিক তাঁর মামাতো ভাই, হারার প্রদেশের শাসনকর্তা রাস মেকোনেনসহ উত্তরে যাত্রা করলেন।

আম্বা (আক্ষরিক অনুবাদ পাহাড়) আলাগীর যুদ্ধে ইতালীয়ান সৈন্যবাহিনী মেনেলিক ও মেকোনেনের হাতে পরাজিত হয়ে প্রথমে আশ্রয় নেয় ম্যাকেলতে, সেখানেও তারা পরাজিত হয়ে আরো উত্তরে আশ্রয় নেয় আডোয়ায়। খুব দুর্গম না হলেও সামরিক ঘাঁটি হিসাবে আডোয়া ছিল উপযুক্ত। উত্তর প্রান্তে আম্বা জাতা ও আম্বা রাইয়ো নামে দুটি পাহাড়; দক্ষিণে আম্বা আব্বাগরিমা, আম্বা এস্তা কিদানে মাহরেৎ এবং আম্বা সেলাগে নামে তিনটে পাহাড। উত্তর ও দক্ষিণের পাহাড়গুলোর নীচে মেমসা উপত্যকা। আবার উপত্যকার মধ্যেই রয়েছে একটি টেবিল ল্যাণ্ড, নাম আম্বা বেলহা। এই আম্বা বেলহার উত্তরে জাতা ও রাইয়ো পাহাডের আডালে ইতালীয়ানরা, আর দক্ষিণে তিনটি পাহাড়ের আডালে মেনেলিক। উভয়েরই প্রাথমিক লক্ষ্য মেমসা উপত্যকা অধিকার করা।

আডোয়া যুদ্ধের পর ১৮৯৭ সালে লোহিতসাগরাঞ্চলের ব্রিটিশ বাণিজ্যদূত ও Modern Abyssinia গ্রন্থের লেখক Wylde ইথিওপীয়ায় এসে সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে আডোয়া যুদ্ধের বিশদ বিবরণ তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন। এ বর্ণনা এতই জীবন্ত যে পড়ে মনেই হয় না তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে কিন্তু উপস্থিত ছিলেন না।

মেনেলিকের সৈন্যসংখ্যা প্রায় এক লাখ এবং প্রত্যেকেরই হাতে ছিল তৎকালীন আধুনিক রাইফেল। এই নিয়মিত এক লাখ সৈন্য ছাড়া অগণিত

দেশবাসী নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রধান সৈন্যবাহিনীর পিছনে দাঁড়িয়েছিল। অন্যদিকে ইতালীয়ান সেনাপতি জেনারেল বারাতিরির সৈন্যসংখ্যা মাত্র সতের হাজার। ইতালীয়ানরা ভারী কামানের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নত। তাদের ৫৬টি কামানের বিপক্ষে মেনেলিকের কামানের সংখ্যা চল্লিশ। আরো একটি জিনিসে মেনেলিক ছিলেন এগিয়ে। সেটা স্থানীয় অধিবাসীদের সহায়তা, যা বারাতিরির কাছে ছিল দুর্লভ। বরং যে সামান্য কয়েকজনের উপর তিনি নির্ভর করেছিলেন তারা তাঁকে ভুল তথ্য ও সংবাদ পরিবেশন করে বিপথে চালিত করেছিল।

জেনারেল বারাতিরি নাকী নিজের সরকারের কাছে আরো সৈন্য চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ক্রিপসীর ধমকে নিরস্ত্র হতে হয়। যাহোক, ১ মার্চ ইথিওপীয়ানদের কপটিক খ্রীষ্টধর্মের অসংখ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একটি দিন। সাধারণত উৎসবের দিনে তারা তাজ ও তালা (দু'টি স্থানীয় সুরা) সহযোগে কাঁচা গোমাংস ভোজে মত্ত থাকে। বারাতিরি ভাবলেন, ঐদিন নিশ্চয়ই মেনেলিকের সৈন্যরা অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকবে। যুদ্ধ শুরু করার ওটাই উত্তম দিন। তিনি ঠিক তাই করলেন।

১৮৯৬ সালের ১ মার্চ ভোর রাত্রে কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে তিনি মেনেলিকের সৈন্যদলকে আক্রমণ করে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে যাবার পরে দেখেন সাতদিকে সাতজন সামন্ত নৃপতিদের সৈন্যদল দ্বারা তিনি অভিমন্যুর মত সপ্তরথী বেষ্টিত হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় অধিবাসীরা যে তাঁকে কুয়াশার মধ্যে ঐ সপ্তব্যূহের মধ্যে নিয়ে আসবে তা তিনি চিন্তাই করতে পারেন নি। সুতরাং যুদ্ধকৌশলে মেনেলিক ছিলেন অনেক সুবিধাজনক অবস্থায়। বারাতিরির সতের হাজার সৈন্যের মধ্যে এগার হাজারই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হল ; মেনেলিকের সৈন্যরা তাঁর চল্লিশটা ভারী কামান দখল করে নিল। ইথিওপীয়ার পক্ষেও ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য নয়। তবে ঠিক কতসংখ্যক সৈন্য প্রাণ দিয়েছিল, তা জানা যায় নি। কারণ, পূর্বেই বলেছি, নিয়মিত এক লাখ সৈন্য ছাড়াও মেনেলিকের সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল অগণিত স্বেচ্ছাসেবক। Wylde র ভাষায়, 'I do not think there is a hamlet that has not lost one or more of its representatives'.

দু' হাজার বছর পূর্বে হ্যানিবলের হাতে রোমান সাম্রাজ্যের সৈন্যদলের পরাজয়ের পর আডোয়ায় মেনেলিকের জয়ই কোন আফ্রিকার দেশের কাছে ইউরোপীয় শক্তির প্রথম পরাজয়। আডোয়ায় জয়লাভের ফলে, বলা

বাহুল্য, মেনেলিক এবং তাঁর দেশ ইথিওপীয়ার আন্তর্জাতিক সম্মান এতই বৃদ্ধি পেল যে প্রায় সব ইউরোপীয় রাষ্ট্রই ইথিওপীয়ার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর বা কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। যে ছিল করুণার পাত্র, রাতারাতি সে শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হল।

নতুন মর্যাদায় যে দেশের সঙ্গে সর্বপ্রথম মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হল, সেটা ইতালী। ১৮৯৬ সালের অক্টোবর মাসে স্বাক্ষরিত হল ইথিও-ইতালী আদ্দিস আবাবা চুক্তি। আডোয়া যুদ্ধের ফলে মেনেলিক টিগ্রে প্রদেশ ইতালীয়ানদের কবল থেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। ইরিত্রিয়া থেকে যে তাদের হটানো যাবে না, তা তিনি জানতেন। তাই নতুন চুক্তিতে তিনি ইরিত্রিয়াকে ইতালীয়ান উপনিবেশ হিসেবে স্বীকার করে নিলেন, বিনিময়ে ইতালীও ইথিওপীয়াকে সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা দিল। এ সঙ্গে আরো প্রতিশ্রুতি দিল যে ইতালী অধিকৃত আসাব বন্দর ইথিওপীয়া বিনা বাধায় বহির্বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। শীঘ্রই গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, অটোম্যান, তুরস্ক, সুদান প্রভৃতি দেশ ইথিওপীয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে আদ্দিস আবাবায় দূতাবাস স্থাপন করে। যে ইথিওপীয়া দু' দিন আগেই ছিল একটি ইউরোপীয় জাতির ঔপনিবেশিক শিকার, আডোয়া যুদ্ধের পরে সে ইথিওপীয়াই সাম্রাজ্যবাদী পথে অগ্রসর হয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে গোপনে দক্ষিণ সুদান অঞ্চল আত্মসাৎ করতে অগ্রসর হল। তবে সে কাহিনী এখানে নয়।

আমরা সবাই জানি যে ১৯৩৫ সালে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট ইতালী কর্তৃক ইথিওপীয়া অধিকৃত হবার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে ইথিওপীয়া এবং লাইবেরিয়া ছাড়া আর কোন স্বাধীন দেশ ছিল না। লাইবেরিয়া স্থাপন করেছিল American Colonization Society মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত ক্রীত-দাসদের পুনর্বাসনের জন্য। ১৮৪৭ থেকেই সে-দেশের দায়িত্ব নিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সুতরাং সে-দেশ গ্রাস করার জন্য কোন ইউরোপীয় শক্তিরই এগুবার উপায় ছিল না। এখন প্রশ্ন ওঠা খুবই সঙ্গত, কিভাবে এবং কিসের জোরে কৃষ্ণ আফ্রিকার একমাত্র দেশ হিসেবে ইথিওপীয়া তার স্বাধীনতা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রক্ষা করতে পেরেছিল? এবং কেনইবা ১৯৩৫ সালে ফ্যাসিস্ট ইতালী ইথিওপীয়ার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল?

দুটি প্রশ্নেরই উত্তর এক। আডোয়ায় ইথিওপীয়ার জয়লাভ। ১৮৮৫ সালের বার্লিন চুক্তির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ঐ চুক্তি অনুসারে লোহিত সাগরের পশ্চিম উপকূলভাগের পশ্চাৎভূমি, অর্থাৎ ইথিওপীয়ার উপর আধিপত্য

স্থাপনের অধিকার ছিল একমাত্র ইতালীর। সে-কাজে অগ্রসর হয়েই ইতালী আডোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়। এ পরাজয়ের ফলে আগামী চল্লিশ বছর সে ইথিওপীয়ার উপরে লোলুপ দৃষ্টি রাখলেও গ্রাস করার চেষ্টা করে নি। ইতালীর নিষ্ক্রিয়তা যে শূণ্যতার সৃষ্টি করেছিল, বার্লিন চুক্তি অনুসারে তা পূর্ণ করার অধিকার অন্য কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ছিল না। আবার ঐ চুক্তি অনুসারেই এবং আডোয়ার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্যই ১৯৩৫ সালে মুসোলিনী ইথিওপীয়া আক্রমণ করে দেশটির স্বাধীনতা পাঁচ বছরের জন্য হরণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই ১৯৪১ সালে ইথিওপীয়া পুনরায় স্বাধীন হয়।

আডোয়া ইথিওপিয়ার গৌরব। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত জানি, প্রতি বছরের ১ মার্চ উৎসবের দিন হিসাবে পালিত হয়। সেদিন সরকারী ছুটির দিন। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত সব বন্ধ থাকে। সামরিক বাহিনী, পুলিস ও স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কুচকাওয়াজ করে। ইথিওপীয়ার স্বাধীনতা-সূর্য সর্বদা উদিত থাকার জন্য দেশের প্রতিটি গীর্জায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়।

সূত্রনির্দেশ

Beckington C F & Hunting G W B--Some Records in Ethiopia

Berkley G F H—The Campaign of Adowa and the Rise of Menelik

Budge E A W--A History of Ethiopia

Buxton D Travels in Ethiopia

Greenfield R—Ethiopia, A New Political History

Gleichen E--Mission to Menelia

Hobson J A—Imperialism : A Study

Jones A H M K Monroe E—A History of Ethiopia

Levine D N—Wax and Gold

Lucas C P—The Partition and Colonization of Africa

Mosley L—Haile Selassie, The Conquering Lion

Muir R—The Expansion of Europe

Oliver R & Fage J D--A Short History of Africa

Pankhurst R. K. P, (ed.)—The Ethiopian Royal Chronicles
Rey C F—Unconquered Abyssinia, As it is Today (1906)
„ —In the Country of the Blue Nile
Robinson R H—England Italy Abyssinia
Skinner R P—Abyssinia Today
Steer G—Ceasar in Abyssinia
Thompson D—Europe since Napoleon
Ullendroff E—The Ethiopians : An Introduction to Country and People
Vivian H—Abyssinia, Through the Lion-Land to the Court of the Lion of Judan
Wylde A B—Modern Abyssinia

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হিটলার থিসিস ঃ একটি সমীক্ষা

রঞ্জিত সেন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই এই যুদ্ধের কারণ খোঁজা শুরু হয়। হিটলার জোর করে এই যুদ্ধ ইউরোপের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছিলেন, অতএব এরজন্য হিটলারই দায়ী—এরকম একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে, কিছুটা সুপরিকল্পিত প্রচারের ফলে। এই ধারণা প্রায় কুড়ি বছর ঐতিহাসিকদের মনে একটা সার্বভৌম বোধ রূপে টিকেছিল। ১৯৬১ সালে এ. জে. পি. টেলর (A. J. P. Taylor) যখন তাঁর অরিজিনস অফ দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার (The Origins of the Second World War) গ্রন্থটি প্রকাশ করলেন তখন একটা ঝড় উঠল। প্রশ্ন উঠল, তবে কি হিটলারের অপরাধতত্ত্ব—হিটলার থিসিস (Hitler Thesis) শুধুই একটা ফানুস ? যুদ্ধে যারা জয়ী হয় পরিকল্পিত প্রচারে তারাই হয় সফল। অতএব চিন্তার আকাশে ফানুস ওড়ানোতে বিজয়ী মিত্রশক্তিগুলির যে একটা নিশ্চিত দায়িত্ব ছিল সে কথা এড়ানো যায় না।

যুদ্ধ হওয়ার পর থেকে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে বলা হতে লাগল যে যুদ্ধ শুরু করার নৈতিক দায়িত্ব হিটলারের। ১৯৩৯ সাল থেকে দু-এক বছরের মধ্যে জার্মানি তার প্রতিবেশী দেশগুলিকে আক্রমণ করেছিল। এর বিপরীতটি ঘটে নি। ১৯৪০ সালের ১০ মে ওলন্দাজরা জার্মানির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নি। ঘটেছিল তার উল্টোটা। অতএব যুদ্ধের নৈতিক দায়িত্ব বর্তাবে হিটলারের উপর—এটাই হিটলার থিসিসের মূলকথা। একটা জোরালো নৈতিক নিশ্চিতিকে উপজীব্য করে হিটলার থিসিস দাঁড় করানো হয়েছিল। হিটলার থিসিসের এক মস্তবড় প্রবক্তা ছিলেন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জি. পি. গুচ্ (G. P. Gooch)। ১৯৪০ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরে তিনি লিখেছিলেন যে যুদ্ধের জন্য হিটলারই দায়ী। তাঁর বক্তব্য ছিল এইরকম ঃ

"১৯১৪ সালের যুদ্ধের দায়িত্ব বিশ্লেষণ গোলযোগ থাকতে পারে কিন্তু

ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ডের উপর জার্মানির আক্রমণ দিয়ে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। বিশের দশকে মিত্রশক্তি তাদের জয়কে কিভাবে প্রয়োগ করেছিল এবং ১৯৩১ সাল থেকে অসন্তুষ্ট শক্তিগুলির প্রতি ইঙ্গ-ফরাসী নীতি কি ছিল তা নিয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু ১৯৩৯-এর মার্চে হিটলারের নেপোলিয়নীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন দাবী উত্থাপিত হওয়ার পর নতুন যুদ্ধের অপরাধ সম্পূর্ণভাবে হিটলারের কাঁধে বর্তায়।"[১]

গুচ্ যা লিখেছেন তা হল যুদ্ধের শুরুতে পশ্চিম ইউরোপে এবং আমেরিকায় সরকারী নীতিনির্ধারক মহলের প্রচলিত কথা। আটত্রিশ বছর পরে ১৯৭৮ সালে গুচ-এর মতকে সমর্থন জানিয়ে লণ্ডন থেকে মাইকেল হাওয়ার্ড লিখেছিলেন: "১৯৪৫ সালে পশ্চিমী দুনিয়ায় সম্ভবত কেউই ছিলেন না (সোভিয়েত ইউনিয়নে আরও কেউ ছিলেন না) যারা বিশ্বাস করতেন না যে, যে যুদ্ধ তারা লড়েছেন ও জয় করেছেন তা শুধু প্রয়োজনীয় ছিল না, সর্ব অর্থে ছিল 'ন্যায়সঙ্গত'।" নৈতিকতার লঙ্ঘনের দিকে থেকে হিটলার অপরাধী, অতএব তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করাটা প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত—এটাই ছিল হিটলার থিসিসের মূল বক্তব্য। এই বক্তব্যকে উপস্থাপিত করার সময় সুচতুরভাবে গোপন রাখা হয়েছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তিনটি বড় ঘটনা—জার্মানির নাৎসীবাদ ও ইটালীর ফ্যাসীবাদের প্রতি ইঙ্গ-ফরাসী তোষণ নীতি, ১৯১৯ সাল থেকে ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে আমেরিকার বিচ্ছিন্ন থাকা এবং ১৯৩৯ সালে রুশ জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি হিটলার থিসিস আলোচনার সময় মিত্রশক্তিবর্গ কোন মিথ্যাচারণ করে নি, শুধুমাত্র এই তিনটি মৌলিক সত্যকে উপস্থাপিত হতে দেন নি। পি. এম. এইচ. বেল (P. M. H. Bell) তাঁর 'দ্য অরিজিনস্ অফ দ্য সেকণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ইন ইউরোপ' (The Origins of the Second World War in Europe) গ্রন্থে লিখেছেন:

"সেই বীভৎস মানুষটির (অর্থাৎ হিটলারের) অপরাধের বাইরে চোখ মেললে প্রশ্ন ওঠে আমেরিকার বিচ্ছিন্নতা অথবা ইংরাজ তোষণনীতি বা নাৎসী-সোভিয়েত চুক্তি নিয়ে যে প্রশ্নগুলিকে এই সময় সরিয়ে রাখা হয়েছিল, ঘুমন্ত কুকুরের মত শুয়ে থাকতে দেওয়া হয়েছিল।"[৩] হিটলারের যুদ্ধাপরাধের নীচে সুকৌশলে তিনটি যুক্তির স্তম্ভকে খাড়া করা হয়েছিল—সাধারণ বুদ্ধি (common sense), নৈতিকতা (morality) এবং অবস্থার চাপ (expediency)। আর এই তিনটিকে দেখিয়ে যুদ্ধের কারণকে চমৎকারভাবে সরল করে দেওয়া

হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ কি এই নিয়ে বিতর্ক তখনো শেষ হয় নি। জনমানসে যুদ্ধের জটিলতাকে বোঝার মতন অবস্থাও ছিল না। সেই সুযোগ নিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত বিতর্কের ঝড়কে প্রশমিত হতে না দিয়ে তার প্রসঙ্গ টেনে গুচ্ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা হিটলারের নৈতিক অপরাধের তত্ত্বটিকে জবরদস্তভাবে বুদ্ধিজীবীদের মগজে পুরে দিলেন আর সেখান থেকে তা প্রযুক্ত হতে লাগল পত্র-পত্রিকায় জনগণের মগজ ধোলাইয়ের কাজে।

হিটলার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই হিটলারের শাসনতন্ত্র ও তার ভূমিকা নিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ায় নানারকম প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। প্রশ্নগুলি মূলত এইরকম, নাৎসী শাসনব্যবস্থা কি এককেন্দ্রিক (monolithic)—শুধুমাত্র ফুয়েরারে (Fuehrer) হুকুমে চলা একটি সংগঠন ? নাকি এর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য আত্মপ্রত্যয়ী, বিবদমান গোষ্ঠী যাদের মধ্যে চলমান ভারসাম্য রক্ষার প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছেন ফুয়েরার ? হিটলার নিজে কি একজন ম্যাকিয়াভেলিয়ান যাঁর কাছে লক্ষ্যই প্রধান, লক্ষ্য চরিতার্থতার পথে নৈতিকতার প্রশ্নটি অর্থহীন ? নাকি তিনি ভ্রান্ত হলেও আপন বিশ্বাসে স্থির, আপন অন্বেষণে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয়শীল ? না কি শেষ পর্যন্ত তিনি একজন মনোরোগী যিনি ঘৃণা-বিদ্বেষ-আক্রোশের অস্থির তাড়নায় দিশাহারা ? তিনি কি স্বাধীন, না অর্থপুঁজির (finance capital) দাস, সাম্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য বুর্জোয়াদের সৃষ্ট নতুন হাতিয়ার ? তিনি নিজে সেনাবাহিনী ও সামরিক অফিসারদের নিয়ন্ত্রক, নাকি তাদের খামখেয়াল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাছে নতজানু একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন নায়কমাত্র ? এই প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছিল যুদ্ধের অনেক আগে ; যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং পরেও এগুলির মীমাংসা হয় নি। আসলে মিত্রশক্তিবর্গ যতই হিটলারের উপর যুদ্ধের দায়িত্ব চাপিয়ে দিন না কেন যুদ্ধের অভিশাপকে ডেকে আনতে তাঁদের ভূমিকা যে কিছু কম নয় তা তাঁরা জানত। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই মিত্রশক্তির ঐক্য ভেঙ্গে যেতে থাকে। ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও আমেরিকার ঐক্য দাঁড়িয়েছিল এক সাধারণ শত্রুর মুখোমুখী। সেই শত্রু যখন নিপাত গেল তখন কার উপর তাঁরা যুদ্ধের দায়িত্ব চাপাবেন ? হিটলার থিসিস এবার ভাঙতে শুরু করল। ১৯৪৮ সালে যুদ্ধোত্তর পর্যায়ের ঠাণ্ডালড়াই যখন শুরু হল জবরদস্তভাবে তখন ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল পরস্পর কালিমালেপনের কালো সাপ। সেই বছর আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেণ্ট থেকে 'নাৎসী-সোভিয়েত সম্পর্ক' (Nazi-Soviet Relations) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হল। পরাজিত জার্মানির মহাফেজখানাগুলি থেকে গোপন দলিলগুলি উদ্ধার

করে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা দেখিয়ে দিলেন যে যুদ্ধের অনেক আগের থেকে রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে বড় মাপের দেওয়া-নেওয়া হচ্ছিল। মার্কিন মহল থেকে নতুন করে একটি তত্ত্ব দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছিল এই মর্মে যে যুদ্ধের জন্য স্তালিন এবং হিটলার দু'জনে সমানভাবে ও যুক্তভাবে দায়ী। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে অচিরেই এর জবাব দেবে এটাই ছিল অবশ্যম্ভাবী। যে বছর আমেরিকা নাৎসী সোভিয়েত সম্পর্কের গোপন দলিল প্রকাশ করল সে বছরই সোভিয়েত দেশ থেকে বের হল 'ইতিহাসের মিথ্যাচারীগণ' (Falsifiers of History)। এই গ্রন্থে দুটি অভিযোগকে দাঁড় করান হল। এক, ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে আমেরিকার পুঁজিপতি ব্যাঙ্কার ও শিল্পমালিকরা জার্মানির যুদ্ধাস্ত্র শিল্পকে গড়ে তোলার জন্য সমস্ত রকম মদত জুগিয়েছিল। দুই, ব্রিটেন ও ফ্রান্স সমাজতন্ত্রী রাশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য হিটলারকে সমস্ত রকমভাবে তোষণ করেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৪০এর যে হিটলার থিসিস আমেরিকা ও রাশিয়ার মদতপুষ্ট হয়ে একটা অখণ্ডবোধ হিসাবে প্রচারিত হয়েছিল সেই থিসিসের অন্তরালে সর্বসম্মতির দুর্বল সমর্থনটি ধ্বসে গেল। হিটলাবের মুখোমুখী পূর্ব-পশ্চিম ঐক্যের যে ভারটি সুচারুভাবে সাজানো হয়েছিল তা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চাপে গুঁড়িয়ে গেল। চল্লিশের দশকের শুরুতে মহাযুদ্ধের ঐতিহাসিক কারণ খুঁজতে একটা রুশ-মার্কিন অংশীদারী চালু হয়েছিল। সেই অংশীদারী তলিয়ে গেল। এবার শুরু হল ইতিহাস রচনায় অনৈক্যের যুগ। এরপর থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমস্ত প্রশ্ন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পটভূমিকা থেকে আলোচিত হতে লাগল।

কোন বড়মাপের যুদ্ধের পেছনে অনেক সময় একটা অনিবার্যতার তত্ত্ব খোঁজা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আলোচনা করতে গিয়ে স্বয়ং হিটলার এই ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ

"অন্যায় করা হবে যদি ভিয়েনা সরকারকে এ বলে তিরস্কার করা হয় যে, যে যুদ্ধ এড়ানো যেত তাকে তাঁরা উস্কে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ ঘটত অনিবার্য-ভাবে, শুধু দু-এক বছরের জন্য হয়ত তাকে পিছিয়ে দেওয়া যেত।"[৪] "যা ঘটেছে তা ঘটতে বাধ্য ছিল, কোন অবস্থাতেই তাকে এড়ানো যেত না।"[৫] "১৯১৪ সালের যুদ্ধ জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় নি। সমস্ত জনগণই বরং তাকে চেয়েছিল।"[৬] চিরকালের মত অনিশ্চিতির অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য একটা বাসনা দেখা দিয়েছিল।"[৭] "শেষ পর্যন্ত অনেক অন্ধ বছর পার হয়ে মানুষ স্পষ্ট করে ভবিষ্যৎকে দেখতে পেরেছিল।"[৮] "জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দীর্ঘকাল ধরে জনজীবনের অনিশ্চিতিতে ক্লান্তবোধ করেছিল।

অতএব অস্ট্রো-সার্বিয়ান বিরোধ এড়ানো যেত এ কথা কারো পক্ষে বিশ্বাস না করাই ছিল স্বাভাবিক। সুতরাং তারা সমস্যার র‍্যাডিকাল মীমাংসা চাইছিল। যে লক্ষ মানুষ এটি চাইত আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।"[৯] "আমি বিশ্বাস করতাম যে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার কাছ থেকে নিজের সন্তোষ আদায় করতে লড়াই করেছে একথা ঠিক নয়, বরং জার্মানি তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে লড়াই করেছে—জার্মানি জাতি লড়াই করছে তার হওয়া-না-হওয়ার, তার স্বাধীনতা ও তার ভবিষ্যতের জন্য। বিসমার্কের কাজ শেষ হওয়া দরকার ছিল।"[১০]

হিটলার এইভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখলেন যে জার্মান জাতি নিজের হওয়া-না-হওয়ার প্রশ্নটি মীমাংসা করতে যুদ্ধে গেছিল। এ কথার এক নিশ্চিত লজিক ছিল এবং তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যতখানি সহজে বলা যেত ঠিক ততখানি সহজেই বলা যেত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। বিসমার্কের সময় থেকে জার্মানি ভাষাভাষি জনগণ যে জাতিসত্তা গঠনের কাজ শুরু করেছিল সে-কাজ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শেষ হয় নি। একটি দু'দশক-বিরতির পর সেই অসম্পূর্ণ কাজ আবার আরম্ভ হয়েছিল তিরিশের দশকে। বিসমার্কের প্রতিশ্রুতিকে পরিণতির পথে নিয়ে যাওয়ার পেছনে ইতিহাসের যে মিশন কাজ করেছে হিটলার তাকেই ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য শক্তির অনিবার্য নির্দেশ বলে মনে করেছেন। "মানুষ স্পষ্ট করে ভবিষ্যৎকে দেখতে পেরেছিল" কোন্ "অনেক অল্প বছর পার হয়ে"? সেগুলি বিসমার্কের ক্ষমতাচ্যুতির ঠিক পরের আর হিটলারের ক্ষমতা দখলের ঠিক আগের বছরগুলি নয় কি? ভার্সাই চুক্তির পর থেকে জার্মান জনজীবনে যে অনিশ্চিত সেই অনিশ্চিতকে কি জনগণ কাটিয়ে উঠতে চায় নি? এই অনিশ্চিতকে কাটিয়ে আপনার বর্ধিষ্ণু জাতিসত্তার বেগবান স্বরূপটিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাতে মার খেতে দেখে জার্মান জনমানসে গভীর বেদনার সঞ্চার হয়েছিল। তারই মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছিল দিশাহারা জাতির একনায়ককের পদতলে সমবেত আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে বিপন্ন অস্তিত্বের সংরক্ষণের প্রয়াস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি।

সূত্রনির্দেশ

1 "While the responsibilties of the war of 1914 remain a subject of controversy, the conflict which began with the Garman attack on Poland on September 1st, 1939, presents

few difficulties to the historian. Opinions naturally differ on the use of their victory by the Allies during the twenties on Anglo-French policy in regard to the dissatisfied powers since 1931 ; but the revelation of Hitler's Napoleonic ambitions in March 1939, quickly followed by demands incompatible with Polish independence, places the guilt of the new conflagration squerely on his shoulders"... G. P. Gooch, The coming of the War, "Contemporery Review", July 1940, p 9

2 "There can have been few people in the Western World (and even fewer in the Soviet Union) who did not believe in 1945 that the war which they fought and won had been not only necessary but in every sense 'just'" . ... Michael Howard, "War and the liberal conscience" (London 1978) p 115

3 "To look further than the guilt of that appalling man might raise question about American Isolation, or British appeasement, or the Nazi-Soviet Pact, which at that stage were better left, like sleeping dogs, to lie"...... P. M. H. Bell, "The Origins of the Second World War in Europe", 1986, (Third impreseion, 1987), pp 39-40

4 "It is really unjust to the Vienna governmental circles to reproach them with having instigated a war which might have been prevented. The war was bound to come. Perhaps in might have been postponed for a year or two at the most"—Adolf Hitler, "Main Kampf, unexpurgated edition, two volumes in one, 1988, Jaico India paperback edition, p 144

5 "What came was bound to come and under no circumstances could it have been avoided". "Ibid"

6 "The war of 1914 was certainly not forced on the masses ; it was even desired by the whole peope". Ibid, p 145

7 "There was a desire to bring the general feeling of uncertainty to an end once and for all". Ibid

8 "At last after many years of blindness, the people saw clearly into the furture". Ibid

9 The overwhelming majority of the people had long since grown weary of the perpetual insecurity in the general condition of public affairs. Hence it was only natural that no one believed that the Austro-Serbian conflict could be shelved. Therefore they looked forward to a radical settlement of accounts. I also belonged to the millions that desired this". Ibid. pp 145-46

10 "I believed that it was not a case of Austria fighting to get satisfaction from Serbia but rather a case of Germany fighting for her own existence the German nation for its own to-be-or-not-to-be, for its freedom and for its future. The work of Bismarck must now be carried on". Ibid, p 146

ট্রটস্কী, প্রিয়ব্রাঝেনস্কি ও সমাজতন্ত্র গঠন

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

১

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সাম্প্রতিক সমস্যার সমাধানকল্পে অনেকে বলশেভিকবাদের মধ্যেই সমস্যা খুঁজে পেয়েছেন।[১] অন্য অনেকে, বলশেভিকবাদকে অখণ্ড মনে না করলেও, বামপন্থী বিরোধী গোষ্ঠীর মতামতের তথ্যানুগ মূল্যায়ণ সর্বদা করেন না। স্তালিনবাদী চিত্রায়ণ স্বীকার করে অনেকে বলেন, ট্রটস্কী, প্রিয়ব্রাঝেনস্কি প্রমুখ ছিলেন "অতি শিল্পায়ণপন্থী" এবং একই সঙ্গে সমাজতন্ত্র গঠনে আস্থাহীন।[২] বুখারিন থেকে মেডভেডেভ, কোহেন, লেউইন প্রমুখের মতে সমাজতন্ত্র গঠন প্রসঙ্গে বামপন্থী বিরোধীদের সঙ্গে স্তালিনের বিশেষ প্রভেদ ছিল না।[৩] এই বিষয়ে অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ রিচার্ড ডে করেছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক বিকাশকে সমাজ পুনর্বিন্যাস ও বিশ্ববিপ্লব প্রসঙ্গে বিতর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ট্রটস্কী ও প্রিয়ব্রাঝেনস্কির মধ্যে প্রভেদকে অতিরঞ্জিত করা, তাঁর দুই ত্রুটি।[৪]

বামপন্থী বিরোধীদের সঙ্গে স্তালিন বা বুখারিনের পার্থক্য নিছক শিল্পায়ণের হার নিয়ে ছিল না। কীভাবে সাম্যবাদের বিকাশ ঘটবে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখলের পর শ্রেণীসংগ্রামের অগ্রগতি কীভাবে হবে, তা ছিল বিতর্কের কেন্দ্রে। বামপন্থী বিরোধীরা মার্কসবাদী ঐতিহ্য অনুযায়ী সাম্যবাদকে দেখেছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর স্বোপার্জিত মুক্তির ফলশ্রুতি হিসেবে। তাঁরা জোর দিয়েছিলেন পার্টি ও রাষ্ট্রের উপর শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির এবং গণতান্ত্রিকতার সর্বময় প্রসারের ফলে আমলাতান্ত্রিক বিন্যাসের অবক্ষয়ের উপর। নিছক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নয় বরং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক ও সামাজিক সম্পর্ক গঠন এবং মূল্যবোধ ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তর ছিল তাঁদের লক্ষ্য। অর্থনৈতিক বিকাশ ছিল ঐ সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্বশর্ত তথা পরিপূরক। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট করে তুলে ধরা হল।

(ক) ১৯২৩-এর ৮ অক্টোবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে ট্রটস্কী একটি চিঠি লেখেন। এতে তিনি বলেন যে, পার্টিতে বেআইনী উপগোষ্ঠীদের উত্থানের কারণ গণতন্ত্রের অভাব এবং কঠোর অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রমিক ও কৃষকদের অসন্তোষ। ঐ চিঠিতেই পরে তিনি বলেন, বাণিজ্যিক ও শিল্প সংকটের কারণ পরিকল্পনার অভাব। পরিকল্পিত বিকাশ ছাড়া কাঁচি সংকট ও শিল্পক্ষেত্রে অপচয় রোধ অসম্ভব। এরপর আবার পার্টির পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সর্বস্তরে সম্পাদকরা সদস্যদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও উপর থেকে মনোনীত ব্যক্তি হওয়ায় পার্টিতে অসুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।[৫]

(খ) ১৫ অক্টোবর ৪৬ জন সুপরিচিত পার্টিকর্মী পলিটব্যুরোর কাছে একটি গোপন দলিল পেশ করেন। ৮ অক্টোবরের চিঠি ও এই দলিল ছিল বামপন্থী বিরোধীগোষ্ঠী গঠনের মূল রাজনৈতিক ভিত্তি। এতেও গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্যাকে যুক্ত করে দেখা হয়।[৬]

(গ) এই চাপের ফলে শেষবারের মত বলশেভিক পার্টিতে সর্বস্তরে খোলামেলা আলোচনা শুরু হয়। এই সময়ে ট্রটস্কীর সমাজতন্ত্র গঠন বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে তিনটি উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হল :

(১) "ক্ষমতা দখল করায় ও গৃহযুদ্ধের ফলে তা সংহত করায়, আমাদের মুখ্য সমস্যা সরে গেছে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের চাহিদার দিকে।"

(২) "লেনিন আমাদের বলেছেন, আমাদের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সমস্যা ছাড়া সংস্কৃতির জন্য সংগ্রামের পথে আর কিছুই বাধা সৃষ্টি করে না।"

(৩) "নৈতিকতার সমালোচনাত্মক রূপান্তর প্রয়োজনীয়, যাতে প্রগতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও চিরাচরিত রক্ষণশীল জীবনের ধারা অব্যাহত না থাকে···। অন্যদিকে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে সামান্যতম সাফল্য, শ্রমজীবী পুরুষ ও নারীর সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি, আমাদের সূক্ষ্মতর উৎপাদনের ক্ষমতা এনে দেবে, সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ের বিকাশে সাহায্য করবে। তা আবার নৈতিকতার ক্ষেত্রে নতুন বিজয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। এইভাবে, দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক আছে।"[৭]

বিশ্ববিপ্লব ও সমাজতন্ত্র গঠনের আন্তঃসম্পর্কের প্রসঙ্গেও বামপন্থীবিরোধী গোষ্ঠীর সদস্যরা এক নির্দিষ্ট বিপ্লবী দিশার পরিচয় দেন। [এ প্রসঙ্গে ইতিহাস অনুসন্ধান-২ ও ৩-এ আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।] প্রিয়রাঝেনস্কির একটি প্রবন্ধ থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনার এই অংশটি শেষ করব :

(ঘ) [১] "যদি একটি পেটিবুর্জোয়া, কৃষিভিত্তিক দেশের বদলে একটি শিল্পোন্নত দেশ সর্বাগ্রে নিজেকে সমাজতান্ত্রিক নিঃসঙ্গতার মধ্যে আবিষ্কার করত, তবে সেই দেশের অর্থনৈতিক পলিসী···হত ভিন্ন—যদি অবশ্য তেমন কোনো দেশ, অপ্রতুল আভ্যন্তরীণ কৃষিভিত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনে বেশীদিন টি'কে থাকতে পারত আমরা অন্যদিক থেকেও একই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি। ধরা যাক, যদি এখনি জার্মানীতে···একটি প্রলেতারীয় বিপ্লব ঘটে···তবে কি আমরা আমাদের নয়া অর্থনৈতিক পলিসী [নেপ] বাদ দিয়েই চলব··· ? ···[অবশ্যই কিছুটা পরিবর্তন হত, কিন্তু] নেপের যতটা বাকি থাকবে তা হল তার অবিচ্ছেদ্য অংশ যা হল একটি কৃষক-প্রধান দেশে শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক পলিসী।" সুতরাং, বিশ্ব বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে অভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রাম প্রসঙ্গে নিষ্ক্রিয়তার কথা তাঁরা বলেন নি। নেপ-কেও নিছক সাময়িক পশ্চাদপসরণ মনে করেন নি। প্রশ্নটা হল, নেপের অর্থনীতি, যা ছিল "মিশ্র", অর্থাৎ বুর্জোয়া অর্থনীতিতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, তা থেকে সামাজিকৃত অর্থনীতির দিকে অগ্রগতি কীভাবে হবে।

(ঘ) [২] "যে মুহূর্তে সমাজতান্ত্রিক শাসনে শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কাজের জন্য ব্যক্তিগত পারিশ্রমিকের বদলে যৌথ পারিতোষিকের দিকে পা বাড়াবেন ; তা হয়ত সাম্যবাদের জন্য সংগ্রামের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকরণের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।··· নতুন পদ্ধতি শ্রমিকদের··· সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও আচার-ব্যবহারের উপর যে দাবী জানাবে, তরুণরা দ্রুততর বেগে তার আলোকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হবেন।"[৮] অর্থাৎ সাম্যবাদী সমাজ-গঠন শিল্পায়ণের সমার্থক নয় এবং চেতনার রূপান্তর কোনো অর্থেই গৌণ নয়।

এই আলোচনা মাথায় রেখেই অর্থনৈতিক বিতর্কের দিকে তাকাতে হবে।

২

১৯২০-এর দশকে সোভিয়েত অর্থনীতি ছিল একটি "অনগ্রসর" অর্থনীতি, (যদিও "অনগ্রসরতা তত্ত্ব" তখন সৃষ্ট হয় নি)।[৯] ১৯২১-এ প্রচণ্ড রাজনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করতে নয়া অর্থনৈতিক পলিসী বা নেপ গ্রহণ করা হয়। যদিও তা প্রথমে দেখানো হয়েছিল "পিছুহঠা" বলে, তাহলেও, বাস্তবে, "যুদ্ধ সাম্যবাদের" অবাস্তব ও ক্ষতিকর অবস্থা থেকে এই ছিল বেরিয়ে আসার পথ। নেপের প্রধান দিক হল কৃষকের কাছ থেকে জোর করে শস্য

আদায় করার পরিবর্তে একটি কৃষি-কর চালু করা, যা দিতে হবে পণ্যে, রুবলে নয়। উদ্বৃত্ত শস্য কৃষকদের বিক্রী করার অধিকার দেওয়া হল।

১৯২১ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত সোভিয়েত অর্থনীতি একের পর এক সংকটে পড়ে।[১০] শেষপর্যন্ত সংকটমোচনের পথ হিসেবে গৃহীত হল স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যৌথ খামার গঠন ও ভারী শিল্পের বিকাশ। কিন্তু এর বিভিন্ন বিকল্প ছিল। সংকটগুলির ও বিভিন্ন প্রস্তাবিত সমাধানের পর্যালোচনা থেকে বামপন্থী বিকল্পের চরিত্র বোঝা যাবে।

১৯২১-২২-এ অর্থ দপ্তরের কমিশার সোকোলনিকভ ছিলেন অর্থনীতির ডক্টরেট, ফলে স্বভাবত প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। মুদ্রার স্থিতিশীলতাই সবচেয়ে বড় চাহিদা, এই বিশ্বাসবশত তিনি শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ঋণ কমান এবং কঠোরভাবে লাভ-ক্ষতির হিসেব অনুযায়ী কাজের দাবী করেন। ফলে যে-কোনোভাবে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীর হিড়িক পড়ে গেল এবং প্রয়োজনীয় মূলধন পুনরুদ্ধারের কাজে বাধা পড়ল। এই ছিল ১৯২১-এ razbazarovanic বা নয়ছয় সংকট। এর প্রতিকারের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি জোট বেঁধে glavks বা ট্রাস্ট গঠন করে পণ্যে দাম বাড়ায়। ১৯২৩৫-এর গোড়ায় দেখা দিল নতুন সংকট—কাঁচি সংকট বা scissors crisis। ১৯২৩-এ দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসে ট্রটস্কী এ বিষয়ে সাবধানতার কথা বলেন, কারণ সুষম বিনিময় না হলে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১১] তিনি বলেন কৃষিপণ্য ও শিল্পপণ্যের মূল্যসূচককে কাঁচির দুটি ফলার মত দেখলে এখন কাঁচি ক্রমেই খুলে যাচ্ছে, প্রয়োজন তাকে বন্ধ করা। ১৯১৩-কে ১০০ ধরলে ১৯২৩-এর ১ অক্টোবরে কৃষিপণ্যের পাইকারী হার ছিল ৪৯, আর শিল্পপণ্যের খুচরো হার (কৃষক যে হারে কিনত) ছিল ১৮৭।[১২]

পার্টি-নেতৃত্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ এই সমস্যার সমাধান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতই ভেবেছিলেন, অর্থাৎ তাঁরা শিল্পক্ষেত্রে আবার ঋণ কমিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সস্তায় বিক্রী করতে বাধ্য করার কথা বলেছিলেন। ট্রটস্কী, প্রিয়ব্রাঝেনস্কি, পিয়াতাকভ প্রমুখ এই মতের বিরোধী ছিলেন। তাঁরাই প্রথম এই সংকট ও তার শ্রেণীগত সমস্যার প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁরাই কাঁচির মুখ বন্ধ করতে ও কৃষকের স্বার্থ দেখতে বলেছিলেন। কিন্তু, তাঁরা একথাও বলেছিলেন যে, নিছক ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সহজ সমাধান প্রলেতারীয় ব্যবস্থার উপযোগী সমাধান নয়। আবশ্যক এমন পন্থা, যা নেপ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁদের তিনটি প্রস্তাব ছিল :

(১) রাষ্ট্রীয় ঋণ বৃদ্ধি করে শিল্পের, বিশেষত "হাল্কা", অর্থাৎ ভোগ্যপণ্য

উৎপাদনকারী শিল্পের, বিকাশ ঘটানো, যাকে গ্রামীণ চাহিদার মোকাবিলা করা যায় ;

(২) দীর্ঘমেয়াদী বিকাশের স্বার্থে ভারী শিল্পে বিনিয়োগ ; এবং

(৩) শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষতি না করে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য কৃষিপণ্যের রপ্তানীর উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।

বামপন্থীরা সতর্ক করে দেন যে, গ্রামাঞ্চলের সমৃদ্ধি যদি প্রলেতারীয় নেতৃত্বে না হয়, যদি তা নিজের পথে চলে, তবে কৃষকদের মধ্যে আয়ের অসাম্য শ্রেণীগত বিভাজনের জন্ম দেবে ও কুলাকদের হাত শক্ত করবে। তাঁরা আরো বলেন যে, শিল্পায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের বেশ কিছুটা আনতে হবে গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত মূল্যকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হস্তান্তর করে।[১৩]

কাঁচি সংকট ছিল গভীরতর এক সংকটের একটি অভিব্যক্তি মাত্র। তা হল "দ্রব্য দুর্ভিক্ষ" (goods famine) ; অর্থাৎ শিল্পজাত পণ্যের অভাব। এখানে নেতৃত্ব ও বামপন্থী বিরোধী গোষ্ঠীর প্রস্তাবের মধ্যে কোনোরকম মিলই ছিল না।

১৯২৩-২৪-এ স্তালিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন, সোকোলনিকভ, রাইকভ, টমস্কী প্রমুখের যে জোট, তার নীতি ছিল কৃষিক্ষেত্রে বাজারে আনা যায় এমন উদ্বৃত্ত যাতে দ্রুত বাড়ে, সেই দিকেই শুধু নজর দেওয়া। এর তত্ত্বগত ব্যাখ্যা করেন বুখারিন ঃ

"আমাদের সমগ্র কৃষক-সমাজকে, তাদের সবকটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরকেই, বলতে হবে ঃ নিজেদের সমৃদ্ধ করুন, সঞ্চয় বাড়ান, আপনাদের খামারগুলির বিকাশ ঘটান।...আমাদের এখন এমন এক পলিসীর রূপায়ণ করতে হবে, যার ফল হবে দরিদ্রদের অবলুপ্তি।"

কৃষিক্ষেত্রে সঞ্চয়ের অর্থ আমাদের শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা। এই চাহিদা আবার শিল্পে বলশালী বৃদ্ধি ঘটাবে, যার সুস্থ প্রভাব পড়বে কৃষিতে।"[১৪]

কৃষি থেকে কীভাবে উদ্বৃত্ত শিল্পে আসবে, তার বুখারিন প্রস্তাবিত পন্থা ছিল ঃ "আমরা কুলাকের [ব্যাঙ্কে গচ্ছিত] আমানত ব্যবহার করব..."।[১৫]

বস্তুত, এ ছিল বহু ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি। প্রথমত, উদ্বৃত্ত থাকত প্রধানত কুলাকের হাতে, তাই অনিয়ন্ত্রিত মুনাফায় দরিদ্র কৃষকের লাভ হয় নি। দ্বিতীয়ত, ১৯২৫-এর মধ্যে রুশ শিল্প তার ১৯১৩-র স্তরে পৌঁছে যায়। এতদিন উৎপাদনের ক্ষমতার চেয়ে কম উৎপাদন হচ্ছিল বলে নতুন বিনিয়োগ ছাড়াই যেন শিল্প বেশ চলছিল। কিন্তু এবার শিল্পজাত পণ্য যথেষ্ট

পরিমাণে সরবরাহ করা এক জরুরী ও জটিল সমস্যা হিসেবে দেখা দিল। তৃতীয়ত, ব্যাঙ্কে রাখা টাকায় তখন ছিল ৫% সুদ। রাষ্ট্র চড়া হারে লাভ না করলে সুদের হার বাড়ানো সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে শস্য বিক্রী না করে ধরে রাখলে অনেক চড়া মুনাফা করার সুযোগ ছিল কুলাকদের সামনে। বামপন্থী বিরোধীদের এ বিষয়ে সতর্কীকরণ নেতৃত্ব কানে তোলেন নি। কিন্তু ১৯২৫-এ দেখা দিল শস্য ধর্মঘট (grain strike)। এই সংকটের ফলে লেনিনগ্রাদের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। চাপে পড়ে বুখারিনের বিরুদ্ধে গেলেন লেনিনগ্রাদের পার্টিনেতা পিটার জালুটস্কি এবং তাঁর চাপে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ।

এই অবস্থাতেই ট্রটস্কী ও প্রিয়ব্রাঝেনস্কির মতামতের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। ট্রটস্কী লেখেন "ধনতন্ত্রের পথে না সমাজতন্ত্রের পথে ?" এবং প্রিয়ব্রাঝেনস্কি লেখেন "নতুন অর্থনীতি" ও অন্যান্য কিছু প্রবন্ধ। রিচার্ড ডে দাবী করেছেন, এই দুটি বইয়ের তথা দুই লেখকের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু প্রিয়ব্রাঝেনস্কি স্বয়ং একটি প্রবন্ধে ট্রটস্কীর সঙ্গে পূর্ণ সংহতি জ্ঞাপন করেন।[১৬]

এখানে ঘটনা পরম্পরার ব্যাখ্যা ত্যাগ করে সংক্ষেপে অর্থনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশতত্ত্ব (development theory) এবং সোভিয়েত "মার্কসবাদ" অনুযায়ী, মোট, বিশেষত মোট রাষ্ট্রীয় অর্থকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—বর্তমানে ভোগের অর্থ এবং উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ (current consumption fund, productive investment)। কিন্তু ট্রটস্কী, প্রিয়ব্রাঝেনস্কি এবং তাঁদের অনুসরণ করা ম্যাণ্ডেল[১৭] দেখিয়েছেন যে উচিত এক ত্রিমুখী বিভাজন করা—উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ, উৎপাদকের বর্তমান ভোগের অর্থ এবং উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যয়। সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ণ ও সমাজতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা গড়ার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ক্ষেত্রেরই ভাগে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। গণতন্ত্র, পরিকল্পনা ও সমাজতন্ত্রের যোগসূত্রও এখানেই। কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন শ্রমিকশ্রেণী নিজের তাৎক্ষণিক চাহিদা সব বিসর্জন দেবে, এমন হতে পারে না। সমাজতন্ত্র গঠন শ্রেণীর নিজের মুক্তির ফল, এই যদি হয়, তবে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনাই তার অর্থনৈতিক দিকটির যথাযথ বিকাশ ঘটাবে।

শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে এই গঠনকার্য সম্পন্ন হতে পারত না, পারেও নি। ট্রটস্কী বলেন, সোভিয়েত অর্থনীতি ও বিশ্ব ধনতান্ত্রিক

অর্থনীতির তুলনামূলক উৎপাদনক্ষমতা একটি মৌলিক বিষয়, কারণ ধনতন্ত্র তার উন্নত অবস্থানকে ব্যবহার করে সোভিয়েত অর্থনীতিকে ধনতান্ত্রিক বাজারের নাগপাশে জড়াতে চাইবে। অথচ, তাঁর মতে, বিশ্ববাজারের সঙ্গে বাণিজ্যও অনিবার্য, কারণ কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শিল্পক্ষেত্রের বিনিময় বৈর দ্বন্দ্বে পরিণত হবে, যদি কৃষি থেকে সবটা প্রয়োজনীয় মূলধন নেওয়ার চেষ্টা হয়। বরং বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে ভোগ্যপণ্য আমদানী, বৈদেশিক ঋণ এবং তার সাহায্যে শিল্পায়ণের কথা বলা যায়। বস্তুত, বুখারিনের ভ্রান্ত নীতি, যা ১৯২৫-এর শস্য ধর্মঘটের ধাক্কার পর আর আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিল না, এবং স্তালিনের একতরফা ভারী শিল্প গঠন ও কৃষক শোষণ করে তার মূলধন আদায় করা, এই দুই বিপদ সম্পর্কেই বামপন্থীরা অবহিত ছিলেন, এবং দুটিকে এড়িয়েই এক প্রলেতারীয় নীতির প্রস্তাব করেন। তাঁরা এ কথাও বুঝেছিলেন যে, শ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি ছাড়া তাঁদের নীতির বিজয় সম্ভব নয়। তাই পার্টি ও রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বৃদ্ধি পরিকল্পনা, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ও বিশ্ববিপ্লব তাঁদের কর্মসূচীকে একসঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছিল। প্রিয়ব্রাঝেনস্কির রচনা থেকে দুয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা গুটিয়ে আনা যায়ঃ

"যদি বা শিল্পক্ষেত্র অংশত কৃষকদের উদ্বৃত্তের সাহায্যেই নিজের সম্প্রসারণ ঘটাত, তবে তার পরস্পরবিরোধী ফল হত এবং শিল্পের ও রপ্তানীর জন্য কৃষিজ সম্পদ আসা বৃদ্ধির হার পড়ে যেত। গভীরতর স্তরে, যতদিন অর্থনীতিতে দুটি ভিন্ন উৎপাদনব্যবস্থা থাকে, যারা অ-সম কৌশলের সাহায্যে উৎপাদন করে, ততদিন এক নির্দিষ্ট স্তরে শিল্পের বিকাশ এত দ্রুত হবে যে কৃষি সেই শিল্পায়ণের ব্যয় বর্ধন করতে বা প্রযুক্তির স্বার্থে আবশ্যক ফসল সরবরাহ করতে পারবে না।"

"[শিল্প বিকাশের স্বার্থে তার কৃষিভিত্তিরও দ্রুত বৃদ্ধি আবশ্যক, কিন্তু] এই বিশাল কর্তব্য ছিল সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের একক ক্ষমতার বাইরে। এখানে রাশিয়ার উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নির্ভর করত পাশ্চাত্যের প্রলেতারীয় বিপ্লবের উপর ও ইউরোপীয় মাপে উৎপাদিকা শক্তির পুনর্গঠনের উপর।"[১৮]

১৯২৭-এ লেখা একটি প্রবন্ধে[১৯] তিনি সাতটি দ্বন্দ্বের কথা বলেন, যা ভারসাম্যের পথে বাধা। তার মধ্যে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রের এবং শিল্প-ক্ষেত্রে তার ভিতর ভারী ও হাল্কা শিল্পের, বিনিয়োগ ও বিকাশে সামঞ্জস্য না থাকলে যে বিপদ আসবে, তা তিনি বলেন।

পরবর্তীকালে, ১৯৩০-এর দশকে, এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ট্রটস্কী ও প্রিয়ব্রাঝেনস্কি স্তালিনের নীতির সমালোচনা করেন।[২০] তাঁদের মতে, কেবল

ভারী শিল্পের উপর একতরফাভাবে জোর পড়ার ফলে এবং শিল্পায়ণ যথেষ্ট অগ্রসর হওয়ার আগে "দেশজুড়ে যৌথ খামার গঠনের ফলে, অর্থনীতির ক্ষতিই হবে। তা আমলাতান্ত্রিক চক্রের হাত শক্ত করবে, শ্রমিক-কৃষকের নয়। ১৯৩৪-এর পার্টি কংগ্রেসেও প্রিয়ব্রাঝেনস্কি স্তালিনের যে প্রচ্ছন্ন সমালোচনা করেন, এই ছিল তার মূল কথা।"[২১]

সুতরাং, (১) কৃষি ও শিল্পের সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব ; (২) সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব ও তার চাপ ; (৩) সমাজতন্ত্র গঠনে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক ও মানসিকতা গঠনের গুরুত্ব, এর ভিত্তিতে বামপন্থীদের চোখে সমাজতন্ত্র গঠনের অর্থ ছিল বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী প্রসার, শ্রমজীবী মানুষের সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং সেই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই অর্থনৈতিক বিকাশ।

সূত্রনির্দেশ

১ যথা P. Corrigan, H. Ramsay and D. Sayer—Socialist Construction and Marxist Theory, New York & London, 1978
২ দ্রঃ, J. Stalin—History of the CPSU (B)—Short Course, এবং J. Stalin—On the Opposition
৩ দ্রঃ, XVI S'yezd VKP : Stenograficheskii Otchet, Vol 3, p 363, Moscow ; R. Medvedev—On Stalin and Stalinism ; S. F. Cohen—Bukharin and the Russian Revolution ; M. Lewin—Political Undercurrents in Soviet Economic Debates, Princeton, 1974
৪ R. B. Day—Leon Trotsky and the Politics of Economic Isolation, Cambridge, 1973
৫ Leon Trotsky—The Challenge of the Left Opposition Vol 3, New York, 1980, pp 51, 52, 53, 54
৬ Ibid., pp 397-403
৭ L. Trotsky—Problems of Everyday Life, New York, 1979, p 15, 17, 30
৮ E. A. Presbrazhensky—The Crisis of Soviet Industrialisation, ed. D. A, Filtzer, London and Basingstoke, 1980, pp 20-21, 24-25
৯ এই অনগ্রসরতা ক্ষমতা দখলের আগে কি সুবিধা এনে দেবে ও পরে কেমন

জটিলতা সৃষ্টি করবে, ট্রটস্কী ১৯০৫-৬—এই তাঁর Results and Prospects পুস্তিকায় সে বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন

১০ ঐ, যুগের ইতিহাস ও সংকট ও সে-প্রসঙ্গে বিতর্কের পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন E. H. Carr—The Interiegnum ; E. H. Carr—Socialism in One Country ; E. H. Carr—Foundations of a Planned Economy ; এবং R. V. Daniels--The Conscience of the Revolution

১১ Drenadsatyi S'yezd RKP(B) : Stenograficheskii Otehet, pp 294-304

১২ Carr—The Interregnum, Harmondsworth 1969, p 187

১৩ শেষ প্রস্তাবটি করেন প্রিয়ব্রাঝেনস্কি, কিন্তু এর সমস্যা সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন, যা আলোচিত হয়েছে ১৮ নং টীকার মূল অংশে

১৪ W. I. Bukharin—Selected Writings on the State and the Transition to Socialism, ed. R. B. Day, Nottingham 1982, p 197, 1981

১৫ Ibid, p 205

১৬ Preobrazhensky—The Crisis etc, p 71

১৭ দ্র: E. Mandel—Marxist Economic Theory, Vol 2

১৮ E. A. Preobrazhensky—From NEP to Socialism London 1973, p 86 87

১৯ Preobrazhensky—The Crisis etc, article : Economic Equilibrium in the USSR

২০ দ্র: L. Trotsky—Writings 1930, New York 1975 ; এবং M. Mekler—"Obschii Krizis Kapifalisma i bor'ba drukh sistem v sveteteorii Preobrazhenskogo", in Roginsky (ed) ; Zakat Kapitalizma v trotskistskom, zerkale (O Knige E. Preobrazhenskogo, "Zakat Kapitalizma"). Moscow 1932

২১ দ্র: XVI S"yezd VKP